এই যে আমি

চার্লি চ্যাপলিন



ভাষান্তর

অর্ণব রায়



কসমো স্ক্রীপ্ট

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৬৩।

প্রচ্ছদ ও পশ্চাৎ চিত্র : কুমার অজিত

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত, ১১ নিতাই বাবু লেন, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত
ও নিউ লোকনাথ প্রেস ৮এ, কাশী বোস লেন, কলকাতা-৬, শ্রীদুলাল চন্দ্র ঘোষ
কর্তৃক মুদ্রিত।

ইন্দ্রজিৎ ও পৃথাকে

—বাবা

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	আছে	পড়তে হবে
১৬৮	সেচ্ছাচারী	স্বেচ্ছাচারী
১৭১	অ্যাডামস্	অ্যাডামস্
১৭১	ভাস্থ	ভার্থ

চিত্র পরিচিতি

...কুটোর মতো ভিড়ে পড়া যেমন, টম হ্যারিংটন এসে ভিড়েছিল আমার জীবনের ঘাটে। আমার দেখাশোনার কাজ করতো। তারই জন্যে জীবনে ঘটে গেলো এক ...টকীয় পরিবর্তন।

আগে ছিলো আমার বন্ধু বার্ট ক্লার্কের রূপসজ্জাকার এবং সব সময়ের সঙ্গী। কীস্টোন কোম্পানীতে বার্ট কৌতুকাভিনেতা। বাস্তব জ্ঞান বলতে মানুষটার কিছুই নেই। পিয়ানো বাজাতো চমৎকার। একবার বললো, এসো না দুজনে মিলে রেকর্ড কোম্পানী খুলি। রাজী হলাম। ভাড়া নেওয়া হলো শহরতলীর মস্ত এক অফিস বাড়ির তিনতলার একখানা ঘর। দুখানা রেকর্ড বের করলাম। দুটোই গানের, আমারই সুর, আমারই সব। এবং বলাবাহুল্য যাচ্ছেতাই। ছাপা হল এক দমকে দু'হাজার। তারপর প্রতীক্ষা। কোথায় খদ্দের! নিছক পাগলামী ছাড়া তো কিছুই না। তিনখানা মোট বিক্রি হলো। একখানা কিনলেন আমেরিকান সুরকার চার্লস্ ক্যাড্ম্যান। দুখানা দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি—আমাদেরই ঘরের সামনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতো রোজ। ব্যস্, বিক্রি শেষ।

অফিস দেখাশোনার দায়িত্বে বার্ট লাগিয়েছিলো টমকে। রইলো সে। একমাস পর পাততাড়ি গুটিয়ে বার্ট গেলো নিউ ইয়র্ক। অফিস বন্ধ। টম বললো যাবে না কোথাও, আমার কোন কাজে যদি লাগতে পারে তবে বর্তে যায়। শর্ত? ...লো, বার্টের সঙ্গে কাজের সময় যা যা পেতো, আমার কাছেও তাই নেবে, বেশি কিছু নয়। কত পেতে? জবাব শুনে আমি তো থ'। নাকি মাইনে বলতে কিছুই কোনদিন পায় নি। শুধু হাত খরচ। সে-ই বা কত, মোটে সাত কি আট ডলার। নিরামিষাশী মানুষ। চা খায়। আর সঙ্গে রুটি, মাখন আর আলু। দেখো কাণ্ড! মায়া হলো খুব। নিলাম কাজে। মাইনে দিতাম। রেকর্ড কোম্পানীর কাজের মাসের মাইনেও চুকিয়ে দিলাম। সেই থেকে টম হলো আমার সেক্রেটারী, আমার তত্ত্বাবধায়ক, আমার সুখ দুঃখের সাথী।

...ী নিরীহ মানুষ। চেহারা দেখে সঠিক বয়েস কত অনুমান করা যায় না। ...ঠোঁট। চালচলনে কেমন হেঁয়ালির ভাব। সাধু সন্তদের মতো মুখ। ভ্রূ ...চুতে তোলা। দৃষ্টিতে বিষাদ। যেন বিষাদের চোখ নিয়েই দেখে সব সময় ...নিয়ার যাবতীয় ঘটন-অঘটন। সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা। ঠিক আয়ারল্যাণ্ডের লোকেদের মতো। ভবঘুরে মন। আর ঐ রহস্য। নিজেকে ঘিরে হেঁয়ালি।

নিউ ইয়র্কের পুব প্রান্তের মানুষ। হওয়া উচিত ছিলো মঠের কোনো পাদ্রী,
এসে ভিড়ে পড়ল নটনটীদের এই অদ্ভুত জগতে। অবাক নয় কি

রোজ সকালে নিয়ম করে যেতো এ্যাথলেটিক ক্লাবে আমা
হাতে চিঠির বোঝা আর খবরের কাগজ। প্রাতরাশের
মাঝে দেখতাম বই রেখে গেছে আমার শিয়রের কাছে। অদ্ভুত
বই, বিচিত্র তাদের লেখক। ল্যাককাডিও হার্ন, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস। এদের
আগে আমি পড়িনি। বসওয়েলের 'জনসনের জীবনচরিত' পড়তে হয়েছিল
জন্য। জিজ্ঞেস করতে হাসতে হাসতে বলেছিলো, রাতে ঘুম আনতে সাহায্য করবে
এমনই এক চরিত্র। জিজ্ঞেস না করলে রা অব্দি কাড়ে না। প্রাতরাশ সাজিয়ে দি
কখন যে উধাও, টেরটিও পেতাম না। সে এক আশ্চর্য মানুষ। অথচ একমুহূ
তাকে না হলে আমার চলে না। বলতাম, এইটা আমার চাই, এটা করতে হবে
শুনে মাথা নাড়তো। দ্বিতীয়বার মনে করিয়ে দেবার দরকার হতো না। দেখতাম
যা চাই যা দরকার সব ঠিকঠাক হাজির।

আর সেই টেলিফোন। ফোনটা যদি না বাজতো, হয়তো জীবনের গতি আমার ভি
রকমের হতো। ক্লাব থেকে সবে বেরোতে যাচ্ছি বেজে উঠলো ঝনঝন্ করে
স্থাম গোল্ডউইন লাইনের ওপ্রান্তে।—কি ব্যাপার স্থাম?—আসবে নাকি একবা
সাঁতারে? আমার সাগর পারের বাড়িতে?

সেটা সতেরো সালের শেষ ভাগ।

মনে আছে আমার। কী যে সুন্দর সেই বিকেল। অপূর্ব। চারপাশে কত
সুন্দরীর মুখ। অলিভ টমাসও আছে। সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই। এলো মিলড্রেড হ্যারিস
সঙ্গে এক পুরুষ সাকরেদ। কি এক হ্যাম তার নাম। অপরূপ সুন্দরী মিলড্রেড
অবাক হয়ে দেখছিলাম তার রূপ। কে যেন বললো, এলিয়ট ডেক্সটারের দিকে নারি
ওর দারুণ নজর। এলিয়টও হাজির। মিলড্রেড ঘোরে ফেরে, এলিয়টের দিকে চোখ
দেখার যেন আর কামাই নেই। এলিয়ট পাত্তা দেয় না। না দিক, আমার কি।
কিসেরই বা দরকার আমার ওর কথা ভেবে। অন্য চিন্তায় তলিয়ে গেলাম।
সময় হলো। ফিরবো এবার। উঠলাম। মিলড্রেড বললো, যাবার পথে
নামিয়ে দিয়ে যেতে পারবো? যাকে নিয়ে এসেছিল, তার সাথে ঝগড়া হয়ে
সে রাগ করে ওকে ফেলে চলে গেছে।

গাড়িতে উঠে বললাম, এমনও তো হতে পারে, আপনার সঙ্গী হয়তো এলিয়ট

ডেক্সটারকে হিংসে করে তাই রাগ। বললো, করুক। এলিয়ট পুরুষ হিসেবে আদর্শ।

...আমি জানি। অন্য পুরুষের প্রতি আসক্তি দেখিয়ে নিজের প্রতি ... সৃষ্টি করা। মেয়েদের এটি চিরপরিচিত ছলাকলা। উস্কে দেবার ... বললাম, এলিয়ট দেখছি ভাগ্যবান ব্যক্তি। আসলে কথার মূল্যের ... এখন সময় কাটানো। গাড়িতে যেতে যেতে চুপচাপ না থেকে কথার পিঠে দুটো একটা কথা বলা। বললো, লোয়া ওয়েবারের ছবিতে কাজ করছে। প্যারামাউন্টের আগামী ছবিতে নাকি কাজ করবে বলে ঠিক। ওর বাসার সামনে গাড়ি থামালাম। নামলো। বাঁচা গেলো! নিশ্চিন্তি। গায়ে পড়া ধরনের মেয়ে। রূপ দেখিয়ে লোক মজিয়ে বেড়ায়। অস্বস্তি হচ্ছিল এতোক্ষণ। ঝাড়া হাত পায়ে ক্লাব বাড়িতে নিজের কামরায় ঢুকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

পাঁচ মিনিটও কাটেনি, বেজে উঠলো টেলিফোন।

ওপাশে মিলড্রেড। বললো, কি করছেন আপনি এখন?

অবাক কাণ্ড। এই রইলাম এতোক্ষণ একসাথে। পৌঁছে দিয়ে এলাম। যেন কত প্রেম আমার সঙ্গে! যেন ও আমার প্রেমিকা। পাঁচ মিনিটের অদর্শনও অসহ্য। তাই ফোন করে খবর নিচ্ছে।

বললাম, ডিনার খাবো এবার। ঘরে বসেই। তারপর বিছানা। তারপর বই পড়তে পড়তে ঘুম।

—তাই নাকি! যেন ভারী অবাক। জিজ্ঞেস করলো কি বই পড়বো। ঘরখানা আমার কেমন। আমাকে নাকি মানসচক্ষে ও দেখতে পাচ্ছে—একলা শুয়ে আছি বিছানায়, আর এপাশ ওপাশ করছি।

কথা বলার কায়দা জানে। মোহ সৃষ্টি করতে পারে। জবাব দিলাম। তারপর আরো প্রশ্ন। আরো জবাব। বললো, কবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে?

কপট ভর্ৎসনার ভঙ্গি করলাম। বললাম, দেখা হলে সেটা এলিয়টের প্রতি অবিচার হবে না কি? বললো এলিয়টকে ও নাকি তোয়াক্কাই করে না। অবিচার আবার কিসের!

বললাম, তবে আর কি, চলো দুজনে মিলে বাইরে কোথাও ডিনার খাই।

বেরোনো গেলো। ভারী মিষ্টি লাগছে ওকে। চমৎকার। তবু ভেতরে যেন ... নেই। সুন্দরী মেয়েদের দেখলে যে সাড়া যে উৎসাহ ভেতরে ভেতরে আমি ...ব করি। শুধু একটাই টান—ওর তীব্র আকর্ষণ। ওকে উপভোগ করার টান। ...য় ওরও সেটাই দাবী। তবু সেই আকর্ষণটুকুকেও রঙীন কল্পনার রঙে সাজাতে যেন ভারী কষ্ট হচ্ছে।

তারপর বেশ কদিন আর ওর কথা মনে নেই।

টম একদিন বললো, নাকি ফোন করেছিল আমায়। তখন মনে পড়লো সব। সেই মোহ। সেই আকর্ষণ। বললো, সোফারের মুখে শুনেছে, নাকি ভা[illegible] এমন সুন্দর মুখশ্রী নাকি সে কখনো দেখেনি। তখন ওর রূপের ক[illegible] সব মিলে অদম্য এক টান। সেই টান। নতুন করে আবার এক সূচনা[illegible] রাত একসাথে ডিনার, একসাথে নাচ, কত জ্যোৎস্না, সমুদ্রের পাশ দিয়ে উন্মাদের মতো গাড়ি ছোটানো। ফলে যা হবার তাই। মিলড্রেড সন্তানসম্ভবা হলো।

আর মুখ খোলেনি টম। জানি না কতখানি কি বুঝেছে। একদিন প্রাতরাশ সাজিয়ে দিচ্ছে টেবিলে, বললাম, আমি বিয়ে করবো। শুনে একটুও অবাক হলো না। নড়লো না একবারও চোখের পাতা। বললো, কবে?

—আজ কি বার?

—মঙ্গল।

—তাহলে শুক্রবারই হয়ে যাক। কাগজ পড়তে পড়তে চোখ না তুলে আমি বললাম।

—পাত্রী কি সেই মেয়েটি—মিলড্রেড হ্যারিস?

—হ্যাঁ।

একটু বিরতি। বললো, আংটি আছে আপনার?

—না। ওটা কিনতে হবে। বাকী যা যা আয়োজন করে ফেলো। আর হ্যাঁ, কেউ যেন জানতে না পারে। ঘাড় নোয়ালো। এ ব্যাপারে মাঝখানের কদিন আর টুঁ শব্দটি নেই। শুক্রবার রাত আটটায় বিয়ে। আমি স্টুডিওতে। ছবির কাজ চলছে। সাড়ে সাতটায় ঢুকলো টম। ফিসফিস করে বললো, আটটায় আপনার একটা জরুরী কাজ আছে, ভুল হয় না যেন। অমনি তাড়াতাড়ি সাজ খুলতে রং তুলতে শুরু করলাম। সাহায্য করলো টম। উঠলাম গাড়িতে। জানি না তখনও কোথায় যাবো। বললো, যাবো আমরা রেজিস্ট্রার মিঃ স্পার্কসের বাড়ি। সেখানেই মিলড্রেডের সঙ্গে দেখা হবে।

পৌঁছে দেখি মিলড্রেড আগেই হাজির।

হলঘরে বসে আছে। আমাকে দেখে আন্তরিক হাসলো। ভারী হয়ে উঠলো আমার মন। ধুলোটে রঙের জামা পরেছে। ভারী সাদাসিধে। তবু খুব [illegible] লাগছে দেখতে। টম হাতে আমার একটা আংটি গুঁজে দিল। ঘরে ঢুকলেন দীর্[illegible] এক ব্যক্তি। বেশ সপ্রতিভ। সবাই মিলে গেলাম পাশের ঘরে। বলাবাহুল্য[illegible] রেজিস্ট্রার মিঃ স্পার্কস্। বললেন, আশ্চর্য সেক্রেটারী জুটিয়েছেন বটে আপনি। আ[illegible]

আগে অব্দি বুঝতে পারিনি, বিয়ের পাত্র খোদ আপনি।

বিয়ের ব্যাপারটা যে এতো সহজ আগে জানতাম না। টমের দেওয়া আংটি পরিয়ে দিলাম মিলড্রেডের আঙুলে। বিয়ে শেষ। অনুষ্ঠানও শেষ। বেরোতে যাবো, স্পার্কস্ বললেন, চার্লি, কনেকে চুমু খাওয়াটাও কিন্তু নিয়মের মধ্যে পড়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো! আমি হাসলাম।

মিশ্র এক অনুভূতি আমার শরীরে মনে। বোকামী হলো না কি! কি এক কাণ্ড করলাম। জড়িয়ে গেলাম অযাচিত এক ঝামেলায়। এই যে মিলন,—কি এর ভিত্তি? তবু যাই হোক, অর্ধাঙ্গিনীর কল্পনা ছিল আমার মনের গভীরে। পেলাম তাকে আজ। কি হবে ভিত্তি দিয়ে? এই তো কত মিষ্টি কত সুন্দর দেখতে মিলড্রেড। বয়েস মোটে উনিশ। আমি নয় দশ বছরের বড়। ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উঠবেই একদিন।

পরদিন সকাল সকাল গেলাম স্টুডিওতে। মন কেমন ভারী। এড্‌নার সাজ-ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, এসে দাঁড়ালো দরজার মুখে। কাগজে সকালেই ফলাও করে খবর বেরিয়েছে। আমাকে অভিনন্দন জানালো।

ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এলাম। পারছি না ওর মুখোমুখি হতে। কেমন অস্বস্তি লাগছে।

ডগলাসকে বললাম, দেখো ভাই মানছি বুদ্ধি সুদ্ধি মিলড্রেডের তেমন নেই। থাকুক আমিও চাই নি। জ্ঞান বুদ্ধির আস্ত একখানা জ্ঞানকোষ বিয়ে করে আমার লাভ কি? বই পড়ে বুদ্ধি ধার করার তো আমার প্রয়োজন পড়ে না।

তবে প্রশ্ন যে একেবারে নেই তা নয়। খানিকটা উদ্বেগও। বিয়ের ফলে আমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না তো? রূপ টেনে রাখবে না তো আমায় সারাক্ষণ ওর কাছটিতে? বা আমিই কি চাই রূপে মজতে, তন্ময় হয়ে থাকতে? কি যে চাই আর চাই না কিছু ঠিক করতে পারি না। ভালবাসি না মিলড্রেডকে, কিন্তু বিয়ে যখন হয়েছে, একে সার্থক করতে চাই, মনপ্রাণ দিয়ে ওকে পেতে চাই।

আর মিলড্রেড? তার কাছে বিয়ে হলো দারুণ একটা উত্তেজনার ব্যাপার, অ্যাডভেঞ্চার যে রকম। ঠিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সব সেরা হলে যে আনন্দ হয়, অনেকটা তাই। বিয়ে থা নিয়ে বিস্তর বই সে পড়েছে। অনেক কাহিনী। বাস্তব জ্ঞান এই প্রথম। কত চেষ্টা করেছি আগামী দিনে কি করবো আমরা, কি আমাদের পরিকল্পনা তাই নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে। কানেও তোলে নি। সর্বদা কেমন এক ঘোর ঘোর ভাব। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেলে ঠিক যে রকম হয় তাই।

বিয়ের পরের পরের দিন। মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের লুই. বি. মেয়ার মিলড্রেডকে বললো, যদি এক বছরের জন্য চুক্তি করে ও কোম্পানীর সঙ্গে, তবে ছ খানা ছবি বাবদ পঞ্চাশ হাজার ডলার ওকে দেবে। শুনে বললাম, খবরদার এরকম চুক্তিতে সই কোরো না। ছবির কাজ যদি বিয়ের পরেও করার তোমার ইচ্ছে থাকে আমি একখানা ছবির জন্য তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।

শুনলো সব মিলড্রেড। মোনালিসার মতো মুচকি হাসি নিয়ে আমার সব কথায় হ্যাঁ দিলো। অথচ পরে শুনি, চুক্তিতে ও নাকি সই দিয়েছে।

খুবই মর্মান্তিক। সব বুঝবো রাজী হবো, করবো ঠিক উলটোটা। রাগ হলো দুজনেরই ওপর। মিলড্রেড আর মেয়ার। এ কী আক্কেল বাপু লোকটার! রেজিস্ট্রারের খাতায় সইয়ের কালি এখনও শুকোয় নি, এরই মধ্যে সাত তাড়াতাড়ি চুক্তির কাগজখানা বাড়িয়ে ধরলো! সবুর সইলো না একটুও!

মাস খানেক পরে শুনি, কি না কি খটামটি লেগেছে কোম্পানীর সঙ্গে। মিলড্রেড বললো, আমি যেন মেয়ারের সঙ্গে দেখা করে ঝামেলা মিটিয়ে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করি। সাফ জানিয়ে দিলাম, কোন অবস্থাতেই আমি যাবো না। যাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে মিলড্রেড যে আরো এক ধাপ এগিয়ে আছে তখনো কি ছাই জানি। ডিনারের ক মিনিট আগে বললো, মেয়ারকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছে। আসছে ও। আমি যেন খাবার টেবিলেই যা বলার বলি। শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। তার মানে!—যদি আসে এখানে আমি ওকে অপমান করবো, যাচ্ছেতাই বলবো। কথা শেষ করতে না করতে দোরের ঘন্টি বাজলো। কি আর করি—এক লাফে পাশের ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে সেঁধোলাম। দু ঘরের মাঝে শুধু কাঁচের একটা ব্যবধান। বেরোবার দ্বিতীয় কোন দরজা নেই।

সময় যেন আর কাটে না। পাশের ঘরে ওরা দুজন। কথাবার্তা বলছে। শুনতে পাচ্ছি সব। হয়তো জানে আমি লুকিয়ে আছি এ ঘরে, কথা তাই যেন মাপা। গুরুজন সুলভ। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। আমার প্রসঙ্গ উঠলো। মিলড্রেড বললো, আমি সম্ভবতঃ বাড়িতে নেই।—তাই নাকি ?…চেয়ার টানার শব্দ পেলাম। উঠেছে। এ ঘরে আসবে নাকি ? ঘুমোবার ভান করলাম। এলেও দেখবে আমি ঘুমে কাতর। এলো না। মেয়ার ডিনার অব্দি অপেক্ষা করতে অরাজী হলো। চলে গেলো একটু পর।

কেটে গেলো কয়েকটা মাস।

এদিকে মিলড্রেডের সেই সন্তান সম্ভাবনার ব্যাপারটা ভুল। এই ক' মাসে একখানা মোটে তিন রিলের ছবি তুলেছি। নাম 'সানি সাইড', সে-ও বলতে গেলে বিস্তর টানাহ্যাঁচড়া

করে। তারপর আর আমার মাথায় চিন্তা বলতে কিছু নেই। ফাঁকা যাকে বলে। অর্থাৎ বিবাহ আমার সৃজনী শক্তির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

ফাঁকা মন আর ফাঁকা মাথা নিয়ে যেতাম এসময় অরফিয়ামে—ক দণ্ডের স্বস্তি পেতে। তবু যা হোক মনটা তো একটু অন্য দিকে থাকবে। নাচতো এক ক্ষ্যাপাটে শিল্পী। এমন একটা আহামরি কিছু নয়। নাচের শেষে নিয়ে আসতো তার চার বছরের ছেলেকে, বাবার সঙ্গে সে-ও মাথা ঝুঁকিয়ে দর্শককে অভিবাদন জানাতো। তারপর নাচতো একটু—সে এক অভিনব দৃশ্য। হঠাৎ নাচ থামিয়ে তাকাতো আমাদের দিকে। তারপর দে ছুট। হাসিতে ফেটে পড়তো সবাই। আবার হাজির করতে হতো তাকে মঞ্চে। নাচতো আবার। এবারকার নাচ সম্পূর্ণ আলাদা। হয়তো ঐটুকু শিশুর পক্ষে নেহাতই বেমানান। তবু মন কাড়তো সবার। মন টানতো। ছিলো এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তাতেই মুগ্ধ করতো দর্শকদের। নাম জ্যাকি কুগান।

তারপর গোটা সপ্তাহ জুড়ে তাকে আর আমার মনে নেই।

একদিন বসে আছি স্টুডিওতে। ভাবছি। ভাবনা নিয়ে রীতিমতো সে এক লড়াই। কিভাবে কি নিয়ে করবো ছবি, কিছুই মাথায় আসে না। এইভাবেই বসে থাকতাম মাঝে মাঝে। সামনে ভাঙা চোরা মঞ্চের কাঠামো। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্টুডিওর নানান কর্মী। দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা চিন্তা উঁকি দিতো মাথায়। সেদিন চিন্তার নামগন্ধও নেই। চোখে চোখ পড়তে হাসছে সবাই মিটিমিটি, নানান ভাবে আমাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছে, সব নিষ্ফল। চিন্তা এক ইঞ্চি এগোয় না। তখন গল্প শুরু করলাম। অরফিয়ামে দেখা সেই নাচের গল্প। শেষে জ্যাকি কুগান। তার নাচ। মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন। ফের নাচ।—সব বললাম।

একজন বললো, সকালের কাগজে সে নাকি পড়েছে জ্যাকি কুগান রোসকো আর-বাকলের পরের ছবিতে কাজ করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তাই তো! বিদ্যুতের মতো চিন্তা খেলে গেলো মাথায়—আমি ভাবি নি কেন একথা এতোদিন? দারুণ জমবে। নেবে দর্শক। আমি আর কুগান মিলে কি করতে পারি, কি করা সম্ভব তার একটা মোটামুটি রূপরেখা মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো।

বললাম, ধরো আমি অর্থাৎ ভবঘুরে। জানলার কাঁচ সারিয়ে বেড়াই। সেটাই আমার পেশা। তা জানলার কাঁচ তো আর হাজারে হাজারে ভাঙতে পারে না। সেটা সম্ভবও নয়। পাঠিয়ে দিই তাই ওকে। আমারই সঙ্গে থাকে। ঢিল ছুঁড়ে ভাঙে জানলার কাঁচ। তারপর আমি গিয়ে সারাই। দুজনের একসাথে থাকার ব্যাপার নিয়েও নানান ঘটনা আছে। তাও কিছু কম নয়।

মোটামুটি সারাটা দিন কাটলো একের পর এক ঘটনা ভাবতে। দৃশ্য সাজাতে। গোটা

একটা দিন। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে ঠিক করলাম প্রতিটি খুঁটিনাটি ক্রিয়াকলাপ, প্রতিটি পরিস্থিতির চুলচেরা বিবরণ। সবাই বললো, লাভ কি! যাকে ভিত্তি করে এতো ভাবনা চিন্তা সেই তো নাগালের বাইরে। ঠিকই। কে জানে আরবাকল্ও হয়তো এমনই কিছু ভেবে থাকবে। আফসোস হচ্ছে খুব। এমনই আহাম্মক আমি ওকে নিয়ে ছবি করার কথা এতোদিনে ভাবিনি!

সারারাত ধরে চললো ভাবনার খেয়া। প্রথমে চাই একটা গল্প। গল্প ধীরে ধীরে এলো। পরদিন সকালে গেলাম স্টুডিওতে। বিষণ্ণ মন। দলবল নিয়ে শুরু হলো মহড়া। বাস্তবিক দরকার নেই মহড়ার, তবু ঐ—কিছু তো একটা করা দরকার। তাই কাজে খানিকক্ষণ ব্যস্ত থাকা।

একজন বললো, অন্য একটি ছেলের খোঁজ করা যাক। কালো চামড়ার কেউ। তাতে মন্দ হবে না। আমি মাথা নাড়লাম। অসম্ভব। আর কেউ পারবে না একাজ করতে। জ্যাকি কুগানের সেই ব্যক্তিত্ব—কার মধ্যে পাবো অমন আশ্চর্য ক্ষমতা!

বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। ছুটতে ছুটতে এসে হাজির কার্লাইস্ল্ রবিনসন, আমাদের প্রচার সচিব। হাঁপাচ্ছে। বললো, জ্যাকি নয়, আরবাকল্ যাকে সই করিয়েছে সে জ্যাকির বাবা, জ্যাক।

চেয়ার থেকে একলাফে নামলাম। বললাম, আর দেরী নয়। এক্ষুনি বাবাকে ফোন করে এখানে আসতে বলো। বলো জরুরী দরকার।

সে এক দারুণ উত্তেজনা। চনমন করে উঠেছে সবাই। দলের কজন তো আনন্দের চোটে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলো। অফিসের কর্মচারীরা শুনে সে কী খুশি, আমাকে মুহুর্মুহুঃ অভিনন্দন। এদিকে জ্যাকিকে তখনো কিন্তু পাই নি। চুক্তি সই হয় নি তখনো। এমনও হতে পারে, শুনে আরবাকল্ও হয়তো সই করিয়ে নিতে পারে আগেভাগে। হয়তো এমন কোন ধারণা তার মাথাতেও উদয় হতে পারে। রবিনসনকে সাবধান করে দিলাম। —খবরদার, বাবা যেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে আমাদের মতলব। ফোনে আর কিছু নয়, শুধু বলো ভীষণ দরকার। জরুরী। যেন এক্ষুনি চলে আসে। যদি ফোনে না পাও, সিধে চলে যাবে স্টুডিওতে, সেখানে একই কথা বলে এখানে নিয়ে আসবে। মোটমাট এখানে আসার আগে সে যেন আমরা কি চাই মোটেই বুঝতে না পারে। যাও আর দেরী কোরো না।

যথারীতি বাড়িতে তাকে পাওয়া গেলো না। স্টুডিওতেও নেই। দুঘন্টা ধরে চললো খোঁজাখুঁজি। দু ঘন্টা পর হদিশ মিললো। আর এই দুটি ঘন্টা সে যে কী ছটফটানি, কী উদ্বেগ!

সে-ও তো যাকে বলে রীতিমতো তাজ্জব। কিসের এতো হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি

কিছুই তো বোঝে না। বিমূঢ় বিভ্রান্ত অবস্থা। স্টুডিওতে আসামাত্র হাত চেপে ধরলাম। বললাম, সাড়া পড়ে যাবে চারিদিকে। আপনি দেখে নেবেন। আগে কখনো এমন কেউ ভাবে নি, করে নি। একটামাত্র ছবি করবে, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে নাম।

সে অবাক। আরো অবাক। নির্ঘাৎ ভাবছে আমার বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বললাম, দারুণ গল্প। দেখতে হবে না, আপনার ছেলের সারা জীবনে করে খাবার রাস্তা এই এক ছবি থেকে উঠে আসবে।

—ছেলে?

—আপনার ছেলে। শুধু দরকার আপনার সম্মতি। যদি আপনি দয়া করেন।

—দয়ামায়ার কি! আপনার ইচ্ছে হয়েছে নেবেন।

শিশু আর কুকুর সম্বন্ধে প্রচলিত একটা কথা আছে। ওরা নাকি সবার চেয়ে ভালো অভিনেতা। কিচ্ছু না। স্রেফ বছর খানেক বয়েসের একটি বাচ্চাকে বসিয়ে দাও স্নান করার গামলায়। কাছে থাকুক একটা সাবান। সাবানটা তুলতে চেষ্টা করবে আর সে যা সব ছবি হবে, দেখে হাসতে হাসতে নির্ঘাৎ পেটে ধরবে খিল। প্রতিটি শিশুর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রতিভা। যার যার নিজস্ব তার ধরণ। তোমার কাজ হবে তাকে বের করে আনা। আনার জন্যে হাজারো কৌশল প্রয়োগ করা। জ্যাকির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা জলের মতো সোজা। শুধু মূকাভিনয়ের কিছু নিয়ম গোড়াতে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। রপ্ত করতে দেরী হলো না একটুও। সে এক অদ্ভুত ছেলে। ইচ্ছে করে আবেগ আনতে পারে, আবার আবেগের সঙ্গে দরকার মতো কাজ মিশিয়ে নিতে পারে। শুধু একবার নয়, বারবার। একই স্বতঃস্ফূর্ততায়। ঠিক গোড়াতে যেমনটি করেছিল সেইরকম। ছন্দপতনের কোন ব্যাপারই নেই।

'দি কিড' ছবিতে একটা দৃশ্য আছে এইরকম। জ্যাকি পাথর ছুঁড়ে জানলার কাচ ভাঙতে যাবে, এমন সময় এক পুলিস চুপিচুপি তার পেছনে এসে তো দাঁড়িয়েছে। হাত তুলতে গিয়ে হাত লেগে গেলো পুলিসের জামায়। অমনি ঘাড় ঘুরিয়ে মানুষটাকে একচমক দেখলো। তারপর লোফালুফি খেলছে যেন পাথরটা নিয়ে, এইরকম খানিকক্ষণ করতে করতে আচমকা দিলো ছুট। মুহূর্তে উধাও।

তো ছবি তোলার অন্য সব খুঁটিনাটি ঠিকঠাক করে জ্যাকিকে ডাকলাম। বললাম কি করতে হবে সব দেখে নাও। আমি যা যা করছি যেন খেয়াল থাকে। তোমার হাতে এই পাথর। পাথর হাতে অবস্থায় তুমি জানলাটার দিকে তাকাবে। তারপর পাথর ছোঁড়ার তোড়জোড় করছো। হাতটা পেছনে আনলে। হাতে ঠেকলো পুলিসের কোট। মুখ উলটো দিকে ফেরানো অবস্থাতেই তুমি বোতামটা হাত দিয়ে টিপেটুপে

দেখলে। তারপর মুখ ফেরালে। দেখলে পুলিস। তখন পাথরটা নিয়ে লোকালুফি খেলতে লাগলে। হাঁটছো এইভাবেই। হঠাৎ দৌড়।

চারবার মোট মহড়া দিলো। কি করতে হবে সে সম্বন্ধে এমন চমৎকার ধারণা জন্মে গেছে যে জোর করে আবেগ টেনে আনার আর দরকার হয় না। আপনা আপনিই মুখচোখের ভাব ফুটে ওঠে। বা বলা যেতে পারে, বোধই ফুটিয়ে তোলে আবেগ। সব মিলিয়ে অনবদ্য সেই দৃশ্য। এই একটি দৃশ্যের জন্য ভীষণ তারিফ পেয়েছে জ্যাকি।

তাই বলে সব দৃশ্যই যে এতো সহজে নেওয়া সম্ভব হয়েছে তা নয়। দেখেছি সহজ দৃশ্য নিয়েই ওর যতো ঝঞ্ঝাট। একটা ছিলো এইরকম—দরজায় ঠেস দিয়ে দোল খাবে। মহড়া দিতে গিয়ে দেখি কেবল ভয়, পাছে পড়ে যায়। ফলে সেটা বাদ দিতে হলো।

আসলে এই যে স্বাভাবিক অভিনয় এর মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই। বিশেষ করে মনকে অলস অকর্মণ্য রেখে অভিনয়। মঞ্চে শুনে অভিনয় করতে গেলে এই ঝঞ্ঝাটই এসে হাজির হয়। অভিনেতার সমস্ত সত্তা চলে যায় শ্রুতির দিকে। ফলে মন হয়ে পড়ে অকর্মণ্য। জ্যাকিরও দেখেছি একই হাল। মনের খোরাক পাচ্ছে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তো সাবাশ। মন ফাঁকা, অভিনয়ও অমনি গোলমেলে।

এদিকে জ্যাকির বাবার সঙ্গে আরবাকলের চুক্তি শেষ। প্রায়ই আসতো ছেলের সঙ্গে আমাদের স্টুডিওতে। পরে একটা দৃশ্যে পকেটমারের ভূমিকায় অভিনয়ও করে। নানানভাবে সাহায্য করতো আমাদের। একটা দৃশ্যে জ্যাকিকে সত্যি সত্যি কাঁদতে হবে। কারখানার দুই অফিসার জোর করে নিয়ে যাবে ওকে আমার অর্থাৎ ভবঘুরের কাছ থেকে। কাঁদতে গিয়ে সে কী কসরৎ! গল্প বললাম ভয়ের দুঃখের—ছেলে খুশীতে একেবারে টই টম্বুর। মতলব বুঝতে পেরেছে তো আমাদের, মোটে তাই কাঁদবে না। দেখলো ওর বাবা অনেকক্ষণ ধরে। বলল, দাঁড়ান আমি কাঁদিয়ে দিচ্ছি।

অপরাধী মনে হলো নিজেকে। বললাম, দেখবেন আবার মারধোর করবেন না যেন।

—আরে না না, মারধোরের কোনো দরকারই হবে না। দেখুন না।

দেখার আর ভরসা হলো না। আহা বেচারা, কী ভীষণ হাসিখুশী। নির্ঘাৎ এমন কিছু করবে যাতে হাউ হাউ করে কাঁদতে বসবে। আমি কি পাষাণ যে সেই দৃশ্য বসে বসে দেখবো? চলে গেলাম নিজের সাজঘরে। একটু পরে শুনি ডাক ছেড়ে কাঁদছে।

বেরিয়ে এলাম। বাবা বললো, নিন, এবার যা করার করুন।

সেই দৃশ্য। অফিসারদের হাত থেকে ওকে আমি ফিরিয়ে এনেছি। কাঁদছে ও। আদর করছি চুমু খাচ্ছি। দৃশ্যগ্রহণ শেষ হলো। বললাম, এখন বলুন দেখি, কেমন করে কাঁদালেন?

—কিছুই না, স্রেফ একটা কথাই বললাম।—যদি না কাঁদে তবে স্টুডিও থেকে নিয়ে গিয়ে সত্যিসত্যি ওকে কারখানার কাজে ভর্তি করে দেবো।

আহা রে! বেচারা তখনও হাপুস নয়নে কাঁদছে। কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। ল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুর ধারা। বললাম। ধাৎ, কে তোকে দেবে রে ারখানায়? আমি আছি না!

বললো, সে তো আমি জানি। বাবা মিথ্যে কথা বলছিল।

গভর্ণর মরিসকে কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম দি কিডের গল্প। টুকরো টুকরো সংশের। মরিস লেখক। মূলতঃ ছোট গল্পকার। সিনেমার চিত্রনাট্য লিখতো। শুনে বললো, অসম্ভব, এ গল্প জমবে না। দুটো পদ্ধতির মিশেল আছে। একটা নাটক আর একটা ভাঙা ভাঙা কমেডি। দুটো কখনো মিশ খায় না। দর্শক চায় আগাগোড়া এর যে কোন একটা। সে অর্থে ছবি মার খাবে।

বিস্তর আলোচনা হলো। বললাম কমেডি থেকে আবেগে উত্তরণের ব্যাপারটা আসলে জোড়া দেওয়ার সাজাবার ব্যাপার। সাজানো ঠিক হলেই সব কিছু ঠিক। তাছাড়া রূপ রীতি অর্থাৎ ফর্ম আসলে গৌণ, মুখ্য বিষয় হলো সৃষ্টি। একটা কিছু তৈরী হলে তবে তো সেটা কিভাবে হাজির করা হবে সেই চিন্তা আসে, সৃষ্টির আগে তো নয়। বিশেষ করে যেখানে শিল্পীর নিজেরই এক ধরনের বিশ্বাস আছে। আছে তার দর্শন। এবং এই বিশ্বাস ও দর্শনে তার নিষ্ঠার এতোটুকু খাদ নেই। সেখানে মিশেল প্রশ্নটা কোন নিয়ম মেনে করার প্রশ্নই ওঠে না। সেটা আসবে স্বাভাবিক ভাবে। যেমন এসেছে আমার গল্পের ক্ষেত্রে। তাতে বিদ্রূপ আছে, কৌতুক আছে, অদ্ভুত অদ্ভুত অলীক ঘটনা আছে, আছে বাস্তবতা, আছে মিলন বিয়োগ দুরকমেরই দ্বন্দ্ব এবং গোটা ব্যাপারটা যে ভাবে মিশেছে সেটা সম্পূর্ণ অভিনব। বলা যেতে পারে নতুন একটা ধরনের প্রবর্তন করা হচ্ছে এই রূপরীতির মধ্য দিয়ে। সেদিক থেকে দি কিড সার্থক হতে বাধ্য।

মোটামুটি আলোচনা এখানেই শেষ হলো।

সম্পাদনার সময় স্যামুয়েল রেজেভস্কি আসতো স্টুডিওতে। সাত বছর বয়েস। সারা দুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন দাবারু। এ্যাথলেটিক ক্লাবে একবার এক প্রদর্শনী খেলায় দেখেছিলাম এক সঙ্গে বিশজন দাবারুর সঙ্গে খেলতে। তাদের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার খেতাবধারী খেলোয়াড় ডঃ গ্রিফিথ্স্ অব্দি ছিলেন। আর অদ্ভুত এই স্যামুয়েল। বোগাটে গড়ন, ফ্যাকাশে ধরনের রং। মুখখানা এইটুকু। মস্ত বড় দুটো চোখ। তাই দিয়ে দেখে যখন নতুন কাউকে, ঝকমক করে, যেন রণং দেহি গোছের একটা ভাব। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে একজন আমাকে সাবধান করে দিলো,—খবরদার,

ছেলে কিন্তু ভারী মেজাজী, ভুলেও বেফাঁস কিছু বলে বসো না। করমর্দন করার চেষ্টা কোরো না। মেজাজ ভালো থাকলে কচিৎ কখনো করমর্দন করে।

তা স্টুডিওতে যখন তার ম্যানেজার আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, আমি তখন সম্পাদনার টেবিলে। কাটছি ফিল্ম। কাটা অংশ খুঁটিয়ে দেখছি। সেই অবস্থাতেই আড়চোখে দেখলাম আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব।

বললাম, পীচফল খেতে কেমন লাগে?

—ভালো।

—তবে চট করে যাও তো বাগানে। গাছ আছে। তাতে মেলা ফল। যে কটা ইচ্ছে তোমার পেড়ে নাও। আমার জন্যে একটা নিয়ে এসো।

মুহূর্তে চোখ মুখ উঠলো ঝিকিয়ে—কোথায় গাছ? কোন্‌দিকে?

বললাম, কার্ল দেখিয়ে দেবে তোমায়। বলে কার্ল রবিনসনকে ডেকে ওকে গাছটা দেখিয়ে দিতে বললাম।

মিনিট পনেরো পর দেখি একগাল হাসি নিয়ে হাজির। দুহাত বোঝাই ফল। আমাকে একটা দিলো। এবং সেই থেকে শুরু হলো আমাদের বন্ধুত্ব।

বললো, তুমি দাবা খেলতে পারো?

—না।

—শিখিয়ে দেবো। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললো, রাত্রে এসো না আমার খেলা দেখতে। বিশটা লোকের সঙ্গে একলা লড়বো।

ঠিক হলো যাবো এবং রাত্রে দুজন একসঙ্গে ডিনার খাবো।

বললো, ঠিক আছে। আমিও চটপট খেলার পাট চুকিয়ে দেবো।

গেলাম সন্ধেবেলা এ্যাথলেটিক ক্লাবে।

কেমন খেলে স্যামুয়েল বুঝবার জন্যে খেলা জানবার দরকার হয় না। একাই একশো। ইংরেজী ইউ অক্ষরের মতো দু মুখ বের করা টেবিল। তাতে বসে বিশজন মধ্যবয়েসী খেলোয়াড়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে নিজেদের দাবার ছকের ওপর। এ ছক থেকে ও ছক ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। শুধু টহল। বয়েস সাত, কিন্তু দেখায় আরো ছোট। হিমসিম খাইয়ে দিচ্ছে এক একজন খেলোয়াড়কে। এর চেয়ে বড় নাটক আর কি হতে পারে।

সমগ্র দৃশ্যটির মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত ভাব। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে প্রায় শ'তিনেক দর্শক। নীরব নির্বাক প্রতিটি মুখ। অবাক হয়ে দেখছে এই ক্ষুদে খেলোয়াড়ের কীর্তি। বিশটা ভারী ভারী মাথা যার দাপটে বেসামাল। কারুর চোখে উদ্বেগের ছায়া, কারুর মুখে মোনালিসা মার্কা হাসি। তিনশো জোড়া চোখ ঘুরপাক খাচ্ছে সাত

বছরের স্যামুয়েলের গতিবিধির সঙ্গে।

সে এক আশ্চর্য প্রতিভা। চমকে দেবার মতো, মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দেবার মতো। তবু যত দেখি তাকে ভেতরে ভেতরে পাক খায় এক অদ্ভুত উদ্বেগ। এইটুকু বয়েসে এতো পরিশ্রম—মগজের এই প্রচণ্ড খাটুনি—এ বোধহয় বেশির চেয়েও অনেক বেশি। হয়তো একদিন ওকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে। চরম মূল্য।

একজন খেলোয়াড় হাত নেড়ে ডাকলো। গেলো তার সামনে। নিবিষ্ট মনে কয়েক মুহূর্ত দেখলো তার ছক। তার পর চাল দিলো। কখনো বা হাঁকলো—কিস্তি! তখন চারপাশে দর্শকের মধ্যে গুঞ্জন। হাসি। পরপর আটজনকে দিলো কিস্তি। খুব অল্প ব্যবধানে। দর্শকের গুঞ্জন যেন আর থামে না।

ঐ তো। ডঃ গ্রিফিথসের সামনে এখন দাঁড়িয়ে। দেখছে নিবিষ্ট মনে। চাল দিলো। চোখ ফেরাতে চোখাচুখি হলো আমার সঙ্গে। হাত নাড়লো। অর্থাৎ—সবুর করো আরেকটু। আমি আসছি।

বাকী কজনকেও কিস্তি দান পর্ব শেষ। আবার ডঃ গ্রিফিথসের সামনে। গ্রিফিথসের চাল দেওয়া তখনও বাকী। ভাবছেন সমানে। স্যামুয়েল বললো, কি ব্যাপার, এখনও হয় নি আপনার।

মাথা নাড়লেন গ্রিফিথস্,—না।

—তাড়াতাড়ি করুন। আর কত সময় নেবেন।

হাসলেন গ্রিফিথস্।

কটমট করে তাকালো তাঁর দিকে। রাগ খুব। বললো, ভাবছেন আমাকে হারাবেন বুঝি? পারবেন না। অসম্ভব। আপনি এটা এখানে দিলে আমি দেবো ওই চাল, ঐটা ওখানে দিলে আমি দেবো এটা।

বলে পরপর সাত আটটা চালের কথা অক্লেশে মুখস্থ বলার মতো বলে গেলো।

—বরং লাভ কি। বললো সে, এই অবস্থায় বসে থাকলে সারা রাত কেটে যাবে। তার চেয়ে বলে দিন ড্র। আমার আপত্তি নেই।

গ্রিফিথসেরও কি আর আপত্তি থাকতে পারে। তিনি মানতে বাধ্য হলেন।

ইদানীং মিলড্রেডকে বেশ ভালো লাগে, কিন্তু কোথায় যেন একটা অদৃশ্য চিড়। সে আর কিছুতে জোড়া লাগার নয়। মনের দিক থেকে যে ছোট তা নয়, তবে বড় নিটপিটে। কিছুতে নাগাল পাই না ওর মনের। কি যে ভাবে কখন কি করে—বোকামীই বেশি। অষ্টপ্রহর দোনামনা ভাব। যেন কাছের নয়, অনেক দূরের কেউ। ইতিমধ্যে একটি

সন্তান হলো। বাঁচলো মোটে তিনদিন। এই শুরু আমাদের সম্পর্ক ছেদের। একই বাড়িতে থাকতাম দু'জন, দেখা হতো কালেভদ্রে। ও থাকতো স্টুডিওতে ওর কাজ নিয়ে। আমি আমার। বাড়ির সেই যে সুখ, সেই ভালা লাগা—কোথায় সে সব? যেন শোকে দুঃখে থমথম কখানা ঘর। ফিরে এসে দেখতাম একজনের খাবার রয়েছে ঢাকা দেওয়া। একা বসে খেতাম। চলে যেতো হুটপাট এখানে সেখানে। না একটা খবর, না কোনো কথা। শুধু শোবার ঘরের খোলা দরজা দেখে বুঝতাম ও বাড়িতে নেই।

হুট করে মাঝে মাঝে রোরবার মুখোমুখি পড়ে যেতাম। যাচ্ছে কোথাও, সেইরকম সাজ। জিজ্ঞেস করলে বলতো, হয় গিশেদের সঙ্গে নয় কোনো বান্ধবীর সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে। ফিরবে সোমবার। আমিও কথাটি না বাড়িয়ে ডগলাসের বাড়ির দিকে রওনা দিতাম। তখন ডগলাস আর মেরীর বিয়ে হয়ে গেছে। আমার আর মিলড্রেডের বিচ্ছেদ এইভাবেই অনিবার্য হয়ে উঠলো। তখন চলছে 'দি কিড' ছবির সম্পাদনার কাজ। আমি গেছি ডগলাসের ডেরায় শনি-রবির ছুটি কাটাতে। ডগলাস বললো, মিলড্রেডকে নিয়ে কিছু কিছু গুজব রটছে। তোমার শোনা দরকার।

বললো। কতটা তার সত্যি কতটা মিথ্যে যাচাই করার প্রয়োজন কখনো বোধ করিনি। শুনে মন যথারীতি খারাপ লাগলো। মিলড্রেডের সঙ্গে দেখা হতে যখন জিজ্ঞেস করলাম, সব অস্বীকার করলো।

করুক অস্বীকার। বললাম, এভাবে থাকা অসম্ভব।

নীরবতা। তাকালো আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে। বললো, কি করতে চাও তুমি? রুক্ষ নিষ্করুণ স্বর। নেই এতোটুকু মমতা কি ভালবাসার ছোঁয়া। এই কি প্রেম? বললাম, আমাদের বিচ্ছেদই ভালো।

জবাব দিলো না। ভেবেছিলাম কিছু একটা প্রতিক্রিয়া হবে। কিছু বলবে। বললো না একটিও কথা। মুখের রেখা এতোটুকু পালটালো না।

বললাম, এটাই আপাততঃ সবচেয়ে সহজ পথ। দুজনেই সুখে থাকবো। তোমার বয়েস কম। সামনে পড়ে আছে বিশাল জীবন। কোন তো লাভ নেই এভাবে জীবন নষ্ট করার। বরং বন্ধুর মতো আমরা পারি পরস্পরের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে। কথা হবে তোমার আমার উকিলের মধ্যে। যদি তোমার কিছু চাহিদা বা দাবী থাকে সেটা বলতে পারো।

—আমার টাকা দরকার। অনেক। মাকে দেখাশোনা করতে হবে।

—বেশ তো, কত কি চাই সেটা নিজেদের মধ্যে আমরা আলোচনা করে নিতে পারি। চিন্তা করার সময় নিলো একটুক্ষণ। বললো, এখন না। আগে আমি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলে নিই। তারপর।

বললাম, বেশ। ততদিন তুমি নয় বাড়িতেই থাকো, আমি ক্লাবে যাই।

মোটামুটি এইভাবেই বিচ্ছেদ। ঠিক হলো, ও বলবে মনের শান্তির জন্যেই এই বিচ্ছেদ। এবং এই ব্যাপার নিয়ে আমরা ঘরে বাইরে এমনকি সাংবাদিক মহলেও মুখ খুলবো না।

পরদিন সকালে টম আমার নিজস্ব জিনিসপত্র নিয়ে গেল ক্লাব বাড়িতে। ভুল হলো এটাই। কাগজে লিখলো, আমাদের বিচ্ছেদ সমাপ্ত। এবং যথারীতি মিলড্রেডকে ফোনের পর ফোন। ক্লাবেও ফোন। আমি ধরলাম না। কি লাভ, কোন বিবৃতি দেবার তো কোন ব্যাপার নেই। মিলড্রেড কিন্তু দিলো। পরের দিনই কাগজের প্রথম পাতায় মিলড্রেডের মস্ত ছবি। নীচে বড় বড় হরফে খবর: আমি নাকি স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি এবং এই মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মিলড্রেড বিচ্ছেদের মামলা রুজু করেছে। অবশ্যই তেমন একটা ক্ষতিকারক বক্তব্য নয়। তবু দুজনের মধ্যে যা চুক্তি ছিলো তার তো বাইরে। ফোন করলাম ওকে। বললাম, কেন তুমি কাগজে বিবৃতি দিলে? বললো, প্রথমে দিতে রাজী হই নি। পরে সাংবাদিকরা বললো তুমি নাকি ইতিমধ্যেই মস্ত এক বিবৃতি দিয়েছো তাই মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। আসলে কাগজওয়ালাদের মতলব আমাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষ ঘনীভূত করে তোলা। বললাম সে কথা মিলড্রেডকে। বললো, এই শেষ, আর কখনো কোন বিবৃতি দেবো না।

কিন্তু দিলো আবারও।

এদিকে ক্যালিফোর্ণিয়ার আইনানুযায়ী বিচ্ছেদের পর মিলড্রেডের প্রাপ্য মোট পঁচিশ হাজার ডলার। আমি দিতে চাইলাম একলাখ। রাজী হলো নিতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সই করার দিন দেখি গরহাজির।

আমরা তো অবাক। উকিল বললো, একটা কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে। খোঁজখবর নিয়ে দেখি।

ব্যাপার যে কি কদিনের মধ্যেই টের পেলাম।

গোলমালের মূল কেন্দ্র 'দি কিড'। ছবির ব্যাপারে ফার্স্ট ন্যাশানালের সঙ্গে আমার ঝগড়াট চলছে। সাত রীলের ছবি। কোম্পানী চায় দু-রীল মাপের তিনখানা ছবি হিসেবে বাজারে ছাড়তে। সেই বাবদ আমার প্রাপ্য হয় মাত্র চারলাখ পাঁচ হাজার ডলার। কেন রাজী হবো আমি? খরচই লেগেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার, সেই সঙ্গে আঠারো মাসের একটানা খাটুনি। বললাম, মামলা করবো। আসলে আইনগত ভাবে আমারই পাল্লা ভারী। ওরা জিততে পারবে না কিছুতে। তাই শুরু হলো চক্রান্ত। মিলড্রেডকে দিয়ে প্যাঁচ কষাতে লাগলো।

তখনো ছবির সম্পাদনা বাকী। মন বললো, যদি এখানে বসে সম্পাদনার কাজ করো তবে বিপদের সম্ভাবনা আছে। পালাও! অমনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে চম্পট। সিধে সল্ট-লেক। সঙ্গে দুজন বিশ্বস্ত কর্মচারী আর প্রায় চার লাখ ফুট মাপের ফিল্ম। সাকুল্যে পাঁচশোর মতো গোছা। উঠলাম সল্ট-লেক হোটেলে। জানাইনি কাউকে সঙ্গে আমাদের ফিল্ম আছে। আনা যে বারণ, বেআইনী। যদি হোটেল কর্তৃপক্ষ জানতে পারে তবে হয়তো দেবে ঘাড় ধরে বের করে। কোথায় রাখি তবে!

গোটা একটা শোবার ঘরে রাখা হলো সব লুকিয়ে চুরিয়ে। বিছানার নীচ থেকে শুরু করে পায়খানার বাটি, বাথরুম, ড্রয়ার—সব বোঝাই। শুধু ফিল্ম আর ফিল্ম। কাজও চললো ফাঁকে ফাঁকে। বলাবাহুল্য যতদূর সম্ভব গোপনে এবং চুপিচুপি। প্রায় হাজার দুয়েকের মতো দৃশ্য বাছতে হবে। নম্বরটম্বর যদিও পরপর করা, তবু কাজের সময় কি আর হিসেব মতো সব মেলে! গেলো হয়তো কোনোটা কোনোখানে হারিয়ে। তখন খোঁজ খোঁজ। বিছানার নীচে, খাটের নীচে, বাথরুমে, দেরাজে, পায়খানায়—খুঁজে খুঁজে হয়রান। সে যে কত অসুবিধে! কত ঝঞ্ঝাট! তবু এরই মধ্যে যাহোক করে সম্পাদনা পর্ব শেষ হলো।

এবার চরম পরীক্ষার লগ্ন। দর্শক সমক্ষে যাচাই করা হবে আমার কাজ। সম্পাদনার পর কি দাঁড়ালো সে তো আর তেমন ভাবে দেখার সুযোগ হয়নি। হোটেলের ঘরে বসে তোয়ালের ওপর ছবি ফেলে চোরাগোপ্তা যেটুকু যা দেখেছি। ছবির মাপ বড়জোর একখানা পোস্টকার্ডের মতো। তাতে কি সঠিক কিছু বোঝা যায়? তবু ভালো, স্টুডিওতে ছবি শেষ করার পর প্রমাণ মাপের পর্দায় পুরো চার লাখ ফুটই একচমক দেখে নিয়েছিলাম। তারই সাথে মিলিয়ে তবু তো খানিকটা ভাবতে পারা যাচ্ছে।

তোয়ালের ওপর ছবি ফেলেই আরো বার কয়েক দেখে নিলাম। হায় হায়, কোথায় এতে মজা! কোথায় রগড়! তবে কি এতোদিনের এতোসব ভাবনা নিষ্ফল গেলো! মোটমাট যতটা ধরে নিয়েছিলাম তার কিছুই বলতে গেলে নয়। কি হবে তবে এ ছবির ভবিষ্যৎ!

যা হবার হবে। ঠিক হলো স্থানীয় একটি চিত্রগৃহে ছবি দেখানো হবে এবং আগে থেকে কোনরকম ঘোষণা না করেই। সেরকমই ব্যবস্থা হলো। মস্ত হল্। সিকি ভাগ আসন শুধু খালি। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে আমি বসে আছি একধারে চুপচাপ। ভালো লাগছে না কারুর দিকে তাকাতে। এই যে এতো দর্শক—এরা দয়ামায়াহীন, নির্দয় নিষ্ঠুর। নইলে এমন মারমুখী কেন এদের ভঙ্গি? আমার ওপর একচোট ঝাল তুলবে বলে যেন মুখিয়ে আছে। কি চায় এরা? বোঝে কি কাকে বলে কমেডি? কিম্বা হয়তো বোঝে। সেক্ষেত্রে দোষটা আমারই। আমিই এদের এতোদিন বুঝতে ভুল করেছি। আমাদের জীবনের এটাই বোধ হয় চরম কমেডি। নিজে আমরা কৌতুক

শিল্পী হয়েও বুঝি না দর্শকের মনোভাব। এর চেয়ে চরম কৌতুক আর কি হতে পারে।

হঠাৎ ভেসে উঠলো পর্দায় আমার নাম, চমকে নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসলাম।—চার্লি চ্যাপলিনের সর্বাধুনিক ছবি 'দি কিড'। শেষ অক্ষর ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে সে কী হৈ চৈ, চিৎকার! সাবাস দিচ্ছে আমাকে, অভিনন্দন জানাচ্ছে। সেটা আরেক ঝামেলা। তার মানে আশা ওদের প্রচুর। আমার কাছে। কিন্তু পারবো কি চাহিদা পূরণ করতে?

প্রথম কয়েকটি দৃশ্যে নিছকই ঘটনার বিবৃতি। কিছুটা ঢিমেতালে, বলতে গেলে থমথমে। যত দেখি, মনে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে। আর ভয়। কি হবে শেষ অব্দি। গাড়িতে বাচ্চাকে একলা ফেলে রেখে মা চলে গেলো, চুরি হলো গাড়ি। চোরেদের তো গাড়িটাই দরকার, বাচ্চা তো নয়। তাকে তাই রাস্তার পাশে নোংরা ফেলার একটা ডাস্টবিনের কাছে শুইয়ে দিয়ে চলে গেলো। তখন এলাম আমি—অর্থাৎ ভবঘুরে। অমনি সারা হল্ জুড়ে হাসি। সূচনা আর কি! ক্রমশঃ বাড়ছে। বাড়ুক। বাচ্চাটিকে আমি তো কুড়িয়ে বুকে তুলে নিলাম। রাখলাম নিজেরই কাছে। একটা দোলনা বানিয়ে দিলাম। ছেঁড়া চট দিয়ে। ফের হাসি। হাসির আর বিরাম নেই। তুঙ্গে উঠলো যখন কেটলীর নলের মুখে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার একটা চুষিকাঠি লাগিয়ে ওকে দুধ খাওয়াতে বসলাম। কিংবা সেই যখন চেয়ারে বসবার জায়গায় গোল মতো করে খানিকটা কেটে চেয়ারটাকে বসিয়ে দিলাম গামলার ওপর। মোটমাট ছবির শেষ অব্দি দর্শক না হেসে চুপ করে বসে থাকার মুহূর্তকাল সুযোগও পেলো না।

এবার ফেরার পালা। যাচাই পর্ব শেষ। এবং মোটামুটি উত্তীর্ণ। অর্থাৎ সম্পাদনার কাজে খুঁত নেই। তো এখানে বসে থেকে আর লাভ কি। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সিধে পুবমুখো। নিউ ইয়র্কে উঠলাম এসে রিৎজ হোটেলে। সে কী খোঁজাখুঁজি! ফার্স্ট ন্যাশনাল আমাকে সমন ধরাবেই। আমিও কিছুতেই নেবো না। হোটেলের ঘরে তো আর দেবার নিয়ম নেই। তাই ঘরেই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। বেরোই না একদম। এদিকে সমন জারী করার লোকটি তো তিনদিন ঠায় বসেই রইলো হোটেলের দরজার মুখে। কড়া নজর। তখন ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস নৈশভোজের নেমন্তন্ন করলেন। লোভ কি আর সামলানো যায়। সন্ধ্যে নাগাদ গটমট করে সেদিনই হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল দারুণ সাজগোজ করা এক মহিলা। সমনদারের সামনে দিয়েই। ট্যাক্সিতে উঠলো। সিধে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের বাসা। ট্যাক্সিতে বসেই পোশাক বদল করলাম। সব ধার করা। চেয়ে নিয়েছি আমার এক সম্পর্কিত শালীর কাছ থেকে। ব্যস, নিশ্চিন্তি।

ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের বই আমি পড়েছি। ভাল লাগতো বেশ। ফ্র্যাঙ্কও আমি

বলতে অজ্ঞান। ভারী অভাবী মানুষ। মাসিক একটা পত্রিকা চালাতেন—পিয়ার্সন্‌স্ ম্যাগাজিন—প্রত্যেকবারই বেরোবার আগে শুনতাম এই বন্ধ হয় হয়। একবার পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ওকে কিছু সাহায্য পাঠিয়ে দিই। কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে আমাকে অস্কার ওয়াইল্ডের ওপর লেখা ওর দুখণ্ড বই পাঠালেন। তার প্রথম পাতায় এই কথাগুলো লেখা:—

চার্লি চ্যাপলিনকে—

সেই বিরল ব্যক্তিদের একজন যিনি আমাকে চেনেন না কিন্তু সাহায্য করতে পিছপা নন, যাঁর শিল্পময় কৌতুক আমাকে মুগ্ধ করে, আমি মনে করি মানুষকে কাঁদায় যারা তার চেয়ে যিনি হাসান তিনি অনেক মহান—তারই প্রতি শ্রদ্ধাবনত শ্রীফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস। আগস্ট ১৯১৯। নীচে প্যাসকালের সেই আশ্চর্য উদ্ধৃতি: "সেই লেখককেই আমি প্রশংসা করি এবং সম্মান দিই যিনি মানুষের সম্বন্ধে সত্যভাষণে পরাঙ্মুখ নন, বলতে গিয়ে যাঁর চোখ জলে ভারী হয়ে ওঠে।"

ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের সঙ্গে সেই আমার প্রথম মুখোমুখি দেখা। সেই নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। দোহারা চেহারা। ছোট খাটো গড়ন। মাথার আকৃতিটি চমৎকার। উন্নত শির। গালে চাপদাড়ি। দেখে যারপরনাই ভালো লাগলো। গলার স্বরটিও মিঠে। ভারী ভরাট আওয়াজ। এক একটা কথা বলেন যেন মর্মে গিয়ে আঘাত করে। তখন সাতষট্টি বছর বয়েস। বৌটি ভারী ফুটফুটে, দেখতে সুন্দরী, কথাবার্তাও মিষ্টি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। তবে স্বামীর প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

ফ্র্যাঙ্ক নিজে সমাজতন্ত্রী, কিন্তু বিসমার্কের প্রতি ওর যথেষ্ট শ্রদ্ধা। জার্মান সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বরং কিছুটা সোচ্চার। বিসমার্কের অনুকরণে কথা বলেন, থামেন। ভালো অভিনেতা হতে পারতেন ফ্র্যাঙ্ক। ভোর প্রায় চারটে অব্দি আমরা গল্প করলাম। সে ভারী চমৎকার।

ঠিক করলাম রিৎজে আর থাকবো না, হোটেল বদল করবো।

কিন্তু যাই কোথায়। সব হোটেল যে বোঝাই। ঠাঁই কি আছে। তার ওপর সমন হাতে সাক্ষাৎ সেই যম। এতোক্ষণে কি আর টের পায়নি রিৎজে আমি নেই। নির্ঘাৎ লোক লাগিয়ে দিয়েছে প্রতিটি হোটেলের দরজায়। তাহলে উপায়।

উপায় ট্যাক্সির চালকই বাৎলে দিলো। বছর চল্লিশের মতো বয়েস। মজবুত গড়ন। তা প্রায় ঘণ্টাখানেক তো ঘুরছি ওরই গাড়িতে। বললো, শুনুন। জায়গা কোনো হোটেল আপনি পাবেন না। তাছাড়া রাতও হয়েছে। বরং এক কাজ করুন,

চলুন আমার সঙ্গে বাড়িতে। এক রাতের তো মামলা। ঘুম থেকে উঠে ভোর বেলা নয় কেটে পড়বেন।

যাবো কি যাবো না এই নিয়ে তো প্রথমে বেশ খানিকক্ষণ দ্বিধা। বললো, কিসের সঙ্কোচ মশাই, বৌ বাচ্চা নিয়ে থাকি—আপনি নয় একরাতের জন্য অতিথিই হলেন। তখন খানিকটা ভরসা পেলুম। তবু ভালো, শোবার ঘরে ঢুকে তো আর সমনদার বাবাজী হামলা করতে পারবে না।

রাজী হলাম।

ধন্যবাদ দিলাম অজস্র। নিজের পরিচয় বললাম।

শুনে সে তো অবাক। মুখে হাসি। বললো, বৌ আপনাকে দেখে যা ঘাবড়ে যাবে না, সে আর বলার নয়।

বেশ জমজমাট এলাকা। ঘিঞ্জি বাড়িঘর। ঢোকালো একটা ঘরে। আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই, তবে ঝকঝকে তকতকে। সে ঘর ডিঙিয়ে পেছন দিকের একখানা ঘর। বেশ বড় সড়। মস্ত একখানা খাট। তাতে বছর বারোর একটি ছেলে ঘুমে অচেতন। ওরই ছেলে। বললো, দাঁড়ান একে আগে সরিয়ে দিই। বলে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে এক ধারে ঠেলে সরিয়ে দিলো। বললো, নিন এবার আপনি লম্বা হোন।

মনে আবারও দ্বিধা।··· শোবো? শোওয়া কি ঠিক? অচেনা অজানা পরিবেশ····। কিন্তু··এই যে এতো আন্তরিকতা, একে কি না করা যায়! ততক্ষণে একপ্রস্থ শোবার পোশাক হাজির। পোশাক পালটে সসঙ্কোচে খাটে উঠলাম।

চোখে ঘুম আর আসে না। যায় না কিছুতে দ্বিধা মন থেকে। ঘুমের ভান করে পড়ে আছি। সে-ও শুয়েছে একধারে। অনেকক্ষণ পরে দেখি উঠে বসলো। নামলো খাট থেকে। পোশাক বদলালো। বেরিয়ে গেলো। একটু পরে দেখি আট বছরের একটি মেয়েকে সঙ্গে করে চুপি চুপি ঢুকলো ঘরে। আমি কিন্তু পূর্ণ সজাগ। সব দেখতে পাচ্ছি। তবু সাড়া নেই। মেয়েটি বোধহয় বোন। হাঁ করে অবাক চোখ নিয়ে দেখলো আমাকে বেশ খানিকক্ষণ। মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসলো খিলখিল করে। হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ভোরের আলো একটু একটু করে ফুটছে।

এদিকে সামনের বারান্দায় বাড়ছে তখন ভিড়। ফিসফাস সে যে কত গুঞ্জন। গৃহকর্তার গলাও টের পাচ্ছি। দরজা ভেজানো তাই দৃষ্টির সবই অগোচর। শুধু কথা আর কথা। আর হাসি, আর শব্দ। ধীরে ধীরে দরজাটা একটু ফাঁক হলো। দেখি সে উঁকি মেরে দেখছে আমি জেগেছি কিনা।

আমি আর সংশয়ের বোঝা না বাড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলাম।

বললো, আপনার স্নানের জল তৈরী। কলঘর সোজা গিয়ে সামনে। এই নিন তোয়ালে আর গাউন।

বলে একখানা তোয়ালে, একটা গাউন আর একজোড়া স্নানের চটি সাবধানে রাখলো।

স্নান সেরে এলাম।

বললো, সকালে কি খাবেন?

বললাম, যা আপনি খাওয়াবেন।

—রুটি, ডিম, কফি?

—ব্যস ব্যস, যথেষ্ট।

মুখের কথা খসাতে না খসাতে খাবার হাজির। ততক্ষণে আমার পোশাক বদল শেষ। স্ত্রী এলো খাবার নিয়ে। বাইরের সেই ছোট্ট ঘর। আসবাব বিশেষ কিছু নেই। শুধু ছোট্ট একটা গোল টেবিল, একটা চেয়ার, আর একখানা আরাম কেদারা। দেয়ালে পারিবারিক কিছু ছবি। একধারে আগুন পোয়াবার চুল্লী। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বাইরে তখন রীতিমতো ভিড়।

আবালবৃদ্ধবণিতা, হৈ চৈ কোলাহল। ঘরে বসে সব আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

বৌ বললো, আপনি যে এখানে এসেছেন সবাই টের পেয়ে গেছে। বলে মুচকি একটু হাসলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকলো গৃহকর্তা,—বাপরে বাপ্, ভিড় তো দেখি বড্ড বেড়ে গেছে! শুনুন মশাই, বরং এক কাজ করুন, বাচ্চাগুলোকে ভেতরে ডেকে আনি। আপনাকে কাছ থেকে একটু দেখে যাক। এদের রাগালেই মুশকিল। খবরের কাগজের অফিসে খবর পৌঁছে যাবে, তখন ঝঞ্ঝাট। সারা রাজ্যের লোক আসবে ঝেঁটিয়ে।

বললাম, বেশ তো, ওদের ভেতরে আসতে বলুন না।

এলো তারা। কুচো কাচার দল। মুখ ভরা হাসি। দাঁড়ালো সারা ঘর দখল করে। আমি তখন কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি। বাইরে কর্তা। ঘরে ঢোকানো এবং বের করার দায়িত্ব তার। অনর্গল নির্দেশ দিচ্ছে,—বেশিক্ষণ থেকো না, বেরিয়ে এসো, পরের দলকে ঢুকতে দাও। কই এসো বেরিয়ে।

ঢুকলো এক যুবতী। থমথমে গম্ভীর মুখ। ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে ছুটে এসেছে দেখলেই বোঝা যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ দেখলো। খুব কাছ থেকে। কেঁদে ফেললো হঠাৎ।—না না, এ সে নয়। ভুল।

বলে রীতিমতো ডুকরে কান্না।

কান্নার কারণ একটু পরেই জানতে পারলাম। কে নাকি বলেছে তাকে, যা গিয়ে দেখে আয় কে এসেছে। অমনি ছুটতে ছুটতে এসেছে। মনে উদ্বেগ। ভেবেছে ভাইকে

দেখবে। যুদ্ধে গিয়েছিলো ভাই তারপর আর খবর নেই। এসে দেখে আমি। নিরাশ হয়ে তাই কান্না।

ফিরে এলাম সেখান থেকে রিৎজে। মরিয়া তখন। যা থাকে ভাগ্যে তাই হোক। দিক আমাকে সমন। কিসের পরোয়া। অবাক কাণ্ড, সমন ধরাবার সেই মানুষটা ত্রিসীমানায় কোথাও নেই। গেলো কোথায়! ঘরে ঢুকতেই দেখি এক টেলিগ্রাম। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লিখেছে আমার উকিল। সব নাকি মিটে গেছে। আর কোন ঝঞ্ঝাট নেই। আর সবচেয়ে যেটা সুখের খবর—মিলড্রেড আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করেছে।

পরদিন ট্যাক্সি চালক আর তার বৌ এসে হাজির। ভারী সাজগোজ দুজনের। কর্তা বললো খবরের কাগজের লোক নাকি খুব এসে ধরেছে রবিবাসরীয়ের জন্য আমার থাকার ব্যাপার নিয়ে একটা লেখা তৈরী করে দিতে।

—কিন্তু কি করে দিই বলুন। আপনার মত না নিয়ে তো পারি না। তাই আমি হ্যাঁ না কিছু বলিনি।

—বলে দিন হ্যাঁ। আমি বললাম। আমার কোন অমত নেই।

মাথা উঁচু করে নয়, নত হয়েই আসতে হলো ফার্স্ট ন্যাশানালের কর্তাদের। সংস্থার সহ সভাপতি মিঃ গর্ডন, পূর্বাঞ্চলের অজস্র প্রেক্ষাগৃহের মালিক, বললেন, পনেরো লাখ যে দেবো আপনাকে, ছবিটাই তো আমাদের দেখা হয়নি।

এ ব্যাপারে আমিও একমত। ছবি তাদের একশোবার দেখা উচিত। দিন ক্ষণ কোথায় দেখানো হবে অমনি সব পাকা করে ফেললাম।

নির্দিষ্ট দিনে মালিকপক্ষের পঁচিশজন প্রদর্শক হাজির। গম্ভীর সবার মুখ। ছবি দেখতে নয়, যেন এসেছে করোনারের আদালতে হত্যা মামলার সাক্ষী দিতে। দয়ামায়ার লেশমাত্রও শরীরে নেই। নিঃশব্দে যে যার গিয়ে আসনে বসলো।

শুরু হলো ছবি। ভেসে উঠলো প্রথম লেখা: এ ছবি হাসির, হয়তো একটু কান্নারও।

গর্ডন বললেন, হুম্, শুরুটা মন্দ নয়, চলতে পারে।

চলতে যে পারে সে ব্যাপারে আমার প্রত্যয়ের অভাব নেই। এটা সল্ট-লেকে প্রথম প্রদর্শনীর দিনই আমি বুঝে নিয়েছি। সেই প্রত্যয় নিয়েই বসেছিলাম এদের দলে। ছবি আদ্ধেক হতে না হতে আমার তো হাত পা শুকিয়ে ঠাণ্ডা। হাসি নেই কারো মুখে। না কোনো মন্তব্য। শুধু নাক টানার শব্দ পেয়েছি দু তিনবার। শেষ হওয়া অব্দি একই রকম। আলো জ্বলতে যে যার হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর, ওমা, কোথায় ছবি নিয়ে আলোচনা করবে কথা বলবে—দেখি তার ধার কাছেও

কেউ নেই, শুরু হলো যত রাজ্যের নিজস্ব কথা।

—হ্যারি আজ কোথায় ডিনার খাবে?

—প্লাজা। বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তারপর যাবো জাইগফেল্ডের শো দেখতে।

—শুনেছি নাকি ভালোই করে।

—হ্যাঁ। যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?

—না। আজই বাইরে যেতে হচ্ছে। ছেলের পরীক্ষা।

এইরকমই। স্নায়ুর ওপর সে যে কী চাপ! শেষে থাকতে না পেরে বললাম, কই আমার ছবির ব্যাপারে তো কিছু বললেন না?

দু একজন নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসলো। কয়েকজন মাথা নীচু করে মেঝের নক্সা দেখায় মন দিলো। গর্ডন পায়চারী করছেন সমানে। থলথলে বদখদ গড়ন, মুখখানা সাক্ষাৎ পেঁচার মতো। তাতে আবার নাকের ওপর একজোড়া চশমা। বললেন, হুম কিছু বলার আগে আমাদের একবার নিজেদের মধ্যে তো আলোচনা করে নিতে হবে।

—সে আপনারা করুন। একবারের বদলে হাজারবার। কিন্তু ছবি কেমন লাগলো সেটা তো আলোচনার আগেও বলা যায়।

—হয়তো যায়। হাসলেন গর্ডন,—কিন্তু মতামত দেবার জন্যে তো আমরা এখানে আসিনি। এসেছি ছবি কিনতে। ভালো কি মন্দ সেটা এখানে গৌণ।

শুনে কে যেন চাপা একটু হাসলো। দেখাদেখি আরো একজন।

বললাম, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করতে পারি আপনাদের। মতামত দিলে তার জন্য বাড়তি এক আধলাও দিতে হবে না।

এক মুহূর্তের বিরতি। গর্ডন বললেন, সত্যি বলতে কি আমি অন্য কিছু দেখবো আশা করেছিলাম।

—এবং সেটা কি বস্তু জানতে পারি কি?

—সেটা আর যাই হোক, পনেরো লাখ ডলার দামের এরকম ছেঁদো ব্যাপার নয়।

—তার মানে আপনারা চাইছিলেন লণ্ডনের মস্ত সাঁকোটা ভেঙে পড়ুক বা ঐরকম উদ্ভট কিছু একটা ঘটুক। তবেই সেটা হতো দামী তাই তো?

—ঠিক তা নয়। তবে কিনা পনেরো লাখ ডলার·· মানে অঙ্কটা তো বিশাল—

—জানি। আমি বললাম, এবং পনেরো লাখই আমার ছবির দাম। এক আধলা কম হবে না। ইচ্ছে হলে আপনারা নিতে পারেন নয়তো বাদ দিতে পারেন।

এগিয়ে এলেন জে. ডি. উইলিয়ামস্। ফার্স্ট ন্যাশানালের সভাপতি। ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে, তাই এসেছেন আমাকে ঠাণ্ডা করতে। বললেন, ছবি আপনার দারুণ হয়েছে। অপূর্ব। আশ্চর্য এর মানবিক আবেদন। সম্পূর্ণ আলাদা ধরণ। একটু সবুর করুন,

আমরা আলোচনা করে যাহোক একটা ব্যবস্থা করবো। আমি কথা দিলাম।

আলাদা ধরণ কথাটা কানে লাগলো। তাছাড়া তখন আমার খুব রাগ। শরীর জ্বলছে রাগে। বললাম, যাহোক কোন ব্যবস্থায় কাজ হবে না। শর্ত আমার একটাই। গুণে দেবেন টাকা, ছবি পাবেন। একহপ্তা সময় দিলাম। এর মধ্যে না জানালে আমিও অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো।

মোটমাট এদের প্রতি তখন আর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। শুধু রাগ। মোটেই ভদ্র ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে।

অবিশ্যি এক হপ্তা অপেক্ষা করার দরকার হলো না। উকিল জানালো, সব ঠিকঠাক। পনেরো লাখেই ছবি ওরা কিনবে। ওদের পনেরো লাখ উশুল হয়ে যাবার পর থেকে লাভের আদ্ধেক আমি পাবো। এই চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর। তারপর থেকে ছবির প্রদর্শনস্বত্ব সম্পূর্ণ আমার। সেখানে কারুর কোন অধিকার থাকবে না।

নির্ঝঞ্ঝাট যাকে বলে। ছবি নিয়ে আর চিন্তা নেই। নেই মিলড্রেডকে নিয়েও। সব দিক থেকে এখন মুক্ত। মন ভীষণ হাল্কা। যেন উড়ছি সর্বক্ষণ মুক্ত হাওয়ায়। এবার দরকার সত্যিকারের একটু বিশ্রাম। উঠলাম গিয়ে হোটেলে। কারো সাথে কোন যোগাযোগ নেই। আছি চুপচাপ। ঘর থেকে বেরোই না। চারদিকে শুধু উঁচু উঁচু দেয়াল। আছি বেশ। ইতিমধ্যে ট্যাক্সি চালকের সেই লেখা কাগজে বেরিয়েছে। তখন যেন ফের খেয়াল গেলো সবার।—তাইতো, আমি হেন মানুষটা যে আছি এখনো। একটু খোঁজ খবর তো নেওয়া দরকার!

ফের আনাগোনা শুরু। ফের বন্ধু বান্ধব, ফের আড্ডা। আমিও ততদিনে বিশ্রাম নিয়ে চাঙ্গা। শুরু হলো আবার সেই মজলিসী জীবন। সেই হৈ চৈ, সেই ঘোরাঘুরি।

আর কত যে শুভানুধ্যায়ী আমার চারপাশে! যেন কিভাবে কত করবে আমার জন্যে তাই নিয়ে চিন্তায় সর্বদা মশগুল। মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক ক্রাউনিনশিল্ডের কথা। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' আর 'ভোগ'-এর সম্পাদক। কী যে খাতির করতো আমায়, কত জায়গায় যে নিয়ে গেছে! আর কন্ডে ন্যাস্ট—পত্রিকার মালিক,—সেই বা কম যায় কিসে? আমার সম্মানে লেগেই আছে নিত্য তিরিশ দিন ভোজ সভা। ম্যাডিসন এভিনিউর ওপর মস্ত বাড়ি। ঢালাও আয়োজন সেখানে খাওয়া দাওয়ার। আসতো কত যে মান্যগণ্য অতিথি! অলিভ টমাস থেকে শুরু করে শহরের বাছাই বাছাই সুন্দরী—কেউ বাদ নেই মজলিসে হাজির হতে।

আর এদিকে রিৎজে আমার কামরায় সে যে কত ফোন, কত নেমন্তন্ন! সারাদিন

ঝনঝন ঝনঝন বাজবার যেন আর কামাই নেই।—এই যে শুনুন, শুক্রবার রাতে আমরা বেড়াতে বেরোবো। যাবেন আমাদের সঙ্গে? কিংবা কাল আমাদের পাড়ায় ঘোড়ার প্রদর্শনী। একবার আসবেন আপনি?

মামুলি আব্দার। অনেকটা গাঁইয়া ধরনের। তবু ভালো লাগতো খুব। কত যে বৈচিত্র্যে ভরা নিউ ইয়র্ক! দিনের চব্বিশ ঘণ্টা মুহূর্তের জন্যেও যেন কামাই নেই। একটা না একটা লেগেই আছে। দেখলাম সব দুচোখ ভরে। মিশলাম। কত বন্ধু কত পরিচিতি। তারপর হঠাৎই যেন আর ভালো লাগে না। যেন মন ছুটি চায় এখান থেকে। এই পরিচিতির বৃত্ত থেকে। বুদ্ধির ছাপ এখানে কম। মন চাইছে ভিন্ন সঙ্গ। চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী মানুষের সঙ্গ। যাবো নাকি গ্রীনীচ পাড়ায়?

এটা চিরন্তন ঘটনা। একটা অবস্থায় পৌঁছে মন চায় মনের খোরাক। প্রচলিত জীবনের গণ্ডী থেকে চায় বাইরে আসতে। বুদ্ধির গোড়ায় শান দিতে চায়। ছাত্র হতে হয় তখন। ছাত্রের মতো মন। শিখবার ঐকান্তিক ইচ্ছে। যে কোন পেশায় নিযুক্ত মানুষই বোধহয় এরকম অনুভব করেন।

নামে পাড়া আসলে গ্রাম। উঠেছি এক বন্ধুর বাসায়। লক্ষ্য চিত্তের শুদ্ধি। মনের খোরাক জোগানো। সেই মন নিয়েই দেখি, কথা বলি। একদিন মনে হলো নতুন একটা অভিধান লিখে ফেলা উচিত যাতে মনের ভাব সামান্য দু একটি কথায় প্রকাশ করার মতো শুধু শব্দ থাকবে। বললাম একজনকে তাই। সে এক ট্রাক-চালক। নিগ্রো। বললো, আছে ওরকম বই। রোজেটস্ ট্রেজারস্। সব পাবেন ওতে।

থমকে গেলাম। আশাহতও বলা যেতে পারে। চিন্তাশীল কাজ করতে এসে প্রথমেই কিনা বাধা! মনে পড়লো আলেকজান্দ্রিয়া হোটেলের সেই ওয়েটারের কথা। এক এক পদ খাবার দিতো আর কার্ল মার্কস্ বা উইলিয়াম ব্লেকের একটা না একটা উদ্ধৃতি শুনিয়ে যেতো।

মোটমাট একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে—জ্ঞানের জগতে আমি নিছকই শিশু মাত্র। কেউ কিছু কম যায় না। জানে সবাই। সে গাড়ির চালকই হোক কি হোটেলের ওয়েটার। এক কৌতুক শিল্পী একদিন আমাকে কথায় কথায় বার্টনের 'অ্যানাটমি অফ মেলাঙ্কলি' বইখানা পড়ে নিতে বললো। এমনই দারুণ বই, নাকি শেকস্পীয়ার অব্দি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পড়ে। অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। স্যাম জনসনও।—শুধু মুশকিল হবে ল্যাটিন অংশ নিয়ে। সে বললো, ওগুলো বাদ দিয়েই বরং পড়বেন।

মোটামুটি জ্ঞানবুদ্ধির জগতে এই আমার অবস্থান। বলা যেতে পারে পথিক আমি। হাঁটতে হাঁটতে পায়ের নীচে কত পথ অতিক্রান্ত হয়, পথ আর শেষ হয় না। নিজেকে বুদ্ধিজীবীদের একজন ভাবতে সাহস হয় না। মাঝে মাঝে নিজের কাছে নিজেকেই

অবাক লাগে। পড়েছি তো কম নয়। সেই ছোটবেলা থেকে আজ অব্দি—কত বই তো পড়লাম। স্বীকার করতে বাধা নেই, পঠন পাঠন ব্যাপারে আমি কিছুটা ধীরজ। সময় লাগে আর পাঁচজনের চেয়ে কিছু বেশি। লেখকের ধাত বুঝতে প্রথম দিকে খানিকটা সময় নিই। বোঝা শেষ, অমনি বইখানি সম্পর্কে আমার যাবতীয় আগ্রহেরও শেষ। আর ইচ্ছে করে না পড়তে। এমনিভাবে কত বই যে আধ-পড়া অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে। আবার শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত পড়েছি এমন বইও অনেক। যেমন প্লুটার্কের 'লাইভস্' এর পাঁচ খণ্ড। একটি শব্দও বাদ যায় নি। সে যে কী কসরৎ! পড়ে মনে হলো, সারবস্তুর চেয়ে আমার কসরতের দামটাই যেন বেশি। আবার কোন বই বারবার পড়তাম। যেন আশ আর মেটে না। প্লেটো, কান্ট, লক, বার্টন—পাঠ্য তালিকা থেকে এরাও বাদ যায় নি। তবে আগাগোড়া নয়। অংশবিশেষ।

গ্রামে থাকতেই ওয়াল্‌দো ফ্রাঙ্কের সঙ্গে পরিচয়। প্রাবন্ধিক, ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিক। হার্ট ক্রেনকেও তখনই চিনলাম। সুকবি। 'দি ম্যাসেস' পত্রিকার সম্পাদক ম্যাক্স ইস্টম্যান, প্রথিতযশা আইনজীবী ডাড্‌লি ফিল্ড ম্যালোন এবং তাঁর স্ত্রী, মার্গারেট ফস্টার ইত্যাদির সংস্পর্শে তখনই আমার আসা। ক্রিষ্টিনের রেস্তোরাঁয় যেতাম তখন লাঞ্চ খেতে। সেখানে আসতো অভিনেতা অভিনেত্রীর দল এবং শিল্প জগতের নানান দিকপাল। তরুণ নাট্যকার ইউজিন ওনীলের সঙ্গে এখানেই আলাপ। পরবর্তীকালে এরই মেয়েকে আমি বিয়ে করি। নাট্যচর্চার সে এক নতুন যুগ। অপেশাদারী বুদ্ধিদীপ্ত নাটক নিয়ে এরা তখন নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। আমাকে একদিন নিয়ে গেলেন মঞ্চ দেখাতে। মঞ্চ না বলে তাকে ছটা ঘোড়া পাশাপাশি রাখা যায় এরকম আস্তাবল বললেও ভুল হয় না।

ওয়ালদো ফ্র্যাঙ্কের লেখার সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয়। পড়েছি সেই বিখ্যাত গ্রন্থ—'আমাদের আমেরিকা'। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম। মার্ক টোয়েন সম্পর্কিত লেখাটি এককথায় অনবদ্য। টোয়েনকে নিয়ে এমন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা এর আগে আমি কোথাও পড়ি নি। আমাকে নিয়েও লিখেছিল একগ্রন্থ। সে রীতিমতো গম্ভীর খটোমটো এক ব্যাপার। যাই হোক। মৌখিক পরিচয় হবার পর থেকে বন্ধুত্ব ক্রমশঃ নিবিড় হলো। ফ্র্যাঙ্ক মূলতঃ ঐতিহাসিক এবং অতীন্দ্রিয়বাদী। চিন্তার গভীরতা তাই অনেকের চেয়ে অনেক বেশি। আর আমেরিকা ওর ধ্যান জ্ঞান। তাই না আমেরিকা নিয়ে এমন গূঢ় আলোচনা করতে সাহস পায়।

কী ভালো যে লাগতো সেই সব দিন! আমি ওয়ালদো আর হার্ট ক্রেন। সন্ধ্যের সময় জড় হয়েছি ওয়ালদোর বাসায়। ক্রেনের সঙ্গে পরিচয় আমার তারই মাধ্যমে। শুরু হতো আড্ডা। সে যে কত কথা কত গল্প! রাত ফুরিয়ে যেতো চোখের সামনে

দিয়ে। ভোরের প্রাতরাশ হাজির। আমরা তখনও সমানে কথা বলে চলেছি। চিন্তার আদান প্রদান আর কি। গভীর গূঢ় সব বিশ্লেষণ। এক কথায় অনবদ্য।

বড় গরীব আমাদের এই হার্ট ক্রেন। বাবা কোটিপতি। মেঠাই তৈরীর মস্ত ব্যবসা। ছেলেকে চেয়েছিলেন ব্যবসার দিকে ভেড়াতে। ওসব কাব্যি-ফাব্যি কি আর ব্যবসায়ীর ছেলেকে মানায়। ছেলে তো ভিড়বে না কিছুতেই। তখন মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। কিসের পরোয়া! ছেলে কি তাতে দমে! আর লিখতোও দারুণ। এই বই লিখতে লিখতে একদিন ওর একটা কবিতা পড়লাম—দি ব্রিজ। আধুনিক কবিতার প্রতি সত্যি বলতে কি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি নেই। রসও পাই না তেমন। তবু ক্রেনের কবিতা পড়ে বলবো কি আমি একেবারে মুগ্ধ। এমন আবেগ, এমন আশ্চর্য নাটকীয়তার প্রকাশ, ভেতরে টগবগ করে ফুটছে রাগ আর রাগ, আর সঙ্গে হীরের টুকরোর মতো অনবদ্য সব কল্পনা—আমার মতো বেরসিককেও দিলো একেবারে অবাক করে।

তা সেই সব আলোচনায় কবিতা নিয়ে কথা উঠতো। আমি বলতাম, দেখো কবিতা হলো দুনিয়ার কাছে প্রেম পত্রের মতো। ক্রেন বলতো, হ্যাঁ, এই নীচ ছোট মনের ছোট্ট দুনিয়াটার কাছে। আমার ছবির কথা উঠলে বলতো, আমার কাজে সে নাকি গ্রীক কমেডির ধারাবাহিকতা দেখতে পায়। আমি বলতাম, দেখো বন্ধু গ্রীক কমেডি বস্তুটি কি সঠিক ভাবে আমি কিছুই জানি না। আরিস্তোফানিসের একখানা বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ একবার পড়তে শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ আর হয়ে ওঠে নি।

পরবর্তীকালে ক্রেনকে গুগেনহাইন বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ক্রেন ততদিনে মাতাল নষ্ট লোচ্চা একটা মানুষ। মেক্সিকো থেকে ফিরছিল একদিন আমেরিকায়। লঞ্চে। দিলো হঠাৎ সমুদ্রে ঝাঁপ। ব্যস, সব শেষ।

আত্মহত্যার কয়েক বছর আগে আমাকে দিলো একখানা কবিতার বই। নিজের লেখা। নাম—'সাদা বাড়ি।' সামনের পাতায় বড় বড় হরফে লেখা—'দি কিডের স্রষ্টা চার্লি চ্যাপলিনকে।' তারপর নিজের সই। তারিখ বিশে জানুয়ারী, ১৯২৮। একটা কবিতার নাম 'চ্যাপলিনীয়।' কবিতাটি এই—

শুধুই নীরবে কিছু বোঝাপড়া
তাতে তৃপ্তি তাতে সুখ
বাতাসে যেমন উড়ে আসে ধুলো
জমা হয়
একটু একটু করে বাড়ে

এখনও পৃথিবীটাকে ভালবাসতে পারি।
সিঁড়িতে বসে থাকে অবুঝ বেড়ালছানা, তাকে
সরিয়ে দিই সাবধানে, পথে যেহেতু গাড়ির ভিড়—
দিই উত্তাপ, আহা ও বাঁচুক।

আবার হাসতে হাসতে অবহেলায়
ফিরিয়ে নিই মুখ।
সব শাসন তখন অগ্রাহ্য। নেই ভয়।
শিশুর মতো সরল তখন মুখের রেখা
আর বিস্ময়ে অবুঝ দুটি চোখ

ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভাঁজে ভাঁজে এমন অনেক দৃশ্য
আসে আর যায়
মুছে যায় অনেক ছবি স্মৃতির অলিন্দ থেকে
মোছে না হৃদয়
তার জমাট বাঁধা ভালবাসা
পারি না তাকে ভুলতে
পারি না তাকে চেষ্টা করেও মুছে ফেলতে

সরু গলির বুকে থমকে আছে চাঁদ
ভাঙা একটা টিন তার বুকেও জ্যোৎস্না
জ্যোৎস্নায় সে যেন কত মনোরম অপরূপ
শুধু কোথায় ডাকে এক অবুঝ বেড়াল ছানা
ডাকে
ডাকতেই থাকে

গ্রামে থাকতে ডাড্‌লী ফিল্ড ম্যালোন দিলেন দারুণ এক পার্টি। হাজির স্বয়ং হল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিল্পপতি জঁ বয়েসভ্যান্‌। ম্যাক্স ইস্টম্যানও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। আমি তো আছিই। একজনের সঙ্গে পরিচয় হলে, নাম জর্জ—দেখি ভীষণ ঘাবড়ে গেছে আর খুব উদ্বেগ। পুরো নাম আমি তার আজ অব্দি জানি না। শুনলাম পরে উদ্বেগের কারণ। নাকি বুলগেরিয়ার রাজার একসময় ছিলো নয়নের মণি। ভারী

ভালবাসতেন রাজা। নিজের টাকায় তাকে সোফিয়া বিশ্ববিত্তালয়ে পড়িয়েছেন, আরো কত কি করেছেন তার জন্যে। এদিকে ছেলের তো লেখাপড়া শিখে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন হয়েছে। রাজার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলো। যোগ দিলো ক্যাম্যুনিষ্ট দলে। চলে এলো আমেরিকায়। বিপ্লবীদের সঙ্গে ভিড়ে পড়লো। তারপর ধরা পড়ে বিশ বছরের জেল। নতুন করে বিচারের জন্য আবেদন করলো। আবেদন মঞ্জুর হতে হতে ঝাড়া দুটি বছর। দু বছর পর জামিনে ছাড়া পেয়েছে। এসেছে আমাদের ভোজসভায়।

দেখি জমিয়ে নিয়েছে বেশ কয়েকজনকে। রীতিমতো ছোটখাট একটা দল। ধাঁধার লড়াই চলছে। ডাভ্‌লি এসে চুপিচুপি আমার পাশে দাঁড়ালো।

বললো, জানেন নতুন মামলাতেও জিতবার এর কোনো সম্ভাবনা নেই। ফের জেলে যেতে হবে।

তাকিয়ে দেখি নতুন খেলায় মেতে উঠেছে তখন জর্জ। সাদা একটা টেবিল-ঢাকা গায়ে জড়িয়ে সারা বার্নহার্ৎ-এর মতো হাঁটছে কথা বলছে। নিখুঁত অনুকরণ। হাসছে সবাই। আমিও। হাসির মধ্যেই কানে ঘুরছে ডাভ্‌লীর কথাগুলো। জেল খাটতে হবে ফের ওকে আঠারো বছর। আশ্চর্য, অথচ মানুষটার এতোটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই।

চলো যাবো এবার। উঠলাম। জর্জ এলো ছুটতে ছুটতে,—আরে চললেন যে। এতো তাড়াহুড়ো কিসের?

জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। হাত ধরে কাছে টেনে নিলাম। বললাম, বলুন আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্যে?

হাসলো। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো আমার হাত। বললো, ভাববেন না। আমি ঠিক আছি। ঠিক থাকবো।

নিউ ইয়র্কে আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কাজ যে পড়ে আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। বিস্তর। প্রথম এবং প্রধান—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফার্স্ট ন্যাশানালের সঙ্গে চুক্তির কাজ শেষ করা। নচেৎ ইউনাইটেড আর্টিস্টের হয়ে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে আবার পরাধীন ভাব। হালকা মাথাটা আবার একটু একটু করে ভারী হয়ে উঠছে। মন আবার অবসন্ন হতে শুরু করেছে। এখনও চারখানা দু রীলের ছবি বাকি। তবে আমার চুক্তি শেষ। চা-র-খা-না। ভাবতেও যেন গা শিউরে ওঠে। যেন জীবনে পারবো না শেষ করতে এইরকম একটা ভয়। যথারীতি ফের স্টুডিওতে সব কিছু সাজিয়ে বসে আছি। নতুন চিন্তা কখন কি আসবে সেই আশায়। আশা রোজই নতুন করে ব্যর্থ হয়।

তখন ভাবলাম, থাক এসব কদিন। বরং যাই, ডাঃ সিসিল রেনোল্ডস্‌কে নিয়ে ক্যাটালিনায় কদিন মাছ ধরি গিয়ে।

মাছ ধরার পক্ষে আদর্শ স্থান হলো ক্যাটালিনা। ভারী শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ। ছোট্ট গ্রাম, নাম অ্যাভালেঁা। দুটি মাত্র হোটেল। বারোমাসই মোটামুটি মৎস্য প্রেমিকদের ভিড়। যদি শোনা যায় টিউনা মাছের ঝাঁক দেখা গেছে, অমনি দলকে দল নৌকো ভাড়া করে ছুটলো তাড়াতাড়ি। আর ঝাঁকও বটে। তিরিশ থেকে তিনশো পাউণ্ড অব্দি একেকটা মাছের ওজন। ইয়া পেল্লাই দেখতে। ছেয়ে গেলো চারিধার। যতখানি চোখ যায় শুধু টিউনা আর টিউনা। এমনও দেখেছি, খবর পেয়ে পোশাক অব্দি ঠিকঠাক পরতে ভুলে গেছে কেউ কেউ, অমনি নৌকো নিয়ে ছুটে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে আগে থেকেই নৌকো ভাড়া করে রাখতে হয়। নয়তো সব ভোঁ ভাঁ।

একবার তো আমি আর ডাক্তার দুজনে মিলে দুপুরের আগেই টকাটক আটটা মাছ তুলে ফেললাম। তিরিশ পাউণ্ডের নীচে কোনটা নয়। তবে এমন সুযোগ কালেভদ্রেই জোটে। যেমন আসে হঠাৎ, চলেও যায় তেমনি। ঝাঁককে ঝাঁক বেমালুম উধাও। তখন আবার অন্য মাছের খোঁজে ছিপ ফেলা। মাঝে মাঝে ঘুড়ি ওড়াতাম টিউনা মাছের জন্য। ঘুড়ির লেজে বেঁধে দিতাম জ্যান্ত একটা ছোট মাছ। ঘুড়ি ভাসিয়ে রাখতাম জলের ঠিক ওপর ওপর, তারপর চলতো প্রতীক্ষার পালা। সে এক দারুণ রোমাঞ্চ। মাছটাকে খাবার জন্য এক একটা টিউনার সে কী চেষ্টা, কী ছটফটানি! জলের ওপর লাফ দিয়ে চেষ্টা করে ধরবার। ঘুড়ি অমনি টান মেরে ওপরে তুলে নিই। তখন ব্যর্থ হয়ে ফেনার পাহাড় সৃষ্টি করে জল ঘুরিয়ে জল ছিটিয়ে রাগে রাগে ডুব দেয়। আমরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ি আবাব নামিয়ে আনি।

তারায়াল মাছও প্রচুর। পেল্লাই ওজন এক একটার। একশো ষাট পাউণ্ড থেকে শুরু করে ছশো পাউণ্ড অব্দি। ধরাটা ঝক্কির। জ্যান্ত মাছ বঁড়শিতে গেঁথে তো টোপ ফেললাম। ধরলো টোপ, কিন্তু গিললো না। টেনে নিয়ে গেলো এক দমকে প্রায় একশো গজ। সুতো ছেড়েই চলেছি। হঠাৎ থামলো। আমারও সুতো ছাড়া বন্ধ। মিনিট খানেকের প্রতীক্ষা। তারপর টোপ গিললো। অমনি সঙ্গে সঙ্গে দিলাম হ্যাঁচকা এক টান। গেঁথে গেলো বঁড়শি। তারপর খেল্ শুরু। ছুটলো অমনি বাঁই বাঁই করে একশো দেড়শো গজ, সুতো ছাড়লাম। অর্থাৎ দৌড়ের টানে সুতো যাচ্ছে না, আমি হুইলের প্যাঁচ উল্‌টো দিকে ঘুরিয়ে নিজেই ছাড়ছি। না ছাড়লে মুশকিল। দেবে এক হ্যাঁচকা টান কি দিক পরিবর্তন করে বেমক্কা অন্য দিকে ছুটবে। অমনি যাবে সুতো কেটে। শেষে আর যখন দেখে গত্যন্তর নেই, ছোটাছুটি করেও

কিছুতে মুখ থেকে ছাড়ানো যায় না বঁড়শি, তখন শুরু করে লাফাতে। জলের ওপর শুধু লাফ আর লাফ আর দুমড়ে মুচড়ে শরীরের নানা কসরৎ। প্রায় তিরিশ চল্লিশটা পরপর। লাফায় আর প্রত্যেকবার মাথা ঝাড়া দেয়। বুলডগের মতো বিশ্রী: দেখতে মুখ। থ্যাবড়া গড়ন। ডাকেও অনেকটা সেইরকম। তারপর কাহিল হয়ে পড়ে। তখন আর কি, আমার খেল্ শুরু। সুতো গুটিয়ে গুটিয়ে নৌকোর কাছে এনে ফেলা। তারপর তোলা। সে আর তখন এমন কিছু ঝামেলার নয়। বিশ বাইশ মিনিটের ব্যাপার মোট। একটা মাছ ধরেছিলাম একবার এই ভাবে। ওজন একশো পঁচাত্তর পাউণ্ড।

মোটমাট দারুণ সে সব দিন। যেমন তার রোমাঞ্চ তেমনি উত্তেজনা। ডাক্তার আর আমি দুজনে নৌকোয় বসা, ছিপ হাতের মুঠোয়, তাকিয়ে তাকিয়ে ঝিম লাগছে, হয়তো কেউ বসা অবস্থাতেই এক চুমুক ঘুমিয়ে নিলাম, ঘুম ভাঙতে উঠলাম আবার ধড়মড়িয়ে, তখন ভোর, সারা ভুবন আলোয় আলো, সামনে মেঘের মতো জমাট বাঁধা কুয়াশা, যতদূর চোখ যায় যেন অনন্ত অসীম, আর নিঃশব্দ। তখন শঙ্খচিলের একক ডাকও যেন মনে হয় অর্থবহ। কিংবা আমাদের নৌকোয় দাঁড়ের ছপছপানি। স্মরণীয় সেই সব অপরূপ মুহূর্ত।

রেনোল্ডসের এবার একটু পরিচয় দিই। ডাক্তার মানুষ। মস্তিষ্কের অপারেশনে যাকে বলে সিদ্ধহস্ত। অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়েছেন এক একটি অপারেশনের মাধ্যমে। উদাহরণের বোঝা ভারী করে কাজ নেই, শুধু একটির কথা বলি। একটি মেয়ে। তখন সে নিতান্তই বালিকা। দিনে অন্ততঃ বিশবার ফিট হতো। খুলির ভেতরে ছিলো একটা টিউমার। বুদ্ধি-শুদ্ধি যাচ্ছিলো সব তালগোল পাকিয়ে। হলো ডাক্তারের হাতে অপারেশন। সেরে উঠলো ধীরে ধীরে। পরে শুনেছিলাম স্কুলে সে নাকি সেরা ছাত্রী হতে পেরেছিলো।

এমন একজন গুণী মানুষ, এমন নামকরা ডাক্তার—মাঝে মাঝে মনে হতো মাথায় বোধহয় পোকা আছে। নইলে অভিনয় নিয়ে অতো মাতামাতি। জীবনে আর কোন শখ নেই। শুধু একটিই বাসনা—একটু অভিনয় করবে। এই অদ্ভুত গুণই তাকে টেনে এনেছিল আমার কাছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পেরেছিলাম। বলতো, জানো, থিয়েটার হলো আত্মার যথার্থ প্রকাশের মাধ্যম। বলতাম, কেন তোমার নিজের বিদ্যেই বা কম কি। কত মানুষকে দাও নতুন জীবন। জড়ভরতকে দেখাও জ্ঞানের আলো—আত্মিক তুষ্টির পক্ষে এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে!

বলতো, এ আর এমন কি কঠিন। তুমি জানলে তুমিও পারতে। শুধু জানতে হয় কোন নার্ভটা কোথায় আছে। আর কি ঝঞ্ঝাট এর মধ্যে? পাশাপাশি, অভিনয় হলো হৃদয়ের বিকাশ, আত্মার এতো বড় তুষ্টি আর কোন কিছুতে নেই।

—তা এতোই যখন অভিনয় ভালোবাসো ছোটবেলা থেকে অভিনয় নিয়ে থাকলেই পারতে, কাঁটাছেঁড়ার মধ্যে ঢুকলে কেন ?

বলতো, এটাই তো আমার জীবনের চরম নাটক হে। এখানে আমি নিজেই মুখ্য অভিনেতা।

তা করতো নাটক। পেশাদার হিসাবে নয়, অপেশাদারী মঞ্চে। আমার 'মডার্ণ টাইমস্' ছবিতে আমি ওকে জেল পরিদর্শকের ভূমিকায় নামিয়েছিলাম।

এদিকে ক্যালিফোর্ণিয়ায় ফিরে শুনি মা নাকি এখন পরিপূর্ণ সুস্থ। যুদ্ধও শেষ। ভাবলাম, তবে নিয়ে আসি না মাকে এই সুযোগে এখানে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। পাঠালাম টমকে সিধে ইংল্যাণ্ড। মাকে সঙ্গে করে ধীরে সুস্থে সাবধানে নিয়ে আসবে, জাহাজে করে, এবং বলে দিলাম, টম যেন মিসেস চ্যাপলিন নামে মার টিকিট না কেটে অন্য যে কোনো নামে কেবিন ভাড়া নেয়।

আসার সময় নিপাট সুস্থ মানুষ। জাহাজে কদিন কোন গোল নেই রাগ নেই দুঃখ নেই একটি অসংলগ্ন কথা নেই—এমনকি মিলে মিশে যাত্রীদের সঙ্গে হৈ হুল্লোড় করেই বলতে গেলে কটা দিন কাটালেন। জাহাজ ভিড়লো নিউ ইয়র্কে। নামলেন যখন ভারী হাসিখুশী মানুষ। ভিসা অফিসের বড় কর্তা খোদ এগিয়ে গিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, —আসুন, আসুন মিসেস চ্যাপলিন। আপনাকে এদেশে পেয়ে আমরা যারপরনাই খুশী। আমাদের চার্লির মা আপনি… …'

মা বললেন, আর আপনি তো সাক্ষাৎ যীশুখ্রীষ্ট।

মুহূর্তে আদর অভ্যর্থনা উধাও। মুখখানা তখন তার দেখবার মতো। কোথায় একটু আগের ফূর্তি, অতো গাল ভরা হাসি, অতো অভ্যর্থনার ঘটা! টমকে গম্ভীরভাবে বললেন, আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, কাগজপত্র দেখতে হবে।

টম তো তৎক্ষণে বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। গোলমাল যে কিছু হতে চলেছে, তার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আলাদা করে সেটা আর বোঝাবার দরকার পড়ে না। শুরু হবে প্রতিটি নথি নিয়ে পয়ে পয়ে গোলযোগ। তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিষ্টি কথায় শান্ত করে যদিও বা খানিকটা বশে আনলো, ফ্যাকরা পুরোপুরি কাটলো না। ছাড়পত্র দিলো এক বছর মেয়াদের। এক বছর পর আবার গিয়ে অনুমতি করিয়ে আনতে হবে। এদেশে মাকে ওরা থাকতে দেবে, তবে স্বনির্ভর অবস্থায়, কারো রোজগারে মা ভাগ বসাতে পারবেন না।

দশ বছর মাকে আমি দেখি না। সে যে কতদিন! দশ বছর আগের মা-ই তো আমার কল্পনায়, আমার ধ্যানে। প্যাসিডেনায় ট্রেন থেকে নামলেন যখন এক বৃদ্ধা, আমি তো দেখে থ। এই আমার মা! এতো বুড়িয়ে গেছেন! মা কিন্তু দেখামাত্র

পিজনী আর আমি দুজনকেই চিনতে পারলেন। সেই আগের মতো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরা, আদর, চুমু—এতোটুকু অস্বাভাবিক কিছু লাগলো না।

আমাদের বাসার কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে একখানা বাংলো ভাড়া নিলাম মার জন্যে। সব সময়ের সাথী বলতে রইলো এক দম্পতি আর এক নার্স। সন্ধ্যেবেলা দুভাই যেতাম দেখা করতে, গল্পগুজব করতাম, খেলতাম তিনজনে বসে। গাড়ি কিনে দিয়েছিলাম একখানা। দিনের বেলা তাতে করে বেড়াতেন, চড়ুইভাতিতে যেতেন—মোটমাট যখন যা ইচ্ছে তাই। মাঝে মাঝে চলে আসতেন আমার স্টুডিওতে। ছবি দেখার আব্দার ধরতেন। তখন আমার তোলা ছবি এক এক করে দেখাতাম। চুপচাপ বসে দেখতেন।

এদিকে নিউ ইয়র্কে তখন 'দি কিড' দেখানো হচ্ছে। দারুণ সফল। আর যা বলেছিলাম ঠিক তাই—জ্যাকি কুগানকে নিয়ে সে রীতিমতো হৈ চৈ। এক 'দি কিড' থেকেই জ্যাকি পেলো প্রায় চল্লিশ লাখ ডলার। বলতে গেলে সারা জীবনের সঞ্চয় ওর। অফিসে বসে রোজই পাই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন বার্তা। সে একেবারে রাশি রাশি। সবাই একবাক্যে বলছে, এ এক চিরন্তন সৃষ্টি। অথচ আমার মোটে সাহস হয় না নিউ ইয়র্কে গিয়ে সবার সাথে বসে ছবিটা একবার দেখে আসতে। বরং এই ভালো। এই আছি দূরে—ক্যালিফোর্নিয়ায়। দূর থেকে শুনবো সবার সমালোচনা। আমি তাতেই খুশী।

আত্মজীবনী তো সঠিক অর্থে নয়, এ আমার জীবনের এলোমেলো কিছু বিবরণ। এর মধ্যে ছবি তৈরী নিয়ে অবান্তর কিছু প্রসঙ্গ না ঢোকানোই ভালো। তাছাড়া এ ব্যাপারে বাজারে বইও আছে বিস্তর। যথেষ্ট মূল্যবান এবং বিখ্যাত। তবে একটা মুশকিল আছে এই সব বইয়ের। লেখকের সিনেমা সম্পর্কিত নিজস্ব ধ্যানধারণা এবং রুচি এর ছত্রে ছত্রে বিধৃত। মনে হয় যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। তাতে পাঠক জানতে পারে কিছু যন্ত্রের নাম, কিছু কারিগরি কায়দা, ব্যস্। চিন্তাশীল ছাত্রের সব সময় অধিকার আছে নাটকীয় সংঘাতের ব্যাপারে নিজস্ব ধ্যানধারণা প্রয়োগ করার। আসলে সৃজনশীল ক্ষমতাটাই বড় কথা। সৃষ্টি করতে পারলে তার যৎসামান্য খুঁটিনাটি কারিগরি কৌশল জানলেই চলে। শিল্পীর কোন বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে না গিয়ে খোলা মনে মুক্তভাবে কাজ করার মধ্যেই আনন্দ নিহিত থাকে। এবং এরকম কাজে রোমাঞ্চও কিছু কম নয়। এই কারণেই বেশির ভাগ পরিচালকের প্রথম ছবিতে মৌলিকত্ব এবং একটা ঝরঝরে সতেজ ভাব লক্ষ্য করা যায়।

বুদ্ধি দিয়ে একটা দৃশ্যকে সাজানো, তার পাত্রপাত্রীর অবস্থান ঠিক করা, তাতে

চরম কৌতূহলের মুহূর্ত সৃষ্টি করা—এ সবই সহজ। এমন একটা ঝকমারি কিছু নয়। কিন্তু অভিনয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। অভিনয়ে খামতি থাকলে যে কোন বুদ্ধিদীপ্ত ঘটনাই অহেতুক এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আর সর্বদাই সহজ সাবলীল ভাবে কোন কিছুকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা রাখা ভালো। সহজই সবচেয়ে সুন্দর।

কায়দা টায়দা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। যেমন ধরুন আগুন পোয়াবার চুল্লীর একটুকরো গনগনে কয়লার ছবি নিলাম, পর্দায় বড় করে দেখালাম সেটা; কিংবা অভিনেতা হোটেলে ঢুকছে, ক্যামেরাও অমনি এগোচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ তার হাঁটাটা খুব ফলাও করে দেখাচ্ছি—এগুলো আমার কাছে খুব একটা জরুরী বলে বোধ হয় না। কয়লা পুড়লে গনগন করবে এটা তো ঘটনা। কেউ হোটেলে ঢুকলে এগিয়ে যাবে কাউন্টারের দিকে, এটাও বাস্তব। এগুলোকে আলাদা করে না দেখালেও চলে। আসল কাজ হলো দর্শককে দৃশ্যটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা। তাকে চিনতে সাহায্য করা। চিনতে পারলে সে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। বুঝতেও তার কোন অসুবিধে হবে না। বরং এগুলো তখন হবে একঘেঁয়েমির নিদর্শন, তার অসন্তুষ্টির কারণ, ছবিতে গতিহীনতা আমদানীর অন্যতম উপায়। বেচারা নিরুপায় হয়ে তখন এরই মধ্যে 'শিল্প' খুঁজে বের করবার ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

দৃশ্যগ্রহণের সময় আমার ক্যামেরা অভিনেতার হাঁটাচলায় নৃত্যছন্দ ফুটিয়ে তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়। যখন ক্যামেরা বসানো থাকে নীচে, মেঝের ওপর বা অভিনেতার নাক বরাবর, তখন সেই ক্যামেরা অভিনেতাকে প্রকট করে না, করে তার তাবৎ ক্রিয়াকর্মকে। ক্যামেরাকে কখনো অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা উচিত নয়।

আর ছবির একটা বড় গুণ হলো সময় সংক্ষেপ। আইজেনস্টাইন এবং গ্রিফিথ দুজনেই এটা ভালো বুঝতেন। চটপট দৃশ্য কেটে অন্য দৃশ্যে যাওয়া বা এক দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্য মিশিয়ে দেওয়া—দুটোই ছবিকে গতিময় করে তোলে।

খুব অবাক লাগে যখন কোন কোন সমালোচককে বলতে শুনি, আমার ক্যামেরার কাজ নাকি বড় সেকেলে, সময়ের সঙ্গে আমি নাকি তাল মিলিয়ে চলতে শিখিনি। প্রশ্ন হলো কোন্ সময়? আমার যে কায়দা সেটা তো আমারই স্বকীয় চিন্তার ফসল, তার একটা স্বতন্ত্র যুক্তি আছে, আছে নিজস্ব বক্তব্য। সে কি কারুর কাছে ধার করা, যে তার সঙ্গে অন্য কিছুর সাযুজ্য বা মিল থাকবে? আর সময়ের তালে পা মিলিয়ে চলার ব্যাপারটা যদি অতো ভীষণ ভাবে মানা হয়, তবে তো বলতে হবে রেমব্রাঁ অনেক পিছিয়ে পড়া শিল্পী, তুলনায় ভ্যান গগ অনেক আগুয়ান।

সে যাই হোক, দুর্ধর্ষ দারুণ ধরনের ছবি যাঁরা করতে চান, তাদের সুবিধার্থে কয়েকটা কথা সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি। ছবি করার কিছু সহজ উপায়। এতে চিন্তা

শক্তির প্রায় কোন প্রয়োজন হয় না, হয় না ভালো অভিনয় দেখাবার। দরকার শুধু কাড়ি কাড়ি টাকা। তা ধরা যাক প্রায় এক কোটি। আর একটা জমজমাট দৃশ্যসজ্জা। দারুণ চমকদার সব সাজপোশাক, এবং অগণিত মানুষ। কি আর লাগে এ ছাড়া? ধরা যা এরকম একটা দৃশ্য নেওয়া হলো—ক্লিওপেট্রাকে প্রচণ্ড আড়ম্বর এবং আভিজাত্য সহকারে ডুবিয়ে মারা হলো নীলনদে। কিংবা আরেকটা—বিশ হাজার মানুষ চলেছে লোহিত সাগরের দিকে, অথবা তাদের দিয়েই জেরিকোর পাঁচিল ধূলিসাৎ করিয়ে দেওয়া হলো। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। ঝামেলাও কিছু নেই। শুধু দরকার কয়েকজন ঠিকাদার। যোগাযোগ করলেই তারা লোকজন হাজির করে সব করে দিয়ে যাবে। পরিচালকদের কাজ হবে চিত্রনাট্যের ফাইল হাতে নিয়ে চুপচাপ স্রেফ চেয়ারে বসে থাকা। খাটাখাটুনি করবে তার সাঙ্গোপাঙ্গোর দল। অতোগুলো লোক সামলানো তো কম কথা নয়। তখন তারাও কিছু সংক্ষেপ রাস্তা বাৎলে নেবে। বাঁশি রাখবে একটা সঙ্গে। একটা ফুঁ—মানে বাঁদিকের দশ হাজার এদিকে সরে এসো, দুটো ফুঁ—মানে ডান দিক থেকে দশ হাজার এগিয়ে এসো। তিনটে ফুঁ—মানে নাও, এবার সবাই পাঁচিল ভাঙতে এগিয়ে যাও। শুরু হবে অমনি দৃশ্য গ্রহণ।

তবে এই জাতীয় ছবিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে আর একটি উপাদানেরও দরকার হয়—সে হলো নায়ক, বা ছবির ভাষায় অতিমানব। সে পারবে সব। সে লাফ দিতে পারবে, গাছে চড়তে পারবে, দুমদাম গুলি ছুঁড়তে পারবে নির্ভুল নিশানায়, মারপিট করতে পারবে এবং যে কোন পরিবেশে যে কোন অবস্থায় যে কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে যেতে পারবে। মোটমাট মানুষের যে কোন সমস্যা সমাধানে সে একেবারে সিদ্ধহস্ত। শুধু একটাই দোষ। সে-ও চিন্তা করে কিছু করতে পারে না।

পরিচালনা সম্পর্কে এবার একটা খাঁটি কথা বলে নিই। যে কোন অভিনেতাকে নিয়ে দৃশ্যগ্রহণের সময় অভিনেতার মনস্তত্ত্ব কিন্তু যারপরনাই সহায়ক। কত রকমই তো হয়। ধরুন একজন অভিনেতা, তাকে নেওয়া হয়েছে প্রায় মাঝপথে। তার আগে অর্ধেক দৃশ্যগ্রহণ শেষ। অভিনয় কিন্তু করে সে দারুণ। তবু ঐ যে এক গোলমাল—এসেছে অনেক পরে, তাই গোড়া থেকে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে না থাকার দরুণ স্বভাবতঃই সে একটু ঘাবড়ে যাবে। থতমত খাবে। তখনই পরিচালকের কেরামতি। তাকে সামলে দিতে হবে সব, এদিকে ছবিও তুলতে হবে নিপুণ ভাবে। এরকম অবস্থায় প্রায়ই আমাকে পড়তে হয়েছে। আমি স্রেফ অভিনেতাটিকে একধারে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্দ্বিধায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। বলেছি, দেখুন মশাই কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। পারছিও না নতুন কিছু ভাবতে। এ অবস্থায় আপনি যদি উদ্ধার না করেন⋯।

ফল হয়েছে। অচিরেই কাটিয়ে উঠেছে তার জড়সড় ভাব। মনপ্রাণ ঢেলে আমাকে সংকট থেকে উদ্ধারের কাজে নেমে পড়েছে। আমিও মাঝখান থেকে হাসিল করে নিয়েছি আমার কাজ।

নাট্যকার মার্ক কনেলি আমাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবেগ আর বুদ্ধি এর কোনটার ওপর নাট্যকার জোর দেবেন? আমি বলেছিলাম, আবেগ। কেননা থিয়েটারে বুদ্ধির চেয়ে আবেগটাই বেশি প্রাধান্য পায়। মঞ্চ থেকে শুরু করে তার দৃশ্যসজ্জা তার পর্দার রঙ্ তার দৃশ্য পরিকল্পনা—সবই যেন আবেগটাকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। চেখভ এটা বুঝতেন, বুঝতেন মোল্নার, বুঝতেন আরো অনেক নাট্যকার। আবেগ থেকেই তো নাটকীয়তার সৃষ্টি। আর এই নাটকীয়তাই হলো নাটক রচনার মূল ভিত্তি।

আমার কাছে থিয়েটার মানে হলো নাটকীয় মুহূর্তগুলির উপযুক্ত সন্নিবেশ, তাকে পর পর সাজানো, তাকে ধীরে ধীরে গুছিয়ে তোলা। এবং হঠাৎ করে ঘটে যাবে এক একটি সংঘাত। ধরুন পড়তে পড়তে কেউ আচমকা বইখানা বন্ধ করে দেবে। চট করে ধরাবে একটা সিগারেট। বাইরে থেকে হঠাৎ দৌড়ে মঞ্চে ঢুকবে। বা বেরিয়ে যাবে আচমকা। দুম করে পিস্তল থেকে বেরোবে এক ঝলক আগুন। কেউ চিৎকার করে উঠবে, পড়ে যাবে ধপ করে হঠাৎ। আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে মনে হতে পারে সস্তায় বাজিমাতের চেষ্টা। তবু বলবো মঞ্চে এরাই প্রাণ এরাই ছন্দ। এরকম অজস্র ছন্দ মিলে তৈরি হয় একটি কবিতা। নাটক হলো সেই আশ্চর্য কবিতা।

লিখবো নাটক বা অভিনয় করবো, অথচ নাটকীয় কোন বোধ থাকবে না, এ কি হয়! থাকবে নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টির অবিরাম চেষ্টা। যে কোন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তবেই তো মন কাড়বে দর্শকের।

উদাহরণ দিই একটা। নিউ ইয়র্কে আমার ছবি 'এ উওম্যান অফ প্যারী'র প্রথম শো। তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিলো মুক্তির দিন ছবি দেখাবার আগে মঞ্চের ওপরই যাহোক একটু গান বাজনার আয়োজন রাখা। চলতো প্রায় আধঘণ্টা ধরে। 'তারই মধ্যে দর্শক ঢুকতো প্রেক্ষাগৃহে, আসন গ্রহণ করতো। তারপর আসর শেষ হলে শুরু হতো ছবি। তো আমাকেও সেরকম একটা কিছু করতে হবে। কি করি? না আছে আগে থেকে কোনা মহড়া, না কোনো কর্মসূচী। ভাবতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়লো অনেকদিন আগের দেখা একটা ছবির কথা। বেহালায় ছড় টানছে এক শিল্পী, ছোট্ট একখানি ঘর, হয়তো কোনো স্টুডিও বা ঐ জাতীয় কিছু। বসে আছে যে যার নিজস্ব ভঙ্গিতে। কটি ভবঘুরে মেজাজের যুবক। ছবির নীচে লেখা 'বীঠোফেনের সুর।'

এই ছবিখানাকে কেন্দ্র করেই আমার চিন্তা ভাবনা এগিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলাম। হাতে মোটে দুদিন সময়।

সাজালাম শেষ অব্দি এইভাবে। এক পিয়ানো বাদককে জোগাড় করলাম। আর এক বেহালা-বাজিয়ে। এক গায়ক রইলো দৃশ্যে। আর কিছু নাচের লোক। এদের নাচ গান বাজনা দেখবার ও শুনবার জন্যে রইলো কিছু অতিথি। বসিয়ে দিলাম তাদের চেয়ারে, দর্শকের দিকে পেছন করে। যেন ভারী তন্ময় তারা, ভারী বিভোর। মদের গ্লাসে চুমক দিতে দিতে আগাগোড়া ঘটনাটি দেখছে। বেহালা বাজাচ্ছে বাদক। একধারে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে এক মাতাল। বাজনার ফাঁকে ফাঁকে নাক ডাকার শব্দ মিলে তৈরী হচ্ছে এক আশ্চর্য স্বর ব্যঞ্জনা। নাচ হলো। সঙ্গে গান। মোটে দুটো লাইন। তাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তখন একজন অতিথি বললো, তিনটে বাজে, এবার আমি উঠবো। আরেকজন বললো, হ্যা হ্যা, আমাদেরও যেতে হবে। বলে একে একে সবাই বেরিয়ে গেলো। শেষ লোকটি বিদায় নেবার পর গৃহকর্তা একটা সিগারেট ধরালেন। আলো নেভাতে লাগলেন এক এক করে। বাইরে থেকে আবছা ভাবে ভেসে আসছে দু এক ছত্র গানের কলি। তারপর সব আলো নিভে যেতে মঞ্চ পুরোপুরি অন্ধকার। শুধু ওপর থেকে চাঁদের এক চিলতে আলো আসছে। চলে গেলেন এবার গৃহকর্তা। গান আরো ফিকে হয়ে আসছে। এরই মাঝখানে ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এলো।

বলবো কি আপনাদের, একটা পিন পড়লে যতটুকু শব্দ, সারা প্রেক্ষাগৃহ এত চুপ যেন তাও শুনতে পাওয়া যাবে। আধঘণ্টা ধরে একমনে নিবিষ্ট চিত্তে দর্শকেরা এইসব দেখলো। কিছুই কিন্তু নয়। গোটা ব্যাপারটাই ফাঁকি। তবু উপস্থাপনার গুণে সেটাই দর্শক মনে রেখাপাত করতে পারলো।

এরই নাম নাটক এবং নাটকীয়তা।

এবং এইটুকুই। এর বাইরে আর কিছু আমার মাথায় ঢোকে না। ঢোকে না শেকস্পীয়ার। পারি না তাঁর নাটক দেখে আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি এমন ভান করতে। মনে হয় যেন বড্ড সেকেলে। যেন মেলে না বর্তমানের সঙ্গে। অভিনয়ের ধারাটাও যেন কেমন। জাঁকজমকের বাহুল্য যেন। আমার ভাল লাগে না। শুনতে শুনতে মনে হয়, যেন নাটকের সংলাপ নয়, শুনছি কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা। অনেকটা এইরকম—

> আমার শান্ত পাক্, এদিকে এসো। মনে পড়ে তোমায়
> সেই একবার আমি বলেছিলাম সমুদ্রের মধ্যে এক চড়ায়
> আর ডলফিনের পিঠে বসা মৎস্যকুমারীর

অপূর্ব সুরেলা ছন্দমধুর গান শুনছিলাম
সে গানে উত্তাল সমুদ্র হয়েছিলো শান্ত
দিগন্তে ফুটে উঠেছিল কটি তারা
যেন উন্মাদ—তার গান শুনবে বলে।

মহান সৃষ্টি সন্দেহ নেই, লেখাও ভারী চমৎকার, কিন্তু নাটকে এই কবিতা আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া রাজা রাণী অভিজাতদের নিয়ে এই সব গল্পও আমার অপছন্দ লাগে। জানিনা এর সঙ্গে আমার ব্যক্তি মানসিকতার যোগ কতখানি। এসব কাহিনীর মুখোমুখি হলেই নিজের জীবনের কথা বারবার মনে পড়ে যায়। ছোটবেলা খাদ্যের খোঁজে সেই যখন মরীয়া হয়ে ছোটাছুটি করতে হতো, তার মধ্যে আভিজাত্যের নামগন্ধও কখনো চোখে পড়ে নি। নিজেকে কিছুতে মেশাতে পারি না আমি রাজা বাদশার সমস্যার সঙ্গে। পারি না এক করতে। যা খুশী করুক হ্যামলেটের মা—যে কারুর অঙ্কশায়িনী হোক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কোন দরদ বা দুঃখ জন্মায় না আমার হৃদয়ে।

দর্শক সমক্ষে কেমন করে হাজির করবো একটা নাটক—এ ব্যাপারে চিরাচরিত প্রথার আমি পক্ষপাতী। মঞ্চ আর দর্শকের মধ্যে স্পষ্ট থাকবে একটি বিভাজন রেখা। মঞ্চে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপিত করা হবে এক একটি ঘটনা, প্রেক্ষাগৃহে দর্শক তাই দেখে অবাক হবে, আশ্চর্য হবে, কখনো বা দুঃখে পড়বে ভেঙে। পর্দা থাকবে অবশ্যই। পর্দা পড়ে একটি দৃশ্যকে দেবে সমাপ্ত করে, পর্দা খুলে দৃশ্যের করবে সূচনা। এক ধরনের নাটক দেখি, অভিনেতারা পাদপ্রদীপের আড়াল ভেঙে এপ্রান্তে চলে আসে, দর্শকের সঙ্গে মিশে যায়। কখনো বা চরিত্র মঞ্চের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে এসে কিছু অন্য কথা বলে আবার গণ্ডীর মধ্যে ফিরে যায়। দুটোই আমার ঘোর অপছন্দ। এই নিয়মের যারা প্রবক্তা, তারা হয়তো বলবেন এতে করে দর্শককে শিক্ষিত করা হচ্ছে। হয়তো হয়। কিন্তু তাতে থিয়েটারের মজা যায় নষ্ট হয়ে। গোটা ব্যাপারটা গদ্যের মতো শুকনো খটখটে অবস্থায় দর্শকের কাছে পৌঁছয়।

মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে একটিই আমার লক্ষ্য। দৃশ্যটিকে বাস্তবমণ্ডিত করতে ঠিক যতটুকু দরকার, ততটুকু দিয়েই সাজাতে হবে মঞ্চ। তার বেশি কিছু নয়। যদি দৈনন্দিন জীবনের কোন কাহিনী হয়, তবে যে মঞ্চরীতিতে একটা জ্যামিতিক ধাঁচ আনতেই হবে তার কোন মানে নেই। বরং এতে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নটি অনেক খাটো হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে দেখি চারুশিল্পীর দল এগিয়ে এসেছেন দৃশ্যসজ্জায় কাজে। অপূর্ব দৃশ্যপট আমরা উপহার পাই। এতে নাটক এবং অভিনয় দুটোই ভালো জমে।

পাশাপাশি, আর এক ধরনের শিল্পীকে দেখি, মঞ্চ তারাও সাজান, খানিকটা আধুনিক চিত্ররীতির ধাঁচে। হয়তো শুধু সামনে আর পেছনের পর্দা জুটো রইলো। একধারে একটা সিঁড়ি—খানিকটা উঠে ব্যস হঠাৎই শেষ। আর কিছু নেই। যেন ফাঁকা মঞ্চটা চিৎকার করে কাতরাতে কাতরাতে বলছে,—বাকী যা কিছু হে দর্শক, তুমি নিজের বিচার বোধ খাটিয়ে ভেবে নাও। সব ছেড়ে দিলাম তোমার হাতে। এটা আমি মানতে পারি না। যেমন পারি না লরেন্স অলিভিয়ারের সেই 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকের বক্তৃতার অংশটুকু মানতে। সম্মান লাভের জবাবে দেওয়া ভাষণ। পরনে সান্ধ্য-কালীন পোশাক, তাতে সাদা গলাবন্ধনী। সংলাপে প্রাচীন পন্থার ছাপ ছিলো ঠিকই, তবে পোশাকটা বড্ড আধুনিক, এবং ফলে বেমানান।

কেউ কেউ বলেন, শরীর মনকে সম্পূর্ণ ভাবে শিথিল করে যদি অভিনয় করা যায় তবেই সত্যিকারের শিল্পরূপ বেরিয়ে আসে। শুধু অভিনয় নয়, সব শিল্পের ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য। মুক্ত মন না হলে সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয়, নিজের ওপর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, থাকবে না ভেতরের কোন তাগিদ। ধরা যাক প্রচণ্ড উত্তেজনাময় একটি দৃশ্য। অভিনেতা শরীর মন শিথিল করে ধীর স্থির ভাবে সব কিছু দেখছেন। তার আবেগের উত্থান ও পতনের অধ্যায় চলছে। বাইরে দেখাতে হচ্ছে তাকে প্রচণ্ড উত্তেজনা, ভেতরে চলছে নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ দ্বিবিধ এক প্রক্রিয়া। দেহ মন শিথিল না হলে এই প্রক্রিয়া চালানো যায় না। কিন্তু কেমন করে অভিনেতা নিজেকে করবে শিথিল ? এটা মোটেই সহজ নয়। তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে বলতে পারি। মঞ্চে ঢুকবার আগে ভীষণ ঘাবড়ে যেতাম আমি। ভীষণ উত্তেজনায় ভুগতাম। তাতে এমনই দৈহিক ক্লান্তি হতো, একটু পরে ঢুকতাম যখন আমার শরীর মন সম্পূর্ণ শিথিল।

অভিনয় কেউ কাউকে শেখাতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। খুব বুদ্ধিমান লোককে আমি দেখেছি মঞ্চে উঠে বোকা বনে যেতে। আবার খুব বোকা লোককে দেখেছি অদ্ভুত মুন্সীয়ানায় অভিনয় করতে। আসলে অভিনয়ের মূল চালিকাশক্তি হলো অনুভূতি বা বোধ। ওয়েনরাইটের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। চার্লস ল্যাম্বের বন্ধু। একাধারে নন্দনতত্ত্বের দিকপাল এবং সাহিত্য জগতের রীতিমতো এক কেউকেটা। ব্যক্তিজীবনে ভারী নৃশংস মানুষ। খুনীও বটে। বিষ খাইয়ে খুন করেছিল খুড়তুতো ভাইকে, নাকি কে তাকে বলেছিলো তাই। বুদ্ধিমান মানুষ সন্দেহ নেই। বুদ্ধি ভাঙিয়ে তার কারবার। কিন্তু সু-অভিনেতা হিসেবে তাকে আমি বলবো ব্যর্থ। কেননা মানুষটার নিজস্ব অনুভূতি বলতে কিছুমাত্র নেই।

পৃথিবীর নাম করা খুনীদের দেখেছি এটাই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধিতে ভীষণ তুখোড়।

কিন্তু বোধের ঘরে ফাঁকি। ঠিক উল্টোটা নজরে পড়ে বোকাদের ক্ষেত্রে। বোধের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, বুদ্ধি একেবারে ঠনঠন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে থাকবে এক অদ্ভুত সাযুজ্য। বোধ এবং বুদ্ধি। তবেই তো তার অভিনয় আমাদের মাতিয়ে রাখতে পারবে।

মহান্ অভিনেতা হবার প্রথম কথাই হলো অভিনীত চরিত্রটিকে ভালবাসতে শেখা। এতদ্বারা কেউ যেন না মনে করেন, তাকে আমি ছোট করতে চাইছি। মাঝে মাঝেই অভিনেতাকে আমি বলতে শুনি,—ইস্ অমুক পার্টটা পেলে আমি খুব ভালো করতে পারতাম। জানিনা সত্যি সত্যি সেটা তিনি করতে পারবেন কিনা, তবে ভালো অভিনেতার ক্ষেত্রে দেখেছি অন্যরকম। নিজের ভূমিকাটি নিয়েই তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন। 'দি বেল্‌স্' নাটকে আরভিং-এর কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে স্যর হাবার্টের সে:ভেঙ্গালির কথা, মার্টিন হার্ভের 'এ সিগারেট্ মেকার্স রোম্যান্স' নাটকে অভিনয়ের কথা। এমন একটা দারুণ চরিত্র নয়, কিন্তু অভিনয়ের গুণে অনবদ্য হয়ে উঠেছিল সেই চরিত্রগুলি। নাটক করবো, নাটক ভালবাসি—এটুকুই যথেষ্ট নয়। আত্মপ্রত্যয়ের প্রশ্নটাও এক্ষেত্রে অনেকখানি।

অভিনয় শিক্ষার যে সব প্রতিষ্ঠান আছে সে সম্পর্কে আমার তেমন কিছু ধারণা নেই। তবে শুনেছি, সেখানে নাকি অভিনেতার ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়। এটা ঠিক, সব অভিনেতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ দেখা যায় না। তাদের ক্ষেত্রে বিকাশের প্রশ্নটি জরুরী। তবে অভিনয় সম্বন্ধে আমি যেটুকু বুঝি তা থেকে বলতে পারি অভিনয় হলো নিজে যা নই তাই বলে নিজেকে প্রকাশ করা। ব্যক্তিত্ব এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত দরকারী। ব্যক্তিত্বের আলোতেই ঝলমলিয়ে ওঠে অসম্ভব সব ব্যাপার। স্তানিস্লাভস্কি জোর দিতেন অভিনেতার আত্মোপলব্ধির ওপর। নিছক অভিনয় করা নয়, যে চরিত্র অভিনীত হচ্ছে সেটাতে একাত্ম হওয়া, নিজেকে সেইভাবে প্রকাশ করা। বোধহয় একেই বলে লীন হয়ে যাওয়া। অভিনেতা নিজে সিংহ নয়, তবু নিজেকে ভাববে সিংহের মতো, নিজেকে সিংহের যাবতীয় গুণদোষের সাম্রাজ্যে বিলীন করে দেবে। তাকে হৃদয়ঙ্গম করবে। কোন্ কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিশেষ চরিত্রের কি কি প্রতিক্রিয়া হয় বা হতে পারে, সব মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। অভিনয়ের এই অধ্যায়টি আমার যতদূর ধারণা কাউকে শেখানো যায় না।

ভালো অভিনেতাকে কোন একটি চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা দেবার ব্যাপারে একটি বা দুটি কথাই যথেষ্ট। যেমন,—এই হলো মাদাম বোভারীর আধুনিক সংস্করণ। বা—এই হলো ফাল্‌স্তাফিয়ঁ। শুনেছি জেড হ্যারিস নাকি এক অভিনেত্রীকে বলেছিলেন—এটা এমনই এক চরিত্র তার দুঃখ দিয়ে কান্না দিয়ে সৃষ্টি হবে অন্ধকারের এক ফুল।

…এটা আমার মনে হয় একটু হিসেবের বাইরে বলা।

সেই যে একটা ধারা চালু আছে—অভিনেতাকে জানতে হবে অভিনীত চরিত্রের সম্পূর্ণ জীবনের ইতিহাস,—আমার বিবেচনায় ব্যাপারটা নেহাতই অহেতুক। নাটকের স্বল্প পরিসরে কি আর অতো কিছু থাকে বা থাকতে পারে? কেউ যদি মন গড়া কিছু ভেবেও নেয়, সেটা হবে নাট্যকারের চিন্তা ডিঙিয়ে ভাবা। সেটা সব সময় যে বুদ্ধিদীপ্ত হবেই, এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না।

নাট্যশিক্ষার কোন কোন প্রতিষ্ঠান শুনেছি অভিনেতার আবেগ সৃষ্টির জন্য নানারকম ক্রিয়া কাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামান। আমার ভারী অবাক লাগে। যে অভিনেতার আবেগ বলে সহজাত কোন গুণই নেই, তার আবার শিক্ষা কি, অভিনয় ছেড়ে দেওয়াই তো তার প্রধান এবং প্রথম কাজ।

অভিনয়ে 'সত্য' কি অর্থাৎ কোনটি যথার্থ এ নিয়ে প্রায়ই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। আমি বলি, এর কোন সঠিক মাপ নেই। ফ্রান্সের কমেডি অভিনয়ে চিরাচরিত অভিনয় রীতি অবলম্বন করেই গোটা ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়। আবার ইবসেনের নাটকে বাস্তব ঘেঁষা অভিনয়ের মাধ্যমে একই বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পায়। দুটোর কোনটাই স্বাভাবিক নয়। দুটোই কৃত্রিম—অভিনয় মানেই তো আসলে কৃত্রিমতা। সেক্ষেত্রে এই কৃত্রিমতাই সত্য। এবং সত্যের মূল ভিত্তি যে মিথ্যা এটা আরো বড় সত্য।

অভিনয় আমি নিজে কখনো আলাদা করে শিখিনি বা এই নিয়ে পড়াশুনোও করিনি। বলতে গেলে আমার জীবনে অভিনয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি যুগের প্রভাব। ছোটবেলা কেটেছে এমন একটা যুগে যেটা কিনা বিরাট সব অভিনেতার যুগ। তাঁদেরই জ্ঞান তাঁদেরই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছি।

অভিনয়ের একটা সহজাত প্রতিভা আমার ছেলে বয়েস থেকেই ছিল। তবু মহড়ার সময় দেখতাম কত পেছিয়ে পড়ে আছি আমি। কত কি জানতে এখনও বাকী। আমার মনে হয় প্রতিটি শিক্ষার্থীরই এই ভাবে চিন্তা করা উচিত। যেটুকু জানে সে, তার চেয়ে আরো বেশি তাকে জানতে হবে শিখতে হবে। এটাই হওয়া উচিত তার জীবনের ব্রত।

অর্থাৎ এক কথায় নিজেকে ঢেলে সাজানো। নতুন ভাবে নতুন আদলে গড়ে তোলা। নিজেকে নতুন করে জানতে চিনতে শেখা। মঞ্চে আছি আমি, কোথায় আছি কতদূর যাবো কি করতে হবে সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ঠিক করে নেওয়া। তবেই না সে অভিনেতা। তবেই তার সঙ্গে শখের অভিনেতার ফারাক। পরিচালনার সময় এই একটি কথা আমি প্রতিটি অভিনেতাকে বারবার মনে করিয়ে দিতাম।

অভিনয়ের সূক্ষ্মতার ওপর আমার বরাবরই নজর। সেই সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারেও। এ ব্যাপারে জন্ ড্রু সবার শিরোমণি। দেখেছি মুহুর্মুহু তাকে রূপ বদল করতে। এই হাসিখুশী, এই গম্ভীর, এই পরিহাসপ্রিয়, এই আবার স্থির। প্রত্যেকটি অংশ নিখুঁত এবং অনবদ্য। একটা মজা এই, মঞ্চে আবেগ আনাটা এমন কিছু জটিল ব্যাপার নয়, যে কোন অভিনেতাই সেটা পারেন। কিন্তু আবেগের সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলোকেও তো স্পষ্টভাবে শোনাবার দরকার আছে। কজন পারেন সেটা?

বারে বারে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাকে আমেরিকান মঞ্চে আমার প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী কে। এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। কজনকে বাছাই করে নাম বললেই মনে হবে বাকীদের হয়তো আমি তুচ্ছ করছি, হয়তো তাদের কাজ ভালো না। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। প্রিয় আমার দু তরফেই আছে—কমেডি অভিনয়েও যেমন, গুরু গম্ভীর অভিনয়েও তেমন। আবার অভিনেতা নয়, এমনি খানিক সময় হাসি গানে দর্শককে অভিভূত করে রাখেন, এদের মধ্যেও আমার পছন্দসই অনেকেই আছেন।

উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই মনে আসে অ্যাল জোল্‌সনের নাম। এমন প্রতিভা সম্পন্ন শিল্পী, এমন যাদুকরী তার প্রভাব—আমি খুব কমই দেখেছি বলা যায়। নিকষ কালো রঙ, অথচ কী আশ্চর্য যে কণ্ঠ। কথা যখন বলেন যেন গমগম করে চারিধার। রসিয়ে রসিয়ে এমন সব চুটকী ছাড়েন, হাসতে হাসতে কানে আঙুল চাপা দিতে হয়, তবু না শুনে উপায় নেই, যাদু যে গলার স্বরে। আর গানের সময়ও তেমনি। ভরাট উদাত্ত গলা। সুরে যেন প্রাণ কেড়ে নেয়। মাতোয়ারা করে তোলে মন। ছবিতেও কয়েকবার নেমেছিলেন। জমেনি তেমন। ছবিতে তো আর গোটা তিনি নন, ছায়া মাত্র। অংশ বিশেষ। কণ্ঠই যে বাদ। সেটা ১৯১৮। তখন খ্যাতির শীর্ষে অ্যাল জোল্‌সন। বিহ্বল দর্শক। দিকে দিকে তার গুণমুগ্ধের ভিড়। অবাক হয়ে মানুষ শুধু তাকে দেখে। দেখার মতোই যে গড়ন। মসৃণ কমনীয় কান্তি, উন্নত শির, উজ্জ্বল শাণিত দুটি চোখ—দেখে দেখে যেন আর আশ মেটে না। আর সেই সব গান—"ঐ যে দেখা যায় রামধনু····" কিংবা "যখন যাবো গো চলে"····তন্ময় মুগ্ধ হয়ে থাকতো শ্রোতা। ব্রডওয়ে নিয়ে একটা কবিতা, তাকে সুরে বেঁধে গাইতেন। ফুটে উঠতো তার কান্না, তার উল্লাস, তার অশ্লীলতা, তার স্বপ্ন, তার লক্ষ্য—সব।

আর এক কৌতুক শিল্পী স্যাম বার্নার্ড। হল্যাণ্ডের লোক। উঁচু দরের অভিনেতা। ভারী রাগ যেন সব কিছুতেই। 'ডিম! এক ডজনের দাম বাট সেণ্ট! তাও পচা! আর মাংস! কি বললে?—দু ডলার! দিলে তুমি! এই এক টুকরো মাংসের জন্যে!' বলে দু আঙুল দিয়ে টুকরোটাকে এমন ভাবে দেখাতেন, যেন একটা ছুঁচ। তারপরই

ফেটে পড়তেন রাগে। গমগম গজগজ করতে করতে সারা মঞ্চ চষে বেড়াতেন।—'মনে আছে সেই সব দিনের কথা? দু ডলার। মাত্র দু ডলার! বয়ে নিয়ে আনতে পারতে না মাংস। এই এত্তোখানি!'

বলে দু হাত দিয়ে মাপ দেখিয়ে দিতেন।

ব্যক্তি জীবনে মানুষটা ঘোর দার্শনিক। মনে আছে একবার, ফোর্ড স্টার্লিং গিয়ে কেঁদে পড়লো,—কি ব্যাপার, না বৌ আমাকে ঠকিয়েছে। স্যাম বললেন, এ আর নতুন কথা কি। নেপোলিয়নকেও তো ঠকিয়েছিল।

ফ্রাঙ্ক টিনিকে দেখেছিলাম নিউ ইয়র্কে যখন প্রথম আসি সেই সময়। দারুণ জনপ্রিয় দর্শক মহলে। মুহূর্তের মধ্যে কথার মারপ্যাচে দর্শককে আপন করে নেন। মঞ্চের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে ফিসফিসিয়ে দর্শকদের বলতেন,—এই জানো, নায়িকাকে না আমি সত্যি বলছি গেঁথে ফেলেছি। বলেই আবার চারদিক দেখতেন, পাছে আর কেউ শুনে ফেলে তাই। তারপর ফের বলতেন,—মানে পুরোপুরি নয়, এখনও একটু বাকী। আজ যখন আসছিল এদিকে, আমি বললাম কেমন আছেন। শুনে একটা জবাব অব্দি দিলো না।

ঠিক সেই সময়ই নায়িকার প্রবেশ। মঞ্চের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। টিনি অমনি ঠোঁটে আঙুল চেপে দর্শকদের মানা করে দিলেন, যেন ভুলেও কেউ কথাটা ফাঁস না করে। তারপর বীর বিক্রমে এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন তাকে,—এই যে কি খবর? কোথায় যাচ্ছো? শুনে খুব বিরক্তি সহকারে নায়িকা মুখ ফিরিয়ে তাকালো তারপর টিনির চোখে চোখ পড়তেই অমনি তড়িঘড়ি গতি বাড়িয়ে দিলো, যাবার সময় আচমকা চিরুনীটা হাত থেকে গেল পড়ে।

তখন ফিরলেন আবার টিনি দর্শকের দিকে। বললেন, দেখলেন তো, যা বলেছিলাম মিলিয়ে নিন। তবে হ্যাঁ, এটা ওর বাইরের ঠাঁট। ভেতরে ভেতরে কিন্তু আমাকেই...' বলে চিরুনীটা দু আঙুলে তুলে ভেতর দিকে তাকিয়ে দলের ম্যানেজারকে ডাকলেন,—হ্যারি, এদিকে একবার আসুন তো।

এলো ম্যানেজার। বললেন, এই চিরুনীটা সাজঘরে নিয়ে রাখুন। ফেলে গেছে।

ক বছর পর টিনিকে আবার মঞ্চে দেখলাম। দেখে আমি তো থ'। এই কি সেই টিনি! কোথায় তার সেই রগড়! কোথায় হাসি! কোথায় ফিসফিসিয়ে দর্শকের সঙ্গে কথা! হাঁটছেন মঞ্চে, কথা বলছেন, যেন ভারী সচেতন। মনটা যেন অভিনয়ের দিকে নয়, নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। আশ্চর্য তো! পরবর্তীকালে টিনির এই পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই আমার 'লাইমলাইট' ছবি। কেন একটা মানুষ হারিয়ে ফেলে তার গুণ, কি করে আত্মবিশ্বাসের বদলে তার মনে জন্ম নেয় আত্মসচেতনতা—এটাই ছিল আমার

প্রধান জিজ্ঞাসা। 'লাইমলাইটে' আমি এ প্রশ্নের জবাবে দেখিয়েছি বার্ধক্য। বুড়ো হয়ে গেছে কালভেরো, দেখেছে অনেক কিছু, ভেতরে ভেতরে জন্ম নিয়েছে এক ধরনের আভিজাত্য। কিন্তু এই তার শেষ। দর্শকের সঙ্গে সেই যে নিগূঢ় অন্তরঙ্গতা সহজে তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া—তা আর নেই। সব গেছে নষ্ট হয়ে।

অভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীমতী ফিস্কের কথা। সদ্য ফোটা ফুলের মতো নির্মল নিষ্পাপ মুখ। বুদ্ধিমতী এবং একই সঙ্গে কৌতুকশিল্পী হিসেবে অনবদ্য। তার ভাইঝি এমিলি ষ্টিভেন্সও চমৎকার। প্রতিভাময়ী শিল্পী, অভিনয়ে স্টাইল বলতে যা বোঝায় খুব সুন্দর জানে, আর অভিনয়ও করে খুব লঘু ছন্দে। জেন কাউলেরও নিষ্ঠা আছে। লেসলী কার্টার তো সারাক্ষণ দর্শককে কিভাবে মাতিয়ে রাখতে হয় চমৎকার জানে। নিছক কমেডি অভিনেত্রীদের মধ্যে ট্রিকিস ক্রিগানজা আর ফ্যানি ব্রাইসের নাম সবচেয়ে প্রথমে মনে আসে। ফ্যানির ছিল আবার ইতিহাসের ওপর পড়াশোনা। তাতে কমেডি দারুণ জমে উঠতো।

ভালো অভিনেত্রী আমাদের ইংল্যাণ্ডেও কম নেই। এলেন টেরি, আদা রীভ, আইরিন ভ্যানব্রা, সিবিল থর্নডাইক এবং খ্যাতনাম্নী শ্রীমতী প্যাট ক্যাম্পবেল। শেষ জনের ছাড়া বাকী সকলেরই অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

থিয়েটারের ঐতিহ্য বলতে যা বোঝায় তার ধারক হিসেবে জন ব্যারিমুরের নাম করা যেতে পারে। শিল্পী হিসেবে যথার্থই অনবদ্য, কিন্তু দোষ ঐ—অভিনয়ের ব্যাপারে বাছাবাছি বা যাচাইয়ের কোন স্থান তার অভিধানে লেখা নেই। যা পাবেন, তাতেই অভিনয় করবেন। সে হ্যামলেটই হোক, কি কোনো জমিদারের স্ত্রীর প্রণয়ীর ভূমিকা হোক—আপত্তি নেই কিছুতেই। অভিনয়ের গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে নাকি খুব মজার।

জেন ফাউলার লিখেছে তাঁর জীবনী, তাতে অভিনয় নিয়ে একটা অদ্ভুত গল্প আছে। প্রচণ্ড মাতাল অবস্থায় একবার নাকি তাঁকে জোর করে বলতে গেলে প্রায় ঠেলেই তুলে দেওয়া হয় হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে। করেন শুরু থেকে শেষ অব্দি এক টানা। ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চের বাইরে এসে বমি করে যান। সমালোচক খুব তারিফ করেছিল সে অভিনয়ের। নাকি এমন 'হ্যামলেট' কোনদিন কেউ করতে পারে নি। যদি এটাই সত্যি হয় তবে বলবো অভিনেতাদের পক্ষে বিষয়টি খুবই লজ্জার এবং অপমানের। তাহলে আর বুদ্ধি দিয়ে অভিনয় করার প্রয়োজন কি রইলো।

জন তখন খ্যাতির শীর্ষে, একদিন বসে আছেন ইউনাইটেড আর্টিস্টসের অফিস ঘরে, আমার সঙ্গে দেখা। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সাঙ্গ হবার পর দুজন আমরা ঘরে

একদা, আমি বললাম, আপনার হ্যামলেটের খ্যাতি তো শেকসপীয়ারের সব নাটকের সব চরিত্রকে ছাপিয়ে গেছে।

বললেন, হ্যাঁ। তবে রাজার ভূমিকাটাও মন্দ না। সত্যি বলতে কি হ্যামলেটের চেয়ে আমার রাজাকেই বেশি ভালো লাগে।

খুব অবাক লাগলো। এই যদি একজন অভিনেতার ভালো লাগার নমুনা হয় তবে তার নিষ্ঠা নিয়ে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে। এই একটি কারণেই তিনি খ্যাতির শীর্ষে ওঠা সত্ত্বেও বুথ, আরভিং, ম্যান্সফিল্ড, স্যর হার্বার্ট প্রভৃতির সমগোত্রীয় হতে পারেন নি। নিজেকে মনে করতেন এক অনবদ্য প্রতিভা। সেই ধারণা নিয়েই থাকতেন সব সময় বুঁদ হয়ে। এবং এসব ক্ষেত্রে যা অনিবার্য হয় তাই। প্রতিভা বিকাশের তো আর প্রয়োজন নেই, সুতরাং অবসর সময়টুকু মদে বিভোর হয়ে থাকো। নিজের সর্বনাশ নিজে সেইভাবেই ডেকে আনেন এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দি কিডের আকাশ ছোঁয়া সাফল্য সত্ত্বেও আমার সমস্যা কিন্তু মেটেনি। চারখানা ছবি এখনও দিতে হবে ফার্স্ট ন্যাশানালকে। কিন্তু দেবো কি। মাথা যে ফাঁকা। চিন্তার নাম গন্ধও তাতে নেই। ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। ঘুরি ফিরি এধার ওধার, মন খুঁজে বেড়ায় ছবির গল্প। স্টুডিওর সাজ সরঞ্জাম বারবার দেখি। যদি আসে মাথায় কিছু। একই জিনিস দেখি রোজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।—ঐ তো পিয়ানোটা, ঐ সেই জেলখানা। ঐ এক জোড়া দরজা, ঐ

আটকে গেলো চোখ। এই তো আমার আগামী ছবি। এই গলফ খেলার সরঞ্জাম। ভবঘুরে খেলবে গলফ। ছবির নাম হবে—'দি আইডল্ ক্লাস।'

গল্প খুবই সাধারণ। ধনীরা যা যা করে, ভবঘুরেও তাই করতে চায়। একবার গেলো দক্ষিণে বেড়াতে। এদিকে ভীষণ শীত। দক্ষিণে গরমের ভাব। তবু যাহোক কটা দিন শীতের হাত থেকে তো বাঁচবে। তা বেড়াতে যায় সবাই ট্রেনে চেপে, গদীতে গদীয়ান অবস্থায়। সে গেলো ট্রেনের নীচে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে। ঘুরতে ঘুরতে গলফ খেলার এক বিরাট ময়দান। দেখে সরঞ্জাম সব মজুত। খেললো প্রাণ ভরে খানিকক্ষণ। তারপর এক নাচের আসর। বড়লোকদের ভিড়। ঢুকে পড়লো সেখানে। এক সুন্দরীর সঙ্গে চেনা পরিচয় হলো। তারপর তো নানান কাণ্ড। প্রেম। তা এসব প্রেম কি আর ধোপে টেঁকে। তারপর হতাশা। আবার তার পথ পরিক্রমা শুরু।

এই ছবির দৃশ্যগ্রহণের সময় আমাকে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়। যদিও মারাত্মক কিছু নয়। বলতে গেলে অতি সাধারণ। তবু তাই নিয়ে পরে যে সব ঘটনা ঘটে,

তার জের চলে বেশ কিছুদিন ধরে। মশালের আলোয় একদিন আমার অ্যাসবেস্টসের তৈরী প্যান্টের খানিকটা পুড়ে যায়। তাপ লাগে সামান্যই। উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। তখন আরেক স্তর অ্যাসবেস্টস দিয়ে প্যান্টের সেই পোড়া জায়গাটা মেরামত করে নিই। কার্ল রবিনসন দেখলো এ এক দারুণ সুযোগ। ঘটনাটা কাগজে দেবো ছবির প্রচারের কাজও খানিকটা হয়ে যাবে। সান্ধ্য সংস্করণে দেখি বড় বড় হরফে ছাপা অদ্ভুত এক খবর—আগুনে পুড়ে আমার নাকি রীতিমতো কাহিল অবস্থা। মুখখানা দারুণ ভাবে পুড়ে গেছে, হাত পুড়েছে, শরীর—মোটমাট কোনমতে আমি বেঁচে গেছি। বাপরে বাপ, তারপর সে যা অবস্থা! চিঠি, ফোন, টেলিগ্রাম—হাজারে হাজারে আসতে শুরু হলো স্টুডিওতে। আমি তখন মরীয়া হয়ে খবর ভিত্তিহীন এই মর্মে কাগজে বিবৃতি দিলাম। বেশির ভাগ কাগজই ছাপলো না, মাত্র কয়েকটাতে ছেপে বেরুলো। সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে এইচ. জি. ওয়েলস্ লিখলেন চিঠি,—আমার দুর্ঘটনার খবর পড়ে নাকি তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। এমনও ইঙ্গিত দিলেন, আমার গুণমুগ্ধ ভক্ত তিনি, যদি আমি আর কাজ না করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে। আমি তৎক্ষণাৎ আসলে কি হয়েছে জানিয়ে তাঁকে তার পাঠালাম।

শেষ হলো 'দি আইডল ক্লাস।' আবার নতুন ছবির ভাবনা। এবারের ছবির মাপ কোন ক্রমেই দু রীলের বেশি নয়। ভাবতে ভাবতে গল্প এলো। গল্প না বলে নকশা বলাই ভালো। ভবঘুরে এবার কলের মিস্ত্রী। জলকল সারানো বসানো নতুন কোথাও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এই তার কাজ। প্রথম দৃশ্য এইরকম। লিমুজিন গাড়িতে চেপে ম্যাক সোয়েন আর ভবঘুরে এসে নামলো দারুণ গাম্ভীর্য নিয়ে। গাড়ির চালক তৃতীয় এক ব্যক্তি। বাড়ীর কর্ত্রী এড্না পারভিয়েন্স ভীষণ যত্ন করলো আমাদের, খাওয়ালো, গল্প করলো। সে একেবারে রীতিমতো আদর আপ্যায়ন যাকে বলে। তারপর খাওয়া দাওয়া পর্ব চুকতে কলঘরে নিয়ে গেলো আমাদের। শুরু হলো কাজ। কাজের হাতিয়ার প্রাথমিক ভাবে একটি স্টেথোস্কোপ। তাই দিয়ে ডাক্তারী কায়দায় মেঝের বুক পরীক্ষা করলাম। টোকা দিলাম বুকে—যেন ফুসফুস পরীক্ষা করছি। কল যেন হাত পা। সেগুলোও পরীক্ষা করা হলো।

এতো অব্দি এগিয়ে ভাবনা আর এগোতে চায় না। ফাঁকা চারধার। যেন শূন্যতা। আসলে ভীষণ যে ক্লান্ত তখন শরীর আর মনের দিক থেকে—সে কি জানি। তাছাড়া কদিন থেকেই লণ্ডনে যাবার একটা ইচ্ছে মনের আড়ালে গুড়গুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওয়েলসের চিঠি তাতে নতুন ইন্ধন। আরো একটা কথা—হেটি কেলি চিঠি লিখেছে আমায় দশ বছর পরে,—"সেই যে দুষ্টু মেয়েটা, তাকে কি তোমার মনে আছে?..." বিয়ে হয়েছে তার, থাকে এখন পোর্টম্যান স্কোয়ারে। যদি আমি লণ্ডনে যাই যেন

অতি অবিশ্যি একবার দেখা করি। সত্যি বলতে কি, চিঠি পড়ে মনে তেমন একটা সাড়া পেলাম না। হেটির আবেগটাও যেন কেমন সাজানো গোছানো। যেন সেদিনের সেই হেটি আর নেই। তাছাড়া আমারও তো দশ বছরে বয়েসটা দশবছর বাড়লো। কত প্রেম করলাম এর মধ্যে, কত প্রেম খারিজ করলাম। সে যাই হোক, তবু লিখেছে যখন, নিশ্চয়ই যাবো একবার দেখা করতে।

টমকে বললাম গোছগাছ করতে। রীভ্‌সকে বললাম স্টুডিওতে তালা দিতে। যেন ঘোষণা করে দেয়, সবার ছুটি। যতদিন আমি না ফিরে আসি ততদিন।

লণ্ডনে যাবার জন্যে মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হবার আগের রাত্রে এলিসি কাফেতে দিলাম এক পার্টি। প্রায় চল্লিশ জনের মতো নিমন্ত্রিত। তাদের মধ্যে আছে মেরী পিকফোর্ড, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, মাদাম মেটারলিঙ্ক আরো নামকরা অনেকে। খুব হৈ চৈ হলো। শব্দ তৈরীর খেলা হলো। ডগলাস আর মেরী দেখালো ছোট্ট একটা নক্শা। ডগলাস সাজলো বাসের কণ্ডাক্টর আর মেরী যাত্রী। টিকিট কাটলো মেরী। বাস থেকে নামলো। হঠাৎ বিপদ। ঘিরে ধরেছে কারা মেরীকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার—বাঁচাও, বাঁচাও! চিৎকার করতে করতে গিয়ে পড়লো নদীতে। তখন লাফ দিয়ে পড়লো ডগলাস। সাঁতার কেটে এগিয়ে গেলো। নিরাপদে নিয়ে এলো ডাঙায়। সবই কিন্তু মূকাভিনয়। আমরা সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিলাম।

এবার আমার পালা। আমি আর মাদাম মেটারলিঙ্ক। 'ক্যামিলি'র মৃত্যু দৃশ্যটুকু করবো। মাদাম মেটারলিঙ্ক ক্যামিলি আর আমি আরমান্দ্। এবার মারা যাবে ও। আমার কোলে মাথা। হঠাৎ শুরু হলো কাসি। প্রথমে খুক খুক, তারপর বাড়তে বাড়তে একেবারে খক খক, খক খক—যেন থামার আর নাম নেই। সারা ঘর জুড়ে শুধু মৃত্যুপথ যাত্রী ক্যামিলির কাসির আওয়াজ। আর এমনই ছোঁয়াচে, বলবো কি, আমাকেও ধরে ফেললো। তখন আমিও কাসছি। সে যেন পাল্লা দিয়ে কে কত চমৎকার কাসতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। ফল হলো উলটো। ক্যামিলির জীবন রক্ষা পেলো আর আমি বেচারা ওরই কোলে মাথা রেখে মারা গেলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙলো সাড়ে আটটা নাগাদ। শরীর মন অবসন্ন। স্নান করে নিলাম চটপট। তখন অবসাদের ভাবটা কাটলো। ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনা। যাবো ইংল্যাণ্ড। কতদিন পরে পা রাখবো আবার মাতৃভূমির বুকে। সাথী হিসেবে একই জাহাজে চলেছে নাট্যকার এড্ওয়ার্ড নব্লক্। আমার বন্ধু এবং 'কিসমৎ' প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের রচয়িতা। জাহাজের নাম 'অলিম্পিক'।

জাহাজে ওঠার সময় সে কী ভিড়! যেন ঝেঁটিয়ে এসেছে যত রাজ্যের সাংবাদিক আর কাগজের অফিসের লোক। ভাব করছে এমন যেন নামবে না এখানে, যেন আমাদেরই সঙ্গে সুদূর ইংল্যাণ্ড অব্দি পাড়ি দেবে। ভাগ্য ভালো, তা আর হয়ে উঠলো না। দুজনকে রেখে বাকীরা সবাই পাইলট নামার সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়তে বাধ্য হলো।

এতোক্ষণ পর কেবিনে আমি একলা। চারপাশে রাশি রাশি ফুলের তোড়া আর ফলের ঝুড়ি। দিয়েছে আমারই সব বন্ধু বান্ধব। যাবো তো দূর পাল্লায়। তাই শুভ কামনা আর ভালবাসার স্মারক। ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে পুরনো দিনের কথা। সেই জাহাজ, সেই অলিম্পিক। দশ বছর আগে কার্নোর দলের সঙ্গে এতেই এসে ছিলাম ইংল্যাণ্ড থেকে। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমি। আজ আবার একই জাহাজে চলেছি ফিরে। এবার কেবিন।

মনে পড়ছে সব। স্টুয়ার্ড দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল প্রথম শ্রেণীর দিকটা। কেমন ভাবে থাকে ওরা, কি খায়, কি করে। ভাড়া শুনে সেদিন আঁতকে উঠেছিলাম। আজ আর চমক বলে কিছু নেই। আজ সবই স্বাভাবিক, সবই সম্ভব। মানুষটা যে বদলে গেছি আমি অনেকখানি। ল্যামবেথের সেই ছোট ছেলেটি তো আর নেই। তখন ছিল খুঁটে খাবার সংগ্রাম। আজ ধনী আমি। প্রচুর আমার বৈভব, যশ। সেইভাবে নতুন রূপে চলেছি স্বদেশে। দুয়ের মধ্যে যে অনেক তফাৎ।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব আলাদা। চলেছি যে ইংল্যাণ্ড এটা বেশ বুঝতে পারছি। ইংরেজী খানা, ইংরেজী কেতা—মোটমাট আমেরিকার নামগন্ধও নেই কোন কিছুতে। আর খানা মানে তো এক এলাহী ব্যাপার। খাবার জায়গা এদিকে দুটো—সবাই বসে খেতে পারে এমন এক পেল্লাই ডাইনিং রুম। আরেকটা নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট, সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছোঁয়া, ছোট্ট রেস্তোরাঁ মতো—নাম রিংজ। সেখানেই আমি আর নব্লক খেতাম। আসতো শ্যাম্পেন, আসতো বেলে হাঁসের মাংস, সুস্বাদু নানান রান্না, দামী মদ, সসেজ, আরো হরেক পদ। খুব আয়েশ করে খেতাম। ভালো লাগতো বেশ। নিত্য নতুন পোশাক থাকতো পরনে। মোটমাট বিলাসের বন্যতে গেলে ছড়াছড়ি।

তবু স্বস্তি কি আছে। শান্তিতে যে ক দণ্ড কাটাবো সে সুযোগ কোথায়? জাহাজের নোটিশ বোর্ডে রোজ টাঙানো হচ্ছে আমাকে নিয়ে নানান খোশ খবর। কবে পৌছবো আমি লণ্ডনে, কোথায় কোথায় যাবো ইত্যাদি। মাঝ দরিয়ায় পৌছুতে না পৌছুতে আরেক উৎপাত। রাশি রাশি টেলিগ্রাম আর চিঠিতে যেন ছয়লাপ। সে যে কত নেমন্তন্ন, কত আব্দার। যেন হঠাৎ ক্ষেপে গেছে সবাই। এদিকে জাহাজ কোম্পানীর নিজস্ব বুলেটিন তো আছেই। তাতে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা নানান টুকরো টুকরো খবরের উদ্ধৃতি। একটা এই রকম: জয়ের মুকুট মাথায় পরে ফিরে আসছে চ্যাপলিন। সাদাম্পটন থেকে লণ্ডন অব্দি তাকে রোমের সম্রাটের কায়দায় অভ্যর্থনা জানানো হবে।

আরেকটা: এ পর্যন্ত প্রকাশিত সবরকম সংবাদ পরিবেশনের রেকর্ড ভঙ্গ করে

আমরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচার করছি চার্লি-বুলেটিন। সারা ইংল্যাণ্ড উদ্বেল। সবার মুখে এক প্রশ্ন—কেমন আছে চার্লি। কবে আমরা তার দেখা পাবো।

আরো একটা : জাহাজ যত এগিয়ে আসছে আমাদের অধীরতাও বাড়ছে। দিকে দিকে উত্তাল হয়ে উঠছে জনতা। ঘরের ছেলে ফিরে আসছে ঘরে।

আরেকটাতে পড়লাম : সাদাম্পটনে আজ রাত্রে কুয়াশার জন্য জাহাজ খানিকক্ষণ আটকে পড়ে। আর পুলিস হিমসিম খায় জনতাকে শান্ত করতে। বন্দর এলাকায় রাশি রাশি মানুষ এসেছে নানান দিক থেকে। সকলের সাধ—প্রিয় চার্লিকে এক মুহূর্ত চোখের দেখা দেখবে। মেয়র জানাবেন প্রাথমিক অভ্যর্থনা। ডকের নিকটবর্তী যে সব বাড়ি থেকে জাহাজ থেকে অবতরণের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়, সেগুলো ইতিমধ্যেই ভিড়ে বোঝাই হয়ে গিয়েছে।

অবাক। আমি বিহ্বল। এমন অভ্যর্থনা পাবো স্বপ্নেও তো ভাবিনি। এর কি সত্যিসত্যি আমি যোগ্য ? হয়তো না। হয়তো বাস্তবের তুলনায় সব কিছুই একটু বেশি। আগে থেকে আন্দাজ পেলে আসা পিছিয়ে দিতাম। আগে যোগ্য হতাম, তারপর আসতাম। এবার আসা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। দেখতে এসেছি পুরনো দিনের স্মৃতি। দেখার তাগিদটাই ভেতরে ভেতরে প্রবল। যাবো কেনিংটনে, দেখবো। যাবো ব্রিগ্নটন, দেখবো। যাবো ৩নং পাওনাল টেরাস—সেই জানলা, অবাক হয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকবো অনেকক্ষণ। যাবো সেই কাঠ চেরাই কারখানায়, কাজ করতাম সেই কবে—তাদের সঙ্গে দেখা করবো, পুরনো দিনের গল্প করবো, যাবো ২৮৭ নং কেনিংটন রোডের সেই বাড়িতে। লুইজির সঙ্গে বাবার সঙ্গে ছিলাম সেখানে কদিন। চোখের দেখা একবার দেখে আসবো—এই তো আমার এবারের আসার উদ্দেশ্য। এরই মোহ তো তাড়িয়ে নিয়ে এলো আমায় এতোদূর।

অবশেষে শেরবুর্গ। জাহাজ থামতে না থামতে দলে দলে কাগজের লোক। কত তাদের প্রশ্ন কত জিজ্ঞাসা—কি বার্তা নিয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডের জন্য ?—ফ্রান্সের ব্যাপারে কি কিছু বলবেন ?—আয়ারল্যাণ্ড যাবেন নাকি ? আয়ারল্যাণ্ডের সমস্যা নিয়ে কিছু বলুন।

আমার তো প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি।

শুরু হলো ফের যাত্রা। এবার ইংল্যাণ্ড। বড় যে আস্তে আস্তে চলছে জাহাজ। আসছে না কেন এখনও সাদাম্পটন ? আর কত দেরী ? উত্তেজনায় ঘুম তো কবে থেকেই ছুটি নিয়েছে। শুধু রাতের পর রাত জাগরণ, ভাবনার পর ভাবনা। এই তো থামলো ইঞ্জিন। এই পেছন দিকে খানিকটা গেলো। নোঙর পড়লো খুব সম্ভবতঃ। এবার স্থির। আমি সব টের পাচ্ছি। পায়ের শব্দ একঝাঁক। আমারই কেবিনের বাইরে।

কথা শুনতে পাচ্ছি। খোশ ইংরেজীতে বাক্যালাপ। জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলাম। কালো মেঘের মতো অন্ধকার। আলো ফোটে নি এখনও ভোরের। দেখতে পেলাম না কিছু। এই তো আমার মাতৃভুমি। বড় ঘুম পাচ্ছে এবার।

ঘুমিয়ে পড়লাম। বড়জোর দুঘণ্টা। স্টুয়ার্ড ডাকলো কফির সরঞ্জাম হাতে। উঠে দেখি সকাল। ধপধপ করছে আলো। ভোরের আলো। ট্রের ওপরে রাখা। একরাশ প্রভাতী সংবাদপত্র। চুমুক দিতে দিতে চোখ বোলালাম।

সব কাগজেরই প্রথম পাতার সংবাদ আমি। বড় বড় হরফে ছাপা আমিই শিরোনাম। একটা এইরকম :

কৌতুক শিল্পীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন :
আজ প্রতিপক্ষের যুদ্ধ বিরতির দিন

আরেকটা :

সারা লণ্ডন চ্যাপলিনের আগমনে মুখর

অন্য আরেকটায় :

লণ্ডনের পথে চ্যাপলিন : বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন

বিরাট বড় বড় হরফে আরেকটা কাগজে দুটি মাত্র শব্দ :

সন্তানকে দেখো

সমালোচনাও করেছে কোন কোন কাগজ। একটা এইরকম :

প্রকৃতিস্থতার জন্য আবেদন

ঈশ্বরের নামে শপথ, আমরা যেন প্রকৃতিস্থ হই। চ্যাপলিন প্রথিতযশা ব্যক্তি এ ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি। ঘরে ফেরার জন্য এই যে তার আকুলতা, কই সেই যখন চলছে আমাদের সংকটের দিন, হুন আক্রমণে আমরা বিপর্যস্ত—তখন তো এই আকুলতা তিনি একবারও বোধ করেন নি। তবে কি আমরা ধরে নেবো রূপালি পর্দার বুকে নানান কসরৎ দেখাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত, বন্দুক হাতে পুরুষোচিত দর্পে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে তিনি ভয় পান ?

জাহাজঘাটায় সাদাম্পটনের মেয়র জানালেন অভ্যর্থনা। তারপর ট্রেন। এবার সিধে লণ্ডন। হেটির ভাই আর্থার কেলী আমার পাশে। আগে থেকেই ঠিক ছিল। জানলার বাইরে ঘুরছে দৃশ্যের পর দৃশ্য। সেই মাঠ সেই দিগন্ত সেই শ্যামলিমা। দেখতে দেখতে আনমনা ভাবে এটা ওটা কথা বলছি।

বললাম, তোমার বোন তো আমাকে নেমন্তন্ন করে রেখেছে। পোর্টম্যান স্কোয়ারের বাড়িতে একদিন ডিনার খেতে যেতে হবে।

আথার অবাক। খানিকটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত। ইতস্ততঃ করে বললো, হেটি মারা গেছে, তুমি শোননি?

ধাক্কা খেলাম। যদিও সেই মুহূর্তে তেমন গভীর তেমন গাঢ় নয় আমার দুঃখ। মনের ভাঁজে ভাঁজে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে রাশি রাশি এলোমেলো ঘটনার স্রোত। হেটির মৃত্যু তার মধ্যে সামান্যই স্থান করে নিতে পারলো। কিন্তু একটা কথা ঠিক। হেটির কাছে আমার এই নতুন চেহারা, নতুন আমাকে দেখাবার একটা আশ্চর্য ইচ্ছে ভেতরে ভেতরে কাজ করছিল। ঠিক স্বপ্ন যেমন। স্বপ্নের প্রাসাদটা হঠাৎই ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো।

লণ্ডনের শহরতলী দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন। প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। দেখছি সব। মেলাবার চেষ্টা করছি। ঐ তো গেলো একটা রাস্তা—কোন্ রাস্তা ওটা? পারছি না মনে করতে। বা পারলেও সেটা যে সঠিক ভাবে সেই রাস্তা সেটা হলফ করে ভাবতে পারছি না। মনে কেবল ভয়—কে জানে যদি না মেলে, যুদ্ধের পরেও সেই পুরনো লণ্ডন কি আর আছে!

আর ভীষণ অধৈর্য হয়ে উঠছি ভেতরে ভেতরে। কী যে সেই ছটফটানি। দেখছি কত কি, চোখে লাগছে না কোন কিছু। শুধু ভাবনা আর ভাবনা। একটার পর একটা এলোমেলো ছবি। ছবির মালা যেন। ভাবনাও পারছি না আর গুছিয়ে তুলতে। সব যেন কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে, জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কেমন করে খুলবো সেই জট।

নতুন একটা শব্দে হঠাৎই যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। স্টেশনে ঢুকবার আগে লাইনের খাঁজে খাঁজে বদলের তালে তালে ছন্দে ছন্দে যে শব্দ হয়। ওয়াটারলু। প্ল্যাটফর্মে নামলাম। যেদিকে চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। দড়ি দিয়ে আগলে রেখেছে পুলিস। ঢেউ উঠছে ভিড়ের চাপে। যেমন ওঠে সমুদ্রের বুকে তরঙ্গ। কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। হঠাৎ কে যেন হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতো টানতে আমাকে একধারে নিয়ে গেল। যেন কয়েদী আমি। গ্রেপ্তার করেছে ভীষণ কোন অপরাধে। জনতার ভিড় একেবারে আমার সামনে। সে ভীষণ উত্তেজনা। যেন তোলপাড় হয়ে উঠলো এক কুণ্ডলী মানুষ। চেঁচিয়ে উঠলো—এই তো, এই তো চ্যাপলিন! সে যে কত ধ্বনি কত উল্লাস। আর এরই ফাঁকে কে যেন আমাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুললো একখানা লিমুজিন গাড়িতে। পাশে উঠে বসলো অব্রে—আমার খুড়তুতো ভাই। পনেরো বছর পরে এই প্রথম আমাদের দেখা। গাড়ি ছুটলো উদ্দাম গতিতে।

অত্রেকে বললাম, আমাদের গাড়ি ওয়েস্টমিনিস্টার সাঁকোর ওপর দিয়ে যাবে তো? অত্রে বললো, যাবে। তখন ওয়াটারলু পার হয়ে আমরা পড়েছি ইয়র্ক রোডে। বদলে গেছে গোটা দৃশ্যটা। পুরনো বাড়ির বদলে এখন সব নতুন নতুন বাড়ি। নতুন সাজে সেজে উঠেছে যেন একটা এলাকা। মোড় ঘুরলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি—ঐ তো, ঐ তো সেই সাঁকো! একটুও বদল হয়নি তো। যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম হুবহু তাই। ঐ পার্লামেণ্ট। দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে সেই পুরনো দিনের মতো। সব আগের মতোই। সব। এই আমার চির দিনের চির চেনা লণ্ডন। চোখ টলমল করে উঠলো।

রিৎজ হোটেলেই উঠলাম। বলা যেতে পারে এ আমার একধরনের খামখেয়ালী। ছোটবেলায় দেখেছিলাম তৈরী হচ্ছে এই হোটেল। উঁকি ঝুঁকি মারতাম বাইরে থেকে, ভেতরে ঢোকার সাহস হতো না। আজ সব কৌতূহলের নিবৃত্তি হবে। সেই কারণেই এখানে থাকবো।

বাইরে বিশাল জনতা। ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে আমাকে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিতে হলো। নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকলাম। স্বস্তি পাচ্ছি না। এই ভাবে বন্দী হয়ে থাকতে তো আমি লণ্ডনে আসিনি। এসেছি দেখতে ঘুরতে, পুরনো স্মৃতির সামনে গিয়ে নতুন করে দাঁড়াতে। এবং তার জন্য বেরোতে হবে সম্পূর্ণ একাকী। কেউ থাকবে না আমার সঙ্গে। কখন হবে সেই সুযোগ!

এদিকে তখনও ভিড়। বাইরে সেই উন্মুখ জনতা। সমানে ধ্বনি আসছে কানে। আসছে তাদের কলতান। বারান্দায় গিয়ে বেশ কয়েক বার দাঁড়ালাম। হাত নাড়লাম। জবাবে তারাও হাত নাড়লো, ধ্বনি দিলো। সে যে কী উত্তেজনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এদিকে কামরা আমার ভিড়ে বোঝাই। কত বন্ধু, কত আত্মজন, আর মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ। ভালো লাগছে না একদম। অন্ততঃ এদের এই সাহচর্য। মন চাইছে ছুটি। বেরোতে হবে একবার। সবার চোখে ধুলো দিয়ে একলা, সম্পূর্ণ একলা। তখন চারটে বাজে। বললাম, একটু বিশ্রাম করতে হবে। সন্ধ্যেবেলা আপনাদের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে কথা বলবো। শুনে সবাই একে একে বেরিয়ে গেলো।

এই সুযোগ। অমনি পোশাক বদলালাম। পেছনের মাল বইবার লিফ্ট বেয়ে নামলাম। কেউ দেখতে পেলো না। সামনে জার্মিন স্ট্রীট। ট্যাক্সি। উঠে বসলাম। চলো এবার সিধে ওয়েস্টমিনিস্টার।

পেছনে পড়ে রইলো হে মার্কেট। পার হয়ে গেলাম ট্রাফালগার স্কোয়ার। তারপর পার্লামেণ্ট স্ট্রীট। ট্যাক্সি ছুটে চললো উদ্দাম গতিতে।

মোড় ঘুরলো। এই তো কেনিংটন রোড। অবাক কাণ্ড! কোথায় বদল! কোন কিছুই তো অন্যরকম নজরে পড়ছে না। ঐ তো এক কোণে সেই গীর্জা, ঐ ট্যাংকার্ড—সেই শুঁড়িখানা। এ যেন যেমনটি দেখে গেছি আমি হুবহু তাই।

তিন নং পাওনাল টেরাসের সামনে গাড়ি থামিয়ে নামলাম। সেই বাড়ি। হেঁটে গেলাম কয়েক পা। ভারী স্নিগ্ধ লাগছে মন। শান্তির এ যেন এক পরম আশ্রয়। সব একই আছে। সেই ফটক। সেই জানলা—ঐ তো জানলা তুটো, এখন বন্ধ। ওখানে বসে থাকতেন আমার মা। মা তখন উদাস। পেটে অন্ন নেই। নেই কোন রোজগার। বসে বসে শুধু ভাবনা আর ভাবনা। সব দেখতে পাচ্ছি আমি চোখের সামনে। বাড়িটা যেন সেই পুরনো দিনের কঙ্কাল। হাড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রাখা কান্না। কান্নার স্বর আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কানে বাজছে আমার সব।

কেউ খেয়াল করল না আমাকে। জানবে কেমন করে কেন আমি দাঁড়িয়ে আছি, কি দেখছি, কি স্বর বাজছে আমার হৃদয়ের গভীরে। শুধু কটা বাচ্চা এলো উৎসুক চোখ নিয়ে। দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। আর না, আমিও গাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

সেখান থেকে সিধে কেনিংটন রোড। সেই কাঠ চেরাইয়ের গুদাম। নেই কিছু। সব নিশ্চিহ্ন। ভেঙে ফেলা হয়েছে। সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে একটা খুঁটি।

২৮৭ কেনিংটন রোড। সিডনী আর আমি এখানে থাকতাম। তখন মা হাসপাতালে। বাবা থাকতেন এই বাড়িতে। আর লুইজি। আর আমার সেই সৎ ভাই। ঐ তো দোতলার সেই ঘর! জানলা। কেমন নিরিবিলি লাগছে এখন। অথচ যে কদিন ছিলাম কত উত্তেজনার আগুনই না পোয়াতে হয়েছে।

ঐ তো সেই ডাকঘর। কেনিংটন পার্কের লাগোয়া। এখানে একটা পাশবই আছে আমার। তাতে ষাট পাউণ্ড জমা। ১৯০৮ সাল থেকে এক পাউণ্ড দু পাউণ্ড করে জমাতে জমাতে ষাট পাউণ্ড জমিয়ে ফেলেছিলাম। তোলা আর হয় নি। থাক না জমা, মন্দ কি!

আর সেই পার্ক। সেই ঘাস। ফুল। সব মিলে যেন দুঃখী এক চেহারা। যেন আমাদের সব দুঃখের খবর লেখা আছে এর ধুলোয়, এর সর্বত্র। মা আমি আর সিডনী এসে বসেছিলাম এখানে একদিন। আমাদের ছুটির দিন। সারাদিন কাটিয়েছিলাম এখানে। কাগজের বল নিয়ে খেলা করেছিলাম। সব মনে পড়ছে অক্ষরে অক্ষরে।

কেনিংটন গেট। হেটির সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখার দিন। দাঁড়ালাম এক মুহূর্ত। একটা ট্রাম এসে থামলো। উঠলো কয়েকজন যাত্রী। নামলো না কেউ। ট্রামটা ছেড়ে চলে গেলো।

ব্রিম্পটন রোডের সেই পনেরো নং গ্রেনশ' ম্যানসনস্। সিডনী আর আমি এখানে ফ্ল্যাট নিয়েছিলাম। সাজিয়েছিলাম বড় যত্ন করে। সে মোহ আগেই কেটে গেছে। এখন শুধু কৌতূহল। শুধু দেখা আর স্মৃতি।

ফেরার পথে হর্নস্-এর দোরগোড়ায় গাড়ি থামিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সেই হর্নস্। সেই মেহগনী কাঠের মস্ত টেবিল, বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, লম্বা টানা হলঘর—বাবা বসে থাকতেন একধারের টেবিলে, সামনে মদের পাত্র। কেমন যেন অদ্ভুত এর আকর্ষণ। সেই সব স্মৃতি মনে পড়ে। গলাটা এক চুমুক ভিজিয়ে নিলাম। নেশার প্রয়োজনে নয়, সেই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। বেরিয়ে এলাম তারপর সেখান থেকে।

পাশেই সেই স্কুল। সেই রকমই আছে। দুবছর পড়েছিলাম এখানে। কেনিংটন রোড কাউন্টি কাউন্সিল স্কুল। সেই ঘেরা পাঁচিল। মস্ত বড় খেলার মাঠ। আগে ছিলো আরো খানিকটা বড়। নতুন বাড়ি উঠেছে। নুড়ি বেছানো সেই রাস্তাটা আর নেই।

ফিরে চলেছি কেনিংটন দিয়ে। স্বপ্ন মনে হচ্ছে সব। এখানে যা হয়েছিল যা দেখেছি তার সঙ্গে যেন বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু আমেরিকার সব কিছু যেন বাস্তব। তবু আশ্চর্য এই, স্বপ্ন এখনো আমাকে টানে। আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো। পারি না সে আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে; তাইতো এলাম ছুটে এতোদূর। আসলে দারিদ্র্যটাকেই এখন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

আমার একাকীত্ব নিয়ে আমার নির্জন স্বভাব নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলে থাকেন। জানিনা, হয়তো আরো অনেক বন্ধু হওয়া উচিত ছিলো আমার, পরিচিতি আরো বেশি হলে ভালো হতো। বেশ হৈ চৈ করে কেটে যেতো দিন। সব সময় মুখর হয়ে থাকতো আমার চারপাশ।

বাস্তবে সেটা হবার সুযোগ হয়নি। বন্ধুত্বের ব্যাপারটা অনেকটা মেজাজের ওপর নির্ভরশীল। ঠিক যেমন মেজাজ ভালো থাকলে ভালো লাগে সঙ্গীত। আর সময়টাও একটা বড় ব্যাপার। বন্ধু পড়েছে মুশকিলে। তাকে সাহায্য করা দরকার। দিলাম পাঠিয়ে কিছু টাকা। এটা সহজ। কিন্তু কোন দরকার নেই কাজ নেই নিছকই বসে গুলতানি অর্থাৎ সময় নষ্ট—এতো সময় আমার কোথায়! হতো তাই মুশকিল। আসতো দলে দলে বন্ধু, আসতো পরিচিতের দল। সে যে কত, গুণে শেষ করা যাবে না। করতাম হৈ চৈ ক'দিন, হঠাৎ সব বন্ধ। হঠাৎ গুটিয়ে গেছি আমি নিজের গণ্ডীর মধ্যে। স্বভাবই যে এই রকম। মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়তে ভালো লাগে। তখন বেপাত্তা। সব ছেড়ে ছুড়ে আমি উধাও। এটাকে কেন্দ্র করেই ঐ সব আজগুবি কথা লেখা। আমি জানি আমার এই স্বভাবই এর কারণ। কিন্তু তার মানে

এই নয় যে বন্ধু আমি ভালবাসি না, এড়াতে চাই তাদের। আর সত্যিকারের বন্ধু কি সবাইকে বলা যায়। সে তো মুষ্টিমেয় দু একজন। আমার জীবনে উদ্ভাসিত ধ্রুবতারার মতো। দিগন্ত আলো হয়ে রয়েছে তাদের সাহচর্যে। সেরকম আর বেশি পেলাম কই যে সময় দেবো তাদের জন্যে, তাদের পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবো?

আসলে লিখেছেন যিনি তার মানসিকতার প্রশ্নটাও কম নয়। লেখকই পারেন কাউকে মহান করতে আবার কাউকে ছোট করতে। যেমন সমারসেট মম। একই সঙ্গে মহান করে তুলে ধরেছেন আমার ব্যক্তিত্ব, আবার অমহানও করেছেন কোন কোন অংশে। লেখাটি হুবহু আমি উদ্ধৃত করছি :—

সহজ সুন্দর এবং অনাবিল চার্লির রসিকতা। তবু সব সময়ই মনে হবে যেন এর আড়ালে রয়েছে নিবিড় নিঃসঙ্গতাবোধ। বড় মেজাজী মানুষ। দরকার হয় না আগে থেকে ঘোষণা করে বলতে যে এরপর তিনি কি করবেন বা কি করা উচিত। একটা বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। যাই করুন না কেন—সে রঙ্গ হোক, কি ব্যঙ্গ—আড়ালে থাকবেই তার দুঃখবোধ। ছবি দেখে কখনও মনে হবে না যে আপনি কোন নিটোল সুখী মানুষের কাহিনী দেখে বেরিয়ে এলেন। আমার মনে হয় বস্তী জীবনের সেই দিনগুলি তাকে এখনও নাড়া দেয়। অভিভূত করে রাখে। যে সম্মান তিনি পেয়েছেন, যে অর্থ যে বৈভব—আমার ধারণা তার নাগপাশে তিনি বন্দী, সে জীবন যাপন করতে তাকে বাধ্য হতে হয়। মাঝে মাঝেই তার চোখ ফিরে যায় সেই পুরনো দিনে। দেখেন সেই যুবকের ছবি। যে অবিরাম চালিয়ে গেছে তার লড়াই। তার দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। যদিও সে জানে এর থেকে কোন পরিত্রাণ নেই, কখনো পূর্ণ হবে না তার জীবনের পাত্র। লণ্ডনের দক্ষিণাংশের জীবন তার চোখে স্বচ্ছল সুখী নিরুদ্বেগ জীবন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি অবাক হয়ে ভাবছেন এখানে কেন আমি এলাম, এ তো, আমার জায়গা নয়। জায়গা তার একটাই, কেনিংটন রোডের পেছন দিকে সেই দোতলার ঘর। লস এঞ্জেলেসে থাকাকালীন একদিন হাঁটতে হাঁটতে তার সঙ্গে গিয়েছিলাম এক বস্তী এলাকায়। শহরের দরিদ্রতম মানুষ সেখানে থাকে। ঘুপচি ঘর আর নোংরা সার সার দোকান। তাতে টাল দিয়ে সাজানো হাজারো জিনিস। গরীবেরা দিনের দিন ঐ সব কেনে। পারে না একসাথে সারা হপ্তার খোরাকী কিনে রাখতে। দেখলাম সেই পরিবেশে পৌঁছে মানুষটার মুখ চোখের ভাব বদলে গেল। বললেন। দেখুন। এই হলো সত্যিকারের জীবন। বাকী সব মেকী, মিথ্যে।

[কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। একটু গোলমাল আছে। মেক্সিকোর দিকে

গিয়েছিলাম সেদিন। আমি বলেছিলাম, বেভারলি হিলসের তুলনায় এখানে জীবন অনেক বেশি গতিশীল। প্রাণ প্রাচুর্যের স্বাদ পাওয়া যায়।]

ব্যাপারটা আমার কাছে একটু উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্যকে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলাটা চিন্তার বিষয়। এমন কোন দরিদ্রের দেখা এখনো আমি পাই নি যে দারিদ্র্য ভালবাসে, দারিদ্র্যের মধ্যেই সে মনের মুক্তির ইন্ধন পায়। মমকেও দেখিনি এমন কোন মানুষকে এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে যে সম্পদ এবং বৈভব হলো বাধ্যবাধকতায় ভরা, সম্পদ মানুষের বন্দীদশা ডেকে আনে। সত্যি বলতে কি এই যে আমি এতো অর্থের মালিক, এতে আমার এতোটুকু বৈরাগ্য নেই, বরং অর্থের মধ্যেই আমি পাই মুক্তির আস্বাদ। আমার অনুরোধ মম যেন এইভাবে মিথ্যের মোড়কে সাজিয়ে তার কোন উপন্যাসের চরিত্র না সৃষ্টি করেন।

দারিদ্র্যে আমার কোন আকর্ষণ নেই। একে আমি নৈতিক উন্নতি সাধনের পথ বলেও মনে করি না। কিছুই শেখায় নি আমাকে দারিদ্র্য। উলটে মূল্যবোধগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে। যত প্রবল হয় দারিদ্র্য, ধনীদের গুণপনা তাদের দয়ামায়া তত আমাদের চোখে বেশি করে ধরা দেয়। এই তো চিরন্তন দারিদ্র্যের চেহারা।

আর এই অর্থ এবং বৈভব শিখিয়েছে আমাকে অনেক কিছু। পৃথিবীটাকে সঠিক ভাবে দেখতে শিখিয়েছে। চিনতে শিখিয়েছে মানুষ—বিরাট নামকরা জ্ঞানীগুণী সব মানুষ। কাছাকাছি হলেই যার সঠিক চেহারাটা বুঝতে পারা যায়—কত সাধারণ সে কত নিম্ন মানের। দূর থেকে কিছুই তার আন্দাজ মেলে না। অর্থ দিয়েছে আমার মধ্যে শক্তি—যে কোন সামাজিক পদমর্যাদার মুখে আমি নির্দ্বিধায় লাথি মারতে পারি। আর দিয়েছে বুদ্ধি। যার দৌলতে আমি যে কোন মুহূর্তে প্রমাণ করতে পারি, বুদ্ধি মানে স্কুল কলেজের পড়া নয়, বুদ্ধি মানে তাবড় তাবড় চিরন্তন সাহিত্য পাঠ নয়। বুদ্ধি জিনিসটা সম্পূর্ণ আলাদা যা হাজার পড়াশুনো করলেও লাভ করা যায় না।

মম যাই বলুন না কেন, আমি জানি, আমি মানুষটা যেরকম ছিলাম, তেমনই আছি। আমি এখনও একক। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। আমি সাধারণের চেয়ে আলাদা। পিতৃ পিতামহের ঐতিহ্য আমার শিরায় শিরায় বহমান। আমার স্বপ্ন আছে। আমার আকাঙ্ক্ষা আছে। এবং কিছু বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। সব যোগ করলে চেহারাটা যেমন দাঁড়ায় আমি ঠিক তাই।

অদ্ভুত ব্যাপার। এসেছি লণ্ডনে, দেখি হলিউডের বন্ধু-বান্ধব চেনা পরিচিতরাই ভিড় করে থাকে সর্বক্ষণ। কিছুতে আর একলা হতে দেয় না। ভালো লাগে না। চাই

এখন অন্য সঙ্গ, অন্য পরিবেশ। এসেছি তো এখানে নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে। যদি পুরনোরাই ঘিরে রাখে সব সময়, নতুনকে কি ভাবে আমি চিনতে পারবো জানতে পারবো ?

মাঝখানে একটা দিন শুধু কাটালাম এইচ. জি. ওয়েলসের সঙ্গে। তারপর আবার যে কে সেই। সেই একঘেয়ে কর্মসূচী। একই বন্ধু। একই মুখ।

নরক বললো, গ্যারিক ক্লাবে ডিনারের আয়োজন হয়েছে। আপনাকে কিন্তু যেতে হবে। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই শিল্পী সাহিত্যিক আর অভিনেতার সঙ্গ। এ ছাড়া সারা ইংল্যাণ্ডে আর কি কোন মানুষ নেই ? ডাকে না তো আমাকে কেউ নেমন্তন্ন খেতে ? গাঁয়ের বাড়ি, সাধারণ মানুষ, গল্প করবো প্রাণ খুলে, বসে খাবো ঘরোয়া রান্না—কই সে সুযোগ এতোদিনেও তো হলো না !

চমৎকার করে সাজানো গ্যারিক ক্লাব। আলোছায়ার অপূর্ব নিয়ন্ত্রণে স্বপ্নময় পরিবেশ। বড় বড় তেল রঙের ছবি সারা দেয়াল জুড়ে। টেবিল ঘিরে আমরা বেশ কয়েকজন। স্যর জেম্‌স্ ব্যারি, ই. ভি. লুকাস, ওয়াণ্টার হেকেট্, জর্জ ফ্র্যাম্পটন, স্যর এডুইন লুটিয়েন্স, স্কোয়ার ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ ইত্যাদি নানান গুণী জ্ঞানী বিশিষ্ট ব্যক্তি হাজির। যদিও এই সব ভোজসভার ব্যাপারে আমার তেমন একটা উৎসাহ নেই, তবু এদের সাহচর্যে নিজেকে ধন্য মনে হলো।

জড়তা কাটিয়ে সহজ হতে খুব একটা সময় লাগলো না। ভারী মিশুকে এরা সবাই, আর তেমনই অমায়িক। ঠিক হলো, এমনি গল্প গুজব হবে, ভোজের পরে সেই যে এক বক্তৃতা পর্ব—সে সব বাদ। ভোজের আসর মাতিয়ে রাখলেন বিশিষ্ট ভাস্কর ফ্র্যাম্পটন। নানান মজার গল্প শুনতে শুনতে আমরা এটা ওটা অজস্র পদের পর গুড়ের পুডিং খেতে মনোযোগী হয়ে পড়লাম।

গুড়ের পুডিংয়ের ব্যাপারে একটা অদ্ভুত মজা আছে। এখানে এসে পৌছবার পর কাগজের লোকেরা যখন এলো আমার বিবৃতি নিতে, কথায় কথায় বলেছিলাম এসেছি এখানে আমি শৈশবের সব স্মৃতি ঘুরে ফিরে দেখতে আর সেই সব মজার মজার খাবার খেতে। যেমন ভাপে সেদ্ধ ঈল মাছ, গুড়ের পুডিং ইত্যাদি। কাগজে সেটাই ফলাও করে ছাপা হলো। তারপর থেকে যেখানেই ডিনার খাই এটা ওটা নানান পদের পর শেষে দেয় পুডিং। এবং বলা বাহুল্য সেটা গুড়ের।

সে যাই হোক, ভোজপর্ব শেষ। এবার উঠবার পালা। নরক চুপিচুপি বললো, স্যর জেমস ব্যারি বলছেন এখান থেকে তার বাড়িতে গিয়ে চা খেতে। যাবেন নাকি ?

আপত্তি আর কিসের। গেলাম। এ্যাডেলফি টেরাসে স্যর ব্যারির স্টুডিও। অপরূপ তার সজ্জা। মস্ত বড় ঘর। জানলা দিয়ে দেখা যায় অদূরে টেমস্ বহমানা।

ঘরের মাঝখান দিয়ে উঠে গেছে একটা চিমনী, সিধে সিলিং ফুঁড়ে বাইরে। আসলে সেটা একটা স্টোভ। জানলার কাছে নিয়ে গেলেন আমাদের। দেখলাম ছোট একটা গলি। গলির ওপাশের বাড়িতে ঠিক উলটো দিকে আরেকটা জানলা। বন্ধ। বললেন, এটা শ'-এর শোবার ঘর। যখনই দেখি আলো জ্বলছে ঘরে, অমনি পাথর ছুঁড়ি। পর পর তিনবার। যদি আড্ডা দেবার মেজাজ থাকে তবে জানলা খোলে, দুজনে বেশ খানিকক্ষণ খোশগল্প হয়। আর মেজাজ না থাকলে বন্ধ। আমিও আর ঘাঁটাই না।

শ'-এর 'পিটার প্যান' নিয়ে প্যারামাউন্ট কোম্পানী হলিউডে ছবি তুলছে। আসবার সময় আমি শুনে এসেছি। ব্যারিকে জানালাম। বললাম, পিটার প্যান কিন্তু ছবির চাইতে নাটক হিসেবেই ভালো জমতো। সম্ভাবনা প্রচুর। তিনি সায় দিলেন। বললেন, আচ্ছা, দি কিডে আপনি ঐ স্বপ্নের অংশটা রাখলেন কেন? আমার তো মনে হয় ঐ স্বপ্নের জন্য গল্পের গতি বাধা পেয়েছে।

বললাম, এটা আমার নিজস্ব একটা ইচ্ছা বলতে পারেন। সিন্ডারেলার ঘটনাটা আমার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল।

পরদিন আমি আর নব্লক কেনাকাটায় বেরিয়েছি, হয়ে গেছে কেনা। নব্লক বললো, চলুন বার্নার্ড শ-এর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। আগে থেকে কোনো কথা নেই বার্তা নেই, হুট করে চলে যাবো? নব্লক বললো, চলুন না, কোন অসুবিধে হবে না।

গেলাম এ্যাডেলফি টেরাসে। শ'-এর সেই বাসা। ঠিক চারটে বাজে তখন। দোরের ঘণ্টি বাজালো নব্লক। তারপর প্রতীক্ষা। হঠাৎ কি বলবো, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন জড়তা। লোকভয়। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার লজ্জা। বললাম, আজ বরং থাক। বলেই অমনি দৌড়। সিধে রাস্তা। পেছন পেছন ছুটে আসছে নব্লক। আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরৎ নিয়ে যেতে চাইছে। আমি কি আর ফিরি? দেখা আর হলো না। হতে হতে সেই ১৯৩১। ভারী আনন্দ পেয়েছিলাম পরিচিত হয়ে।

পরদিন ভোর তখন, ঘুমটা হঠাৎ টেলিফোনের ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেলো। পাশের ঘরে ফোন। আমি শোবার ঘরে। শুনলাম আমার আমেরিকান সেক্রেটারীর গলা। ওপাশের কথা শুনে যেন খানিকটা অবাক। বলছে,—কে? কে বলছেন? ...প্রিন্স অফ ওয়েলস্?

নব্লক তখন সেখানে হাজির। এসব অবস্থায় কেমন করে কথা বলতে হয় কি বিশেষ নিয়মকানুন সব তার কণ্ঠস্থ। সেক্রেটারীর হাত থেকে ফোন নিয়ে বললো, হ্যাঁ, বলুন? আজ রাত্রে? ধন্যবাদ। আমি জানিয়ে দিচ্ছি।

ফোন রেখে সে কী উত্তেজনা নব্লকের! সেক্রেটারীকে বললো, জানেন প্রিন্স

অফ ওয়েলস্ নিজেই কথা বললেন। চার্লির সঙ্গে আজ ডিনার খাবেন। কত বড় সম্মান! আমি এক্ষুনি গিয়ে কথাটা জানিয়ে আসি।

সেক্রেটারী বললো, একটু পরে যাবেন। এখনও উনি ওঠেন নি।

—পরে! নব্লক অবাক। এমন একটা সুসংবাদ—আপনি বলছেন পরে? দরকার হলে আমি ঘুম থেকে তুলে জানিয়ে আসবো।

এবং যথার্থই তাই। দরজার হাতল ঘুরলো। আমি উঠে বসলাম। উত্তেজনায় কাঁপছে বলতে গেলে থরথর করে। বললো, আজ কিন্তু কোন কাজ রাখবেন না। খোদ প্রিন্সের সঙ্গে আজ ডিনার।

ও যতখানি উত্তেজিত, আমি ঠিক ততখানি নিস্পৃহের মতো বলসাম, কিন্তু আজ যে আমার এইচ. জি. ওয়েলসের সঙ্গে ডিনার খাবার কথা। আজ তো সম্ভব হবে না।

নব্লক আমার কথায় কর্ণপাত মাত্র না করে প্রিন্সের সঙ্গে ডিনার খাবার জন্যে আমাকে তৈরী থাকতে বললো।

তা ভেতরে ভেতরে আমারও যে উত্তেজনা হচ্ছে না এমন নয়। বাকিংহাম প্রাসাদে বসে প্রিন্সের সঙ্গে ডিনার! এ সৌভাগ্য ক জনের ভাগ্যে জোটে? কিন্তু···নব্লককে বললাম, আমাদের সঙ্গে কেউ রসিকতা করছে না তো? কালকেই না কাগজে দেখলাম প্রিন্স রাত্রে সদলবলে স্কটল্যাণ্ড রওনা হয়ে গেছেন শিকার করতে?

কানে এবার যেন জল গেলো। মুহূর্তে মিইয়ে গেল চোখ মুখ। বললো, দাঁড়ান, আমি বরং নিজেই যোগাযোগের চেষ্টা করে দেখি।

বলে ফোন করলো। একটু পরে ফের ঢুকলো ঘরে। চোপসানো বেদানার মতো মুখ। বললো, ঠিকই বলেছেন আপনি। ব্যাপারটা ভুয়ো। প্রিন্স কাল রাত্রে স্কটল্যাণ্ডে গেছেন। আজ ফিরবেন না।

সেদিনই সকালে আরেক খবর। রোসকো আরবাক্‌ল্ নাকি খুনের দায়ে সোপর্দ হয়েছে। কিস্টোন কোম্পানীতে আমার সেই পুরনো সহযোগী। পরিচালক। গোটা ব্যাপারটাই সাজানো। রোসকোকে আমি ভালো করেই জানি। একটা মাছিকে অব্দি খুন করতে তার হাত কাঁপে। সে কিনা করবে হত্যা! কাগজের লোকেরা এ ব্যাপারে আমার মতামত নিতে এলো। বললাম আমার নিজস্ব ধারণা। পরে সেটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। সসম্মানে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন আরবাক্‌ল্। কিন্তু ক্ষতি যা তা আর পূরণ হবার নয়। কেউ আর কাজ দিতে চায় না। কদিন আর পারে সেইভাবে মানুষ বাঁচতে। বিশেষ করে অমন একজন গুণী মানুষ। বছর না ঘুরতে আচমকা একদিন মারা গেলো।

যে কথা বলছিলাম। বিকেলে ওয়েলসের সঙ্গে অসওয়াল্ড স্টোল থিয়েটারে আমার

সাক্ষাতের কথা। ওয়েলসেরই একটা গল্প নিয়ে ছবি তুলেছে, সেটা দেখানো হবে, আমরা দুজন পাশাপাশি বসে দেখবো। পৌঁছে দেখি সে ভীষণ ভিড়। জনারণ্যে মুখর হয়ে আছে চারপাশ। তারই মধ্যে নামলাম গাড়ি থেকে। জানিনা কেমন করে কিভাবে কে বা কারা আমাকে ভিড় এড়িয়ে তুললো নিয়ে লিফটে। সিধে তিনতলা। সেখানে ছোট্ট অফিস ঘর। বসে আছেন ওয়েলস্ শান্ত ভাবে। আর চারপাশে ভিড়। গাদাগাদি বলতে যা বোঝায়। দেখে আমি তো স্তম্ভিত।

এই কি পরিচিত হবার মতো পরিবেশ? নিরিবিলি দুটো কথা বলা, মনের ভাবের আদান প্রদান—সে কি এই এতো ভিড়ের মধ্যে সম্ভব। দেখলাম ওয়েলসও রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করছেন। এগিয়ে গিয়ে করমর্দন কবলাম। অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে চোখ ধাঁধানো আলো, ছবি তোলার হিড়িক—এরা যেন ক্যামেরা নিয়ে ওত পেতে ছিলো এতোক্ষণ এই বিরল মুহূর্তটির আশায়। চুপিচুপি বললেন ওয়েলস্, আজ আপনার আর আমার বধ হবার পালা। বলে মুচকি হাসলেন!

সে ঘর থেকে তারপর প্রেক্ষাগৃহে। ছবি দেখানো শুরু হলো। পাশাপাশি বসলাম দুজন। শেষ হবার মুখে ওয়েলস্ বললেন, কেমন দেখলেন? সত্যি বলতে কি ছবিটা মোটেই ভালো নয়। আমি এতোটুকু ভনিতা না করে বললাম, ভালো লাগলো না। আলো জ্বললো একটু পরে। বললেন, নায়কের ব্যাপারে কিন্তু অমন নির্দয় হলে চলবে না। ভালো ভালো দুচারটে কথা বলতে হবে। নায়ক অর্থাৎ একটি বালক—জর্জ কে. আর্থার। মোটামুটি ভালোই করেছে। ছবির একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র বলতে গেলে সে-ই।

ভারী স্থিতধী চিত্তের মানুষ আমাদের ওয়েলস্। বেরিয়ে বললেন, বুঝলেন খারাপ ছবির চেয়ে খারাপ বস্তু আর সারা দুনিয়ায় নেই। তবে অবাক কাণ্ড সেগুলোও দর্শক দেখে।

সেদিন এইটুকুই। ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ আর হয়ে উঠলো না। বিকেলের দিকে একখানা ছোট্ট চিরকুট লিখে পাঠালেন—

একসাথে ডিনার খাবো, ভুল যেন না হয়। যদি খুব অসুবিধে বোঝেন, ওভারকোটে আগাপাস্তলা ঢেকে টুক করে বেরিয়ে পড়বেন। ঠিক সাড়ে সাতটা। সময়টা মনে থাকে যেন। নিরালায় বসে দুজন একটু গল্প করবো।

গিয়ে দেখি রেবেকা ওয়েস্টও সেখানে। আলাপ আলোচনা যৎপরোনাস্তি উচ্চমানের। বেশ ভারী ভারী কথা। ওয়েলস্ রাশিয়ার গল্প শোনালেন। কদিন আগে রাশিয়া থেকে ঘুরে এসেছেন।

বললেন, উন্নতির কাজ চলছে, তবে খুবই ঢিমেতালে। আসলে খস্‌খস্ করে

দুপাতা কর্মসূচী লিখে ফেলাটা সোজা। কিন্তু সেটাকেই যখন কাজে রূপ দিতে হয় তখন কালঘাম বেরিয়ে যায়।

—কিন্তু এর সমাধান কিভাবে সম্ভব?

—কিভাবে আর, শিক্ষার মাধ্যমে।

বললাম, সমাজবাদ জিনিসটা কি সে সম্পর্কে আমার প্রকৃত কোন ধারণা নেই। আসলে খেটে খাবার ব্যাপারটাতেই আমার ঘোর অপছন্দ। আমি চাই মানুষ খাবে, বাঁচবে, কিন্তু তার জন্য তাকে কোন পরিশ্রম করতে হবে না।

বললেন, তাহলে এই যে আপনি ছবিগুলো করেন, এগুলো খাটুনি নয়?

—কোথায় খাটুনি। আমি বললাম, এ তো খেলা। বাচ্চাদের খেলা।

জিজ্ঞেস করলেন ছুটিতে আমি কি করবো কোথায় কোথায় যাবো?

বললাম, এখান থেকে যাবো পারী। তারপর স্পেন। স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে হবে। শুনেছি নাকি খুব দারুণ। নাকি ভারী চমৎকার লাগে দেখতে।

বললেন, তা ঠিক, তবে ঘোড়াগুলোর ওপর বড় নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়।

হাল্কা সুরেই বললাম, তা ঘোড়া নিয়েই বা আপনার এতো খুঁতখুঁতুনি কিসের?

বলেই প্রমাদ গণেছি। নিজের ওপর নিজেরই খুব রাগ। ছি ছি, এ আমি কি বললাম! কি বলতে কি বলে ফেললাম! কি মনে করবেন মানুষটা আমার সম্বন্ধে। এ লজ্জা আমি রাখবো কোথায়?

ফেরার পথে সারা রাস্তা নিজেকেই নিজে গাল দিতে দিতে ফিরলাম।

পরদিন দেখা করতে এলেন স্যর এড্‌উইন লুটিয়েন্স। নব্লকের বন্ধু। বিখ্যাত স্থপতি এবং গৃহনির্মাণ শিল্পী। দিল্লীতে সরকারী কি একটা অফিস-বাড়ি তৈরী হবে, তারই পরিকল্পনা নিয়ে তখন ব্যস্ত। হালে দেখা করে এলেন বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা পঞ্চম জর্জের সঙ্গে। সে এক গল্প বটে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন খেলনা আকারের ছোট্ট একটা কলঘরের মডেল। তাই নিয়ে তো বিরাট হৈ চৈ। ছ ইঞ্চি প্রমাণ দৈর্ঘ্য। এক গ্লাস জল ধরে এমন একটা ছোট্ট চৌবাচ্চা। তাতে লাগানো ছোট্ট একটা শিকলি। শিকলিতে টান দিলেই জল পড়ে নল দিয়ে গবগবিয়ে। পায়খানার বাটি ধোয়া হয়ে যায়। দেখে রানীর যা ফুর্তি। বারবার টানেন, আবার ভরে দেন চৌবাচ্চা। নিখুঁত একেবারে। তখন প্রস্তাব হলো, যদি খেলনা আকারেই গোটা একটা বাড়ির পরিকল্পনা করেন লুটিয়েন্স। হলো তাই। নামকরা শিল্পীদের ডাকিয়ে নকসা তৈরী হলো। তারপর নকসা মিলিয়ে গোটা বাড়িখানা। সে একেবারে দেখার মতো জিনিস। রাণী বললেন, এটা রাজপ্রাসাদে না রেখে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোক, দেখার জন্য

নগদ দর্শনী দিতে হবে। হলো সেই প্রদর্শনী। প্রচুর অর্থাগম হলো। সেই টাকা পরে ব্যয়িত হলো নানান সেবামূলক কাজে।

মোটামুটি এই পর্ব এখানেই শেষ। আপাতত নতুন কিছু আর করার নেই। সামাজিক যোগাযোগ যথেষ্ট হয়েছে। বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী শিল্পী সাহিত্যিক স্থপতির সঙ্গে পরিচয় হলো। ঘুরে ঘুরে আশ মিটিয়ে দেখে এলাম ছেলেবেলার স্মৃতি বিজড়িত সব অঞ্চল। ফাঁকা লাগছে এবার। তাছাড়া নরকও নেই, গেছে ব্রাইটনে। আমি একা। পারিনা বেরোতে পথে। ভিড় ছেঁকে ধরে চারপাশ থেকে। কাঁহাতক আর ট্যাক্সিতে সঙের পুতুল সেজে বসে থাকা যায়। পালাবার জন্যে মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যাকে বলে চম্পট। পাততাড়ি গুটোবো এবার। যাবো সোজা পারী।

তাই করলাম। বলতে গেলে কাউকে কিছু না জানিয়ে একেবারে চুপি চুপি রাতের অন্ধকারে উধাও। জানে না শোনে নি কেউ, ও মা বলবো কি—কালেতে জাহাজ ঘাটায় সে যা ভিড়! উল্লাস আর জয়ধ্বনি! —ঐ শার্লট, শার্লট এসেছে। স্বাগতম্। শুভ হোক তোমার আগমন। রাশি রাশি জনতা আর ভিড় আর ঠেলাঠেলি। জাহাজ থেকে নামার মুখে আমি তো পড়ে যাই প্রায়। সেই অবস্থাতেই হাত নেড়ে করুণ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে অভ্যর্থনার জবাবে আমার শুভেচ্ছা জানালাম। শেষে এমনই হুড়োহুড়ি, ট্রেনে ওঠা দায়। উঠলাম যাই হোক। পারীতে পৌঁছে একই অবস্থা। আবার সেই ভিড়, সেই পুলিস বাহিনী। আবারও একপ্রস্থ ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। গুঁতোয় গুঁতোয় আমার তো ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। উৎসাহের একেবারে চরম। পুলিসই উদ্ধার করলো সেই অবস্থা থেকে। প্রায় একরকম কোলে তুলে বসিয়ে দিলো ট্যাক্সিতে। ছুটে চললো ট্যাক্সি। তা যদিও আপ্যায়নের মাত্রাটা একটু অন্য ধাতের, তবু মন্দ লাগছে না। এতোটা অবিশ্যি আমি পাবো আশা করি নি। বড় ক্লান্ত লাগছে। হাজার হোক, এমন ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি তো বহুদিন অভ্যেস নেই।

ক্লারিজে উঠলাম। বলবো কি, প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তর ফোন। ঝালাপালা একেবারে। যতবারই ফোন তুলি, ওধারে অ্যানি মর্গানের সেক্রেটারী। অমনি ফোন নামিয়ে রেখে দিই। জে. পি. মর্গানের মেয়ে অ্যানি মর্গান। নির্ঘাৎ কোন না কোন অনুরোধ বা ঐ জাতীয় কিছু একটার দরকার পড়েছে। তাই ফোন। কিন্তু আমি না ধরতে চাইলেও ও তরফ কি আর সহজে হাল ছাড়ার পাত্র। এবার প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর। তখন বাধ্য হয়ে ধরলাম। বললো, মিস মর্গান আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। পাঁচ মিনিট মাত্র সময় দিলেই যথেষ্ট। আমার কি সময় হবে? বললাম, ঠিক আছে, যেন হোটেলে চলে আসেন। ঠিক পৌনে চারটেয়।

বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

তো চারটে রাজতে পাঁচেও এলো না। কি আর করি, আমি বেরোবার জন্যে পা বাড়িয়েছি। ছুটতে ছুটতে ম্যানেজার হাজির। কি ব্যাপার? না। এসেছেন মিস মর্গান। আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বলতে না বলতে শ্রীমতীও হাজির। একেবারে মুখোমুখি। বললাম, দুঃখিত, চারটেয় আমার একটা জরুরী কাজ আছে। আপনি বরং

—না না। আমি আপনার বেশি সময় নষ্ট করবো না। দু একটা মোটে কথা। চলুন না কোথাও একটু বসি।

বললো, দি কিড ছবির একটা প্রদর্শনী শো করবো। যুদ্ধে ফ্রান্স তো বলতে গেলে বিধ্বস্ত। উন্নয়নের জন্য মেলা টাকা দরকার। আপনি যখন এখানে আছেন, অমনি ধারণাটা মাথায় এলো। শোয়ের দিন আপনাকে হাজির থাকতে হবে। তাহলে আমরা বিস্তর টাকা তুলতে পারবো।

বললাম, ছবি আপনি দেখান আপত্তি নেই। কিন্তু আমি হাজির থাকতে পারবো না।

—তা কি করে হয়। অ্যানি বললো, আপনি না থাকলে অতো টাকা দেবে কে? তাছাড়া আপনাকে ঐ দিন আমরা সম্বর্ধনা জানাবো বলে ঠিক করেছি।

মনের মধ্যে শয়তানী বুদ্ধিটা মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। বললাম, তাই নাকি—সম্বর্ধনা?

—হ্যাঁ। অন্ততঃ সেরকমই ঠিকঠাক। সরকারের কাছে এই নিয়ে আমরা দরবার করবো। আমরা চাই সরকারী তরফ থেকেই আপনাকে সম্বর্ধনা জানানো হোক। একটা ব্যাপারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি—এ জন্যে চেষ্টায় আমাদের কোন ত্রুটি হবে না।

বললাম, দেখুন তাহলে। আমি তো বার্লিন যাবো কদিনের মধ্যেই। দিন তিনেক থাকবো। যদি কোন সরকারী সিদ্ধান্ত হয় আমাকে জানাবেন। তারপর বিবেচনা করে দেখবো হাজির থাকতে পারি কি না।

বলে আর দ্বিতীয় কোন কথা নয়, সোজা ফটকের দিকে পা বাড়ালাম।

সামাজিক পরিচিতির ব্যাপারটাকে আমি মনে করি একটা দুর্ঘটনার মতো। হঠাৎই ঘটে যায়। লাগে শুধু একজনের একটু চেনা করিয়ে দেওয়া। সেই সূত্র ধরে তোমার যদি এলেম থাকে কিছু, ব্যস্‌-ঢুকে পড়ো।

ভেনিজুয়েলার দুটি মেয়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। সহজ সরল মেয়ে। নিউ ইয়র্কের সোসাইটি বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ ধনী পরিবারের মানুষদের মধ্যে ঘোরাফেরা—দুজনেরই একেবারে অবাধ যাতায়াত। এক নামে সবাই চেনে। জিজ্ঞেস

করতে আমাকে বলেছিলো তাদের এই অন্তপ্রবেশের গূঢ় রহস্য। জাহাজে রকফেলার পরিবারের একজনের সঙ্গে পরিচয়। সে দিলো একখানা পরিচয় পত্র। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের নামে আলাদা আলাদা চিঠিও লিখে দিলো। আর কে পায়, শুরু হলো খেল্! একজন থেকে আরেকজন, এক পরিবার থেকে আরেক পরিবার। শুনেছি বিবাহিত পুরুষদের নাকি একদম ঘাঁটাতো না। তাতে যে গিন্নীরা রুষ্ট হবেন। আখের নষ্ট হবে তা হলে। দেখতাম কী খাতিরটাই না করতো গিন্নীরা। সন্তুষ্ট করে রাখতো সব সময়। অসন্তুষ্ট হলেই যদি স্বামীকে ভাগিয়ে নেয়। শেষমেশ বিয়েও তারাই দিলো।

অভিজাত ইংরেজদের সমাজে আমার ঢুকে পড়াটাও অনেকটা দুর্ঘটনারই মতো। ক্লারিজ হোটেলে থাকাকালীন কলঘরে স্নান করছি একদিন। জর্জ কার্পেন্টিয়ার সিধে একেবারে সেখানেই হাজির। জ্যাক ডেম্পসীর সঙ্গে লড়াইয়ের আগে থেকেই জর্জকে আমি চিনি, নিউ ইয়র্কে পরিচয়।—তা কি ব্যাপার, হঠাৎ যে এখানে! বললো, বাইরের ঘরে এক বন্ধুকে বসিয়ে রেখে এসেছে। অভিজাত ইংরেজদের বলতে গেলে শিরোমণি। আমি যেন এক্ষুনি গিয়ে একবার দেখা করে আসি।

গেলাম সেই অবস্থাতেই। কোন মতে আলখাল্লা মতো একটা গায়ে জড়িয়ে। গিয়ে দেখি স্যার ফিলিপ সাস্থন। ভারী খুশী হলাম পরিচিত হয়ে। সেই শুরু। বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল একটানা তিরিশ বছর। শুরু সেদিন রাত্রে ডিনার দিয়ে। স্যর ফিলিপ আর তার বোন লেডী রকস্যাভেজ ছিলেন উপস্থিত। পরদিন আমি বার্লিন রওনা হই।

বার্লিনের অভিজ্ঞতা বেশ মজার। চেনে না সেখানে আমাকে কেউ, কোন ছবি তো তখনও যায় নি, দেখানো হয় নি। আছি সাধারণ আর পাঁচজনের মতো। নাইট ক্লাবে গিয়ে ভালো একটা টেবিল চাইলাম, সেটা অব্দি দিলো না। বললো, ঐটেতে বসুন। বসলাম। তখন পাকে চক্রে এক আমেরিকান অফিসার সেখানে হাজির। দেখেই তো অমনি চিনে নিয়েছে আমায়। প্রচণ্ড রুষ্ট হয়ে হোটেলের মালিককে বললো আমি কে, কি আমার পরিচয়। শুনে মালিক তো হতভম্ব।—তাই নাকি! শুরু হলো গুজগুজ ফুসফুস। এ কান থেকে ও কান। একটু পরে দেখি গুটিগুটি ভিড় জমতে শুরু হয়েছে আমার টেবিলের চারধারে। যুদ্ধের সময় এক জার্মান ইংল্যাণ্ডে ছিলো বন্দী অবস্থায়, সেখানে আমার দু তিনটে ছবি দেখেছে। হঠাৎ চিনতে পেরে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো—আরে, শার্লি! বাকী যারা উপস্থিত সবাই তো তখন তাকেই দেখছে। অবাক সকলে। সে বললো, আমাকে দেখছো কি, শার্লিকে চেনো না? ঐ যে ঐ তো বসে আছে! তারপর হঠাৎ

টেবিল থেকে নেমে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মতো সে কী চুমুর ঘটা। তাতেও খুব একটা কিছু হলো না। দু একজন উকিঝুঁকি দিলো শুধু, ব্যস্। তখন এগিয়ে এলো পোলা নেগ্রি। ঘটনাচক্রে সেও সেদিন সেখানে হাজির। সিনেমার নামকরা অভিনেত্রী। সারা জার্মানীর মানুষের বলতে গেলে নয়নের মণি। বললো, আপনি আমার টেবিলে এসে বসুন। তাই বসতে সবার তখন যেন টনক নড়লো। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলো আমায়।

পরের দিন এক অদ্ভুত চিঠি পেলাম।—

প্রিয় চার্লি,

ডাড্লি ফিল্ড ম্যালোনের বাড়ির ভোজসভায় আপনার সঙ্গে পরিচয়। সেই সুদূর নিউ ইয়র্কে। তারপর কত জলই না গড়িয়ে গেছে। আপাততঃ আমি হাসপাতালে আছি। ভীষণ অসুস্থ। যদি একবার দেখা করতে আসেন বড় ভালো লাগবে। খুব আনন্দ পাবো। আসছেন তো? ইতি জর্জ।

নীচে হাসপাতালের ঠিকানা আছে। কিন্তু কে এই জর্জ? চিন্তায় পড়া গেলো। চিনতে পারি না কিছুতে। হঠাৎ মনে হলো, তাই তো, এ সেই জর্জ নয়তো, বুলগেরিয়ার সেই ছোকরা, আঠারো বছর যার জেল খাটার কথা? চিঠির বয়ান দেখে তো মনে হয় খুব বেকায়দায় পড়েছে, কিছু সাহায্যের দরকার। পাঁচশো ডলার তাই সঙ্গে নিয়ে গেলাম তাকে দেখতে। ঘরে ঢুকে দেখি সে এক পেল্লাই কামরা। রুগীর কেবিন বলতে সচরাচর আমরা যা দেখি সেরকম নয়। একধারে একটা টেবিল, তাতে দু দুটো টেলিফোন। সামনে সাধারণ পোশাক পরা দুজন লোক। নাম বললাম নিজের। একজন পাশের ঘরে নিয়ে গেলো। দেখি বিছানায় শোয়া জর্জ। আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিলো। হাসলো। সেই লোক কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চলে যেতে বললো জর্জ। তখন বেরিয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলাম ওরা কে? বললো, আমার সেক্রেটারী। ব্যস, এ ব্যাপারে আর কোন কথা নয়। কেমন করে এলো সে এখানে, জেলে গেলো না কেন—কোন প্রসঙ্গে কোন কথাই তুললো না। আমিও জিজ্ঞেস করলাম না কিছু। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার শুধু একই প্রশ্ন—অমুক বন্ধু কেমন আছে? তমুকে এখন কি করছে, এই সব। যথাসাধ্য জবাব দিলাম। অবাক লাগছে খুব। হঠাৎ একটা মস্ত উপন্যাসের মাঝখানের অনেকগুলো অধ্যায় যেন ছেঁড়া। কিছুতে পারছি না সূত্র জোড়া দিতে। হয়তো বুঝে থাকবে আমার মনের অবস্থা। বললো, সে এখন রুশ সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারী। এখানে এসেছে রেল ইঞ্জিন কেনা কাটা করতে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে।

পাঁচশো ডলার পকেটে করেই ফেরৎ চলে এলাম।

ভালো লাগছে না বার্লিন। হতাশার ছাপ চতুর্দিকে। পরাজয়ের গ্লানি তখনো যেন ভুলতে পারে নি কেউ। তারই স্মারক হিসেবে দেখি অগণিত যোদ্ধা ভিক্ষুক—দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, কারোর নেই হাত, কারোর পা হয়তো গোড়া থেকে কাটা। এদিকে অ্যানি মরগ্যানের সেক্রেটারী ক্রমাগত তার পাঠাচ্ছে। ট্রোকাডারোতে 'দি কিড' প্রদর্শনীর দিন আমি হাজির থাকবো এই মর্মে প্রচার পর্ব শুরু হয়ে গেছে। আমি যেন নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত থাকি। তখন জবাবে পালটা তার পাঠালাম। বললাম আমি হাজির থাকবো এমন তো কোনো প্রতিশ্রুতি দিই নি। অহেতুক আমাকে এই ঝামেলায় ফেলা কেন। বরং প্রয়োজন বোধে এই মর্মে আমি কাগজে আলাদা ভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ফরাসী জনগণকে আমার অনুপস্থিতির কারণ জ্ঞাত করতে পারি।

তখন এলো ফের অ্যানির তার। লিখেছে: সরকারী তরফ থেকে ঐদিন আপনাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এ ব্যাপারে সরকারের স্বীকৃতি আমরা লাভ করেছি। সাক্ষাতে বিস্তারিত জানাবো। আপনি নির্দিষ্ট দিনে দয়া করে উপস্থিত থাকবেন।

ট্রোকাডারোতে 'দি কিড' সেদিনই প্রথম মুক্তি পাচ্ছে। আমি, সিসিল সোরেল আর অ্যানি মরগ্যান পাশাপাশি বসে। লোকে লোকারণ্য হল। প্রথমে দেখানো হলো একটা ডকুমেণ্টারী ছবি। তারপর আলো জ্বললো। সরকারী তরফের দুজন কর্তাব্যক্তি এসে আমাকে পরম সমাদরে নিয়ে গেলেন মন্ত্রীদের আসনে। দেখি মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যরা আগে থেকেই হাজির। ঝাঁক বেঁধে এলো একদল সাংবাদিক। আমেরিকান সাংবাদিকও একজন আছে তাদের দলে। সমানে বকর বকর করছে আমার কানের পাশে,—এটা সরকারী খেতাব নয়। কেন রাজী হলেন আপনি? এ খেতাব ওরা স্কুল মাস্টারদের দেয়। এটা আপনার সম্মানের যোগ্য নয়। ছেলে ভুলনো খেতাব। লাল ফিতেতে ঝোলানো মেডেল। লাল দেখেই অমনি মজে গেলেন।

জবাব দিই নি কোন কথার। তবে এখন বলি, আমি এতেই খুশী, এতেই সন্তুষ্ট। স্কুল মাস্টারদের সমগোত্রীয় হতে পারা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলে আমি মনে করি। প্রশংসাপত্রে লিখলো—শিল্পী নাট্যকার জনমনোরঞ্জক মহামান্য চ্যাপলিনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হলো।

এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি হতে পারে?

অজস্র ধন্যবাদ দিলো অ্যানি। দুপুরে ভার্সেলিসে লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন। গিয়ে দেখি গ্রীসের যুবরাজ, লেডী সারা উইলসন, সেনানায়ক পল লুই উইলার, এলসা ম্যাক্সওয়েল প্রমুখ নানান মান্যগণ্য ব্যক্তিবৃন্দ হাজির। ঠিক কি কি কথা হলো

কার প্রশ্নের জবাবে কি বললাম আমার মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে, ভারী খোশ মেজাজে ছিলাম সেদিন, গল্পে কথায় হাসি তামাশায় সকলকে মুগ্ধ করে রেখেছিলাম।

ওয়ালদো ফ্র্যাঙ্ক পরদিন হোটেলে জাক্ কপুকে নিয়ে হাজির। জাক ফরাসী দেশে নব নাট্য আন্দোলনের প্রবক্তাদের একজন। গেলাম তিনজনে মিলে সার্কাস দেখতে। ভালোই কাটলো সময়। পরে জাক্-এর নাটুকে দলের সঙ্গে ডিনার খেলাম।

পরদিনই লণ্ডনে ফেরার কথা। স্যর ফিলিপ সাসুনের ওখানে ল্যাঞ্চের নেমন্তন্ন। হাজির থাকবেন সস্ত্রীক লর্ড রকস্যাভেজ। পরিচয় হবে লয়েড জর্জের সঙ্গে। তিনিও হাজির থাকবেন। কিন্তু বিধি বাম। পারলাম না সময় মতো হাজির হতে। ভীষণ কুয়াশার জন্যে প্লেন ছাড়তে তিন ঘণ্টার মতো দেরী। ফলে সব মাটি।

এইখানে স্যর ফিলিপ সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলে নিই। ব্যক্তি জীবনে যুদ্ধের সময় ছিলেন লয়েড জর্জের প্রধান সচিব। বয়েসে আমারই প্রায় সমান, অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আর দেখতেও অপূর্ব সুন্দর। ব্রাইটন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন পার্লামেণ্টে। বিরাট ধনী। তবু অকর্মণ্য হয়ে কখনো বসে থাকতে দেখিনি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারতেন আর নানান কাজে ব্যস্ত থাকতেন সারাক্ষণ।

প্যারিসে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিন কথায় কথায় বলেছিলাম তাঁকে, আর ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে সবার চোখের আড়ালে একটানা কদিন বিশ্রাম নিই। কেউ আসবে না বিরক্ত করতে। কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে না। একেবারে একান্তে বসে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। অবস্থা যা হয়েছে ইদানীং তুচ্ছ ব্যাপারেও ঘাবড়ে যাই। স্নায়ুর ওপর চাপ তো সব সময়। এমন কি হোটেলের দেয়ালের রঙ দেখলেও চোখে ধন্দ লাগে।

হাসলেন স্যর ফিলিপ। বললেন, কি রঙের দেয়াল আপনি পছন্দ করেন?

—হলুদ আর সোনালী।

বললেন বিশ্রামের জন্য তার লিম্ফে আছে মস্ত জমিদারী। সেখানে গিয়ে সময় সুযোগ মতো আমি যেন কটা দিন কাটিয়ে আসি। গিয়েছিলাম সেখানে অনেকদিন পরে। গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড—দেয়ালের রঙ, মায় জানলা দরজার পর্দা অব্দি হলুদ আর সোনালী রঙের। আমারই জন্যে সব নতুন করে ব্যবস্থা করিয়েছেন।

আর অদ্ভুত অপূর্ব সেই বাড়ি। কী যে অপরূপ তার সাজ! রুচি আছে মানুষটার। আমাকে থাকতে দিয়েছিলো যে অংশে—সে যা বাহার যা বিলাস! রাত্তিরে স্যুপ রেখে দিতো একটা বাটিতে, এমনই তার কায়দা—নীচে একটা তাওয়া মতো। তাতে সারারাত কুসুম কুসুম গরম হয়ে থাকতো সেই স্যুপ। যাতে মাঝরাতে উঠে হঠাৎ খিদে পেলে আমি খেতে পারি। ভোর হতে না হতে থরে থরে বাটিতে

প্লেটে খাবার সাজিয়ে চার চাকা একটা ঠেলা গাড়ি—ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসতো দুই খানসামা। সে এক এলাহী কাণ্ড। আমেরিকান মাছের কাটলেট থেকে শুরু করে ডিম ভাজা, ডিমের গোলা কুসুমে ভাজা রুটি—সব হাজির। ইংরিজী খানাও অঢেল। যেটা ইচ্ছে খাও। যা ইচ্ছে ফিরিয়ে দাও। একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম আমেরিকা ছাড়ার পর থেকে ময়দার কেক আর পাই না। পরদিনই ঘুম থেকে উঠে দেখি বিছানার পাশে প্লেটে বোঝাই কেক। সদ্য তাওয়া থেকে নামানো, তখনো ধোঁয়া উঠছে। যেন ভোজবাজি। ভাবতেও রীতিমতো অবাক লাগে।

আর মুগ্ধ চোখ নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম স্যর ফিলিপকে। সে এক আশ্চর্য মানুষ। সারা বাড়ির কাজ ঘুরে ঘুরে দেখছেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন, কোটের পকেটে ঢোকানো একটা হাত। আরেক হাতে মুক্তোর এক ছড়া হার—এটা নাকি তাঁর মায়ের। স্মৃতি হিসেবে সবসময় কাছে কাছে রাখেন। এক একটা মুক্তো এই এত্তো বড় বড়—মানাতোও ভারী চমৎকার।

মোটামুটি বিশ্রাম নিয়ে কদিনেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। স্যর ফিলিপ বললেন, যাবেন নাকি আমার সঙ্গে হাসপাতালে? যুদ্ধ ফেরৎ আহতদের দেখে আসবেন? গিয়ে আমার তো চোখে জল আসার দাখিল। আহা রে কষ্ট! যুবক সব। কতই বা বয়েস! একজনের দেখলাম সারা অঙ্গ অসাড়। শুধু ঠোঁট দুটোই যা নাড়তে পারে। তাই দিয়ে ধরে তুলি, তাই দিয়ে রঙ করে। ছবি আঁকে। আরেক জনের হাত হয়ে আছে মুঠো, কিছুতেই আর খোলে না। অবস্থা এমন শেষে হাত অবশ করে ছুরি চালাতে হলো। কেটে ঠিক করতে হলো। নইলে নখ যদি হাতের তালুতে ঢুকে যায়! আরো নাকি কত রকম রুগী আছে। তাদের আরো মারাত্মক অবস্থা। স্যর ফিলিপ আমাকে সেদিকে নিয়ে গেলেন না। বললেন, আমি নাকি সহ্য করতে পারবো না সে দৃশ্য, দেখে কান্না আসবে।

লিম্ফ্ থেকে সিধে লণ্ডনে ফিরে এলাম। পার্ক লেনে সুবিশাল অট্টালিকা স্যর ফিলিপের। উঠলাম সেখানে। তখন সেখানে ছবির প্রদর্শনী চলছে। স্যর ফিলিপেরই আঁকা। সারা বাড়ি কার্পেটে মোড়া। আর ঘরে ঘরে ফুলদানী, তাতে নীল রঙের লিলি ফুল। পরদিন দেখি; সব ফুল বদলে প্রতিটি ফুলদানী নতুন ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে।

একদিন গেলাম স্যর উইলিয়াম অরপেনের স্টুডিও দেখতে। সেখানে দেখি স্যর ফিলিপের বোন লেডী রকস্যাভেজের বিশাল এক প্রতিকৃতি। ভারী অপূর্ব করে আঁকা। অরপেনের যে এতো গুণ আগে বুঝিনি। বোকা সোকা দেখতে একটা মানুষ। চোখে মুখে সব সময় নির্লিপ্ত ভাব—তারই তুলিতে যে এতো জাদু আছে সে কি কাজ না দেখে বুঝতে পারা যায়।

আর একদিন গেলাম এইচ. জি. ওয়েলসের গাঁয়ের বাড়িতে। দুই ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে ছোট সংসার। ছেলে দুটি কেম্ব্রিজ থেকে সদ্য ফিরেছে। আমাকে বললেন ক দিন কাটিয়ে যেতে।

বিকেলে সে এক এলাহী ব্যাপার। কেম্ব্রিজ থেকে এলেন জনা ত্রিশের মতো অধ্যাপক। এসেছেন আমারই সঙ্গে দেখা করতে। বাগানে চেয়ার পাতা হলো। বসলাম সবাই গোল হয়ে। ছবি তোলা হলো পুরো দলটার। কথাবার্তা আর কতটুকু। সবাই অবাক হয়ে ঘুরে ফিরে কেবল আমাকেই দেখে। যেন মানুষ নই আমি। অন্য কোন গ্রহ থেকে আসা এক বিচিত্র জীব।

সন্ধ্যেটাও কাটলো বেশ হৈ হৈ করে। পরিবারের কজন আর আমি। বুদ্ধির খেলা চললো খানিকক্ষণ। তারপর রাত। নৈশ ভোজ এবং ঘুম। বাপারে বাপ, সে যা শীত! ভাবলে এখনও আমার হাড়ে কাঁপন ধরে। ঘর তো নয়, বরফ দিয়ে তৈরী দেয়াল। তাপ বলতে মোমবাতির ফিনফিনে একটু আলো। দু চোখের পাতা আর কিছুতে এক করতে পারি না। পরদিন ভোরে ওয়েলস্ এলেন খোঁজ খবর নিতে। বললেন, কি ঘুম হয়েছিলো তো?

বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ চমৎকার।

বললেন, দেখুন দিকি। অন্য যে সব অতিথি আসেন, সবাই বলেন কী ঠাণ্ডা ঘর, ঘুমোতে পারিনি একদম। কই, আপনার তো কোনো কষ্ট হলো না।

বললাম, কষ্ট ঠিক নয়। তবে নিতান্ত যদি পীড়াপীড়ি করেন বলবো,ঘর আপনার ঠাণ্ডা বললে কম বলা হয়, আসলে বলা উচিত বরফের মতো ঠাণ্ডা।

মনে পড়ে আরো কত কথা। স্মৃতির বাগানে যেন রাশি রাশি ফুল। তাঁর ছিমছাম পড়ার ঘর, গাছের ছায়ায় নিরিবিলি নির্জন। বিলাসের কোন ছাপ নেই। লেখার সেই পুরনো আমলের ঢালু টেবিল। অপূর্ব শ্রীময়ী স্ত্রী। গৃহকর্মে নিপুণ। নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে একাদশ শতকের একটা গীর্জা দেখাতে। সেখানে খোদাইকরের সঙ্গে পরিচয়। পুরনো পাথরের খোদাই করা ফলক থেকে পেতলের ছাঁচে তুলে রাখেন ছাপ। হরিণ ঘুর ঘুর করতো বাড়ির আনাচে কানাচে। রঙীন ফোটোগ্রাফী নিয়ে জন আরভিনের সরস উক্তি, আমার বিরক্তি প্রকাশ। একদিন ওয়েলস্ পড়ছিলেন কেম্ব্রিজের এক অধ্যাপকের রচনা, শুনে আমি বলেছিলাম, পঞ্চদশ শতকের কোন সাধুসন্তের লেখা বলে মনে হচ্ছে। ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের গল্পও শুনেছিলাম তাঁর মুখে। নাকি একটা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখেছিলেন ওয়েলস্, নানান পত্রিকায় পাঠিয়ে নিরাশ হয়ে অবশেষে পাঠিয়ে দিলেন ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের দপ্তরে। এলো চিঠি।—সত্বর এসে একবার সাক্ষাৎ করে যান।

—তা কায়ক্লেশে চলে দিন। দেখা করতে যাবো তার জন্য তো পোশাক দরকার। কোথায় পাই অতো টাকা? শেষে জাঁদরেল দেখে এক টুপি কিনলাম। নতুন নয়, হাত ফেরৎ। তাই চাপিয়ে তো দপ্তরে গিয়ে হাজির। সাদরে অভ্যর্থনা করে ভেতরে বসালেন। টুপি তো খুলে রেখেছি টেবিলের ওপর। গোড়াতেই খেঁকিয়ে উঠলেন, —এ টুপিটা আবার কোত্থেকে জোটালে? আমি চুপ। বললেন, হাবিজাবি এ সব কি লিখেছো? বলে লেখাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আমার সামনে।—এতোখানি বয়েস হলো বোঝো না এতো ভারী লেখার আজকাল আর কদর নেই? বুদ্ধিকে আজকাল আর কেউ রেয়াত করে না? আমি তো ভয়ে জড় সড়। কথা বলেন আর ঘুঁসি মারেন টেবিলে, টুপিটা লাফিয়ে ওঠে প্রায় হাত খানেক। আমি তো ভাবি, এই বুঝি একটা ঘুঁসি এসে পড়ে আমার টুপির ওপর, অতো কষ্ট করে কেনা জিনিসটা না চুপসে যায়। সে যাই হোক, ভূয়সী প্রসংশা করলেন আমার লেখার, ছাপবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, টাকা পয়সার রফা হলো। শেষে পরবর্তী সংখ্যার জন্য লিখতে অনুরোধ করলেন।

টমাস বার্কির সঙ্গে আমার লণ্ডনেই আলাপ। 'লাইমহাউস নাইট্‌স্' গ্রন্থের লেখক। দেখতে একেবারে হুবহু কীট্‌সের মতো। কথা বলেন না বললেই হয়। নিতান্ত দরকার পড়লে একটা কি দুটো। আমাকে নিয়ে বিকেলে বেরুতেন বেড়াতে। জমতো বেশ। হাঁটছি দুজন পাশাপাশি, মোড় ঘুরছি, দাঁড়াচ্ছি—রা'টি নেই কারো মুখে, একেবারে চুপচাপ। মুখচোরা গোছের মানুষ। যেমন এই আমি। যে কদিন ঘুরলাম ফিরলাম, ভুলেও বুঝতে পারিনি, আমাকে কি চোখে দেখলেন, মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে গেলো। শেষে বছর চারেক পর একদিন দেখি পাঠিয়ে দিয়েছেন সদ্য বেরোনো বই—'দি উইণ্ড এ্যাণ্ড দি রেন।' নিজেকে নিয়েই লেখা, অনেকটা আত্মজীবনী মূলক। পড়ে আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম। আসলে আমারই মতো দুঃখে কেটেছে তো ছেলেবেলা। তফাৎ বিশেষ নেই। এই মানুষ কি আমাকে পছন্দ না করে পারেন?

মোটামুটি চারদিকের নানান কাজের ঝামেলা মিটতে একদিন অব্রের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেলাম। আমার সেই খুড়তুতো ভাই। জিমি রাসেলের সঙ্গেও একদিন দেখা করে এলাম। কার্নোর দলে একসঙ্গে ছিলাম আমরা। এখন দিব্যি এক শুঁড়িখানার মালিক হয়ে বসেছে। ঠিক করলাম আর নয়, এবার আমেরিকায় ফিরে যাবো।

যাওয়াটাই উচিত। কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছি দিন দিন। কাজ তো কোনো কিছু নেই। শুধু যোগাযোগ ডিনার আর পরিচয়। তবু যেতে যে চায় না মন। সাধ যায় আরো কটা দিন থাকি, আরো কটা দিন না হয় দেখি ঘুরে ফিরে। পুরনো জিনিস বারবার দেখতে যেন নতুন লাগে। পুরনোর মধ্যে আমি নতুনের স্বাদ পেতে চাই।

তবে একটা কথা ঠিক—যা দেখেছি, যতখানি, যত কিছু—আমি তাতেই তৃপ্ত।

সম্পূর্ণ তুষ্ট। পেছনে পড়ে রইলো আমার প্রিয় মাতৃভূমি। তার অগণিত মনুষ আর প্রিয় বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতের দল। সবার ভালোবাসা আমি দুহাতে কুড়িয়েছি। ফরাসী জনগণ দুহাত বাড়িয়ে আমাকে কোল দিয়েছেন। আমি তৃপ্ত। আমি খুশী। অতীতকে ফেলে যাবো আমার পেছনে। তিন নম্বর পাওনাল টেরাস আমার হৃদয়ে বহুদিন জাগরূক হয়ে থাকবে। এই সব স্মৃতি বুকে নিয়ে আমি নতুন করে কাজ শুরু করতে চাই। ক্যালিফোর্নিয়া আমার কর্মস্থল। এবং কাজই আমার জীবনের সত্য। কাজ বাদ দিয়ে আমার কি অস্তিত্ব বলতে কিছু আছে!

নিউ ইয়র্কে পৌছতে না পৌছতে মেরী ডোরোর ফোন। আশ্চর্য্য, মেরী করছে ফোন! ক বছর আগে এই ফোন না আমার বুকের মধ্যে ঝড় তুলে দিতো। মেরীর সঙ্গেই সেদিন দুপুরের খানা খেলাম। গেলাম ওর নাটক দেখতে। নাম : 'লিলিজ ইন দি ফিল্ড'।

রাতে ম্যাক্স ইস্টম্যান আর তার বোন ক্রিস্টালের সঙ্গে নৈশ ভোজ। সঙ্গ দিলো ক্লড্ ম্যাকে। ক্লড্ জামাইকার কবি। পেশায় বন্দর কর্মী।

চলে আসবো যেদিন নিউ ইয়র্ক থেকে, সেদিন ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস নিয়ে গেলেন সিং সিং জেলখানা দেখাতে। যাবার পথে বললেন, নাকি আত্মজীবনী লিখছেন। বয়েসটাতো ফুরিয়ে যেতে চললো।

বললাম, বয়েসই দেয় বয়েসের ভার লাঘব করে। বয়েস বাড়ছে বয়েস বাড়ছে বলে চেঁচামেচি করলে কি আর বয়েস না বেড়ে কমতে থাকবে?

সিং সিং জেলখানায় হাজত খাটছে জিম লারকিন। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহী নেতা, একাধারে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক এবং কর্মী। পাঁচ বছরের মেয়াদ। ফ্র্যাঙ্ক চলেছেন তাকে দেখতে। বক্তা হিসেবে লারকিন অতুলনীয়। হাজতবাসের কারণ, নাকি সরকারকে উৎখাত করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। গোটা ব্যাপারটাই ভুয়ো। জুরী আর মহামান্য বিচারক মহোদয়ের কীর্তি। এটা পরে অবশ্য প্রমাণও হয়েছে। রাজ্যপাল অ্যাল্ স্মিথের হস্তক্ষেপের ফলে বেকসুর খালাস পান লারকিন। তখনই গোটা চক্রান্তের ইতিহাস প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অদ্ভুত এই সব জেলখানার পরিবেশ। এক কথায় যাকে বলে অমানুষিক। সিং সিং জেলে মান্ধাতার আমলের সেই এক বিরাট দালান, তাতে সারি সারি খুপরি, এক একটা খুপরিতে থাকে ছ জন করে কয়েদী। এ কোন্ দিশী মানবিকতা? আমরা যখন গিয়ে পৌছলাম, তখন কাজের সময়। দালান ফাঁকা। কয়েদীরা গেছে জেলের কারখানায় কাজ করতে। শুধু যায়নি একজন। এক যুবক। বিষণ্ণ চোখ। শক্ত মুঠোয় ধরা গরাদ। দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সঙ্গী ওয়ার্ডেন জানালেন, যে কোন কয়েদীর ক্ষেত্রে প্রথম একটা বছর এই দালানে থাকতে হয়। প্রথম প্রথম বড় খারাপ লাগে। পরে সহ্য হয়ে যায় সব। এক বছর কাটলে নিয়ে যায় ওদিকের নতুন বাড়িতে। সেখানে ব্যবস্থা এর চেয়ে ভালো। খোলামেলা ভাব। মোটামুটি ভালোই লাগে।

দেখি একটা দরজা খোলা। ঢুকে পড়লাম সরেজমিনে ঘরের অবস্থা দেখবো বলে। দেখে তো আমি অবাক! এই ঘর! এই ঘুপচি দেয়াল-চাপা ছাদ-চাপা—এখানে থাকে ছটা মানুষ! আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসছে। বেরিয়ে এলাম। হয়তো বুঝে থাকবে যুবকটি আমার মনের ভাব। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসলো।

ওয়ার্ডেন বললেন, ভিড়ের চাপ এখানে সব চেয়ে বেশি। কয়েদী আসার আর বিরাম নেই। আরো কিছু ঘর তৈরী না করলেই নয়। কিন্তু করে কে।—বুঝলেন না। আমাদের একঘরে করে রেখে দিয়েছে সবাই। কেউ একবার ভুলেও আমাদের কথা বলে না। এই সব অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা—কেউ একটা প্রতিবাদ অব্দি করে না। কত দরবার করলাম, কত রাজনীতিককে কত কি বললাম, কানেও তোলে না। আমরা নিজেদের চেষ্টায় এর চেয়ে বেশী আর কি করবো বলুন।

গেলাম 'হত্যা-কূপ' দেখতে। হত্যাই বলবো। আগে ছিলো ফাঁসির রেওয়াজ, এখন এসেছে নতুন ব্যবস্থা। যাকে বলে সর্বাধুনিক। আসামীকে বসানো হয় চেয়ারে। বিশেষ ভাবে তৈরী চেয়ার। তাতে থাকে বৈদ্যুতিক তারের যোগ। মুহূর্তের ঝলক এসে প্রাণটুকু কেড়ে নিয়ে যায়। কাঠের রেলিংয়ের এধারে বসে আগাগোড়া মৃত্যু দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারপর সেখান থেকে নিয়ে যায় তাকে পাশের একটা ঘরে। সেখানে ডাক্তার কেটে দেয় তার পায়ের শিরা। তারপর মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ওয়ার্ডেন বললেন, সে সময় নাকি মস্তিষ্কে রক্তের তাপ থাকে প্রায় দুশো বারো ডিগ্রী ফারেনহাইট।

সভ্যতার নমুনাই বটে। আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে মানবিকতার ছোঁয়াটুকুও নেই। তবে ফাঁসি কি দোষ করেছিল। কেন বরবাদ হলো শাস্তির সেই চিরন্তন ব্যবস্থা?

বেরিয়ে এলাম সে ঘর থেকে।

জিম লারকিনের খোঁজ করলেন ফ্র্যাঙ্ক। ওয়ার্ডেন বললেন, যদিও নিয়ম নেই, তবু দেখা করবার অনুমতি আপনারা পাবেন। আমার সঙ্গে আসুন।

গেলাম পেছন পেছন। এটা কারখানার একটা অংশ। জুতো তৈরী হয়। খবর দিতে বাইরে এলো জিম। লম্বা দোহারা চেহারা। ভারী সুন্দর দেখতে। ধারালো দৃষ্টি। আমাদের দেখে মুচকি হাসলো।

একটু যেন ঘাবড়েও গেছে। জড়সড় ভাব। কাজে কত তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে সেটাই যেন একমাত্র চিন্তা। বললো, এটা ভালো নয়। এই যে আমি কাজের সময় বাইরে আছি, সবাই ভাববে ফাঁকি দিচ্ছি। এ সময় তো বাইরে থেকে বড় একটা কেউ দেখা করতে আসে না। আমি যাই।

ক্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

বললো, না। ভালোই আছি। শুধু বাড়ির খবর পাই না এই যা দুশ্চিন্তা। সবাই তো সেই আয়ার্ল্যাণ্ডে, আর আমি এখানে। আজ অব্দি একটা চিঠিও পাই নি।

ক্র্যাঙ্ক বললেন, দেখি কি করতে পারি।

চলে গেলো জিম।

আমরাও বেরিয়ে এলাম।

বললেন, অবাক কাণ্ড! দেখে খুব দুঃখ পেলাম। অমন একটা তেজস্বী সাহস মানুষ। কদিনেই কেমন মিইয়ে গেছে, জেলখানার নিয়ম কানুনে কেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ফিরে এলাম হলিউডে। মার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভালোই আছেন। বেশ হাসিখুশি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন আমার লণ্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

বললাম, বললে না তো ছেলেকে নিয়ে তোমার কতখানি গর্ব কতখানি অহংকার।

—সে তো অনেক। মা বললেন। কিন্তু তুই আর কতদিন এইভাবে থাকবি বল্ তো? বিয়ে থা করলি না, থিয়েটারের গল্পের মতো জীবন।

হাসতে হাসতে বললাম, সে তো তোমারই জন্যে। তুমিই তো সব কিছু জন্যে দায়ী।

মা বললেন, আমার জন্যে না ছাই। সারাদিন একবারও বলতে শুনি না ভগবানের নাম। আজ অব্দি দেখলাম না ভগবানের নামে কাউকে এতোটুকু সাহায্য করতে। তোর তো মতিচ্ছন্ন হবেই।

বললাম, মাগো, ভগবানের নাম নিয়ে পড়ে থাকলে আর যাই হোক টাকা রোজগার হয় না। এটা ঘটনা।

বাড়ি ফেরার পথে রীভ্স্ শোনালো অদ্ভুত সব ঘটনা। রীভ্স্ আমার ম্যানেজার। লণ্ডন রওনা হবার আগে তার স্ত্রীকে বলে গিয়েছিলাম মায়ের দেখাশোনা করতে। যেতেন তাই মাঝে মাঝে। তখন নাকি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। বেদম হাসিখুশী। দেখলে কে বলবে মাথার গোলমাল। গিন্নী গেলে সে যে কী খাতির কী যত্ন! কত গল্প করতেন পাশে বসিয়ে। বলতে বলতে হো হো হাসি। এই হাসেন, এই আবার গম্ভীর। তখন আর হাজার ডাকাডাকিতেও মুখ খোলেন না। তো একদিন গিন্নী আর সারাক্ষণের দেখাশোনার নার্স দুজনে নিয়ে বেরোলেন মাকে, জামার মাপ দেবেন। দোকানের সামনে গিয়ে সে যা জেদ! কিছুতে নামবেন না গাড়ি থেকে। —নামবো কেন? গাড়িতে করে এলে কেউ নামে? ইংল্যাণ্ডে তো দোকানের লোকেরা এসে গাড়ি থেকেই মাপ নিয়ে যায়। ওরা আসুক।

সে যাই হোক, বিস্তর বোঝাবার পর তো নামলেন। সামনেই দোকান। ভারী ফুটফুটে দেখতে একটি মেয়ে চার্লির মা শুনে সে কী খাতির! মাপ নিলো। একের পর এক কত যে কাপড়ের বাণ্ডিল টেনে এনে দেখালো। মার আর কিছুতে পছন্দ হয় না। নার্স এবং গিন্নী একটা পছন্দ করলেন, দেখে নাক টাক কুঁচকে সে তো তেঁতো গেলার মতো অবস্থা।

বললেন, না না ওটা আমি পরবো না, ও পরে বেশ্যারা। আমাকে অন্য রঙ দেখান।

শুনে মেয়ে তো থ'। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইলো মার মুখের দিকে। তারপর নীচু হয়ে অন্য বাণ্ডিল খুলতে লাগলো।

আর একদিন। উট পাখির চাষ হয় এক খামার বাড়িতে, মাকে নিয়ে গেছেন তাই দেখাতে। মালিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালো। ডিম ফুটে কিভাবে বাচ্চা হয়, কোন্ কোন্ ডিম ফোটে সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলো। একটা ডিম হাতে তুলে বললো, এই দেখুন এটা—আগামী হপ্তায় বাচ্চা ফুটবে। এখন হাজার তা' দিয়েও লাভ নেই। তখন টেলিফোন এসেছে তার অফিস-ঘরে। একজন এসে খবর দিলো। ডিমটা নার্সের হাতে দিয়ে অমনি গেলো ফোন ধরতে। মার কী রাগ! নার্সের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন ডিম,—তোমার লজ্জা করে না, মার ডিম মার কাছে না রেখে নিজে হাতে করে রেখেছো? দেখছো না মা কেমন পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। দিয়ে দাও এখুনি, ফিরিয়ে দাও।

বলে নিজেই ছুঁড়ে দিলেন পাখীটার দিকে, পড়লো মাটির ওপর। ধপ করে পড়ে ফেটে গেলো। তখন উপায়ান্তর না দেখে মাকে নিয়ে গিন্নী আর নার্স দে ছুট। সিধে গাড়িতে উঠে তবে স্বস্তি।

—আর একদিন তো আরেক মজার কাণ্ড। গিন্নী বললেন। হঠাৎ খেয়াল চাপলো, আমাদের সবাইকে আইসক্রীম কিনে খাওয়াবেন। তো কেনা হলো। চলেছি গাড়িতে করে। রাস্তার মাঝখান বরাবর নর্দমায় তখন কাজ হচ্ছে। একজন দেখি গর্তের বাইরে মাথাটা বের করে কি করছে। চলতি অবস্থায় তাকেও আইসক্রীম দিতে গিয়ে তো বেচারার সারা মুখে একেবারে মাখামাখি। গাড়ি ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। পেছন ফিরে হাত নেড়ে বললেন, চেটেপুটে খেও বাছা। শরীর ঠাণ্ডা হবে।

নিজের কোন ব্যাপারে কোন কথা কোনদিন মাকে বলতাম না। এড়িয়েই চলতাম। মা কিন্তু সব খবরই রাখতেন। আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সাথে গোলমালের সময় হুট করে একদিন বলে বসলেন, তা হ্যাঁরে, এই সব ঝঞ্ঝাটের কথা পাঁচজনকে বলে বেড়াস কেন? লুকিয়ে রাখতে পারিস না? বরং যা না, কদিন বেড়িয়ে আয়। দেখবি সব ধামা চাপা পড়ে গেছে।

আমি তো অবাক। বললাম, কোন্ ব্যাপারে তুমি বলছো ?

—এই যে কাগজে নিত্যি ফলাও করে বেরোচ্ছে। ওরা জানবে কেন তোর নিজের মনের কথা ?

বললাম, ওরা নয় ধরে নিলাম আনেকখানি জানে। তুমি কতটুকু কি জানো বলো।

—কি করে আর জানবো বল। জানলে তো আগে থাকতে বুদ্ধি শুদ্ধি দিতে পারতাম।

বেভারলি হিলসের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন আমার ছেলেদের দেখতে। দুটি ছেলে, নাম চার্লি আর সিডনী। প্রথম আসার কথা আমার মনে আছে। সত্ত বানিয়েছি বাড়ি। নতুন নতুন আসবাব দিয়ে সাজানো, অগুণতি কাজের লোক। ঘুরে ঘুরে এঘর সেঘর দেখলেন। একদম চুপ। তারপর জানলা। দূরে দৃষ্টি দিলেন ছড়িয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের একটা অংশ এখান থেকে নজরে পড়ে। তো তখনও চুপচাপ। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কি বলেন শুনবার জন্যে।

বললেন, বড় নিরিবিলি রে। কথা বলতে ভাল লাগছে না। শান্তির ভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে।

আর এই যে আমার এতো অর্থ এতো বৈভব, তা নিয়ে যেন কোনরকম উত্তাপ নেই, নেই এতোটুকু ভাবনা। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, এমনই হয়তো ধরে নিয়ে থাকবেন। একদিন বসে আছি দুজন সামনের বাগানে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ফুল দেখলেন। তারিফ করলেন খুব। বললেন, এতো খাটা খাটুনি তুই করিস কখন ?

বললাম, আমি কেন করবো। দুজন মালী আছে, তারাই করে।

অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললেন, দুজন! তা হাঁরে তোর অনেক টাকা তাই না ?

বললাম, মা, এই মুহূর্তে তোমার ছেলে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের মালিক।

—হুঁ। মাথা নাড়লেন মা খুব গম্ভীর ভাবে—তা বেঁচে বর্তে সুস্থ হয়ে থাকবি, তবে তো পারবি সব কিছু ভোগ করতে। শরীরের দিকে যত্ন নিস।

তারপরও দু বছর মাকে নিয়ে আর কোন ঝামেলা নেই। সুস্থ শরীর। মন সদা প্রফুল্ল। হঠাৎ 'দি সার্কাস' ছবি তুলছি তখন, একদিন খবর পেলাম নাকি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

আসলে পিত্তের ধাত ছিল। তাই নিয়ে আগে একবার খুব অসুখ হয়। সেরেও উঠেছিলেন। এবারও তাই নিয়ে গোলযোগ। ডাক্তার বললেন, আপারেশন দরকার, কিন্তু হার্ট দুর্বল, তাই সাহস হচ্ছে না।

হাসপাতালে গিয়ে দেখি সঙ্গীন অবস্থা। প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেটে। ওষুধ দিয়েছে

ঘুমের। তারই ঘোরে বেহুঁশ ভাব। বললাম, মা মাগো আমি চার্লি। এই যে তোমার পাশে। বলে হাতখানা তুলে নিলাম হাতে। সেই অবস্থাতেই চোখ না মেলে আলতো ভাবে আমার হাতে চাপ দিলেন, কাছে টানলেন সামান্য একটু। তারপর বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকালেন।

উঠে বসতে চাইলেন। সম্ভব হলো না। ভীষণ অসুস্থ শরীর, তার ওপর সেই মারাত্মক যন্ত্রণা। ছটফটানির ভাবও আছে। বললাম, কোন চিন্তা নেই ভালো হয়ে যাবে। আবার সেরে উঠবে তুমি। ববলেন, কি জানি। বলে হাতে চাপ দিলেন। তারপরই জ্ঞানহারা।

পরদিন। তখন আমি স্টুডিওতে। কাজ চলছে। খবর এলো, মা আর নেই। জানতাম এরকমই হবে। ডাক্তার আগের দিন আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ কাজ বন্ধ করে মেকাপ তুলে সাজ খুলে সহকারী পরিচালক হ্যারি ক্রকারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দাঁড়িয়ে রইলো হ্যারি বাইরে। আমি ঢুকলাম ঘরে। একধারে মস্ত একটা জানলা। চেয়ারে বসলাম। সামনের বিছানায় মা। শেষ শয্যায় শায়িত। জানলার পর্দা দিয়ে বাইরের আলো আসছে। বাইরে তখন ভীষণ রোদ। ভীষণ গরম। ঝিম ধরা ভাব। ঘরে অফুরন্ত নীরবতা। আর মা আমার। ঐ তো তাঁর শরীর। শরীর নয়, দেহ। ছোট্ট গড়ন, মাথাটা বালিশে একটু তোলা, চোখ দুটি বোজা। আর কোনদিন মা চোখ খুলে আমাকে দেখবেন না। জানি না, হয়তো মৃত্যুর মুহূর্তেও কষ্ট পেয়েছিলেন। হয়তো যাতনা বেড়েছিল। সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে হলিউড—তবে কি মরবেন বলে মা এসেছিলেন এতো দূরে? তখন মনে পড়লো হাজারো স্মৃতি। যেন ঝড়। যেন উড়ে চলেছে অজস্র শুকনো পাতা আমার স্মৃতি সব, তোলপাড় করছে বুক, মনে পড়ছে মার দুঃখ, মার গ্লানি, মার সাহস, তার যন্ত্রণা, তার জীবন··· ····

চোখ ফেটে জল এলো আমার। আমি কাঁদলাম।

সে যে কতক্ষণ কত দেরী মনে নেই। সময় যেন থমকে আছে। বেরোলাম যখন ঘর থেকে দেখি হ্যারি দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সান্ত্বনা দিলো। ফিরে গেলাম বাড়িতে।

সিডনী তখন ইওরোপে। অসুস্থ। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে পারলো না যোগ দিতে। গেলাম আমি আমার দুই ছেলে আর তাদের মা। হলিউডের সেই কবরখানা। কে একজন এসে বললো, তাহলে কফিনের ব্যবস্থা করি? আমি বাধা দিলাম। কফিন নয়। আলগা মাটিতে শুয়ে থাকবেন আমার মা, ওপরে থাকবে ঘাস, তার ওপরে খোলা আকাশ। কফিন তো একটা খাঁচা।

তখন সেই রকমই ব্যবস্থা হলো।

একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি। মা আর নেই। জানি না তাঁর ছবি আমি ঠিক মতো আঁকতে পেরেছি কিনা, বা ছবি আঁকার আদৌ আমি যোগ্য কিনা। তবে একথা ঠিক, অসীম কষ্ট সহ্য করেছিলেন মা, তা নিয়ে কখনো তাকে মুখ গোঁজ করে থাকতে দেখি নি। আর ছিলেন দয়া আর ভালবাসার প্রতিমূর্তি। ধর্মের প্রতি আসক্তি ছিলো ঠিকই, কিন্তু পাপীকে কখনো অবজ্ঞা করতেন না। বরং চেষ্টা করতেন তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে। তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে। কখনো এতোটুকু অশালীন আচরণ করতে দেখিনি। মুখ ফসকে কটু কথা হয়তো দু একটা বেরিয়ে যেতো, কিন্তু তার পেছনে অসুস্থতাই বড় কারণ। আর এই যে জীবনভর এতো দুঃখ এতো গ্লানি—কখনো বুঝতে দেন নি চিরদুঃখী আমরা, দুঃখই আমাদের জীবনের প্রধান নিয়ন্তা। বরং অসীম দুঃখের মধ্যেও আমাদের আভিজাত্যের কথা বলতেন, পুরনো দিনের গল্প বলতেন। সেই ভাবেই গড়ে তুলেছিলেন আমাদের মন।

সেবার নিউ ইয়র্কে এলেন শ্রীমতী ক্লেয়ার শেরিডান।

প্রখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর, লেখিকাও বটে। সদ্য ঘুরে এসেছেন রাশিয়া। তারই অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন 'মেফেয়ার থেকে মস্কো।' হৈ হৈ করে বিক্রী হচ্ছে সে বই। তারই সম্মানে ভোজসভার আয়োজন হলো। উদ্যোক্তা স্যাম গোল্ডউইন। আমারও ডাক পড়লো।

লম্বা ছিপছিপে দেখতে, মুখখানা সুশ্রী। ব্যক্তি জীবনে উইনস্টন চার্চিলের ভাগ্নী এবং প্রখ্যাত রিচার্ড ব্রিন্সলি শেরিডান পরিবারের গৃহবধূ। তিনিই প্রথম ইংরেজ নারী যিনি বিপ্লবের পর প্রথম মস্কো ঘুরে আসার বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী। বলশেভিক পার্টির তরফ থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পার্টির বড় বড় হোমরাচোমরা ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে লেনিন ট্রটস্কি প্রমুখের আবক্ষ মর্মর মূর্তি তৈরী করার জন্য।

এদিকে মহিলাকে নিয়ে আমেরিকানরা তো পড়েছে উভয় সংকটে। রুশপন্থী বলে পরিচিত, এদিকে আবার বিশিষ্ট বংশের মেয়ে। আদর আপ্যায়ন না করেও উপায় নেই। বিশেষ করে তথাকথিত ওপরতলার সোসাইটিতে। তারই সুবাদে ভীষণ খাতির। শুনলাম নাকি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একের পর এক মূর্তি গড়ছেন। তালিকায় শ্রীযুক্ত হার্বার্ট বেয়ার্ড সোপ, বার্নার্ড বারুশ—এরাও আছেন। আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হলো, তখন সারা দেশ ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে ছ বছরের ছেলে ডিকি। কথায় কথায় বললেন, এ দেশে নাকি মূর্তি গড়ে পেট চালানো দুষ্কর। গিন্নীদের এগিয়ে

গিয়ে বেশির ভাগ কর্তাই নাকি সটকে পড়েন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, নাকি অতোক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে ভারী লজ্জা করে।

বললাম, আমি কিন্তু লাজুক নই। আপনি স্বচ্ছন্দে আমার মূর্তি গড়তে পারেন।

তখন কাদামাটির তাল আর অন্যান্য দরকারী সাজসরঞ্জাম নিয়ে এলেন আমার বাড়িতে। খাওয়া দাওয়ার পর শুরু হতো কাজ, চলতো বিকেল অব্দি। চুপ করে বসে থাকতাম এক ভাবে। অবিশ্যি একেবারে চুপচাপ নয়। গল্প বলতেন মহিলা অনর্গল। নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার গল্প, রুশ দেশের নানান গল্প, নিজের ব্যক্তি-জীবনের কথা। ভারী সুন্দর কথা বলার কায়দা তো। আর তেমনই জ্ঞান বুদ্ধি বিচক্ষণতা। লাভই হতো আমার। নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হতে সাহায্য করতো।

তা মূর্তি যখন শেষের মুখে, একদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখখানা ভালো করে দেখে বললাম, এ কি করেছেন আপনি? এ তো এক শয়তানের মাথা।

বললেন, ঠিক। শয়তানও হতে পারে। আবার জ্ঞানীও হতে পারে।

মিথ্যে নয়। হওয়া সম্ভব। যদিও দুই মেরুর দুটি সত্তা, কাজ দুজনের সম্পূর্ণ বিপরীত, তবু মিল এই মাথায়। এখানেই দুয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক।

বললেন, জানেন রাশিয়া নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভারী বিচ্ছিন্ন মনে হয় নিজেকে। বুঝতে চায় না কেউ কিছু। ধারণা তো করেই রেখেছে আগেভাগে, সেখান থেকে একচুল কেউ নড়বে না। নেহাৎ শুনতে হয় তাই শোনে।

বললাম, দরকার কি বক্তৃতায়? বেশ তো বই লিখেছেন একখানা। তাতেই তো যা বলার বলা হয়ে গেছে। রাজনীতির মধ্যে মাথা গলিয়ে লাভ কি! মিথ্যে কষ্ট পাবেন।

বললেন, রাজনীতি নয়, যা সত্যি যা স্বচক্ষে দেখে এসেছি আমি সেই কথাই বলি। ওরা বিশ্বাস করতে চায় না। দেখলে আপনিও বিশ্বাস না করে পারবেন না। আর তাছাড়া বক্তৃতা তো দিতে হয় আমাকে টাকা রোজগারের জন্যে।

টাকাটা বড় নয়। আমি জানি, এক্ষেত্রে বিশ্বাসই বড়। মূলে আছে ভালবাসা। ক্লেয়ার রাশিয়াকে সত্যি সত্যি ভালবাসেন।

তার পর দীর্ঘ বিরতি। ১৯৩১ সালে ফের আমাদের দেখা। টিউনিসের শহরতলী এলাকায় থাকেন। বললাম, কি ব্যাপার, আপনি একেবারে অত দূরে গিয়ে বাসা বাঁধলেন?

বললেন, সস্তায় পেয়ে গেলাম তাই। যা রোজগার করি তাতে লণ্ডনের গাঁয়ে মাত্র দু কামরার একখানা ঘর কোনক্রমে ভাড়া নেওয়া যায়। টিউনিসে আস্ত একটা বাড়ি, সঙ্গে বাগান—আমার ডিকি তো বাগান বড় ভালবাসে, তাছাড়া ঐ টাকাতে কাজের লোকও জুটে গেছে।

হায় ভিকি! উনিশ বছর বয়েসে বেচারা মারা যায়। সে যে কী আঘাত মায়ের মনে! সেই মন আর কোনদিন জোড়া লাগে নি। সব ছেড়ে ছুড়ে নিয়েছিলেন ধর্মের ঠাঁই। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর কে কি বলবে জানি না, আমার মনে হয় নিছকই সান্ত্বনা পেতে। ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক হতে নয়।

এই যে মানুষের হঠাৎ করে বদলে যাওয়া,—আসলে জীবনে আসে এমন এক একটা মুহূর্ত, যার দাপটে সব যায় তছনছ হয়ে। ফ্রান্সে এক কবরখানায় আমি দেখেছিলাম এক পাথরের ফলক, তাতে ছোট্ট একটি মেয়ের হাসি খুশী ছবি, তার নীচে একটি মাত্র কথা—'কেন?' দুঃখ সেখানে স্তম্ভিত করে দিয়েছে পিতাকে, অধীর চিত্তে মৃত আত্মার কাছে তিনি এই প্রশ্নটি রেখেছেন। বাস্তবিক এ প্রশ্নের কি কিছু উত্তর নেই? আছে। আমি মনে করি এই যে জীবন আমাদের এই যে অস্তিত্ব এর সব কিছুই অর্থময়, এমন নয় যে নিছকই আকস্মিক। কোন কোন বিজ্ঞানী অবিশ্যি একে অর্থহীন আকস্মিক বলেই চিহ্নিত করেন। ব্যাখ্যা সত্যিই জটিল। আসলে জীবন আর মৃত্যুর রহস্য এমনই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে যে একে আমরা আকস্মিক ঘটনা বলে মেনে নিতে বাধ্য হই।

আসলে ক্ষতির পরিমাণটাও যে অনেকখানি। মৃত্যুজনিত ক্ষতি। প্রতিভাধর জনৈক ব্যক্তি মারা গেলেন তাঁর জীবনের মধ্যাহ্নে, তাঁর প্রতিভা হয়তো দিগন্ত উন্মোচিত করে দিতে পারতো, পেতাম আমরা নতুন কত কিছুর সন্ধান। এরকম মৃত্যু মন দেয় দমিয়ে। তখন মনে হয় এই জগৎ সংসার এই মানুষ জন সব অর্থহীন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? অর্থ কি একেবারে নেই? আছে সেই মৃত্যুর পেছনেও কোন নিগূঢ় নির্মম সত্য। সে সত্য আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

কিছু দার্শনিক আছেন তাঁরা বলেন সমস্ত বস্তুই কোন না কোনভাবে ক্রিয়াশীল এবং এই যে অস্তিত্ব আমাদের বা যে কোন বস্তুর, তাতে কোন কিছুই যুক্ত বা বিযুক্ত হয় না। যদি বস্তু মাত্রেই ক্রিয়া বলে চিহ্নিত হয়, তবে সেই ক্রিয়ার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ এবং তার প্রতিক্রিয়া থাকবে। যদি এই সূত্রকে সত্যি বলে মেনে নিই, তাহলে বলতে হয়, প্রতিটি ক্রিয়াই কোন না কোন ভাবে পূর্ব নির্ধারিত। তাহলে এই যে আমার নাকটা হঠাৎ চুলকে উঠলো, এটাও আগে থেকে ঠিক করা। বেড়াল হেঁটে গেলো ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা অব্দি, পাতা পড়লো গাছ থেকে টুপ করে, হাঁটতে গিয়ে শিশু হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। এসব যে হবে তা নিশ্চয়ই আগে থেকে কোথাও না কোথাও ঠিক করা আছে। সেটা কোথায়? কোন্ অনন্তে অসীমে তাকে খুঁজলে পাওয়া যাবে? এবং সেই নিয়ম কি অনন্তকাল ধরে একইভাবে চলবে? এরকমই অজস্র প্রশ্ন এসে ভিড় করে মনে। যার জবাব পাওয়া যায় না। শুধু ঘটনাগুলো আমরা চোখের সামনে

ঘটতে দেখি। তার প্রতিক্রিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে টের পাই। কিন্তু কোথায় তার শুরু কোথায় শেষ, সে প্রশ্নের জবাব আর পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার, আমি কিন্তু প্রচণ্ড অর্থে ধার্মিক নই। ধর্মের প্রশ্নে মেকলের চিন্তার আমি অনুগামী। মেকলে বলেছেন, ধর্মের একটি ব্যাখ্যা নিয়ে ষোড়শ শতকে যতখানি কুশলতার সঙ্গে তর্ক বিতর্কের পত্তন হতো, একই কুশলতার সঙ্গে আজো সেই একই ব্যাখ্যা নিয়ে গভীর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যদিও কয়েক শো বছরে পৃথিবী যায় অনেকখানি এগিয়ে, আসে নানান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, তার আবিষ্কার, তার প্রয়োগ, তবু বিতর্কের সময় সেগুলোকে কেউই হিসেবের মধ্যে ধরেন না। তর্ক চলে সেই প্রাগৈতিহাসিক নিষ্ঠায়।

এই কারণেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নে আমি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলি। কোন কিছুতেই আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস নেই। সত্য হলে মেনে নিতে তাকে কোন অসুবিধে হয় না, অর্থাৎ চিন্তায় যার নাগাল পাওয়া যায়, আরো ভাঙিয়ে বললে অঙ্কের হিসেবে যা কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মেলে, তাকেই আমি সত্য বলে মেনে নিই। এবং এ ব্যাপারে আরো একটি ধারণা আমার আছে। আমার মনে হয়, সব সময় যুক্তি দিয়ে সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না। যুক্তি মিলিয়ে হিসেব করতে বসলে গোটা ব্যাপারটাই একটা শর্তের মতো হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ভিত্তি তখন শুধু কিছু তর্ক আর কচকচি। মৃত মানুষকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমরা স্বপ্ন দেখি। এ অভিজ্ঞতা আমার আপনার প্রত্যেকের। স্বপ্নে তাকে একই সঙ্গে মনে হয় জীবিত ও মৃত। স্পষ্ট ভাবে ভাগ হয়ে যায় তখন দুটি সত্তা। একে যদি আমি যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ না করতে পারি, তবে কি বলবো আগাগোড়া স্বপ্নের ব্যাপারটাই ভিত্তিহীন, অর্থহীন? এক সেকেণ্ড সময়কে দশ কোটি ভাগে ভাগ করা যায়। এটা অঙ্কের হিসেবে সত্য। কিন্তু তাকে আমি কল্পনা করবো কিভাবে? এবং যেহেতু কল্পনায় আসবে না তাহলে কি চোখ কান বুজে বলে দেবো এরকম হয় না, অঙ্ক ভুল?

বয়েস যত বাড়ছে, বিশ্বাস আমাকে তত পেয়ে বসছে। ঠিক বিশ্বাস নয়। এক ধরনের গভীর আস্থা বোধ। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এই আস্থা বোধ থেকেই আমাদের যাবতীয় চিন্তার জন্ম। এটা আমার বিশ্বাস। আস্থা না থাকলে বিশ্বাস না থাকলে কি করে এতো ব্যাখ্যা এতো তর্ক এতো যুক্তির অবতারণা হয়? যা আমি বিশ্বাস করি মনে প্রাণে, যাতে আমার গভীর আস্থা, তাকেই তো সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ। তাই তো এতো বিজ্ঞান এত অঙ্ক। বিশ্বাস খুলে দেয় মনের উত্তরণের দুয়ার—এ আমার একান্ত বিশ্বাস এবং ধারণা। যাবতীয় অসম্ভবকে সে বাতিল করে। বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করার অর্থ—নিজেকে অগ্রাহ্য করা, নিজের সব কিছু

: স্থিধর্মী ক্রিয়াকর্মকে খারিজ করা বাতিল করা।

যাবতীয় অজানা অজ্ঞাত রহস্যে আমার বিশ্বাস। যুক্তি দিয়ে যে সব রহস্য আমরা সমাধান করতে পারি না। আমি মনে করি আমার কাছে যা দুর্জ্ঞেয়, অপর কারুর কাছে তা জ্ঞেয় এবং সত্য। এবং এই অজ্ঞাত সত্যের মধ্যেই আছে যাবতীয় মঙ্গলের ইঙ্গিত।

হলিউডে জীবন বড় একঘেঁয়ে। নিজের কাজ নিয়ে স্টুডিওতে বিভোর হয়ে থাকি, দেখা করতে পারি না আর কারো সাথে। ফলে নতুন বন্ধুও আর হয় না। আদি অকৃত্রিম বন্ধু বলতে ডগলাস আর মেরী।

ভারী সুখে আছে দুটিতে। সেই বিয়ের পর থেকে। ডগলাস নতুন করে সাজিয়েছে বাড়ি, তার সংস্কার করেছে, বানিয়েছে বাড়ির লাগোয়া এক অতিথি নিবাস। আর থাকে তো যেন রাজার কেতায়। তেমনই খাওয়াদাওয়া, তেমনই ডাকের মাথায় সব কিছু হাজির। অতিথিবৎসল বলে সুনামও খুব।

এলাহি ব্যবস্থা স্টুডিওতেও। আছে একটা সাজঘর তাতে হেন পোশাক নেই যা অমিল। আর এক দারুণ স্নানঘর। সেখানে গরম ঠাণ্ডা দুরকম জল, মায় ভাপে স্নান করারও ঢালাও ব্যবস্থা। আর অছে মস্ত এক পুকুর। তার টলমল নীল জল। কাটো দেদার সাঁতার। যতক্ষণ মন চায় স্নান করো।

গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এলে তাদের নিয়ে যেতো স্টুডিওতে, দেখাতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিভাবে ছবি তৈরী হয়, শেষে পুকুরের সামনে এনে ছেড়ে দিতো। তখন কি আর স্নান করবার লোভ সামলানো যায়। দুদ্দাড় নেমে পড়তো সবাই জলে। স্নান সেরে তোয়ালে জড়িয়ে বসে থাকতো চেয়ারে, যেন রোমের গণ পরিষদের বিরাট এক একজন তার্কিক।

ছবিও তুলে রাখতো অদ্ভুত অদ্ভুত। থাইল্যাণ্ডের রাজা স্নানঘর থেকে বেরিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়ার মুখে—সেই অবস্থায় একখানা ছবি। ভাবতে অবাক লাগে এই লোকটাই রাজা। কতজনকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আল্‌বার ডিউক, সাদারল্যাণ্ডের ডিউক, অস্টেন চেম্বারলেন, ভিয়েনার মারকুইস—আরো কত কে। প্রায় উলঙ্গ এক একজনের শরীর। দেখে মনে হতো, পোশাকটাই তাদের আসল পরিচয়। পোশাক বাদ দিলে তারাও সাধারণ পাঁচজনেরই মতো।

তো এলো হোমরাচোমরা কেউ, অমনি আমারও নেমন্তন্ন। আসলে ততদিনে আমিও যে একটা দর্শনীয় বস্তু বনে গেছি। কতক্ষণেরই বা দেখা। ঘড়ি ধরা তো পর পর কাজ। প্রথমে ঘুরে ফিরে স্টুডিও এবং চারধার দেখা, তারপর স্নান, ঠিক আটটায় মজলিস, সাড়ে আটটায় ডিনার, তারপর ছবি দেখা। ফাঁকে ফাঁকে এই

যা দু একটা কথা, পাশাপাশি বসে হয়তো ডিনার খেলাম কি ছবি দেখলাম। ব্যস্, আমার কাজ শেষ। পারিও না বাপু গায়ে পড়ে মিশতে। প্রকৃত চেনা যাকে বলে তা কি আর ঐটুকু সময়ে হয়। অচেনাই থেকে যেতো প্রায় সবাই। ভিড় বেশি হলে দু একজনকে এনে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিতাম। কিন্তু ঐটুকুই, তার বেশি কিছু নয়। আমি তো আর ডগলাসের মতো অতিথিবৎসল নই যে সারাক্ষণ অতিথি অভ্যাগতদের নিয়ে হৈ চৈ করে কাটিয়ে দেবো।

আর সে যে আপ্যায়নের কত রকম কায়দা! ডগলাস আর মেরী যেন জানে না এমন কোন কাজ নেই। আপন করে নেবেই নেবে যে কোন অপরিচিতকে। শুরু তো হলো মহামান্য মান্যবর ইত্যাদি নানারকম সম্বোধন দিয়ে। মোটে রাতটুকু। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে শুনি নাম ধরে ডাকাডাকি পর্ব শুরু হয়ে গেছে।

ভোজের টেবিলে আসতো ছুটে ডগলাসের পোষা কুকুর। তাকে নিয়ে খেলা চলতো একচোট। দেখে তো অতিথিরা হেসে কুটিপাটি। মেয়েদের দেখতাম বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে কেবল ডগলাসকেই দেখছে। আমার কাছে যে কতজন চুপিচুপি গেয়েছে তার প্রশস্তি। গাইবার মতোই মানুষ যে। এমন আদর যত্ন খাতির আর পাবে কোথায়।

শুধু একবারই মোটে। ডগলাসের সব চেষ্টা বিফল। মোটে খুশী করতে পারে না অভ্যাগতদের। নাম আমি বলবো না কেননা নাম প্রকাশে অসুবিধে আছে। শুধু ঘটনার বিবরণ দিই। এবং কিভাবে সে যাত্রা উদ্ধার পেলো ডগলাস, সেই কথাই বলি।

সদ্য বিয়ের পর এসেছে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে। স্বামী আর স্ত্রী। হপ্তাভর এটা ওটা নানান ব্যবস্থা করে ডগলাস আর মেরীর ভগ্নোদ্যম অবস্থা। মেয়েটির মুখে আর কিছুতে হাসি ফোটে না। গেলো স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে একদিন ক্যাটালিনায়। ভাড়া করা মস্ত বজরায় চেপে মাছ ধরার বিস্তর চেষ্টা হলো। বিফল চেষ্টা। ফিরে এলো খালি হাতে। একদিন স্টুডিওর মাঠে হলো ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা। সে রীতিমতো উত্তেজনার ব্যাপার। মেয়ের কিছুতেই যেন মন আর ওঠে না। যেন বিষাদের প্রতিমূর্তি। সারাক্ষণ মুখ গোঁজ করেই রইলো।

খাওয়া দাওয়ার রকমফেরের ব্যাপারে তো প্রশ্নই ওঠে না। নিত্যি নতুন রান্না। নতুন নতুন তার স্বাদ। ভোজের টেবিলে কত গল্প করে ডগলাস, কত মজার কথা বলে। মেয়ে চুপ তো চুপ। যেন শক্ত এক খণ্ড বরফ। কিছুতেই আর গলে না। কিছুতেই হাসি ফোটে না বরফ শীতল চোখে।

তখন আমার শরণ। ডগলাস বললো, দেখো দেখি কাণ্ড। ভারী যাচ্ছেতাই অবস্থা। এতো করলাম তবু হাসে না, কথা বলে না। আজ তোমাকে ওর পাশে বসাবো।

বলেছি তোমাকে নিয়ে নানান গল্প। খুব মজার মানুষ তুমি। দেখি তুমি হেন ব্যক্তির পক্ষে কিছু সম্ভব হয় কিনা।

অন্য সময় হলে অচেনা অজানা একটি মেয়ের পাশে ঝুপ করে বসে পড়াটা হয়তো দৃষ্টিকটু হতো। মোটামুটি পরিচয় যখন দিয়ে রেখেছে তখন আর কোন অসুবিধে নেই। বসলাম গিয়ে পাশে। কি করবো মোটের ওপর আগে থেকে ভেবে এসেছি। রহস্যের একটা ছদ্ম আবরণ থাকবে আমার আচরণে। কিছুটা অলৌকিক। তাই দিয়েই আসল উদ্দেশ্য হাসিল করবো।

টেবিলে খাবার হাজির। আমি তোয়ালেটা টেনে পায়ের ওপর গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, কই, একটু হাসুন।

মেয়েটি মুখ ফেরালো। অবাক চোখে তাকালো আমার দিকে। বললো, আমাকে কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ। একটু হাসুন।

—হাসবো?

—আলবাৎ। হাসিই এখন আপনার খুব দরকার। আমি মাথা না তুলে বললুম।

কয়েক মুহূর্ত নীরব। কি যেন ভাবলো। বললো, হঠাৎ একথা বলছেন কেন?

—বলছি আপনার বিষণ্ণ ভাব দেখে। গুণতে জানি আমি। আপনার কোন্ মাসে জন্ম?

—এপ্রিল।

—হুম্! অর্থাৎ মেষ রাশি। ঠিক। এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো।

—তার মানে? কি বলতে চাইছেন আপনি? বলে মুচকি একটু হাসলো।

—মেষ রাশি যাদের তাদের কাছে এই মাসটা খুব খারাপ।

—আশ্চর্য, আপনার কথাগুলো কিন্তু ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

—স্বাভাবিক। আমি বললাম, গ্রহ নক্ষত্রে এখন খুব ঠোকাঠুকি চলছে। সময় আপনার ভালো যাবে না।

—এটা কি শুধু আমারই ক্ষেত্রে?

—হ্যাঁ। আপনার ঐ যে বললাম মেষ রাশি।

ঝুঁকে পড়লো একটুখানি। বললো, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে আপনার কথা। সব। জানেন, কদিন ধরে মনটা আমার ভারী খারাপ।

—গোটা মাসটাই এইরকম থাকবে।

—কি করবো ভেবে মোটে দিশা পাই না। যত ভাবি মন এতো খারাপ হয়ে যায়!

—বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা।

—দেখুন না কী ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। মোটে তো একটা পেট। নয় গায়ে খাটবো, নয় ছবিতে ভিড়ের পার্টে নামবো। শুধু একটাই বাধা। ওরা ভারী দুঃখ পাবে। সম্মানে লাগবে খুব।

ওরা অর্থাৎ স্বামী। যতই গোপন রাখার চেষ্টা করুক, বুঝতে আমার এতোটুকু অসুবিধে নেই। এবং এ অবস্থায় রহস্যের খোলস ঝেড়ে ফেলে কিছু বাস্তব জ্ঞান দেওয়া দরকার। যদিও কতটা ঠিক হবে জানি না। বললাম, দেখুন পালিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। তাতে স্বস্তি পাবেন না। কেউ পায় না। আসলে জীবন মানেই হলো চাহিদা। চাহিদা সারা জীবনেও মেটবার নয়। হুট করে কিছু করার আগে হাজারবার ভাববেন। নইলে পরে অনুশোচনায় দগ্ধাতে হবে।

—ঠিক। সায় দিলো সে।—আপনার সঙ্গে কথা বলে ভারী আনন্দ পেলাম। খুব হাল্‌কা লাগছে মন। ভালো লাগছে। আপনি আমার সমস্যা বুঝতে পেরেছেন।

আর তখন ডগলাসের কী চোরা চাউনি! কতবার যে দেখেছে আমাদের এর মধ্যে! মেয়েটি এই প্রথম তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো।

ডিনারের শেষে টানতে টানতে নিয়ে গেলো আমায় একধারে।

—বলি ব্যাপার কি বলো তো? কথার যেন কামাই নেই? আমি তো ভাবলাম কথার ঝোঁকে কানটান না আবার কামড়ে ছিঁড়ে নাও।

বললাম, এমন কিছু নয়। এমনিই কথা। খেজুড়ে আলাপ যাকে বলে। তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

ফার্স্ট ন্যাশানালের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে আর সামান্যই বাকী। সব সম্পর্ক তারপর ছেদ। আমিও ঝাড়া হাত পা। আর কি ভুলেও করি এই মাটি খাওয়া কাজ! এদের নেই এতোটুকু বিবেচনাবোধ, না আছে মায়া দয়া, এমনকি দূরদৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তারও লেশমাত্র চিহ্ন নেই। ছাড়ান পেলে মোটমাট বাঁচি। সবচেয়ে বড় কথা, বড় ছবি করার নানান চিন্তা ইদানীং খুব বেশি বেশি করে মনের মধ্যে তোলপাড় খাচ্ছে। ভালো লাগছে না আর এই দু রীল তিন রীলের কাজ।

আর কোন ব্যাপারে ছেদ টানা যে কী মুশকিল, কী ঝঞ্ঝাট! শেষ যেন আর হতে চায় না। প্রথমে করলাম দু রীলের একখানা ছবি—'মাইনের দিন'। আরো বাকী দুটো ছবি। করলাম 'তীর্থযাত্রী'—চার রীল। প্রায় পূর্ণদৈর্ঘ্যেরই ছবির মতো। তাই নিয়ে ফের সেই দর কষাকষি, টানা হ্যাঁচড়া। স্যাম বলতো, শার্লি মোটে ব্যবসা বোঝে না, শুধু নজর থাকে কম পেলাম কি বেশি পেলাম সেই দিকে। তা সেবার আর বেশি ঝক্কি পোয়াবার দরকার হলো না। দি কিডের অমন রমরমা, তারপর কি আর মুখ খুলতে ওরা সাহস পায়! বললাম, এক কাজ করুন, দু খানা দু রীলের বদলে একখানা চার রীল নিয়ে আমার সব চুকিয়ে দিন। দর চাইলাম মাত্র চার লাখ। তাতেই রাজী। ঠিক হলো, লাভের ওপরও আমার পাওনা থাকবে এবং আমি এবার নিশ্চিন্তে ফার্স্ট ন্যাশানালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ কোম্পানীতে যোগ দিতে পারবো।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এদিকে নতুন কোম্পানীতে ইতিমধ্যেই কিছু জট পাকিয়েছে। ডগলাস আর মেরীর প্রস্তাব অনুযায়ী জোসেফ শেঙ্ক এসে যোগ দিয়েছে কোম্পানীতে। একেবারে সস্ত্রীক। স্ত্রী হলেন গিয়ে শ্রীমতী নর্মা তালমাজ—বিশিষ্টা অভিনেত্রী। নাকি তারও যাবতীয় ছবি এবার থেকে আমাদের কোম্পানীর নামেই মুক্তি পাবে। জোসেফকে দেওয়া হলো সভাপতির পদ। মানতে পারলাম না। এমন নয় যে মানুষটাকে আমি এতোটুকু অপছন্দ করি। কিন্তু পছন্দ অপছন্দ দিয়ে তো আর চিড়ে ভেজে না, প্রশ্ন হলো কি সে করেছে কোম্পানীর জন্যে যে এসেই একেবারে সর্বোচ্চ পদ। বৌকে সঙ্গে এনেছে তাই? সেটাই বা কি করে বলি। অভিনেত্রী হলেও এমন একটা আহামকি

কিছু নয় যে নাম শুনলে হুড়্দাড় করে দর্শক দৌড়ে আসবে। বিশেষ করে ডগলাস আর মেরীর তুলনায় চাহিদা নেহাতই কম। আরো একটা ব্যাপার আছে। জুকরকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমরা কোম্পানীতে নিই নি কেননা তার দাবী ছিল কোম্পানীর লাভে ভাগ বসানো। জোসেফ কি জুকরের চেয়েও যোগ্য যে তাকে নিতে হলো এবং লাভের অংশীদার করা হলো? যাই হোক, এসব নিয়ে আর প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, কেননা তাতে ডগলাস এবং মেরীর মন ক্ষুণ্ণ হতে পারে। নয় মেনেই নিলাম। দেখা যাক পরে কি হয়!

কদিন পরেই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার এক বৈঠক। যথারীতি হাজির থাকার নির্দেশ এলো। গেলাম। প্রথমে নব নির্বাচিত সভাপতির এক দীর্ঘ বক্তৃতা, তাতে আগামী দিনের নানান আশার ইঙ্গিত। তারপর মেরী। বললো আমাদের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেননা সিনেমা-শিল্পে আসছে বিরাট পরিবর্তনের ঝড়। সব প্রেক্ষাগৃহের মালিক জোট বাঁধছে। তাদের মূল লক্ষ্য আমরা অর্থাৎ আমাদের নতুন কোম্পানী। এমতাবস্থায় ছবি তৈরী করে প্রদর্শন করাতে অসুবিধে হবে। ফলে কোম্পানীর টিকে থাকা দায় হয়ে পড়বে।

শুনলাম সব, কিন্তু সত্যি বলতে কি যেভাবে বললো ওরা আমি মোটেই ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখি না। আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন! ছবি যদি ভালো হয়, মান যদি হয় উন্নত, তবে কে আছে এমন যে তাকে দেখবে না, তাকে এক ঘরে করে রাখবে? বললাম সে কথা। কেউ তাতে ভরসা পায় না। জোসেফ বললো, আগে থাকতেই আমাদের ব্যবস্থা নিয়ে রাখতে হবে। বীমা করিয়ে রাখবো সব ছবি। তাতে মার খেলেও বীমা কোম্পানী সামান্য কিছু লাভের বিনিময়ে আমাদের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে দেবে। এই মর্মে সে নাকি ইতিমধ্যে ওয়াল্ স্ট্রীটের ডিলন-রীড্ কোম্পানীর সঙ্গে কথাও বলেছে। এগিয়েছে কথা। তারা রাজী। চার কোটি ডলারের শেয়ার ছাড়বে বাজারে আমাদের কোম্পানীর নামে। আমাদের তার জন্য কোন ঝামেলা পোয়াবার প্রয়োজন হবে না। তারা নেবে ফী আর শেয়ার বিক্রীর ওপর কমিশন। ব্যস্, আমাদের আর চিন্তার কোন কারণ রইলো না।

প্রবল ভাবে বিরোধিতা করলাম। শেষে এও বললাম, আমি চাই না আমার করা কাজের লাভে আর কেউ ভাগ বসাক। তাদের দরকারই বা কিসের। আসল প্রশ্ন হলো ভালো ছবি না খারাপ ছবি। যদি ভালো হয়, কোন জোটই কিছু করতে পারবে না। সব চেষ্টাই ভণ্ডুল হতে বাধ্য।

পালটা বক্তব্য রাখলো জোসেফ। বললো, দেখুন, কোম্পানীর হয়ে ঐকান্তিক ভাবে চাইছিলাম আমি কিছু গঠনমূলক কাজ করতে। এর ফল আমরা সকলেই

ভোগ করতে পারতাম। কিন্তু প্রবল বিরোধিতার মুখে তা আর বোধহয় সম্ভব হয়ে উঠলো না।

মেরীও শোনালো আমাকে এক তক্কা। বলার কায়দা তো খুব। সোজাসুজি বলে না, বলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, কৌশলে।—আমি নাকি স্বার্থপরের মতো নিজের কথাটুকুই ভাবছি। জোসেফের কাজের খুব তারিফ করলো। বললো, নিঃস্বার্থ ভাবে সে যা করেছে. আমাদের তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। সেটাই হবে আমাদের.তরফে সবচেয়ে বড় গঠনমূলক কাজ।

হোক, আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়তে রাজী নই। গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম নিজের জায়গায়। এক কথা আমার—দেবো না কাউকে নিজের পরিশ্রমের ফলে ভাগ বসাতে। তখন খুব কথা কাটাকাটি, খুব তর্ক। বলতে গেলে সবাই আমার বিপক্ষে। একলা আমি আমার পক্ষে। শেষে বললাম, বেশ তাহলে আপনারা যা করবার করুন, আমি বেরিয়ে যাই। কি দরকার আমার আপনাদের সঙ্গে থেকে? তখন টনক নড়লো সবার। ধাতস্থ হলো। জোসেফ বললো, এমন কাজ আর কখনো করবে না যাতে আমাদের বন্ধুত্বে চির ধরে বা সামগ্রিক ভাবে কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং এ ব্যাপারে সকলে একমত হলাম।

এবার ছবি।

কাজ হবে শুরু। ঠিক করলাম, এড্‌নাকে করবো নায়িকা। এড্‌না আর আমি কিন্তু তখন মেরুর দু প্রান্তের বাসিন্দা। মনের দিক থেকে ভীষণ রকম বিচ্ছিন্ন। তবু নায়িকা হিসেবে ও সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, এটা আমি আন্তরিক ভাবে চাই। কিন্তু বাস্তবের নিরিখে বিচার করলে তার একটা অসুবিধেও আছে। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আচার-আচরণেও যথেষ্ট পালটে গেছে এড্‌না। এখন লাগে একটু দিদিমণি গোছের, ভারভাত্তিক চালচলন। ছোটখাটো মজাদার ছবির কাজ হয়তো উৎরে দিতে পারে, কিন্তু ছোট ছবি তো আর আমার মতলবে নেই, এখন করবো পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্র। তাতে দরকার আরো অনেক চরিত্র, আরো সাবলীল অভিনয়।

তবু বেশ কয়েক মাস এড্‌নাকে নায়িকা ঠাউড়ে 'দি ট্রোজান উইমেন' ছবি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করলাম। আমারই গল্প। পুরনো দিনের কাহিনীর খোল নলচে বদলে নতুন কালের নতুন চিত্ররূপ। শেষে দেখি খরচ পড়বে অস্বাভাবিক। ফলে চিন্তা আর এগোবার সুযোগ পেলো না।

আরো একটা গল্প ভাবলাম। নেপোলিয়নের জীবনীর আংশিক চিত্ররূপ। এড্‌না হবে জোসেফাইন। আমি নেপোলিয়ন। ফুটিয়ে তুলবো তার সাহস, তার শক্তিমত্তা, বয়স্ক সেনাপতিদের চক্রান্ত—সব মিলিয়ে আগাগোড়া এক মহাকাব্য।

প্রথম কদিন যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলো, তারপর দেখি হঠাৎই যেন আর আগ্রহ পাই না, যেন ভালো লাগে না আর ভাবতে। তখন বাদ দেওয়া ছাড়া আর কি গত্যন্তর থাকতে পারে ?

ঠিক এই সময় পেগি হপকিন্স জয়েস এলো হলিউডে। দেখতে ডাকসাইটে সুন্দরী, সারা গা গয়নায় মোড়া আর নগদ ত্রিশ লাখ টাকার মালিক। সব নাকি পতি দেবতাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদায়। পাঁচটা মোট বিয়ে। পাঁচটাই আপাততঃ বরবাদ। বাবা নাপিত। জাইগফেল্ডের দলে নাচতো, তাতেই দর্শকের নজর কাড়ে। হেঁজিপেঁজি নয় কেউ। প্রত্যেকে কোটিপতি। তাদেরই ঘায়েল করা টাকা। তা পাঁচ স্বামীর হাত বদল হলে কি হবে দেখতে এখনও অপরূপ। শুধু চোখে মুখে একটু যা ক্লান্তির ছাপ। এসেছে সোজা প্যারিস থেকে। পরনে কালো রঙের গাউন। কারণ জিজ্ঞেস করতে বললো, কদিন আগে নাকি এক ছোকরা তাকে না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে, তারই জন্য শোকের এই পোশাক। আর দুঃখে শোকে জর্জরিত মন নিয়েই হানা দিলো আমাদের এই হলিউডের দুর্ভেদ্য দুর্গে।

একদিন দুজনে একান্তে বসে খাচ্ছি ডিনার, বললো, জানেন শয়তানী আমার দুচোখের বিষ। মোটে ভালো লাগে না বিয়ে থা নিয়ে কারুর সঙ্গে নষ্টামি করতে। স্বামী সংসার পরিজন কে না চায় বলুন। পেলাম কি একটাও মনের মতো স্বামী ?

বলে হাতের বালাটা ঠেলে ওপর দিকে তুলে দিলো। এই এত্তোখানি পুরু, পুরোটা খাঁটি বিশ ক্যারেট হীরে আর পান্না দিয়ে মোড়া। হাসতে হাসতে বললো, এটা আমার এক স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া বিয়ের দস্তুরী।

বিস্তর জুটিয়েছে এইভাবে। এক স্বামীর কাছে নাকি বিয়ের রাতে লিখিয়ে নিয়েছে পাঁচলাখ ডলারের চেক। ঘর বন্ধ করে নিজে ছিল ঘরের ভেতর আর সে বেচারা বাইরে। ভেতরে ঢুকবার জন্যে সে কী কাকুতি মিনতি। বললো, ঢুকতে দেবো, আগে চেক লিখে দাও। তখন দিলো। দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলো চেক। তখন দরজা খুললো।

বললো, পরদিন সকালে উঠে ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক জমা দিয়ে টাকা তুলে আমার নামে জমা করে তবে নিশ্চিন্তি। উদ্বেগে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। আর তারও এমন আঁদিখ্যেতা। দিলাম রেগেমেগে শ্যাম্পেনের বোতল দিয়ে মাথায় এক ঘা বসিয়ে।

বললাম, তারপরই বুঝি ছাড়াছাড়ি ?

—মোটেই না। হাসলো,—মার খেয়ে দেখি দ্বিগুণ আহ্লাদ। যেন আমার হাতের মারটুকুও মিষ্টি। কিছুতেই আর আমাকে ছাড়তে চায় না।

টমাস ইন্‌সের বজরায় একদিন দুজনেরই নেমন্তন্ন। আমি আর পেগি। আর টমাস তো আছেই। যথারীতি শ্যাম্পেনের বোতল খুলে বসেছি। দেখি রাত যত বাড়ে পেগির চেহারাও যেন একটু একটু করে বদলায়। আর তখন আর আমার দিকে নজর নেই, টমাসের প্রতিই যেন সমস্ত মনোযোগ। আমাকে এক ফাঁকে জবরদস্ত সাবধানও করে দিলো।—সেই যে স্বামীর মাথায় ভেঙেছিলো বোতল, বেগড়বাঁই করলে নাকি আমার মাথাতেও ভাঙতে ইতস্ততঃ করবে না।

তা আমিই বা কম যাই কিসে! খেয়েছি ক পাত্তর কিন্তু হুঁশ তো আমার টনটন আছে। শান্তভাবে বললাম, যদি সেরকম কোন কিছু করার ধান্দা দেখি, অমনি সটান তুলে জলে ফেলে দেবো। বুঝে সুঝে যেন যা করার করে।

ফলে সেই থেকে আমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তারপর শুনি মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের আরভিং থালবার্গের সঙ্গে খুব মাখামাখি চলছে। বিয়ে নাকি হয় হয়। আসলে ছোকরা বয়েস তো আরভিঙের, নেশায় পড়েছে, নেশা কাটতে আর কতক্ষণ। কদিন পরে শুনি সত্যিই তাই। আমার মনে হয় পেগির আসল রূপের পরিচয় পেয়ে থাকবে। তারপরই মোহভঙ্গ।

বলতে গেলে খুবই অল্প দিনের পরিচিতি, এরই মাঝে পেগি বলেছিল এক ফরাসী প্রকাশকের গল্প। নাকি ভারী খাতির জমেছিল তার সঙ্গে, তারই টুকরো টুকরো বিবরণ। এই বিবরণীর ওপর ভিত্তি করেই আমার 'এ উওম্যান অফ প্যারিস' ছবি। এড্‌না নায়িকা। আমি অভিনয়াংশে নেই। এ ছবিতে আমার মুখ্য ভূমিকা পরিচালকের।

কিছু সমালোচক বলে থাকেন, নির্বাক ছবিতে নাকি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখানো অসম্ভব। যেহেতু ভাষা নেই, কিছু মোটা দাগের কাজ দিয়ে সব কিছু বোঝাতে হয়, প্রকাশ করতে হয়। যেমন প্রেম।—নায়ক ঠেসে ধরলো নায়িকাকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে, নামিয়ে আনলো মুখ, নিঃশ্বাস পড়ছে নায়িকার ঠিক গলার টনসিলের ওপর, তারপর অন্ধকার। অর্থাৎ সব পরিষ্কার ভাবে বোঝানো হয়ে গেলো। কিংবা ক্রোধ— ধাঁ করে ছুটে গেলো একটা চেয়ার, আছড়ে পড়লো দেয়ালে, পালটা দিক থেকে অন্য একটা চেয়ার ছুটে এলো। অথবা মারপিট।—দুমদাম চললো কিছু ঘুঁষোঘুষি, দুই দলকে দেখা গেল, ব্যস্‌ দৃশ্য শেষ। এগুলো মোটা দাগের এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। সমালোচকেরা এরই জের টেনে ঐ সব কথা বলেন। 'এ উওম্যান অফ প্যারিসে' আমি তাদের সব যুক্তি খণ্ডন করে দেখিয়ে দিলাম, নির্বাক ছবিতেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখানো সম্ভব এবং রীতিমতো সূক্ষ্ম ভাবেই। একটা দৃশ্যের কথা বলি। ঘরে ঢুকেছে এড্‌নার এক বান্ধবী, হাতে একখানা পত্রিকা। তাতে খবর বেরিয়েছে এড্‌নার প্রণয়ীর নাকি বিয়ে। শীগগিরই হতে যাচ্ছে। খবরটা একচমক দেখে এড্‌না

পত্রিকাখানা একধারে রেখে দিলো। তেমন একটা আগ্রহ বা উৎসাহ দেখালো না। সিগারেট ধরালো। একটু পরে চলে গেলো বান্ধবী। তাকে দোর অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলো, হাসি মুখে শুভরাত্রি জানালো। তারপর দোর বন্ধ করে দ্রুত ফিরে এলো নিজের জায়গায়, পত্রিকাখানা ফের খুললো, সেই খবর, পড়লো এবার ভীষণ আগ্রহ সহকারে, পড়তে পড়তে চোখ মুখের ভাব কিন্তু বদলাচ্ছে, ভীষণ যে তোলপাড় চলছে তার মনের মধ্যে এটা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কি বলবেন একে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নয় কি? এমনই অসংখ্য ছোট ছোট মুহূর্ত নিয়ে ছবিখানি তৈরী। এড্‌নার শোবার ঘরের একটি দৃশ্যে দেখি, কাজের মেয়েটি আলমারীর দেরাজ খুলছে, খোলার সময় দেরাজ থেকে পুরুষ মানুষের জামার একটা কলার ছিটকে মেঝেয় পড়লো। বলাবাহুল্য মানুষটি এ্যাডলফ্ মেঞ্জু—ছবির মুখ্য চরিত্র। তার সঙ্গে এড্‌নার যে ভাব ভালবাসা আছে, আলমারীর দেরাজে কলার দেখেই সেটা বুঝতে পারা যায়।

দর্শক মহলে যথেষ্ট তারিফ পেলো ছবি। বিদগ্ধজনেরা বিস্তর প্রশস্তি করলেন। নির্বাক ছবির মধ্যে বোধহয় এটাই প্রথম কাহিনীচিত্র যাতে ব্যঙ্গ আর মনস্তত্ত্ব চমৎকার ভাবে মিশ খেতে পেরেছে। শুরু হলো একে তখন অনুকরণের ঘটা। একই জাতীয় অনেকগুলো ছবি এলো বাজারে। তার মধ্যে একটা আর্নস্ট লুবিস্কের 'দি ম্যারেজ সার্কেল'। মেঞ্জু তাতেও নায়ক। আর বলতে দ্বিধা নেই, প্রায় একই ধরনের চরিত্রে তাকে এ ছবিতেও অভিনয় করতে হলো।

রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গেলো মেঞ্জু। যাকে বলে রীতিমতো নায়ক। এড্‌নার যে কে সেই। ইতালীতে পাঁচ হপ্তার কাজের একটা চুক্তি হলো—নগদ দর্শনী দশ হাজার ডলার। এলো আমার মতামত চাইতে। আমি নিতে বললাম। কিন্তু ওরই দেখি খুঁতখুঁতুনি। সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবে এখান থেকে সুদূর ইতালিতে! সব সম্পর্ক ছিন্ন করে! বললাম, কিসের অসুবিধে। যাও, কাজ করো, শেষ হলে আবার ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ো। এখান থেকে তোমার চাকরী তো, আর যাচ্ছে না। দশ হাজার ওখানে পাচ্ছো, এখানেও দশ হাজারই পাবে। তখন গেলো। তৈরী হলো ছবি। বাজারে বেরুলো। কিন্তু তারিফ পেলো না। ফলে যথারীতি এসে আমাদের সঙ্গে আবার যোগ দিলো।

'এ উওম্যান অফ প্যারিসে'র কাজ তখন চলছে, পলা নেগ্রি হলিউডে এসে রীতিমতো হৈ চৈ বাঁধিয়ে তুললো। মূলে এখানকার প্যারামাউন্ট প্রচার সংস্থা। কী যে বাড়াবাড়ি ওদের প্রতিটি কাজে! গ্লোরিয়া সোয়ানসন আর পলাকে নিয়ে সে যে কত গল্প, কত মনগড়া কাহিনী! একজন নাকি আরেকজনকে হিংসে করে। নাকি ভীষণ ঝগড়া

হুজনের। আর প্রতিটি ঝগড়ার বিবরণই একেবারে কাগজের প্রথম খবর, বেশ বড় বড় হরফে। দু একটা এইরকম—'সোয়ানসনের সাজঘর নেগ্রির চাই-ই চাই।' 'পলা নেগ্রির সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধে গ্লোরিয়ার স্পষ্ট না।' 'গ্লোরিয়ার অনুরোধে নেগ্রির সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত।' আরো কত কি সব আমার মনেও নেই।

এদিকে গ্লোরিয়া আর নেগ্রি কিন্তু প্রাণের বন্ধু। একদম শুরু থেকেই। কাগজের এই সব অপপ্রচারে তাদের কিন্তু কোন ভূমিকাই নেই। সবই প্রচার সংস্থার কাজ। তাতে ফলও হলো। রাতারাতি ছড়িয়ে গেল পলার নাম। আর একের পর এক শুধু ভোজসভা আর আমন্ত্রণ।

এরকম এক সভায় আমিও নিমন্ত্রিত। সভা ঠিক বলবো না, আসলে নাচের এক প্রদর্শনী। পলারই সম্মানার্থে। দুজনের জন্য পাশাপাশি দুটি বক্স নির্দিষ্ট। আমি আমারটায় একলা, পলা জাঁকিয়ে বসেছে তার প্রচার সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে। হঠাৎ শুনি ডাকছে চিৎকার করে আমাকেই—শার্লি, কই এসে অব্দি তোমার দেখা তো একদিনও পেলাম না। একটা ফোন করলেও তো পারতে। জার্মানি থেকে এই এতোখানি পথ এলাম শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করবো বলে। তোমার মনে কি একটুও দয়া মায়া নেই?

শুনে তো আমার হয়ে গেছে! বলে কি মেয়েটা! সত্যি এসেছে এতোখানি পথ আমার সঙ্গে দেখা করতে! ভালবাসার ব্যাপারট্যাপার আছে নাকি! অবিশ্যি একটা কথা ঠিক—কানে যেন একটু বেসুরোই ঠেকছে। তেমন করে চেনা হলো কবে যে ভালবাসায় ছটফট করবে! সেই তো বার্লিনে মিনিট কুড়ির জন্য দেখা! তাতেই এতো!

বললো, তুমি বড্ড নিষ্ঠুর শার্লি, ভীষণ নির্দয়। আমি বলে কবে থেকে বসে আছি তোমার দেখা পাবার আশায়! থাক, তোমাকে আর কিচ্ছু করতে হবে না। দরকার নেই ফোন করার কি দেখা করার। আমিই যা করার করবো। তোমার স্টুডিওর ফোন নম্বর বলো। আমি তোমাকে ফোন করবো।

গোড়া থেকেই লাগছে যেন কেমন। যেন একটু বেশি বেশি। লোক-দেখানো ভাবটাই যেন বেশি। সত্যি সত্যি কি আর যেভাবে যতখানি করে বললো ততখানি? মোটমাট সেই মুহূর্তে তেমন একটা গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। বলুক না ও যা বলার, আমার কি! তা কদিন পরে দেখি নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে। বেভারলি হিলসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসাচ্ছে এক মস্ত ভোজের আসর, সেখানে আমাকে নাকি হাজির থাকতেই হবে। তো গেলাম। আড়ম্বরের সে একেবারে ঢালাও ব্যবস্থা। মান্যগণ্য আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাজির। সবাইকে বাদ দিয়ে দেখি আমারই

ওপর নজর। এবং বেশ চোখে লাগার মতো। লাগছিলো কিন্তু বেশ। অমন সুন্দরীর সাহচর্য কে না চায়। বেশ উপভোগ্য যাকে বলে। আর সেই থেকেই শুরু। বলা যায় নতুন এক পর্বের সূচনা। আমার আর পলার গভীর হার্দ্য সম্পর্কের। যেখানে যাই আমার সঙ্গে পলা। যেন পলা ছাড়া আমাকে কল্পনাও করা যায় না। অচিরেই সাংবাদিকদের টনক নড়লো। বড় বড় হরফের শিরোনাম হয়ে বেরুলো খবর—"পলা বাগদত্তা। পাত্র চার্লি চ্যাপলিন।" দেখে ভারী অশান্তি পলার। আমাকে বললো, তুমি শিগগীরই যাহোক একটা বিবৃতি দাও।

বললাম, দেওয়া তো উচিত তোমার। এ সব ক্ষেত্রে মেয়েরাই আগে বিবৃতি দেয়।

বললো, কি জানি, আমার কিছু মাথায় আসছে না।

পরদিন পলার এক দূত এসে আমাকে বললো, পলা নাকি বলে পাঠিয়েছে আমার সঙ্গে আর দেখা করবে না। কেন কি কারণ কিছু বলেনি। তো বেশ, তাই সই। সন্ধ্যে হতে না হতে সে কী ফোনের ঘটা! একবার দুবার তিনবার। পলা নয়। করছে তার দাসী। আমি যেন একটুও সময় নষ্ট না করে অমনি চলে যাই। পলা খুব অসুস্থ। নাকি ভীষণ দেখতে চাইছে আমাকে। গেলাম। দেখি কাঁদো কাঁদো মুখ দাসীর, তড়িঘড়ি আমাকে নিয়ে ঢোকালো বাইরের ঘরে। পলা আগে থাকতেই সেখানে হাজির। শুয়ে আছে শোফায়, চোখ বোজা। আমি ঢুকতে চোখ খুললো। দেখলো। তারপর ঠোঁট উলটে বললো, তুমি বড় নিষ্ঠুর বড় নির্দয়। বলে দু হাত বাড়িয়ে দিলো।

পরের দিনই প্যারামাউন্ট স্টুডিও থেকে ম্যানেজার চার্লি ইটনের ফোন।—আপনি তো আমাদের বড় মুশকিলে ফেলেছেন। মুখোমুখি কথা বলার দরকার আছে।

বললাম, বেশ তো, আসুন না বাড়িতে। কথা হবে।

এলো। তখন প্রায় মাঝরাত। দোহারা চেহারা ইটনের। কোমলতার নামগন্ধও শরীরের কোথাও নেই। একটু ভূমিকা করারও প্রয়োজন বোধ করলো না। বললো, শুনুন কাগজের এই সব গুজবে তো পলার শরীর মন রীতিমতো ভেঙ্গে পড়েছে। আপনি যাহোক কিছু বলে অন্ততঃ একটা ব্যবস্থা করুন।

—কি বলতে বলেন আমাকে। আমি সোজা তার চোখের দিকে তাকালাম।

—আশ্চর্য আপনি তো ভালবাসেন ওকে। না কি?

—ভালবাসি কি না তা দিয়ে আপনারই বা দরকার কি?

—আমাদের মুশকিলটা আপনি বুঝতে পারছেন না। অধৈর্য্য ভাবে বললো ইটন, কোটি কোটি টাকা আমরা ওর পেছনে লাগিয়ে বসে আছি। ও আমাদের নায়িকা। আলতু ফালতু খবর ছড়ালে বিপদ। ছবি মার খেতে পারে। তার চেয়ে এক কাজ করুন আপনি ওকে বিয়ে করে ফেলুন।

বললাম, আপনি কি মনে করেন প্যারামাউন্টের স্বার্থ রক্ষার জন্যে আমি ওকে বিয়ে করবো? আমি দুঃখিত, পারলাম না আপনাকে সন্তুষ্ট করতে।

—বেশ তাহলে কথা দিন আর কোনদিন ওর সাথে দেখা করবেন না।

—সেটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আপনি বরং পলাকে আগে বলুন।

এর পর আর কথা এগোলো না। এগোনো সম্ভবও নয়। তাছাড়া কিসের আমার তোয়াক্কা, আমার কি প্যারামাউন্ট কোম্পানীর শেয়ার কেনা আছে যে ওদের স্বার্থের কথা আমাকে ভাবতে হবে!

সে যাই হোক, ভেতরে ভেতরে কোথায় কি কলকাঠি নাড়লো জানি না। দেখি তারপর থেকে পলা আর ফোন করে না খবর নেয় না। আমিও যোগাযোগে ইতি ঘটালাম।

তা পলার সঙ্গে আমার মেলামেশা কালীন মেক্সিকো থেকে একদিন একটি মেয়ে এসে হাজির। সিধে স্টুডিও। কি ব্যাপার—না, এসেছে চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে দেখা করতে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম নয়, আগেও হয়েছে। বেশির ভাগই উন্মাদ নয় ছিটেল। ম্যানেজারকে ডেকে বললাম যেমন করে হোক ওকে ভাগাতে।

তখন কাজ চলছে ছবির। মেয়েটির সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনার প্রশ্নই ওঠে না। হঠাৎ বাড়ি থেকে ফোন, মেয়েটি নাকি ফটকের সামনে সিঁড়িতে বসে আছে। কিছুতেই যাবে না। বললাম, খবরদার, গতিক কিন্তু সুবিধের নয়, ওকে যেমন করে হোক ভাগাও। খানসামা বললো, বিস্তর চেষ্টা করেও কোন লাভ হয় নি। বললাম, জানি না ওসব আগে ভাগাও তারপর আমি বাড়িতে ঢুকবো, নইলে আজ আর স্টুডিও থেকে নড়ছি না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ফোন করে জানালো, আপদ নাকি বিদেয় হয়েছে।

এদিকে সেদিনই পলা আর সস্ত্রীক ডাক্তার রেনোল্ডসের আমার বাড়িতে নৈশভোজের নেমন্তন্ন। খেতে খেতে মেয়েটির গল্পই করছি, এমন সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খানসামার প্রাবেশ। ভয়ে সাদাটে দেখাচ্ছে চোখ মুখ। বললো, সর্বনাশ মেয়েটি নাকি দোতলায় আমার ঘরে আমারই বিছানায় শুয়ে আছে! সে গিয়েছিল বিছানা ঠিক করতে। দেখে সে একেবারে নাক ডাকিয়ে ঘুম। পরেছে আমারই পাজামা। দেখলে মনে হয় যেন এ বাড়িরই একজন।

শুনে তো মাথার চুল সিধে হবার যোগাড়! তাইতো, কি করা যায় এখন!

ডাক্তার বললো, কোন চিন্তা নেই। দাঁড়ান আমি একবার ওপর থেকে ঘুরে আসি। গেলো। আমরা তো খাওয়া বন্ধ করে হাঁ করে বসে আছি সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে। একটু পরে ফিরে এলো। বললো, অনেক কথা বলে এলাম। দেখতে

সুন্দরী, বুদ্ধিতেও তুখোড়। বয়েস কম। জিজ্ঞেস করতে সেই কথা—চার্লি চ্যাপলিনকে আমি একবার চোখের দেখা দেখতে চাই। বললাম, কিন্তু সেজন্য এই যে তুমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছো জানো, এই দোষে তোমাকে উন্মাদ বলে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে? বললো, আমি উন্মাদ নই। চার্লি চ্যাপলিনের ভক্ত। মেক্সিকো থেকে এই এতোখানি পথ এসেছি শুধু একবার চোখের দেখা দেখবো বলে। এছাড়া আর আমার কোন মতলব নেই। তখন বললাম, সে পরে বিবেচনা করা যাবে। আগে তুমি পাজামা ছেড়ে নিজের পোশাক পরে ভদ্রস্থ হও, ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে গিয়ে বোসো। নয়তো আমরা পুলিস ডাকতে বাধ্য হবো।

পলা বললো, দাঁড়ান দাঁড়ান, আগেই পুলিসের হুজ্জুৎ করতে যাবেন না। আমি বরং একটু কথা বলি। ওকে বাইরের ঘরে নিয়ে আসতে বলুন।

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, কেননা এলে কি করতে কি করে বসবে তার তো কোন ঠিক নেই, ফলে সব আনন্দ মাটি। পলা বললো, দেখিই না আগে কি হয়। আগে থেকে ব্যস্ত হয়ে কি লাভ।

তখন খানসামা নিয়ে এলো ওকে নীচে বসবার ঘরে। খুব শান্তভাবে ঢুকলো। চেহারায় সত্যিই একটা মাদকতা আছে। বললো সারাদিনে নাকি কিছু পেটে পড়েনি। ক্ষিধে পেয়েছে। পলা বললো, বেশ তো, তাহলে খাবার দিতে বলি। বললো খাবে না। শুধু এক গ্লাস দুধ পেলে খেতে পারে।

তখন দুধের ব্যবস্থা করা হলো।

বসেছে দুধের গ্লাস নিয়ে, পলার তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন।—

—চ্যাপলিনকে তুমি বুঝি ভালবাসো?

—না না, ভালবাসা নয়, ভক্তি। চ্যাপলিন মহান শিল্পী। তার কাজ আমার মনে শ্রদ্ধা জন্মায়।

—কি ছবি দেখেছো তার?

—সব।

—আমার কোন ছবি দেখেছো?

—দেখেছি।

—কেমন লেগেছে?

—ভালো। তবে শিল্পী হিসেবে চ্যাপলিনের ধারে কাছে পৌঁছতে এখনও আপনার ঢের দেরী।

পলা তো হাঁ।

আমি বললাম, দেখো তুমি যা করেছো বা করতে চাইছো তা নিয়ে কিন্তু বিস্তর ভুল

বোঝাবুঝির অবকাশ আছে। তুমি আর এখানে না থেকে মেক্সিকোতে ফিরে যাও। খরচ আমি দেবো।

বললো, দেবার দরকার নেই, টাকা আমার আছে। তখন ডাক্তার দিলো তাকে বিস্তর উপদেশ। শুনলো চুপচাপ। তারপর নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

পরদিন দুপুরবেলা, আমি তখন বাড়িতে। খানসামা ছুটতে ছুটতে ঢুকলো ঘরে। কি ব্যাপার? না, যায় নি এখনো, রাস্তার মাঝখানে শুয়ে আছে। বিষ খেয়েছে। কাতরাচ্ছে। হয়তো একটু পরেই মারা যাবে। তখন পুলিসে খবর দিলাম। পুলিস এসে নিয়ে গেলো সিধে হাসপাতালে। কি হলো তখন আর কিছু জানি না। পরদিন কাগজ পড়ে সব জানতে পারলাম।

প্রথম পাতাতেই ছবি। বসে আছে হাসপাতালের বিছানায়। পাকস্থলী থেকে বিষ বের করার পর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। বিষ নাকি ওটা মোটেই নয়, ফাঁকি। নিজেই সে কথা পরে সাংবাদিকদের বলেছে। আসল মতলব পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাই ওই ভান করে রাস্তার মাঝখানে শুয়েছিল। এসেছিল এখানে ভাগ্যান্বেষণে। সিনেমায় নামতে। যেমন তেমন ভাবে যদি একটু ঠাঁই পাওয়া যায় তাই আমার কাছে আগমন। জিজ্ঞেস করতে বলেছে, চ্যাপলিনের সে একজন গুণমুগ্ধ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর তার দায়িত্ব নিলো জনকল্যাণ লীগ। আমার কাছে চিঠি লিখলো,—পারি কি আমি কোনভাবে তাকে সাহায্য করতে? অন্ততঃ মেক্সিকো অব্দি পৌঁছবার খরচপত্র দিয়ে কি সহায়তা করতে পারি? লিখলো, কোন বদ মতলব নাকি নেই, মেয়েটি এমনিতে সহজ এবং সরল।

তখন আমি মেক্সিকো পৌঁছবার যাবতীয় খরচ পাঠিয়ে দিলাম।

এবার করবো একটা কৌতুক ছবি। বলা বাহুল্য ইউনাইটেড্ আর্টিস্টসেরই ছত্রচ্ছায়ায়। লক্ষ্য কিছুটা অভিনব। 'দি কিড'কে ছাপিয়ে যাবো এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা। চলছে তাই নিয়ে একের পর এক চিন্তা। নিছক ছবি নয়, এবার যা করবো তা হবে চিরন্তন আরেক সৃষ্টি। অনেকটা এপিক ধর্মী। কিন্তু করবো কি নিয়ে! কোথায় গল্প! কোথায় বা চিন্তার সূত্র। কিছুই যে আসে না মাথায়। কি করি এখন!

গেলাম ডগলাসের বাড়িতে বেড়াতে। রোববারের সকাল। বসে আছি দুই বন্ধু। ডগলাস বললো, দাঁড়াও, কয়েকটা ছবি দেখাই তোমায়। পাহাড়ের। বলে খুলে বসলো ছবির অ্যালবাম। আলাস্কার কিছু ছবি কিছু ক্লনডাইক চূড়ার। চিলকুট গিরিবর্ত্মের একটা, সেটাতে ধপধপে বরফে ঢাকা পাহাড়, তারই ওপর দিয়ে চলেছে

পিঁপড়ের মতো সারি সারি একদল অভিযাত্রী। নীচে লেখা তাদের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সে বড়ো কষ্টের। দেখতে দেখতে চিন্তার পোকাটা মাথার মধ্যে হঠাৎ নড়ে চড়ে উঠলো। তাইতো, পাহাড়ের এই ব্যাপারস্যাপার নিয়েও তো একটা ছবি করা যায়! ব্যস, শুরু হয়ে গেলো অমনি টুকরো টুকরো মজাদার ঘটনার আনাগোনা। একটু একটু করে সব মাথায় আসছে আর কি। শুরুটা মোটের ওপর এই ভাবেই।

তা এই যে রগড় বা কৌতুক এর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি। কৌতুক মানেই হলো কোন কিছুকে তুচ্ছ বোধ করা। চরম দুঃখকে একমাত্র কৌতুক দিয়েই তুচ্ছ করা যায়। ভীষণ অসহায় অবস্থায় মানুষ আচমকা হো হো করে হেসে ওঠে। অর্থাৎ অসহায় অবস্থাটাকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চায়। এটা পারে বলেই মানুষ বেঁচে আছে। নয়তো কবে কে জানে পাগল হয়ে যেতো।

ডনার দলের অভিযান নিয়ে এরকমই একখানা বই পড়েছিলাম।

ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়ার পথে সিরিয়া নিভেদা পাহাড়ে বরফে পথ হারিয়ে ফেলে। দলে ছিলো মোট একশ ষাট জন। মাত্র আঠারো জনের জীবন রক্ষা পায়। বেশির ভাগ মরে ক্ষিধের তাড়নায়। জীবিতদের মধ্যে দেখি নরখাদকের চেহারা। মড়া মানুষের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে দিনের পর দিন। সে ভারী দুঃসহ অবস্থা। পড়তে পড়তে চোখ ভারী হয়ে ওঠে। আর বেঁচে থাকার এই অদ্ভুত প্রয়াসের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় আমার ছবির সেই আশ্চর্য দৃশ্যটি। প্রচণ্ড ক্ষিধের তাড়নায় আমি জুতো সেদ্ধ করছি, পরে খাচ্ছি তাই গভীর মনোযোগ সহকারে। এক একটা পেরেক যেন মাংসের এক একটা হাড়, তার আশ্চর্য স্বাদ, সেই ভাবেই চেটেপুটে গিলছি। জুতোর ফিতেটা যেন স্প্যাগেটিরই মতো চমৎকার কোন খাবার, সেই ভাবে সেটা মুখে পুরছি। আর ওদিকে ক্ষিধের ঘোরে আমার সাথী দেখছে আমার দিকে, ভাবছে আমি মুরগী, অমনি ছোরা নিয়ে তাড়া করছে আমাকে মারবে বলে।

ছমাস ধরে চললো পরের পর দৃশ্য গ্রহণের কাজ। চিত্রনাট্য বলতে কিছু নেই। নানান কৌতুকময় ঘটনা, তারই টুকরো টুকরো ছবি। ভাবি, কে জানে করতে করতে এমনি ভাবে যদি একটা গল্পের নাগাল পাই! গল্প আর আসে না। হয়তো এলো বা খানিক দূর অব্দি, হঠাৎ আটকে গেলো একটা অদ্ভুত জায়গায়, সে জট আর কিছুতে ছাড়ে না। বহু দৃশ্য বাদও দিলাম। একটা ছিলো এস্কিমো যুবতীর সাথে ভবঘুরের ভালবাসার দৃশ্য। মেয়েটি তো শিখিয়ে দিয়েছে ভবঘুরেকে কেমন করে এস্কিমো-কায়দায় ভালবাসা জানাতে হয়। নাকে নাক ঘষে। এবং একবার নিজে করে দেখিয়ে দিলো। ভবঘুরে এবার চলেছে সোনার খোঁজে। বিদায় জানাতে এসেছে। মেয়েটির নাকে

নাক ঘষে বিদায় জানালো। চলে যাচ্ছে এবার। হঠাৎ কি মনে করে থমকে দাঁড়ালো। আঙুল দিয়ে ঘষলো একবার নাক। আঙুলে চুমু খেলো। তারপরই আঙুলটা মুছে ফেললো প্যাণ্টে। কেননা নাকের সর্দি আঙুলে লেগে গেছে।

আগাগোড়া এস্কিমো পর্ব পরে বাদ দেওয়া হয়। কেননা সম্পাদনার সময় দেখা যায় নাচঘরের মেয়েটির অংশটুকু এস্কিমো অংশের চেয়ে অনেক জরুরী। দুটো পাশাপাশি রাখলে একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

দি গোল্ড রাশ ছবি তোলার সময় আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করি। বিয়ের প্রয়োজনও দেখা দেয়। কেননা তখন আমার দুই ছেলে বড় হয়েছে, তাদের দেখাশোনা করাটা একান্ত দরকার। এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে বিশেষ আর কিছু বলার নেই। বিয়ের পর থেকে আপ্রাণ চেষ্টা ছিল যাতে স্থায়ী হয় আমাদের সম্পর্ক। কিন্তু শেষ অব্দি আর তা হলো না। দু বছর পর প্রচণ্ড তিক্ততার মধ্য দিয়ে আমাদের এই নতুন পর্বের পরিসমাপ্তি হয়।

নিউ ইয়র্কের স্ট্র্যাণ্ড থিয়েটারে 'দি গোল্ড রাশের' মহরৎ হলো। আমিও গিয়ে বসলাম দর্শকের আসনে। শুরু থেকেই সে যা উল্লাস যা হৈ হৈ। প্রথম দৃশ্যে পাহাড়ের মতো একটা উঁচু চূড়ার চারপাশে আমি হাসিখুশী মুখ নিয়ে ঘুরছি। পেছনে পেছনে ঘুরছে একটা ভল্লুক। দেখে দর্শক তো হেসে কুটিপাটি। শেষ অব্দি রইলো এই হাসির তোড়। ছবি শেষ হতে আমাদের কোম্পানির সেলস্ ম্যানেজার হিরাম আব্রামস্ এসে আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। বললো সাবাশ। সাবাশ চার্লি। ষাট লাখ ডলার আমরা এই ছবি থেকে পাবো। আপনি লিখে নিতে পারেন। এর একটুও এপাশ ওপাশ হবে না।

ষাট লাখ ডলারই লাভ হয়েছিলো গোল্ড রাশে থেকে।

মহরতের পর হঠাৎ আমার শরীর খারাপ হলো। আমি তখন রিৎজ হোটেলে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ সে যে কী অস্বস্তিকর অবস্থা! এক বন্ধুকে ফোন করলাম। তখন রীতিমতো হাঁফ ধরেছে আমার। বললাম, শিগগীরই আমার উকিলকে খবর দাও।

সে তো অবাক,—উকিল! তোমার তো এখন দরকার ডাক্তার।

—না। উকিল। আমি উইল করবো।

বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে সে বেচারা আর কি করে ডাক্তার উকিল দুজনকেই ফোন করলো। পেলো না উকিলকে বাসায়। নিয়ে এলো ডাক্তারকে। দেখে শুনে বললেন স্নায়ুর ওপর আচমকা চাপ পড়েছে। আসলে গরমটা সহ্য হচ্ছে না আপনার। কদিন গিয়ে সমুদ্রের তীরে খোলামেলা বাতাসে কাটিয়ে আসুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আধঘণ্টার মধ্যে আমি ব্রাইটনে। সামনে সমুদ্রের অনন্ত বালুবেলা। পথে কেঁদেছি খানিকক্ষণ। কেন সঠিক করে বলতে পারবো না। সামনের দিকেই একখানা ঘর পেলাম। একফালি বারান্দা। সামনে অগাধ জলরাশি। আর কী মিষ্টি হাওয়া! তো বারান্দায় বসেছি খানিকক্ষণ, দেখি ভিড়। একজন করে জমতে জমতে একেবারে রীতিমতো ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি। আর সমানে চিৎকার —চার্লি,' 'এই চার্লি,' 'এদিকে একবার তাকাও' 'এই যে আমি ডাকছি।' এমনই বিরক্তিকর অবস্থা যে একটু পরে আমাকে বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকতে হলো।

হঠাৎ শুনি হৈ হৈ রৈ রৈ চিৎকার। ঠিক একপাল কুকুর আচমকা একসাথে ঘেউ ঘেউ করে উঠলে যেরকম হয়। বেরিয়ে দেখি, হাবুডুবু খাচ্ছে একজন জলে। সাঁতার জানে না। টিউব ছুঁড়ে দিলো। একটু পরে তুলে আনলো। দেরী হয়ে গেছে তখন। বাঁচলো না আর বেচারী। আমার জানলার সামনেই মারা গেলো। অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে গেলো মৃতদেহ। উত্তেজনা তখনো কমেনি, শুনি আবারও হৈ হৈ, আবারও গেলো গেলো রব। এবার একজন নয়, একসঙ্গে দুজন। পড়ে গেছে হঠাৎ জলে। তোলা হলো তাদের। ভাগ্যি ভালো, মরলো না কেউ। মোটমাট সে এক জঘন্য অবস্থা। এলাম কোথায় নিরিবিলি বিশ্রাম নিতে, অষ্টপ্রহর এই উত্তেজনা, স্নায়ুর ওপর এইরকম চাপ। কাঁহাতক আর সহ্য হয়।

ঠিক দুদিন পর সেখানকার পাট চুকিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে এলাম।

২০

বাড়িতে ফিরে শ্রীমতী গারট্রুড্ স্টেনের সঙ্গে পরিচিত হবার নিমন্ত্রণ পেলাম। আমারই এক বন্ধুর বাড়িতে দ্বিপ্রাহরিক বৈঠক। গিয়ে যখন পৌঁছলাম শ্রীমতী বসে আছেন ঘরের ঠিক মাঝখানের চেয়ারে। বাদামী রঙের পোশাক। হাত দুখানি কোলের ওপর জড়ো করা। লাগছিল ঠিক ভ্যান গগের মাদাম রুলিন্ ছবির মতো। শুধু তফাৎ, ছবিতে চুলের রঙ কটা, আর গারট্রুডের ঘাড় অব্দি ছোট করে কাটা বাদামী চুল।

অতিথিরা রয়েছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ধারে ঘেঁষতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। এক মহিলা এসে বললো, শ্রীমতী গারট্রুড আপনাকে ডাকছেন। গেলাম। বিশেষ কথা বার্তা বলার সুযোগ হলো না। আসছেন আরো অতিথি। সবার সঙ্গে পরিচয় পর্ব চলছে। আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম।

খাওয়ার টেবিলে দেখি আমার পাশেই আসন। কথায় কথায় শিল্পের প্রসঙ্গ উঠলো। যতদূর মনে পড়ে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে খুব তারিফ করছিলাম, তারই সূত্র ধরে আলোচনা। তা সেদিকে দেখি খুব একটা আগ্রহ নেই। বললেন, প্রকৃতির সব সৌন্দর্যে কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। আসল সৌন্দর্য প্রকৃতিকে অনুকরণের মধ্যে। এবং এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চললো বেশ খানিকক্ষণ ধরে কসরৎ। বললেন ঐ তো দেখুন না শিল্পীর হাতে তৈরী মার্বেল পাথর, কত অপূর্ব, আসলের চেয়ে কত সুন্দর। টার্নারের সূর্যাস্তের ছবির কথা ভাবুন। আসল সূর্যাস্তের দৃশ্যের চেয়ে কত অপূর্ব। এমনকি ছবির আকাশটুকু দেখলে অব্দি তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কথা বাড়ালাম না। যদিও তর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। নীরবে সব কিছু মেনে নিলাম।

এরপর উঠলো সিনেমার প্রসঙ্গ।

বললেন, গল্পগুলো বড্ড সেকেলে। বড্ড একঘেঁয়ে। আর ভীষণ জটিল। অর্থাৎ কষ্টকল্পিত। জায়গায় জায়গায় মনে হয় যেন জোর করে মেলানো হয়েছে।

বললেন, এরকম কেন হবে? তার চেয়ে বরং এরকম একটা ছবি করুন না। আপনি হাঁটা ধরলেন। সোজা হেঁটে গেলেন অনেকখানি। সামনে পড়লো একটা মোড়। মোড় ঘুরলেন। তারপর আরেকটা। তারপর আরো একটা। অসুবিধে কি?

কি আর অসুবিধে! মনে মনে ভাবলাম। অর্থাৎ আপনার হিসেব মতো যদি

কেউ প্রশ্ন করে গোলাপ ফুল কাহাকে বলে,—আপনি বলবেন গোলাপ মানে তাই যা গোলাপ অর্থাৎ গোলাপ। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই শূন্য। এর তাৎপর্য কি আপনার মতো দর্শক ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে ?

খাবার টেবিলে বেলজিয়ামের সুন্দর কাজ করা ঝালর দেওয়া অপূর্ব দেখতে একটা টেবিল ঢাকনা। তারিফ পেলো খুব অতিথিদের কাছ থেকে। কফি দেওয়া হলো। এতো হাল্কা কাপ যে হাতে তুলতে গিয়ে জামার আস্তিনে লেগে উলটে গেলো, টেবিল ঢাকনার ওপর কফি পড়লো চলকে। সে যা আফসোস আমার! ঈস, এতো সুন্দর ঢাকনাটা, দিলাম আমি একটা দাগ ফেলে! বারবার ক্ষমা চাইলাম, নিজের অসাবধানতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। মরমে মরে যাবার অবস্থা যেন আমার। একটু পরে দেখি গারট্রুডের কাপও উল্টেছে। অর্থাৎ দলে ভারী হচ্ছি ধীরে ধীরে কিন্তু ঢাকনাটার জন্য দুঃখ ক্রমশঃ বাড়ছে। এদিকে শ্রীমতীর কিন্তু লজ্জা বা দুঃখের কোন বালাই নেই। চিন্তা শুধু নিজের জামাটা নিয়ে। বললো, ভাগ্যি ভালো, আমার জামাতে পড়ে নি। শুনে আমি তো থ। এই না হলে সত্যিকারের শিল্পরসিক!

জন ম্যাসেফিল্ড এলেন একদিন স্টুডিওতে। এমনিই এসেছেন। সুন্দর মানুষ। দীর্ঘ দেহ, আচার ব্যবহারও অত্যন্ত সুন্দর। ভারী বুঝদার লোকও বটে। আমি আবার এই ধরনের লোকের সামনে অপ্রস্তুত বোধ করি। লজ্জা পাই খুব। গুছিয়ে কথা বলতেও যেন গোলমাল হয়ে যায়। শুধু সেবারই দেখলাম অন্যরকম। সব পারছি ঠিক ঠাক। কথা বলা, গল্প, মায় ম্যাসেফিল্ডের নিজের লেখা কবিতার হুবহু মুখস্থ পর পর চারটে লাইন। মনে আছে আমার এখনও। কবিতার নাম 'গলির সেই বিধবা।' লাইনগুলো এইরকম—

> এপাশে জটলা উদগ্রীব মুখ, ওপাশে রুদ্ধ কারাগার
> প্রতীক্ষা শুধু ঘণ্টা বাজবে বিদায়ের শেষ ধ্বনি
> শূন্য হৃদয়। এই ভাবে কতকাল কেটে যায় নিরাশায়
> ওপাশে তখন শৃঙ্খলে বাজে নরকের ঝনঝনি।

মনে পড়ছে মেরিয়ন ডেভিসের কথা। তখন 'দি গোল্ড রাশের' প্রদর্শনী চলছে। এলিনর গ্লিন একদিন ফোন করে বললো মেরিয়ন ডেভিসের সঙ্গে দেখা করার কথা। নাকি উদগ্রীব হয়ে আছে আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। অ্যামবাসাডর হোটেলে হবে দেখা। খাওয়া দাওয়ার পর যাবো প্যাসাডেনায়। সেখানে চলছে আমার 'দি আইডল ক্লাস।' তিনজন পাশাপাশি বসে ছবি দেখবো।

মেরিয়নকে আগে আমি কখনো চাক্ষুষ দেখিনি। তবু অপরিচিত নয়। প্রচারের সে যা বহর! হার্স্ট কোম্পানীর যে কোন কাগজ বা পত্রিকা ওল্টালেই মেরিয়নের

ছবি নয়তো কোন না কোন বিষয় নিয়ে কোন খবর। খবরে খবরে যাকে বলে ছয়লাপ অবস্থা। কত যে রসিকতার ঢেউ বইতো মেরিয়নকে নিয়ে। যা কিছু দেখে বা করে বা বলে সবেতেই মেরিয়নের তুলনা। বেট্রিস লিলিকে কে যেন একদিন লস এঞ্জেলেস শহরের আলো দেখাচ্ছিল। দেখে বেট্রিস বললো, অপূর্ব! দারুণ। সব আলো মিলে আমি দেখতে পাচ্ছি একটাই নাম—মেরিয়ন ডেভিল্। এরই নাম প্রচার। এর গুণাগারও দিতে হতো মেরিয়নকে। কোন ছবি হয়তো মুক্তি পেলো বাজারে। ভিড় নেই। হল্ ভোঁ ভাঁ। ফলে কদিন পরেই বাজার থেকে সে ছবি উধাও।

একদিন ডগলাসের বাড়িতে বসে মেরিয়নের একখানা ছবি দেখছি। নাম—'হোয়েন নাইটউড ওয়াজ ইন ফ্লাওয়ার।' দেখে আমি তো যাকে বলে মুগ্ধ। বেশ অভিনয় করে তো মেয়েটি! বিশেষ করে কৌতুক ঘেঁষা চরিত্রে। কিসের দরকার অত হৈ চৈ প্রচারের। নিজের গুণেই তো পারে বাজীমাৎ করতে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম তাই সেদিন এলিনর গ্লিনের সেই সান্ধ্য ভোজসভার আসরে। মিলিয়ে নিচ্ছিলাম পর্দায় দেখা মেরিয়ন ডেভিসকে। কথায় কথায় বললাম আমার মনের কথা। শুনে সেই সহজ সরল অনাবিল হাসি। সেদিন থেকে অটুট বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়লাম দুজনেই।

গভীর ভালবাসা মেরিয়ন আর হার্স্টের মধ্যে। হয়তো বা ভালবাসার উর্ধেও অন্য কিছু। সারা আমেরিকার লোক জানে সেই ভালবাসার কথা। মুখে মুখে ফেরে দুজনের নাম। তিরিশ বছরেও এ সম্পর্কে এতোটুকু ফাটল ধরে নি। এমনকি হার্স্ট মারা যাবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

আর অদ্ভুত মানুষ এই হার্স্ট। যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করেন, কোন্ সে মানুষ যার ব্যক্তিত্ব আপনার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, নির্দ্বিধায় আমি একজনের নামই করবো—উইলিয়াম র‍্যানডলফ্ হার্স্ট। অবাক মানুষ। অবাক তার হাবভাব চালচলন। সবই অবাক করার মতো। তার ছেলেমানুষী, তার বিচক্ষণতা, তার দয়া, তার কঠোরতা—অবাক হয়ে আমি শুধু দেখতাম। অনন্ত ঐশ্বর্যের মালিক ছিলেন নিজে। তবু অর্থের কাছে কখনো বাঁধা পড়েন নি। এক কথায় বলতে গেলে মুক্ত মানুষ। এমন খোলা মনের লোক আমি আর কখনো দেখিনি। কতরকম যে ব্যবসা! সব সামলাতেন নিজে। সংবাদপত্র থেকে শুরু করে খনি, জমিজমা, চাষবাস—কি নেই। সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করতে একদিন বলেছিল—সব মিলিয়ে নাকি চল্লিশ কোটি ডলারের মালিক। সে সময় তার অজস্র টাকা। ভাবতে পারা যায় না।

এক একজন এক একরকম বলে থাকেন হার্স্টের সম্পর্কে। কেউ বলেন হার্স্ট প্রকৃত অর্থে দেশপ্রেমিক বলতে যা বোঝায় তাই। কেউ বলেন ভীষণ সুযোগ সন্ধানী আর স্বার্থপর। নিজের ব্যবসা নিজের সম্পত্তি ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না। আমার

চোখে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ। অসম সাহসী। যে কোন ঝুঁকি নিতে পিছপা নন। পাশাপাশি অসম্ভব রকম দিলখোলা। টাকাকে তো কোনদিন টাকা বলে জ্ঞান করতে দেখিনি। আর টাকাও অঢেল। নাকি পৈত্রিক সূত্রেই পেয়েছিলেন। গল্প আছে এই ব্যাপার নিয়ে। রাসেল সেজ্‌ সে সময়কার মস্ত ধনী। একবার নাকি হার্স্টের মা শ্রীমতী ফোয়েবের সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন থাকতেন ফিফ্‌থ এভিনিউর বাড়িতে। গিয়েছেন মাকে ছেলের ব্যাপারে সাবধান করতে।—দেখুন, আপনার ছেলে যদি ওয়াল স্ট্রীট নিয়ে কাগজে লেখা বন্ধ না করে, তবে কিন্তু ভীষণ মুশকিলে পড়বে। কাগজ বিক্রী হবে না। বছরে লোকসান দশ লাখ ডলার।

মা বললেন, তাতে ভয়ের কিছু নেই বাছা। বছরে দশ লাখ লোকসান দিয়েও ছেলে আমার আশি বছর স্বচ্ছন্দে টিকে থাকতে পারবে। অতো ভেবো না।

আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হার্স্টের—আমার মনে আছে, আরেকটু হলে না জানি কী গোলই পাকিয়ে বসেছিলাম সেদিন। নিয়ে গিয়েছিল সাইন সিল্‌ভারম্যান, ভ্যারাইটি পত্রিকার সম্পাদক। রিভার সাইড ড্রাইভের মস্ত বাড়ি। দুপুরবেলা। ঠিক অগাধ ধনীর বাড়ির সাজসজ্জা যেরকম হয়, হুবহু সেইরকম। উঁচু ছাদ, আগাগোড়া মেহগনী কাঠে মোড়া, দেয়াল জোড়া বড় বড় ছবি—প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সমাধার পর আমরা গিয়ে খাবার টেবিলে বসলাম।

হার্স্টের মা বসেছেন একধারে, হার্স্ট আমার উলটো দিকে, পাশে সিলভারম্যান। মোটে এই চারজন। বড় ভালো মানুষ এই মহিলা। ভীষণ মিশুকে। হার্স্ট চুপচাপ বড় বড় চোখে আমাকে কেবল দেখছেন। আর তো সমানে বকবক করেই চলেছি।

হার্স্টকে বললাম, এর আগেও আপনাকে আমি দেখেছি। মাত্র একবার। বো আর্টস্‌ রেস্তোরাঁয়। দুই মহিলাকে নিয়ে আপনি বসেছিলেন। আমার এক বন্ধু আপনাকে চিনিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে খোঁচা। টেবিলের নীচ দিয়ে সিল্‌ভারম্যান আমার হাঁটুতে গোত্তা মারছে। বুঝলাম ভুলটা কোথায়। মা রয়েছেন পাশে সেটা আর খেয়াল করিনি।

বললাম, তবে সত্যি বলতে কি, আপনি সেই লোক কিনা এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার বন্ধুর ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে হ্যাঁ, দেখতে অনেকটা আপনারই মতো।

হার্স্ট দুষ্টু হেসে বললেন, তাহলে একই রকম দেখতে দুজন লোক থাকায় সুবিধে আছে বলুন?

আমি বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ সে আর বলতে?

মা খেতে খেতেই মাথা নীচু করে বললেন, হ্যাঁ, মস্ত সুবিধে। খুব।

ঘাম দিয়ে তখন যেন আমার জ্বর ছাড়লো।

এবার মেরিয়নের প্রসঙ্গে আসি।

হলিউডে এসেছিলো হার্স্টের কসমোপলিটান প্রোডাকসন্সের ছবিতে কাজ করতে। থিতু হয়ে গেলো এখানেই। বেভারলি হিলস্ এলাকায় নিলো বাড়ি ভাড়া। এদিকে হার্স্ট নিয়ে এলো তার দুশো আশি ফুট মাপের মস্ত শাম্পান। পানামা খাল হয়ে সিধে ক্যালিফোর্নিয়া। তারপর থেকে সে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। সে যেন আরব্য রজনী বইয়ের জ্যান্ত এক একখানা পাতা! মেরিয়নের আমন্ত্রণে হপ্তাঙ্ক দুদিন কি তিন দিন বসতো সান্ধ্যভোজের আসর। দেখবার মতো তার ব্যবস্থা। প্রায় শত খানেক অতিথি হাজির। অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে শুরু করে হার্স্টের পত্রিকার সম্পাদক মায় অফিসের লোকজন—সবার নেমন্তন্ন। আর মধ্যমণি বলতে হার্স্ট আর মেরিয়ন। হার্স্টই এক নম্বর। ভীষণ অস্বস্তিতে কাটতো হার্স্ট না আসা অব্দি। খেয়ালী গোছের মানুষ তো। কখন কি মেজাজে থাকেন বলা দায়। যদি দেখতাম খোশমেজাজ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম—যাক, ভালোই কাটবে সময়টুকু! আর যদি এসেই শুরু করতেন চোটপাট কি কাউকে বকাঝকা—আমাদেরও কাহিল, তার মানে বুঝতে অসুবিধে হতো না আমাদেরও কপালে দুর্ভোগ আছে।

একবারের একটা ঘটনার কথা বলি।

প্রায় পঞ্চাশ জন আমরা নিমন্ত্রিত, দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। হার্স্ট গম্ভীর। দূরে চেয়ারে বসা। চারপাশ ঘিরে কাগজের সম্পাদকের দল। নীচু গলায় কি যেন জরুরী আলোচনা চলছে। একধারে সোফায় বসে আছে মেরিয়ন। অপরূপ তার সাজ। শুধু রাগ রাগ চোখ। তাতে ভ্রুকুটি। সেইভাবেই তাকিয়ে আছে হার্স্টের দিকে। ভেতরে ভেতরে রাগের একটা আগুন যেন ধিক ধিক করে জ্বলছে।

হঠাৎ আর থাকতে পারলো না বোধহয়। চিৎকার করে ডাকলো, কই এদিকে শোনো তো।

হার্স্ট চোখ তুলে তাকালেন তার দিকে। খানিকটা অবাক, খানিকটা জিজ্ঞাসু। বললেন, কি ব্যাপার, তুমি কি আমাকে ডাকছো?

—হ্যাঁ। একবার এদিকে আসতে হবে।

বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। চোখে প্রচ্ছন্ন আদেশের ভঙ্গি। আমরা চুপ। সম্পাদকের দল পিছু হটতে শুরু করেছে। এমন নিঃশব্দ যেন একটা ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে।

আর হার্স্টকে দেখছি আমরা। সমস্ত মনোযোগ এখন তাঁর দিকে। চোখের অবাক ভাবটা আর নেই। সেখানে এখন রাগ। এখন ক্রোধ। তাই জমছে ধীরে

ধীরে। আঙুল উঠছে নামছে চেয়ারের হাতলের ওপর। মুখ থমথমে। লাল তার আভা। হয়তো ফেটে পড়বেন এখুনি। তারই প্রস্তুতি।

অর্থাৎ গোটা সন্ধ্যাটাই মাটি। কি হবে আর দাঁড়িয়ে থেকে। হাত বাড়িয়ে ভাবছি টুপিটা নেবো কি নেবো না, এমন সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন হার্স্ট। মুচকি হাসলেন। বললেন, এতো যখন ডাকাডাকি তখন তো আমাকে উঠতেই হয়। এগিয়ে গেলেন পায়ে পায়ে সোফার কাছে। মেরিয়নের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, বলো সুন্দরী, তোমার জন্য কি করতে পারি?

মেরিয়ন বললো, আচ্ছা তুমি কি বলো তো! সময় নেই অসময় নেই ফাঁক পেলেই কেবল কাজ! কাজ করতে ইচ্ছে হয় তো যাওনা তোমার অফিসে। আমার এখানে কেন? দেখছো না দাঁড়িয়ে আছেন সবাই তখন থেকে। এসে অব্দি গলা ভেজানোও হয় নি। তুমি থাকতে সেটাও কি আমাকে দেখতে হবে?

হার্স্ট বললেন, বুঝেছি বুঝেছি। আর বকতে হবে না। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি। বলে অমনি রান্নাঘরের দিকে দৌড়লেন।

আমরাও অমনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বলিহারি বটে মেজাজ। কত যে তার কাহিনী। একবার লস এঞ্জেলেস থেকে নিউ ইয়র্ক চলেছি ট্রেনে করে, ভীষণ জরুরী একটা কাজ না গেলেই নয়, হঠাৎ মাঝপথে এক টেলিগ্রাম, পাঠিয়েছেন হার্স্ট—মেক্সিকো যাবেন তিনি, আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। আমি সবিনয়ে পাল্টা তারে লিখে পাঠালাম যে অসম্ভব আমি যেতে পারছি না তিনি যেন কিছু মনে না করেন। না পারার কারণটাও সংক্ষেপে লিখে জানালাম। ট্রেন পৌছল কানসাস সিটি স্টেশনে। দেখি দুই মক্কেল দাঁড়িয়ে আছে, হার্স্টেরই লোক, এদের আমি চিনি। বললো, নিয়ে যেতে এলাম আপনাকে। কর্তার হুকুম। আমার জরুরী কাজের কথা বললাম। বলে, সে সব আপনাকে ভাবতে হবে না। উকিল পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। যা করবে তারাই আপনার হয়ে করবে। আপনি চলুন।

এর পর কি আর না গিয়ে পারা যায়!

বলবো কি, এমন মেজাজী মানুষ আমি কমই দেখেছি। পয়সাকে মোটে পয়সা জ্ঞান করেন না, যেন দু হাতে যত্রতত্র কয়েক মুঠো ছড়িয়ে দিতে পারলেই শান্তি। ধনী তো রকফেলারও। কই, তাকে তো কেউ দেখেনি এরকম। পিয়েরপো মার্গান তো নিজের মুখেই বলতেন, তিনি নাকি অর্থের বশ। আর এই মানুষ—এই হার্স্ট—লাখে লাখে টাকা দিতেন উড়িয়ে। একেবারে আক্ষরিক অর্থে লাখে লাখ। যেন কিছুই না তাঁর কাছে। যেন মায়ের দেওয়া এক হপ্তার পকেট খরচ।

মেরিয়নকে বানিয়ে দিয়েছিলেন একখানা বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন রাজপ্রাসাদ। সমুদ্রের বলতে গেলে একদম ধার ঘেঁষে। জায়গাটার নাম সান্তা মনিকা। ইতালী থেকে আনিয়েছিলেন মিস্ত্রী। মোট সত্তরখানা ঘর। তিনতলা। তিনশো ফুটের মতো চওড়া। নাচঘর ছিলো একটা। এমন তার পালিস যেন মেঝের দিকে তাকিয়ে দিব্যি চুল আঁচড়ানো যায়। দেয়াল সোনার জলে মাজা। আর সারা বাড়ি জুড়ে দেয়ালে দেয়ালে শুধু ছবি আর ছবি। লরেন্সের ছবি, রেনোল্ডসের ছবি, আর সে যে কত শিল্পীর ছবি—সব আসল, খোদ শিল্পীর নিজের হাতে আঁকা। আর একটা ছিলো লাইব্রেরী। তার দেয়াল কাঠ দিয়ে মোড়া। মেঝেতে একটা বোতাম। তাতে চাপ দিলে মেঝের একটা অংশ উঠে স্থির খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সেটা তখন পর্দা। তাতে স্বচ্ছন্দে ছবি ফেলে সিনেমা দেখা চলে।

খাবার ঘরখানাও দেখবার মতো। পঞ্চাশ জন অতিথি বসতে পারে হাত পা ছড়িয়ে। বাড়ির একটা অংশে ছিলো অতিথি নিবাস। তাতে বিশ জনের থাকার মতো বড় বড় ঘর বেশ কয়েকখানা। আর ছিলো একটা পুকুর, তার নীচে ইতালী থেকে আনা শ্বেত পাথরের মোড়ক। দৈর্ঘ্যে তা প্রায় শ খানেক ফুট। পাশেই ব্যাগান। তা-ও দেখবার মতো। পুকুরের সঙ্গে লাগোয়া একটা ছোট্ট পানশালা, তাতে সবসময়ের জন্য হরেক রকম পানীয় মজুত, আর তারই পাশে একটা ছোট্ট নাচঘর। মেঝে তার বিশেষ করে ক্যাবারের জন্যে তৈরী।

বাড়ি তৈরী হবার পর সান্তা মনিকা কর্তৃপক্ষ প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ছোট্ট একটা জেটি করার প্রস্তাব করে। এই নিয়ে টাইমস্ কাগজে লেখালেখিও হয়। ছোট ছোট স্টীমার মোটর বোট এই সব এসে ভিড়বে। কর্তৃপক্ষের কিছু অর্থাগমও হবে। তা আমার মোটের ওপর প্রস্তাবে সায় ছিলো। হালফিল কিনেছি তখন ছোট্ট একখানা শাম্পান। একদিন কথায় কথায় হার্স্টকে আমার মতামত জানালাম। বললেন না না এ অসম্ভব। জেটি মানেই যত রাজ্যের মাঝিমাল্লার ভিড়। গোটা পরিবেশ দুদিনে তুলবে বিষিয়ে। আড়েঠাড়ে তাকাবে বাড়ির জানলার দিকে। কেন রে বাপু, সান্তা মনিকা। কি বেশ্যাপট্টি?

ফলে জেটি করার প্রস্তাব বাদ। এবং এই হলেন হার্স্ট। এ রকমই স্পষ্ট বক্তা, সিধে সাধা, সহজ স্বচ্ছন্দ ও অনাড়ম্বর। ভনিতা নেই কিছুতে। মেজাজ খুশী তো নাচলেন খানিকক্ষণ। নাচ খারাপ কি ভালো হচ্ছে, কে কি বলছে বা বলছে না এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ভাল আছে মেজাজ এটাই তো সবকিছুর উর্ধ্বে। দেখতেও যে খুব একটা চতুর কি তুখোড় বা ধারালো চোখ, নাক, মুখ তা নয়। ভোলাভালা ধরন, একটু যেন বোকাসোকাই ভাব। তাকে ঘষে মেজে চালাক চতুর দেখাবার কিন্তু

এতোটুকু চেষ্টা নেই। যা তিনি নিজে সেরকমই রাখতে চান। অনেকে বলতো পত্রিকার সম্পাদকীয় উনি নিজে লেখেন না, আর্থার ব্রিসবেনকে দিয়ে লেখান, অমন জ্ঞানী গুণী লেখা লেখবার নাকি ক্ষমতাই তার নেই। অথচ ব্রিসবেন আমাকে নিজের মুখে বলেছে মূল্যবান সব কটি লেখাই হার্স্টের এবং সেগুলি রচনার গুণে যুক্তিতে নাকি অনবদ্য।

মাঝে মাঝে বড্ড ছেলেমানুষী আচরণ করে বসতেন। অপছন্দের কথা শুনলেন কি ব্যস—অমনি সারা মুখ মন থমথমে। মনে আছে একদিনের কথা। শব্দ জব্দর খেলা হবে, তারই জন্যে দল করা হয়েছে। দুজন দুজন করে দল। হার্স্ট তখন ধারে কাছে নেই তাই তাকে দলে নেবার প্রশ্নই আসে না। এমন সময় হঠাৎ এসে হাজির। বললেন কি করছেন আপনারা? বললাম শব্দ জব্দ খেলবো, তারই জন্যে দল পাকিয়েছি। বললেন, আমি কোন দলে? জ্যাক গিলবার্ট বললো, আপনি বাদ।—এ্যাঁ, বাদ! আমাকে বাদ দিয়ে আপনারা খেলবেন? বেশ খেলুন, আমি চলে যাচ্ছি। বলে সেই যে রেগে বেরিয়ে গেলেন, সারাক্ষণেও আর দেখা পেলাম না।

ছিলো গবাদি পশু প্রজননের বিরাট ব্যবসা। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর চার লাখ একর মাপের তিরিশ মাইল দৈর্ঘ্যের বিশাল খামার। একধারে মালভূমি ধরনের উঁচু খানিকটা জায়গা, সেখানে খামারের অতিথিশালা। দূর থেকে দেখলে মনে হতো যেন দুর্গ। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা প্রায় শ পাঁচেক ফুট, আর সমুদ্র থেকে দূরত্ব চার মাইল। মূল বাড়িখানি তৈরীর যাবতীয় মালপত্র নাকি ইওরোপ থেকে আমদানী করা, সমুদ্রপথে। বাড়ির মাথাটা দেখতে গীর্জার মতো। চারধারে বাংলো। এক একটা বাংলোয় ছজন করে অতিথি থাকার বন্দোবস্ত। আসবাব-পত্র মায় ঘরের সিলিং অব্দি ইতালীয় ধাঁচে তৈরী। মস্ত খাবার ঘর। সেখানে এক সঙ্গে আশি জনের মতো বসে খেতে পারে। অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিটি বাংলোতেই খেলাধূলার নানান উপকরণ আছে।

অদূরেই চিড়িয়াখানা। তাতে সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, ওরাং-ওটাং, সাপ—কি নেই! ফটক থেকে অতিথিশালা প্রায় পাঁচ মাইলটাক পথ। গাড়িতে করে যেতে হয়। গোটা পথের ধারে লটকানো সারি সারি নোটিশ—এই পথে জীবজন্তুরও অবাধ গমনের অধিকার থাকিবেক। ফলে আমাদের প্রাণান্ত। বসে আছি তো গাড়িতে বসেই আছি। সামনে দিয়ে চলেছে উট পাখীর সারি, নয়তো এক পাল চমরী গাই। কিংবা হরিণ। কখনও বা ধুমসো কালো চেহারার একপাল মোষ। অধিকার যখন আছে তখন আগে তারা চলে যাবে, তবে তো আমাদের যাওয়া।

সে এক এলাহি ব্যবস্থা। অতিথি আসবে ট্রেনে, তার জন্য গাড়ি স্টেশনে আগে থেকেই হাজির। কিংবা আসবে উড়োজাহাজে,—বিমান বন্দরের একধারে আছে

নিজস্ব অবতরণ ক্ষেত্র। সরকারী বিধিনিষেধের কোন বালাই নেই। নামো বিমান থেকে, গাড়িতে উঠে পড়ো—ব্যস্ সিধে অতিথিশালা। গাড়ির কাঁটার মতো নিখুঁত। পৌঁছবামাত্র দেখিয়ে দেওয়া হবে ঘর, তাতে বিশ্রামের যাবতীয় ব্যবস্থা বলতে গেলে পরিপাটি করে সাজানো। বলে দেওয়া হবে, আটটায় ডিনার এবং সাড়ে সাতটায় পানাহারের আসর। সেটা যে খাবার ঘরে নয়, বাইরের হলঘরে বসবে, সেটুকুও একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আর আমোদ প্রমোদ? বা অবসর বিনোদন? কোন্‌টা ভালবাসো তুমি সেটাই এখানে বড় কথা। যদি চাও সাঁতার কাটতে, আছে শান বাঁধানো বিশাল পুকুর। তাতে টলটল করছে নীল জল। ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেস আছে তো নাও ঘোড়া, ঘুরে এসো যতদূর তোমার ইচ্ছে। ইচ্ছে হলে টেনিস খেলেও সময় কাটাতে পারো। নয়তো অন্য কোনো খেলা। সবেরই বন্দোবস্ত আছে। চাই কি চিড়িয়াখানাতেও কাটিয়ে আসতে পারো খানিকক্ষণ। কোন নিষেধ নেই। কেউ বাধা দেবে না তোমাকে, বা পথ আগলে দাঁড়াবে না। শুধু অতিথির ইচ্ছেটাই এখানে আসল ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, একটি ব্যাপারে সামান্য কিছু বিধিনিষেধের প্রশ্ন আছে।—সন্ধ্যে ছটার আগে কিছুতেই মদ খাওয়া কি পানাহারের আসর বসানো চলবে না। এটা হার্স্টের নিজেরই বারণ। তবে মেরিয়নের বেলায় দেখেছি সব বারণের কষিই যায় আল্‌গা হয়ে। এক্ষেত্রেও আলাদা কিছু হয় না। বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসতো গাদাগুচ্ছের। বিকেল হতে না হতেই বসাতো ককটেলের আসর। তাকে বাধা দেবার সাহস কারো হতো না।

আর ডিনার তো নয় যেন রাজবাড়ির ভোজ। যেন প্রথম চার্লসের অভিষেকের খানা খেতাম নিত্য তিরিশ দিন। বেলে হাঁস বা পাতিহাঁস নয়তো ডাক পাখির মাংস তো আছেই। সঙ্গে হাজারো পদ। বলে শেষ করা যায় না এইরকম। এমনিতে দিতো কাগজের রুমাল। শুধু হার্স্ট গিন্নী যখন হাজির থাকতেন, তখন দিতো লিনেনের।

সেটা অবিশ্যি বছরে মাত্র একবার। কেননা সারা বছরে একবারই বেড়াতে আসতেন তিনি স্যান সিমেননে। সে একটা অদ্ভুত বোঝাপড়া যেন। আসতেন শ্রীমতী, অমনি মেরিয়ন তল্পি তল্পা গুটিয়ে সিধে সান্তা মনিকায়। আমরাও সঙ্গী হতাম। আমার ব্যাপারটা একটু আলাদা। গিন্নীর সঙ্গে আমার পরিচিত সেই ষোলো সাল থেকে। বন্ধুত্বই বলা যায়। ফলে কি সান্তা মনিকা কি স্যান সিমেননে দু জায়গাতেই আমার অবারিত দ্বার। খবর পাঠিয়ে ডেকে আনাতেন গিন্নী। সে এক দঙ্গল মেয়ে, শ্রীমতীর যাবতীয় বন্ধু বান্ধব, তার মধ্যে আমি। গিয়ে ভাব দেখাতাম এমন যেন এই প্রথম এলাম এখানে, আগে কোনদিন আসিনি। দেখে মিটিমিটি হাসতেন। বলতেন, তবে কি আমি ধরে নেবো মেরিয়ন ছাড়া আর কেউ এখানে ছিলো

—কোনো মেয়ে? ভারী মুশকিল তখন। যদি বলি হ্যা, তবে সেটা হার্স্টের বিপক্ষে যায়, আবার যদি বলি না, তবেও সেটা হার্স্টের বিপক্ষে যায়। উভয় সংকট যাকে বলে আর কি। তা একটা কথা,—মেরিয়নের ব্যাপার নিয়ে কোনোদিন হিংসে করতে বা অসন্তুষ্ট হতে দেখিনি। জানতেন সব। স্বামীর সঙ্গে মেরিয়নের যে একটা অন্যরকম সম্পর্ক আছে তা নিয়ে এতোটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচের কোন ভাব ছিলো না। বলতেন আমাকে অনেক কথা। শুধু আমাকেই বলতেন।—বুঝলেন, ও এমন ভাব দেখায় যেন মেরিয়ন বলে কাউকে ও কোনদিন দেখেনি, চেনে না। দুজনের মধ্যে যেন কোন সম্পর্কই নেই। এই যে এসেছি আমি, যেন আমি অন্ত প্রাণ, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়ের নামও জানেনা। রইলো সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ, ঘুরঘুর করে বেড়ালো। মোটে কয়েক ঘণ্টা। দুপুরের খাবার খেতে বসলাম। মাঝপথে খানসামা এসে দিলো কি এক চিঠি। পড়েই হঠাৎ চোখ মুখ চঞ্চল হয়ে উঠলো। উঠে পড়লেন খাবার শেষ না করেই। বললেন, ভীষণ দরকার আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হচ্ছে। যত শিগগীর সম্ভব ফেরার চেষ্টা করবো। তুমি ভেবো না আমার জন্যে। বলে সেই যে চম্পট, আর ফেরার নাম নেই। এটা আজ বলে নয়, ফি বছরের ব্যাপার। আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। জানি আমি কোথায় যায়। মেরিয়নের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। জরুরী কাজ টাজ সব মিথ্যে, বানানো।

মনে আছে সেই সব দিন। গিন্নী আর আমি। দুই বিপরীত সত্তা, তবু বন্ধু আমরা, মনের কত না কাছাকাছি। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর বেরোতাম পায়চারি করতে। সে যে কী চমৎকার, কী আকাশ ভাঙা চাঁদের আলো—আমি বলে বোঝাতে পারবো না। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দশদিক। দূরে সাতটা পাহাড়ের চূড়া যেন ছবির মতো আকাশের গায়ে মেশানো। আর লাখো লাখো, কোটি কোটি শুধু তারা আর তারা। দু চোখ ভরে দেখার মতো সেই অনবদ্য দৃশ্য। চিড়িয়াখানায় তখন হয়তো ডাকছে সিংহ। নয়তো কি হয়েছে জানিনা—সমানে চিৎকার করছে ওরাংওটাং। পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে সেই ডাক। অলৌকিক লাগছে। যেন মায়া সব। গা সিমসিম করা কেমন যেন ভয়ের ভাব। সব ছাপিয়ে চলছে সেই ওরাংওটাঙের ডাক। যেন থামবে না। চলবে সারারাত।

বলতাম, ওটা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। তাই যখন তখন ডাকে।

বলতেন, শুধু ওটা নয়, এই সারা মাঠ, এই আকাশ বাতাস, চারপাশের এই অসংখ্য মানুষ জীবজন্তু সবাই পাগল, সবাই মনোবিকারের রোগী। এক আছে মাথা পাগল আপনাদের ঐ হার্স্ট, গাঁথনির পর গাঁথনি তুলে শুধু ঘর বানানো। নাকি আরো তুলবে। জীবনের শেষ দিন অব্দি। তারপর? কে করবে এর দেখাশুনো? কি কাজে

লাগবে এতো বিশাল জমি? হোটেল এখানে চলবে না। কে আসবে এই ফাঁকা মাঠে ছুটি কাটাতে? বড় স্কুল কি বিশ্ববিদ্যালয়?—আমি লিখে দিতে পারি কেউ এখানে আসবে না।

বলবো কি, সে যেন মনের জ্বালা, তীব্র ভৎর্সনা দিয়ে তৈরী একেকটা শব্দ, তবু রাগ নেই, নেই এতোটুকু অসন্তোষ। ঠিক মা যেমন অসন্তোষ নিয়ে ছেলেকে বকেন, তাকে শোধরাবার চেষ্টা করেন, এ যেন ঠিক তাই। মায়ের দরদ দিয়েই দেখতেন নিজের স্বামীকে। অদ্ভুত আশ্চর্য সেই সম্পর্ক। গভীর ভালবাসার সুর তাতে বাঁধা। ভালো চাইতেন স্বামীর। আমাদেরও মঙ্গল কামনা করতেন। মুগ্ধ হয়ে শুধু তাকে দেখতাম। অবিশ্যি পরে সেই যখন রাজনীতি নিয়ে বড্ড জড়িয়ে পড়লাম আমি। বা বলা যায় আমাকে জড়িয়ে ফেলা হলো, তারপর থেকে আমার সঙ্গে আর তেমন সম্পর্ক রাখেন নি। আমাকে এড়িয়ে চলতেন।

একদিন। স্যান সিমেননে গিয়েছি বেড়াতে। দেখি ভীষণ উত্তেজিত মেরিয়ন। ভীষণ। আর খুব ঘাবড়ে গেছে। বললো সাংঘাতিক কাণ্ড। একজন অতিথি। আমারই মতন বেড়াতে এসেছে। যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, নাকি ক্ষুর হাতে কে একজন অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে। তারপর জখম। ব্যস্।

তা ঘাবড়ে গেলেই মেরিয়ন তোতলাতে থাকে। সে ভারী মজা লাগে তখন। বললো, ভ-ভ-ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এখনও আততায়ীকে খুঁ-খুঁজে পাওয়া যায় নি। হার্স্ট অমনি কজন গো-গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছেন। খুব গোপনে। আর কেউ এখনও জানে না। শু-শুধু আপনাকেই বললাম।

বললাম, তা সেই মহামান্য অতিথিটি কোথায়?

—দেখাবো। ডিনার টেবিলে আসবে। চুপিচুপি চিনিয়ে দেবোখন।

নৈশ ভোজের টেবিলে আমার উলটো দিকে বসলো এক যুবক। মুখে ব্যাণ্ডেজ। বলতে গেলে সারা মুখ জুড়েই। শুধু চোখ আর ঝকঝকে সাদা দুপাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। তাতে হাসির ঝিলিক। চোখাচুখি হতে হাসি হাসি দাঁতেই ডানধারে মাথা নুইয়ে আমায় অভিবাদন জানালো।

টেবিলের নীচে দিয়ে খোঁচা দিলো মেরিয়ন। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, এই সেই লোক।

তা অত বড় একটা আঘাত, তাতে খিদের এতোটুকু থাকতি নেই। দেখি খাচ্ছে খুব। প্রশ্ন করছে নানান লোকে নানান কিছু। কোন জবাব নয়, শুধু হাসছে নয়তো কখনো কখনো ঘাড় নুইয়ে হ্যাঁ না দিচ্ছে।

খাওয়া দাওয়ার পর মেরিয়ন নিয়ে গেলো জায়গাটা দেখাতে। একটা পাথরের মূর্তি। বললো, এইখানেই ঘটনা ঘটে। এই নীচে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছিল।

—তা মূর্তির পেছনে ওরই বা কি দরকার পড়েছিল তখন?

—ঐ যে, বললাম আততায়ী। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে মূর্তির পেছনে গিয়ে লুকোয়।

বলতে না বলতে ফের তার আবির্ভাব। যেন অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো একটা মানুষ। মুখ রক্তে মাখামাখি। ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। টলতে টলতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেলো। আমি তো দেখে তিন লাফে দশ হাত পেছনে। মেরিয়ন চীৎকার করতে শুরু করেছে। অমনি কে জানে কোত্থেকে বেরিয়ে এলো বিশজন মানুষ। ঘিরে ধরলো যুবককে। কী গোঙানি তখন তার—মেরে ফেললরে, কে কোথায় আছো····। অমনি চ্যাংদোলা করে তুলে নিলো তাকে দুজন গোয়েন্দা, নিয়ে গেলো অতিথিশালার দিকে। মেরিয়নও তাদের পেছন পেছন গেল।

ভীষণ উত্তেজনা ভেতরে ভেতরে। কিছুই জানার সুযোগ নেই। ফিরে এলাম অতিথিশালায়। দেখি মেরিয়ন। বললাম, কি, কিছু জানা গেলো?

বললো, হ্যাঁ। ওরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। নাকি কেউ কিছু করেনি। ওর নাকি নিজেরই সব কীর্তি। মাথায় ছিট আছে।

সে রাত্রেই মালপত্র সমেত তাকে গাড়ি করে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসা হলো। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

স্যর টমাস লিপটনের সঙ্গে স্যান সিমেননেই পরিচয়। সান্তা মনিকাতেও বেশ কয়েকবার দেখেছি। স্কটল্যাণ্ডের মানুষ। বৃদ্ধ। ভারী মিষ্টি ব্যবহার। আর কথায় কথায় পুরনো দিনের একটা না একটা গল্প টেনে আনতেন।

আমাকে বলতেন, দেখো চার্লি তুমি যেমন আমেরিকায় এসেছিলে কপাল ফেরাতে, আমিও ঠিক তাই। প্রথমবার যে জাহাজে করে আসি সেটা আসলে গরু মোষ নিয়ে আসার জাহাজ। তখনই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম—এর পরের বার যখন আসবো, নিজের বোটে চড়ে আসবো। এসেছিও তাই। বলতেন চায়ের ব্যবসার নাকি কোটি কোটি টাকা স্রেফ ডাকাতি করে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। লস এঞ্জেলেসে প্রায়ই আমরা তিন বন্ধু এক সাথে বসে ডিনার খেতাম—আমি, স্যর টমাস আর আলেকজাণ্ডার মুর—স্পেনের রাষ্ট্রদূত। মুর আর স্যর টমাসের শুরু হতো পুরনো দিনের গল্প। সে যে কথায় কথায় কত মহামান্য ব্যক্তিবর্গের নাম কত চেনা জানা। কত হাতি ঘোড়া যে মারা পড়তো তাদের আলোচনায়। আমি বসে বসে শুনতাম।

সে আশ্চর্য সব দিন। গল্পে গানে মজলিসে মুখর প্রতিটি মুহূর্ত। আর কি হপ্তায়

বলতে গেলে হার্স্ট আর মেরিয়নের সান্নিধ্য। ঢালাও নেমন্তন্ন যে আমার মেরিয়নের সান্তা মনিকার বাড়িতে। যেতে ভালোও লাগতো খুব। ঐ বৈভব ঐ আড়ম্বরের মধ্যে দিন কাটাতে ভারী চমৎকার লাগতো। তাছাড়া মেরী আর ডগলাস তো নেই, গেছে ইওরোপ বেড়াতে! আমারও ছুটির দিনগুলো ফাঁকা। কি আর করা— সান্তা মনিকাতেই যাই।

একদিন সকালবেলা। মেরিয়ন লিখেছে এক চিত্রনাট্য। আমাকে শোনালো। তারপর বললো, বলুন কেমন হয়েছে। বললাম, ভালোই। তবে একটু মেয়েলী ভাব বেশি। গল্পেও মেয়েটিরই প্রাধান্য। সে তার পছন্দসই মানুষটিকে বেছে নিয়েছে। এবং এক্ষেত্রে মানুষটি নিরুপায়।

কথাটা মোটে মনঃপূত হলো না হার্স্টের। বললেন, এখানেই ভুল। আসলে পুরুষই বেছে নেয় তার মনের মতো মেয়েকে। মেয়ের এক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই থাকে না।

বললাম, সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঠিক নয়ও। এই তো যেমন ধরুন না কেন আপনি। তর্জনী দেখিয়ে বললো আপনাকে—তুমি আমার। ব্যস, আপনি ওর হয়ে গেলেন।

হার্স্ট বললেন, আপনি ভুল বলছেন। আগাগোড়া ভুল।

আমি মাথা নাড়লাম,—ভুল নয়। আসলে এদের ছলাকলা এতো নিপুণ যে আপনি ভুলেও ধরতে পারবেন না পছন্দটা কার। আপনার মনে হবে আপনিই এর হোতা।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলে এক ঘুঁষি। মুখ চোখ লাল। কাঁপছেন। বললেন, আমি ভুল নই। আমি হলপ করে বলতে পারি। আমি যদি সাদা বলি তাহলে সাদাই, কালো হলেও কালো নয়। আমার মুখে মুখে আপনি মোটে তক্কো করবেন না।

আমি তো থ। খুব অপ্রস্তুত লাগছে। খুব অপমানিত। পারছি না বরদাস্ত করতে। দেখি খানসামা এসেছে কফি নিয়ে। বললাম, কফির কাপ রেখে আপনি চট করে কাউকে পাঠিয়ে আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনুন তো। মালপত্র গোছাবার ব্যবস্থা করুন। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবো না।

বলে রাগে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে উঠে নাচঘরে গিয়ে সমানে প্রচণ্ড উত্তেজনায় পায়চারি করতে লাগলাম।

মেরিয়ন এলো একটু পরেই। ভীষণ উদ্বেগময় চোখ। বললো, কি ব্যাপার চার্লি, কি হয়েছে?

বললাম, দেখো, আজ অব্দি কেউ কখনো কোন অবস্থাতে আমার সঙ্গে গলা তুলে কথা বলতে সাহস পায় না। আর ঐরকম অভদ্র ভাবে। কি ভাবেন তিনি নিজেকে? নেপোলিয়ন? নাকি স্পেনের নিয়ো?

গলা কাঁপছে আমার। জড়িয়ে যাচ্ছে। কাঁপছে সারা শরীর। কি করবো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

মেরিয়ন একটিও কথা না বলে যেমন ঢুকেছিল ঘরে, বেরিয়ে গেল।

একটু পরে দেখি খোদ কর্তা হাজির। একটু আগের রাগ, কি চোখ রাঙানি—কোথায় সে সব! যেন সদাশিব মানুষটি, কিছুই জানেন না কিছুই বোঝেন না। বললেন, কি ব্যাপার, আপনি এখানে কেন?

—শুনুন আমাকে কেউ চোখ রাঙাবে ধমকাবে আমি পছন্দ করি না। বিশেষ করে অতিথি হিসেবে আমি যখন এখানে রয়েছি। ঢের হয়েছে। এই আমার শেষ। আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাবো।

চুপ করে রইলেন একটু কাল। আমারই চোখে চোখ। কি যেন খুঁজলেন আতিপাতি। বললেন, একটু সবুর করুন। এখনই সিদ্ধান্ত নেবার মতো কিছু হয় নি। চলুন দুদণ্ড বসে কোথাও একটু আলোচনা করা যাক।

গেলাম তখন পেছন পেছন। হলঘরে একটা ঝোলানো দোলনা। তাতে বসতে পারে মোটে দুজন। সে-ও যদি প্রমাণ চেহারায় হয়। হার্স্ট তো বিশাল দশাসই মানুষ। ছ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। সেই রকমই মস্ত বপু। বসলেন আগে দোলনায়, আমাকে পাশে বসতে ইশারা করলেন। বসলাম। সে একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থা। পারছি না নড়াচড়া করতে। শুধু পায়ের ঠেলায় দোলনাটা যা পারি দোলাতে। বললেন, দেখুন সত্যি বলতে কি মেরিয়নকে আমি মানা করেছিলুম যেন লেখে না ঐ সব হাবিজাবি। কি লাভ! আপনার মতামতে যেহেতু খুব আস্থা তাই আপনাকে শুনিয়েছে। আপনি তো শোনামাত্র প্রশংসা শুরু করে দিলেন। তা আপনিই বলুন! আমার লাগে না সম্ভ্রমে? নিজেকে ছোট মনে হয় না! আসলে রাগটা তো আমার নিজের ওপর।

আর কি। এরপর কি আর কোন কথা থাকতে পারে। বরং নিজেরই তখন ভারী লজ্জা লাগছে। ছি ছি, কি বলতে কি না কি বলে বসলাম। ক্ষমা চাইলাম তখন। নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। খুব একচোট হাত মেলানোর ঘটা হলো। যাকে বলে উষ্ণ করমর্দন। এবার উঠতে হয়। দুজনেই একসঙ্গে চেষ্টা করি উঠতে। পারি না। আটকে গেছি দুজনেই। জায়গা যে ছোট। শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর কি যেন খট্ করে আওয়াজ হলো। নির্ঘাৎ ভাঙলো কোন কিছু। তখন যে যার নিরাপদে মুক্ত হলাম।

আসলে ব্যাপারটা মিটমাটের পেছনে মেরিয়নেরই কারচুপি। আমার কাছ থেকে সব শুনে সিধে গেছে হার্স্টের কাছে। তীব্র ভাষায় জানিনা কি না কি বলেছে।

ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছে। তারপর এসেছেন হার্স্ট। তারপর তো শুনলেনই আপনারা—যে কে সেই। জলে জল আর মাছে মাছ। সব আবার আগের মতো শান্ত।

আসলে মানুষটাই এই। রাগলে উগ্রচণ্ডী। রাগ পড়ে গেলে যেন এককুচি বরফ। এই মেজাজ আছে বলেই না উইলিয়াম র‍্যানডলফ্ হার্স্ট!

আর পাশাপাশি আমাদের মেরিয়ন। সদা উৎফুল্ল, উচ্ছল, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর, যেন জীবনের একফালি জ্বলন্ত উদাহরণ। হার্স্ট নিউইয়র্কে গেলেই ডাক পড়তো আমাদের। তখন বেভারলি হিলসের ভাড়া বাড়িতে থাকে মেরিয়ন, সান্তা মনিকার প্রাসাদ তখনো তৈরী হয় নি। সে সব আশ্চর্য দিন। এক একদিন এক একজনের বাড়িতে ভোজের আসর। আর হৈহৈ হুল্লোড়, নাচগান। মাঝে মাঝে বাস ভাড়া করে বেরিয়ে পড়তাম দল বেঁধে। সঙ্গে থাকতো ভাড়া করা বাজনদারের দল। যেতাম হয়তো মালিবুতে। ধু ধু করে শুধু বালি আর বালি, সামনে অনন্ত সমুদ্র। কাঠকুঠো জড় করে জ্বালাতাম আগুন, বসতাম চারপাশে গোল হয়ে। তারপর তো গান আর নাচ আর বাজনা আর হৈ হৈ। চড়ুইভাতির মতো রান্নাও কিছু না কিছু হতো। মিলে মিশে সবাই বসে খেতাম।

লুয়েলা পার্সন্‌সও সঙ্গী হতো আমাদের এই সব হৈ-হুল্লোড়ের আসরে। হার্স্টের কাগজের সাংবাদিক। সঙ্গে থাকতো হ্যারি ক্রকার। হ্যারিকে পরে আমি আমার ছবিতে সহ পরিচালক হিসেবে নিয়ে নিই। বাড়ি ফিরতে ফিরতে তো সেই রাত কাবার—ভোর তখন চারটে বা পাঁচটে—মেরিয়ন খুনসুটি করতো লুয়েলার সঙ্গে। বলতো, দেখো বাপু, হার্স্ট যেন ভুলেও না জানতে পারে। জানলে তোমারই চাকরী কিন্তু পয়লা খতম। আমার আর কি! আমাকে তো আর ছাড়তে পারবে না! তা লুয়েলা যথারীতি মুখে কুলুপ এঁটেই থাকতো।

একদিনের কথা মনে আছে। মেরিয়নের বাড়িতে নৈশভোজ। আমরা খাবার টেবিলে বসেছি সবে, অমনি ঝনঝন করে বেজে উঠলো টেলিফোন। মেরিয়ন গেলো ধরতে। একটু পরে ফিরে এলো যখন, চোখ মুখের সে যা অবস্থা। রাগে যেন গনগনে লাল। বললো, কতবড় অপমানের কথা, কর্তা ফোন করেছিল নিউইয়র্ক থেকে। বললো আমার ওপর নজর রাখার জন্যে নাকি লোক লাগিয়ে রেখে গেছে!

বিশদ বিবরণ মেরিয়নের মুখেই শুনলাম। ফোনে গড়গড় করে পড়ে শুনিয়েছেন এক গোয়েন্দার রিপোর্ট। তাতে নাকি আছে, ভোর চারটের সময় গোয়েন্দাপ্রবর মেরিয়নকে একজনের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছে, তারপর পাঁচটার সময় আরেক বাড়ি থেকে। এবং এইভাবে প্রায় গোটা দিনেরই নানান হিসেব তাতে আছে। ফোনে নাকি বলেছেন হার্স্ট, লস এঞ্জেলেসে তিনি যত শিগ্‌গির সম্ভব ফিরে আসছেন এর

হেস্তনেস্ত করতে। অর্থাৎ সরল ভাষায় মেরিয়নের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছেদ। চরম একটা বোঝাপড়া না করা অব্দি নাকি তার মোটে শান্তি হচ্ছে না।

আর মেরিয়ন? সে-ও বেপরোয়া। হোক একটা হেস্তনেস্ত, তাই সে চায়। ভেবেছে কি হার্স্ট! কি না কি এক রিপোর্ট, তারই ভিত্তিতে বোঝাপড়া! কি এমন অন্যায় সে করেছে! যাবে না বন্ধুর বাড়ি? ডাকবে না তাদের নিজের বাসায়? এটুকু স্বাধীনতা যদি না থাকে তবে কিসের জীবন? কিসের সম্পর্ক? যাক সব চুকেবুকে। তাতে এতোটুকু দুঃখ নেই।

এই সময় হঠাৎ কানসাস সিটি থেকে এক টেলিগ্রাম। হার্স্টের। নাকি রওনা হয়েছিলেন। ফিরে যাচ্ছেন ফের।—পারলাম না যেতে। দুঃখিত। যাচাই করার বোঝাপড়া করার তেমন উৎসাহ আর পাচ্ছি না। সুখের স্মৃতিঘেরা দিনগুলোকে চাই না মিথ্যে সন্দেহের ধোঁয়ায় বিষাক্ত করতে। নিউইয়র্কের কাজ চুকিয়ে তারপর ফিরবো।

সবে পড়া শেষ হয়েছে কি হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানা। এতে দু ছত্র মোটে লেখা।—না, নিউইয়র্কে যাওয়া আর হয়ে উঠলো না। আমি লস এঞ্জেলেসেই যাচ্ছি।

সে এক সাংঘাতিক পরিস্থিতি। দম ধরা ভাব। তটস্থ হয়ে আছি আমরা সবাই। এলেন। ফের প্রতীক্ষা। মেরিয়নের সঙ্গে একান্তে কি যেন কথা হলো। নিভৃত আলাপ যাকে বলে। বেরিয়ে এলো দুজনেই। দেখি মুখে হাসি। আমাদেরও ঘাম দিয়ে ছাড়লো জ্বর। কাটলো তবে মেঘ! সেদিনই আরো বড় করে আরো নানান বন্ধু বান্ধব ডেকে বিশাল এক ভোজ। সে প্রায় একশো ষাট জনের মতো নিমন্ত্রিত। ভাড়া নিতে হলো আলাদা একটা বাড়ি। এতো লোককে এক সঙ্গে বসতে দেবে এমন বাড়িতে কি থাকে তখন মেরিয়ন! ভোজের টেবিলে এসে বসলো যখন, দেখি হাতে সদ্য কেনা একটা হীরের আংটি—দাম মোটে পঁচাত্তর হাজার ডলার। এটা সঙ্গে করেই নাকি নিয়ে এসেছিলেন হার্স্ট। সব আবার যা যা ঠিক আগের মতো।

মাঝে মাঝে এরই মধ্যে বদল চাইতো মন। সেই একঘেঁয়ে স্থান সিমেনন নয়তো মেরিয়নের সান্তা মনিকার বাড়ি। প্রায় ফি হপ্তায় ভোজসভা আর ভোজসভা। ভালো কি লাগে! মন কি সায় দেয়! মনের কথা হয়তো কখনো প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভাষায়। অমনি সাজো সাজো রব। জলে ভাসালো হার্স্টের মস্ত শাম্পান। বাছাই বাছাই তাতে অতিথি। যাবো হয় ক্যাটালিনা নয়তো সান দিয়েগো। সে আরো দক্ষিণে। তা এরকমই এক জলযাত্রায় টমাস ইনস্ পড়লো অসুস্থ হয়ে। হার্স্টের কসমোপলিটন ফিল্ম প্রোডাকসন্স কোম্পানীর তখন সে-ই মালিক। তার হাতেই সব দায় দায়িত্ব। গেছে সবাই সান দিয়েগোয়। আমি শুধু বাদ। যেতে পারিনি সঙ্গে।

এলিনর গ্লিন গিয়েছিল। তার মুখেই শুনলাম পরে। সে নাকি হঠাৎই ভীষণ অবস্থা। হৈ হুল্লোড়ে মেতে ছিল বেশ, হঠাৎ খেতে বসে ইন্‌সের পেটে ব্যথা। খাওয়া ফেলেই উঠে পড়তে হলো। সবাই বললো বদহজম। কিন্তু ব্যথা উত্তরোত্তর বাড়ে। তখন তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তার বললো হৃদরোগ। সাময়িক সুস্থ হয়ে ফিরে এলো বেভারলি হিলসের বাড়িতে। তিন হপ্তা পরে শুনি ফের ব্যথা, ফের ধাক্কা বুকে। ব্যস, তাতেই মৃত্যু।

আর অমনি কী গুজব আর কী কথা! তার যেন অন্ত নেই। কেউ বললো গুলি করা হয়েছে ইন্‌সের বুক লক্ষ্য করে, সেটা নাকি হার্স্টেরই কাজ। একেবারে মিথ্যে। আমি হলফ করে বলতে পারি। কেননা আমি হার্স্ট আর মেরিয়ন মরবার দু হপ্তা আগে ইন্‌সকে দেখতে গিয়েছিলাম তার বাড়িতে। দেখে সে কী আনন্দ! কথা বললো কতো! বললো, ভালো হয়ে উঠবে শিগগির, আবার আমাদের সঙ্গে হৈ হুল্লোড় জুড়বে। গুলি করলে কি আততায়ীকে দেখে মানুষের এতো আনন্দ হয়!

ইনস্‌ মারা যেতে ক্ষতি হলো সবচেয়ে বেশি কসমোপলিটন কোম্পানীর। গেলো তখন ওয়ার্নার ব্রাদার্সের হাতে। দু বছর পরে সেখান থেকে ফের এম. জি.এমের হাতে। এম.. জি. এম স্টুডিওতে মেরিয়নের জন্য হার্স্ট বানিয়ে দিলেন বিশাল এক সাজঘর।

এই ঘরে বসেই হার্স্ট চালাতেন তার সংবাদপত্রের ব্যবসা। লেনদেন হতেও দেখেছি। প্রায়ই দেখতাম বাইরের ঘরে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন, চারপাশ ঘিরে প্রায় জনা বিশ পঁচিশ কাগজের লোক। সে একেবারে রীতিমতো ভিড় আর কি। আর খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে কী নজর মানুষটার! বলতেন, একি এই টাইপটা এরকম বিশ্রী দিলেন কেন? বা,—না না, এ খবর এইভাবে লেখা ঠিক হয় নি! কিংবা,— বিজ্ঞাপন এ সংখ্যায় কিন্তু খুব কম। হালকা লাগছে কাগজ। এটা ঠিক না। রে লংকে এক্ষুনি তার করে দিন যেন আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। এমন সময় সহসা হয়তো মেরিয়নের আবির্ভাব। সেজেগুজে যেন ফুরফুরে পরীটি। মেঝেয় ছড়ানো সার সার কাগজ, অকাতরে তারই ওপর দিয়ে হেঁটে এলো। একেবারে হার্স্টের সামনে। বলতে, কি ব্যাপার তোমার বলো তো। ভেবেছো কি তুমি? আমার সাজঘর কি তোমার কাগজের অফিস। এক্ষুনি সব সরিয়ে নিতে বলো। আমার গা ঘিন ঘিন করছে।

সবচেয়ে মজা হতো মেরিয়নের ছবির শুভমুক্তির দিন। ডাক পড়তো আমার। হার্স্ট আর মেরিয়ন এক সাথে যাবে ছবি দেখতে, আমি যেন সঙ্গ দিই। তিনজনে তো একই গাড়িতে চেপে রওনা দিতাম। বেশ খানিকটা গিয়ে আর হয়তো একটুখানি

দূর প্রেক্ষাগৃহ, গাড়ি থামিয়ে হার্স্ট নেমে পড়তেন। বলতেন, এটুকু পথ আমি হেঁটেই যাবো, তোমরা যাও। ভয় যে মনে খুব। পাছে কেউ দুজনকে একসঙ্গে দেখে ফেলে! তাই নিয়ে তাহলে পরে কথা উঠবে। উঠলেও ঠিক। হার্স্টের 'একজামিনার' আর 'লস এঞ্জেলেস টাইমসের' তো একবার ভীষণ লড়ালড়ি। কেউ কিছু কম যায় না। মূলতঃ রাজনৈতিক লড়াই। তা হার্স্টের সঙ্গে কি আর পারে। পিছিয়ে পড়তে লাগলো টাইমস্। তখন উপায়ান্তর না দেখে মরিয়ার মতো শুরু করলো ব্যক্তিগত কেচ্ছা। কি—না, ঐ যে মেরিয়নের সঙ্গে তোমার অবৈধ সম্পর্ক আছে। সান্তা মনিকায় বানিয়ে রেখেছো মধুকুঞ্জ, একই মানুষের দুটো সত্তা।...হার্স্ট জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, নিজের কাগজে এ নিয়ে একছত্র লিখলেন না অব্দি। পরের দিন চন্তদন্ত হয়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির। বললেন, চার্লি, আমার হয়ে একটা কাজ করবে? মেরিয়নের মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার তো কফিনে কাঁধ দেওয়া উচিত। হবে না যাওয়া। ঠিকও নয়। তুমি বরং আমার প্রতিনিধি হিসেবে আমার কাজটুকু চুকিয়ে এসো।

আমি তাঁর অনুরোধ রেখেছিলাম।

তেত্রিশ সালে হার্স্ট গেলেন ইওরোপ ভ্রমণে, আমাকেও বললেন সঙ্গে যেতে। শুধু আমি তো একা নই, বিরাট এক দল। কানার্ড জাহাজের প্রায় একটা অংশ পুরোপুরি ভাড়া নেওয়া হলো। মন চাইলো না যেতে। বিশজনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওঠা বসা, তদুপরি হার্স্টের মর্জিমতো কোথাও হয়তো দুদিন বেশি থাকা, নয়তো কোথাও দুদিন কম থাকা। নিজস্বতা বলে একদম কোন কিছু নেই। যাবো বেড়াতে অথচ নিজের ইচ্ছের ওপর নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না এ কি হয়! তাই, না করে দিলাম।

তাছাড়া অভিজ্ঞতা আছে আমার একই সাথে মেক্সিকো ভ্রমণের। তখন আমার স্ত্রী আবার সন্তানসম্ভবা। দ্বিতীয় পক্ষের। দশ খানা গাড়ি নিয়ে সে এক রীতিমতো শোভাযাত্রা যেন। চলছে সার বেঁধে পিলপিলিয়ে পিঁপড়ের মতো একের পেছনে আরেকজন। মেরিয়ন আর হার্স্ট উঠেছে একখানা গাড়িতে, আমি আমার স্ত্রী আরেকখানায়। রাস্তায় খানাখন্দ অঢেল। যেহেতু হার্স্ট চলেছেন আগে আগে ঝাঁকুনি খাচ্ছেন, লাফিয়ে উঠছেন কখনো আসন থেকে—আমাদেরও ঐ পথ দিয়েই যেতে হবে। এটা নিয়ম। এক একটা ঝাঁকুনি খাই আর বেদম গালাগালি দিই হার্স্টকে। রাস্তা ক্রমশঃ এতোই খারাপ হতে লাগলো, গাড়ি থামিয়ে সেদিকে আর না গিয়ে ঢুকলাম দল বেঁধে পথের ধারে এক খামার বাড়িতে। বিশ জনের জন্য মাত্র দুখানা তাতে ঘর। তার আবার একটা পেলাম আমি, আমার স্ত্রী আর এলিনর গ্লিন।

টেবিলে চেয়ারে শুয়ে বসেও অনেককে ঘুমুতে বা ঝিমোতে হলো। কজন গেলো রান্নাঘরে, একজন আর দিগ্বিদিক মালুম না পেয়ে সিধে মুরগীর খাঁচার চালে। এদিকে আমাদের ঘরে একটা মোটে বিছানা, তাতে আমার স্ত্রী শুয়ে, আমি দুটো চেয়ার জোড়া দিয়ে আয়েস করে একটু বসলাম। এলিনর শুলো ভাঙা একটা সোফায়। তা ঘুম কি আর আসে। ঝিমুনির ভাব কেটে যেতে পুরোপুরি জাগা তখন, হঠাৎ চেয়ে দেখি দিব্যি ঘুম লাগিয়েছে এলিনর। সাজতে পারে তো খুব মেয়েটা। দারুণ সে সব পোশাক। একদিকে কাত হয়েই শুয়ে রইলো। ভোরে উঠলো যখন ঘুম থেকে, কে বলবে এই মেয়ে ঘুমিয়ে ছিলো এতোক্ষণ। জামার ভাঁজ একটুও ভাঙে নি, মোছে নি এতোটুকু মেকাপ, চুল সেই নিখুঁত করে আঁচড়ানো। যেন বলামাত্র এক্ষুনি চলে যেতে পারে প্লাজায়, দিব্যি খেয়ে দেয়ে আবার ফিরে আসতে পারে।

ইওরোপ যাত্রায় হার্স্টের সঙ্গী হিসেবে গেলো হ্যারি ক্রকার, আমার প্রাক্তন সহ পরিচালক। সিনেমার কাজ ছেড়ে এখন সে হার্স্টের একান্ত সচিব। যাবার আগে এলো আমার কাছে স্যর ফিলিপ সাসুনকে উদ্দেশ্য করে একখানা চিঠি লিখিয়ে নিতে। হার্স্ট দেখা করতে যাবেন। দিলাম।

তা খুব নাকি খাতির করেছিলেন স্যর ফিলিপ। হার্স্ট যদিও ইংরেজ বিদ্বেষী এবং সেটা স্যর ফিলিপ যদিও ভালো করেই জানতেন, বুঝতে দেন নি নিজের আচার আচরণে। প্রিন্স অফ ওয়েলসের সঙ্গে দেখা করাতেও একদিন নিয়ে যান। ঝাড়া দুটি ঘণ্টা দুজনে মুখোমুখি বসে একান্তে নিভৃতে কত কথা, কত আলোচনা। প্রিন্স নাকি মুখের ওপরই জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইংরেজদের ওপর আপনার এতো রাগ কিসের? জবাব কি দিয়েছিলেন হার্স্ট জানিনা। তবে শুনেছি আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই হয়েছে।

বুঝি না, কেন মানুষটা এমন ইংরেজ-বিদ্বেষী। ইংল্যাণ্ডে এদিকে নিজের বিরাট সম্পত্তি, তার আয় ভালো, বছরে বছরে লাভের বিশাল অঙ্ক আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে জার্মানীর সঙ্গে কিন্তু খুব দহরম মহরম। জার্মানী থেকে কাউন্ট বার্নস্টর্ফ যখন এলেন রাষ্ট্রদূত হয়ে, তখন সে যা খাতিরের চোট, তাই নিয়ে তো পরে কত কেচ্ছা ছড়ালো। শত চেষ্টা করেও হার্স্ট পারেন নি সে সব ধামা চাপা দিতে। কাগজেও দেখেছি এই খাতিরের প্রমাণ। হার্স্টের পত্রিকা গোষ্ঠীর বহির্বিষয়ক সংবাদ-দাতা কার্ল ভন ভাইগাণ্ড কলম ধরলেই জার্মানীর প্রশংসা করে একটা না একটা কিছু লিখতো। এমনকি জার্মানী যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেটাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে স্বাগত জানাতো।

সেবারই ইওরোপ বেড়াতে গিয়ে হার্স্ট জার্মানীতে যান হিটলারের সঙ্গে দেখা

করতে। হিটলারের সংশোধনী ক্যাম্পের কথা তখন তেমন কেউ একটা জানতো না। এই নিয়ে প্রথম কাগজে লেখা শুরু করে আমার বন্ধু কর্নেলিয়াস ভ্যাণ্ডারবিল্ট। কিভাবে জানিনা ঢুকে পড়েছিলো কোন একটা ক্যাম্পে, সেখানে নাৎসী বাহিনীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে তারই ওপর লিখতে শুরু করে। সে এতো মর্মান্তিক এতো নৃশংস, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এক একটা লেখা পড়ে আমরা শিউরে উঠতাম।

একগাদা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলো ভ্যাণ্ডারবিল্ট। তাতে হিটলারের নানান ভঙ্গিতে বক্তৃতা দানের ছবি। মুখখানা দেখলেই হাসি পায়। যেন হুবহু আমারই নকল। ঠিক আমারই মতো গোঁফ, খাড়া চুল আর সরু চাপা মুখ। মানুষটা দেখতে বড় কুৎসিৎ। হিটলারকে কোনদিনই আমি একজন রাশভারি রাষ্ট্রনায়ক বলে ভাবতে পারিনি। লাগতো যেন সার্কাসের ক্লাউন। সেই রূপটাই মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছিল। আর সে যা ভঙ্গিরে বাপু! একটা ছবিতে হাত দুটো ঠিক থাবার মতো উর্ধ্বে তোলা। যেন এক্ষুনি সামনের লোকজনদের ঘাড়ে খপ করে বসিয়ে তুলে আনবে একদলা মাংস। আরেকটায় একহাত ওপরে, একটা নীচে। যেন বল করতে চলেছে কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়। আরেকটা ছবিতে দুটো হাতই মুঠো করে সামনে তুলে রাখা। যেন মুগুর নিয়ে ব্যায়াম করছে। একটা ছবি স্যালুটের কায়দায়। কাঁধের ওপর হাত, সেটা চিৎ, ছবিটা দেখলেই সারা শরীর আমার নিশপিশিয়ে উঠতো। মন চাইতো দিই এখুনি হাতের ওপর কালিঝুলি মাখা একটা থালা বসিয়ে। তাহলে মানাবে ভালো। মোটমাট মানুষটাকে ঘিরে এমনই সব আমার চিন্তা। হাল্কা ভাব। অবিশ্যি চিন্তা অচিরেই পালটাতে হলো। আইনস্টাইন আর টমাস মানকে বাধ্য করলো যখন জার্মানী ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসতে, তখন দেখলাম লোকটার ছবিতে রগড় আর একটুও নেই। যা আছে তার নাম হিংস্রতা, তার নাম শয়তানী এবং তারই নাম পাশবিকতা।

আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার ১৯২৬ সালে। তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে। তা সেই যে একটা নিজস্ব চিন্তা আছে আমার—বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিকেরা বাস্তবিক পক্ষে রোম্যান্টিক, মনের গহনে লুকিয়ে থাকে তাদের রোম্যান্টিকতা, তাকেই রূপ দেন ভিন্ন পথে—দেখি আইনস্টাইনের সঙ্গে একেবারে হুবহু সেই চিন্তার মিল। দেখতে তো মানুষটা অপূর্ব সুন্দর, তার ওপর হাসিখুশী আর মিশুকে। সময় লাগে না বেশি কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে। এমনিতে কিন্তু ভারী শান্ত ভারী চুপচাপ। আসলে আড়ালে যে লুকিয়ে আছে দারুণ এক আবেগ। যতো বুদ্ধি, বুদ্ধির যতো ধার সবেরই তো উৎস সেই আবেগ।

তা ইউনিভার্সাল স্টুডিওর কার্ল লেমেল আমাকে ফোন করে জানালো, আইনস্টাইন নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। শুনে বলবো কি সে যা উত্তেজনা আমার! তড়িঘড়ি ছুটলাম। স্টুডিওতে দুপুরের ভোজের আয়োজন। উপস্থিত আমরা মোট ছজন। আমি বাদে আইনস্টাইন, তাঁর স্ত্রী, তাঁর সচিব হেলেন ডুকাস, অধ্যাপক ওয়াল্টার মেয়ার—তাঁর সহকারী আর লেমেল, ব্যস আর কেউ নেই। দেখছিলাম অবাক চোখে স্বামী স্ত্রী দুজনকেই। স্ত্রীর মুখ চৌকোটে, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর: স্পষ্ট বললেন, অমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রী হতে পেরে তিনি যৎপরোনাস্তি গর্বিত। ইংরাজী ভারী চমৎকার বলেন মহিলা। অন্ততঃ স্বামীর চেয়ে ঢের গুণ ভালো।

খাওয়া দাওয়ার পর সদলবলে লেমেল বেরুলো ঘুরে ঘুরে স্টুডিও দেখাতে, গিন্নী আমাকে একধারে ডেকে নিয়ে বললেন, তা আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। কর্তাকে নেমন্তন্ন করুন না একবার বাড়িতে। দেখবেন খুব খুশী হবেন। আড্ডার সুযোগ পেলে একেবারে এক পায়ে খাড়া। তো করলাম নেমন্তন্ন। আমার পরম সৌভাগ্য যাকে বলে। বেশি লোকজনকে জানালুম না! শুধু দুজনকে বললাম হাজির থাকতে। অর্থাৎ মোট আমরা পাঁচজন, এবং বলাবাহুল্য উপলক্ষ্য নৈশভোজ।

খেতে খেতে সে নানান গল্প। গিন্নী শোনালেন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের সেই কালজয়ী কাহিনী।

বললেন, তা সকালে তো ঘুম থেকে উঠে নীচে নেমেছেন, পরনে শোবার পোশাক, আমি জলখাবার দিলাম। বসে রইলেন হাত গুটিয়ে। ছুঁলেনও না। আমি বললাম, কি হয়েছে তোমার, খাবার খাচ্ছো না কেন? বললেন, দারুণ একটা ব্যাপার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। খাবারে মন বসাতে পারছি না। বলে শুধু কফিটুকু খেলেন। তারপর সেখান থেকে সোজা পিয়ানোর টেবিল। বাজাতে বসলেন। পাশে তো খাতা আর কলম খোলা। বাজান খানিকটা, থামেন, কি না কি লেখেন একটু, আবার বাজান। আর মাঝে মাঝেই বলতে শুনি,— ওঃ! দারুণ একটা ব্যাপার, দারুণ!

তখন আমার ধৈর্য্যটৈর্য্য সব শেষ। বললাম, তখন থেকে বলছো দারুণ, দারুণ— তো কি সেটা আমাকে বলো।

বললেন, ভীষণ কঠিন। খুব। এখনই তোমাকে বলা যাবে না। আগে আমি হিসেবটিসেব কষে বের করে নিই।

বলেই ফের বাজনা। ফের থেমে খাতায় কি সব লেখা। সেইভাবে চললো আধ-ঘন্টাটাক। তারপর পিয়ানোর টেবিল ছেড়ে উঠে সিধে চলে গেলেন দোতলায় নিজের পড়ার ঘরে। শুধু যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন, যেন বিরক্ত না করি। আর সেই ঘরেই রইলেন নাগাড়ে দু হপ্তা। খাবার পাঠিয়ে দিতাম আমি ওপরে। সারাদিন

আর উঠতেন না। শুধু বিকেলে একবার। উঠে ঘরের মধ্যেই একটু পায়চারি করতেন। তারপর আবার বসতেন গিয়ে লেখার টেবিলে।

দু হপ্তা পর নামলেন যখন, হাতে দু খানা মাত্র কাগজ। আর ভারী ক্লান্ত দেখতে। কদিনে যেন শরীরের সব রক্ত শুষে গিয়েছে। বললেন, এই নাও। এটা রাখো। নিলাম হাতে। দেখি ওপরে লেখা—আপেক্ষিকতার সূত্র।

ডঃ রেনোল্ডস্ সেদিনের নিমন্ত্রিত অতিথিদের একজন। আমি বিশেষ করে আসতে বলেছিলাম, কেননা পদার্থবিদ্যায় রেনোল্ডসের যথেষ্ট পড়াশুনো আছে। আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করলো, ডিউনের 'সময় নিয়ে চর্চা' বইখানি পড়েছেন কিনা।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, পড়েন নি। বললো, ভারী একটা অদ্ভুত তত্ত্ব কিন্তু হাজির করেছে ডিউন। এই যে আয়তন, অর্থাৎ কোন একটা কিছুর মাপ, সেই ব্যাপারেই খানিকটা এগিয়ে।

আমার দিকে দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকালেন আইনস্টাইন, বললেন, এগিয়ে মাপ? সেটা আবার কি বস্তু?

ফলতঃ সে প্রসঙ্গ বাদ। আর কি রেনোল্ডস সাহস পায়। বললো, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

বললেন, না, ভূত আমি দেখিনি। তবে একডজন লোক যদি এই ব্যাপারে একই রকম সাক্ষ্য প্রমাণ আমার কাছে হাজির করতে পারে, তাহলে তখন বিশ্বাস করবো।

এদিকে আধিভৌতিক ব্যাপার স্যাপার নিয়ে হলিউড তখন সরগরম। বিশেষ করে বড় বড় অভিনেতার বাড়ি। সেখানে বসে ভূত বিশেষজ্ঞদের সভা। তাতে নানান রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটিয়ে দেখানো হয়। আত্মাকে ডেকে আনার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। আমার দুর্ভাগ্য আমি কোনদিন এমন কোন আসরে হাজির থাকতে পারি নি। ফ্যানি প্রাইস নাকি একটাতে ছিল। সে নিজের চোখে দেখেছে, একটা টেবিল নাকি আস্তে আস্তে মাটি থেকে উঠে শূন্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তাজ্জব কাণ্ড! আইনস্টাইনকে জিজ্ঞেস করলাম, ভূত নামাবার কোন আসরে কোনদিন হাজির থেকেছেন কিনা। বললেন, না। আমি আর সে ব্যাপার নিয়ে না ঘাঁটিয়ে বললাম, নিউটনের তত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদের কোন যোগাযোগ আছে কিনা।

বললেন, হ্যাঁ। এটা তারই সংযোজন মাত্র।

গিন্নীকে বললাম, শিগগীরই ইউরোপ বেড়াতে যাবার ইচ্ছা আছে। সুযোগ সুবিধে পেলেই বেরিয়ে পড়বো।

বললেন, তবে তো ভালোই। সিধে বার্লিনে চলে আসুন, আমাদের ওখানেই উঠবেন। বাড়ি ঘর কিন্তু খুবই সাধারণ, আগে থেকে বলে রাখছি। আর হবে না—

হুঁশ থাকলে তো। কি যে এক অদ্ভুত মানুষ। বলে বলে আমি হয়রান হয়ে গেছি। রকফেলার ফাউণ্ডেশান থেকে দশ লাখ ডলারের বৃত্তি নিজের নামে জমা হয়ে আছে। আজ অব্দি এক আধলাও তা থেকে খরচ করার নাম নেই।

এতোটুকু বাড়িয়ে বলেন নি মিসেস আইনস্টাইন। বার্লিনে গিয়ে একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। অতি সাধারণ ফ্ল্যাট, তাতে আড়াইখানা মাত্র ঘর। বাইরের ঘরের একধারে খাবার টেবিল পাতা। অর্থাৎ একই সঙ্গে সেটা বাইরের ঘর আবার খাবার ঘর। মেঝের কার্পেটেরও জরাজীর্ণ হাল। আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। শুধু মস্ত একটা পিয়ানো। ঘরের সবচেয়ে দামী জিনিস বলতে ঐটাই। ঐ পিয়ানো বাজাতে বাজাতেই সৃষ্টি হয়েছিল আপেক্ষিকতা সূত্রের প্রথম খসড়া। তারপর বাজনা ছেড়ে সটান গিয়ে উঠেছিলেন দেড় তলার পড়ার ঘরে। সেখানে টানা দু হপ্তা হিসেব আর পুঁথিপত্রের আড়ালে ডুব। মাঝে মাঝেই মনে পড়ে সেই পিয়ানোর কথা। আছে কি এখনো? আইনস্টাইনের স্মৃতি হিসেবে কি মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে? না কি নাৎসী বাহিনী ভেঙেচুরে কাঠ দিয়ে আগুন জালিয়ে যুদ্ধের সময় আগুন পুইয়েছে?

সে এক বিভীষিকার যুগ। সারা জার্মানীর বুকে নেমে এসেছে সন্ত্রাস। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে উন্মাদের মতো নাৎসী বাহিনী। আইনস্টাইন সপরিবারে চলে এলেন আমেরিকায়। যেন অকূল পাথার। টাকা পয়সার হিসেব তো মোটে বোঝেন না। গৃহিণী পরে গল্প করেছেন আমার কাছে। নাকি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে কত কি সম্মানী বেতন হলে পোষায় এই সব জানতে চেয়ে চিঠি লিখলো। জবাবে এমন এক বেতন চেয়ে পাঠালেন দেখে তো খোদ কর্তৃপক্ষেরই চোখ ছানাবড়া। তারা তখন লিখলো, এতো কম টাকায় আমেরিকার মতো জায়গায় তিনি কুলিয়ে উঠতে পারবেন না এবং এই বিবেচনায় তারাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার তিনগুণ টাকা দেবে বলে সম্মতি জানিয়ে যোগদান করতে অনুরোধ করলো।

সাঁইত্রিশ সালে সপরিবারে এলেন ফের ক্যালিফোর্নিয়ায়, তখন আবার আমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে যে কী সম্মান, কী আদর! বললেন, তিন বাজনদার সঙ্গে নিয়ে এসেছি, খাওয়া দাওয়ার পর আপনাকে দারুণ বাজনা শোনাবো। সে এক এলাহী ব্যাপার। খোদ আইনস্টাইন বাজাচ্ছেন মোৎজার্টের সুর, চোখ দুটি বোজা, যেন ভাবের রাজ্যে উধাও হয়ে গেছে বর্তমান। আর দুলছেন তালে তালে—যদিও তালিম তেমন নেই, সাবলীলতা কম, তবু অনবদ্য, অপূর্ব সেই সন্ধ্যা। আমার চিরদিন মনে থাকবে। অনেকক্ষণ পরে সঙ্গীরা তাঁকে থামালো। তিনি বসলেন এসে আমার পাশে। শুরু হলো ওস্তাদ হাতের বাজনা। সেও অপূর্ব।

আমি হেন আমি—আমারও যেন অস্তিত্ব সুরের দোলায় গেছে লয় হয়ে। আর সে কী উদখুর্ষ্যান তাঁর। আর পারছেন না ধৈর্য্য ধরতে। আমার কানে কানে এরই ফাঁকে একবার ফিসফিস করে বললেন, আমি কিন্তু আর একবার বাজাবো। হলো না আর সে যাত্রা। তিনজন নিয়ে নিয়েছে অনেক সময়। তারপর আর নতুন করে বাজনা শুরু করার পরিবেশ নেই। গৃহিণী দেখলাম তাতে ভারী অসন্তুষ্ট। স্বামীকে বললেন, এ আর এমন আহামরি কি! তুমি এদের চেয়ে বরং ঢের ঢের ভালো বাজিয়েছো।

কদিন বাদেই আমার বাড়িতে নৈশভোজের নেমন্তন্ন। সে বেশ জমজমাট আসর। মেরী পিকফোর্ড, ডগলাস, মেরিয়ন ডেভিস, হার্স্ট আরো বেশ কজন হাজির। মেরিয়ন বসেছে আইনস্টাইনের পাশে, হার্স্টের পাশে মিসেস আইনস্টাইন। শুরু হলো ভোজ। বেশ চলছে কথাবার্তা, হঠাৎ দেখি সব কেমন চুপচাপ। কথা যেন সব শেষ। ভাষা যেন সবারই মুখে ফুরিয়ে গেছে। আমি চেষ্টা করলাম আসর আবার সরগরম করে তুলতে। বৃথা সে চেষ্টা। হার্স্টের মুখে যেন কুলুপ আঁটা। আইনস্টাইনও তাই। শুধু তফাতের মধ্যে তাঁর ঠোঁটের কোণে আলগা হাসির ঝিলিক, আর হার্স্ট গম্ভীর। যেন থম মেরে গেছেন হঠাৎ।

মেরিয়ন যেন আরো এককাঠি ওপরে। বসে আছে এতোক্ষণ মানুষটার পাশে। ডেকে ডেকে কথা বলছে সবার সঙ্গে, হাসছে, শুধু যাবতীয় হিসেব থেকে যেন পাশের মানুষটাই বাদ। যেন খেয়ালই নেই তাঁকে। যেন চেনেও না। অধ্যাপকও চুপ। খাচ্ছেন একমনে। আমি অবাক হয়ে শুধু দেখছি সব কিছু। ভোজ শেষ। উঠবো সবাই এইবার। হঠাৎই যেন মেরিয়নের খেয়াল হলো। বললো, তা আপনার চুল যে খুব বড় বড় হয়েছে। এবার তো না কাটলেই নয়।

হাসছেন অধ্যাপক মিটিমিটি। মুখে জবাব নেই।

আর নয়। এবার উঠে পড়াই উচিত। আমি বললাম, আপনারা পাশের ঘরে চলুন। কফি খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আইজেনস্টাইনের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। রাশিয়ার চিত্র পরিচালক। হলিউডে এসেছিলেন দলবল সমেত। দুজনের কথা আমার মনে আছে। এক—গ্রিগর আলেকজান্দ্রভ, দুই—আইভর মণ্টেগু।

মণ্টেগু তখন ছোকরা। ইংরেজ। আইজেনস্টাইনের বন্ধু। খুব দেখা সাক্ষাৎ হতো তিনজনের সঙ্গে। আমার বাগানে পর পর কদিন টেনিসও খেলেছিলেন। সে অতি জঘন্য। আলেকজান্দ্রভের খেলা সবচেয়ে খারাপ।

প্যারামাউণ্ট কোম্পানীর হয়ে একখানা ছবি করবেন আইজেনস্টাইন। সেই

সূত্রেই এখানে আসা। খুব নাম তখন তাঁর। 'পোটেমকিন' তুলেছেন, তুলেছেন 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনের' মতো বিখ্যাত ছবি। সেই সুবাদেই প্যারামাউন্ট তাঁকে আনিয়েছে। তা শুরু হলো চিত্রনাট্যের কাজ। আইজেনস্টাইন নিজেই লিখলেন। ছবির নাম 'সাত্তার্স গোল্ড'। ক্যালিফোর্নিয়ায় গোড়ার দিকে ইতিহাস বলা যেতে পারে। তাতে রাজনীতির নামগন্ধ নেই। নেই কোন প্রচারের বালাই। তবু ঐ এক ভয়! মানুষটা যে রুশ। আগমনও বিপ্লবোত্তর রাশিয়া থেকে। যদি দর্শক না নেয়। শেষ অব্দি সেই ভয়েই সে ছবি আর হলো না।

একদিন কথায় কথায় সাম্যবাদ নিয়ে আমার সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন আজকের যুগের শিক্ষিত সর্বহারার সঙ্গে পুরনো দিনের ঐতিহ্যবাহী অভিজাত সম্প্রদায়ের মনের পুরোপুরি মিল আছে? প্রশ্ন শুনে খানিকটা অবাক হলেন বোধহয়। নিজেও মানুষটা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকেই এসেছেন। বললেন, শিক্ষিত হলে মনের গঠনটাই পুরোপুরি বদলে যায়। তখন আর মাটি পুরনো থাকে না। তাতে যে কোন গাছ লাগালেই ভালো ফসল মেলে।

আইজেনস্টাইনের 'আইভ্যান দি টেরিব্‌ল্' আমি দেখেছিলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। বলবো কি ঐতিহাসিক ছবি বলতে আমরা যা বুঝি এ যেন তার সীমা ছাড়িয়ে আরো অনেক কিছু। এর ধারে কাছে পৌঁছবার ক্ষমতা অব্দি কারো নেই। যেন কাব্য এর প্রতিটি ছত্রে। ইতিহাস নিয়ে কেউ যখন ছবি তোলে, তাতে মূলের চেয়ে বিকৃতির ভাগটাই থাকে বেশি। দেখে দেখে ইতিহাস সম্বন্ধে একটা অনীহাই জন্মে গিয়েছিল। 'আইভ্যান' দিলো আমার সব কিছু ওলটপালট করে। তাইতো, এভাবেও তো ইতিহাসকে তুলে ধরা যায়! এই আশ্চর্য কবিতার মতো, এইভাবে সত্যকে এতোটুকু বদল না করে! এরই নাম তো শিল্পবোধ। ইতিহাস তো কেবলমাত্র কিছু ঘটনার সন্নিবেশ, আর শিল্প হলো তাকে সাজিয়ে তোলার মধ্যে, তার খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে।

তবেই তাকে বলবো আমরা কবিতা।

২১

তখন আমি নিউইয়র্কে। একদিন এক বন্ধু বললো, ছবিতে শব্দ যোজনার কাজ নাকি ব্যাপক ভাবে শুরু হয়ে গেছে এবং সে নিজে নাকি এরকম একখানা ছবি দেখেও এসেছে। বললো, দেখবেন আমি বলে রাখছি, অচিরেই ছবির দুনিয়ায় শব্দ আনবে এক প্রচণ্ড আলোড়ন।

কথাটা কানে শুনে রাখা, এইটুকুই। এর বেশি আর কিছু মনে রাখবার প্রয়োজন হলো না। বেশ কিছুদিন বাদে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের প্রথম সবাক চিত্র বাজারে বেরুলো। আমি গেলাম দেখতে। রাজা রাণীর গল্প। সাজ পোশাক চমৎকার। অতুলনীয় সুন্দরী: দেখতে একটি মেয়ে, সেই নায়িকা। গোড়ার দিকে নামধাম কিছু তার বোঝার উপায় নেই। কেননা বেশ খানিকক্ষণ নির্বাক ছবিরই মতো। অদ্ভুত লাগছে তার অভিনয়। ঢল ঢল কমনীয় দুটি চোখ। তাতে ফুটে উঠেছে রাগ দুঃখ ঘৃণা অভিমান। অনেকটা শেক্সপীয়রের নাটকের মতো। ভালোই লাগছে দেখতে। হঠাৎই যেন এক বিপর্যয়। সমস্ত নৈঃশব্দ্য ছিন্ন ভিন্ন করে কানের কাছে শাঁখ বাজাবার মতো অদ্ভুত এক আওয়াজ। শুনে আঁৎকে উঠতে হয়। অর্থাৎ শব্দ। ছবির জগতে সেই নতুন আগন্তুক। প্রকাশ পেলো রাজকুমারীর একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে।—না না, আমি গ্রেগরীকেই বিয়ে করবো, তাতে যদি সিংহাসন যায় যাক।

ছন্দ কেটে গেলে ঠিক যেরকম হয়। এতোক্ষণের অবাক করা সেই পরীর মতো মেয়েটি যেন এখন এক ঘোর দর্শনা নারী। দেখতে পালটায় নি এতোটুকু, শুধু আওয়াজে নিজেকে বদলে ফেলেছে। ভালো লাগছে না আর তাকে। মিলছে না কথার সঙ্গে অভিনয়ের রীতি। দুয়ে যেন দুস্তর ব্যবধান। শুধু কথার পর কথা সাজানো। আর কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ। যেমন, দরজার হাতলটা ঘোরানো হলো, শব্দ উঠলো এমন যেন ট্রাক্টর চলেছে পথ দিয়ে। বা দরজা বন্ধ হলো, যেন কাঠের আওয়াজ নয়, মস্ত দুটো মালবাহী গাড়ি মুখোমুখি খেলো ধাক্কা, ভেঙে পড়লো একটা আর একটার ঘাড়ে। সে এক অতিপ্রাকৃত পরিবেশ যেন। নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যাপার নেই। তরোয়ালে তরোয়ালে দুই নাইট করছে যুদ্ধ। লাগছে যেন ইস্পাত কারখানার নানান যন্ত্রের নানান মিশ্রিত আওয়াজ। পরিবারের কজন বসেছে খাবার টেবিলে, মাত্র কিছু বাসনপত্র। আওয়াজ উঠছে যেন ভীষণ ব্যস্ত একটা রেস্তোরাঁ, তার হৈ চৈ, কাপ ডিশ বাসন ধোওয়ার নানারকম শব্দ। কিংবা হয়তো জল ঢালা হচ্ছে গ্লাসে, আওয়াজ

উঠছে মুদারার শেষ সুরটির মতো। আলোড়ন নয়, দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে মনে হলো, শব্দের ব্যাপারটা বেশি দিন বোধহয় ছবির জগতে আয়ু টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

একমাস পরে বাজারে বেরুলো নতুন আরেকটা ছবি—এম. জি. এম কোম্পানীর 'দি ব্রডওয়ে মেলডি।' আগাগোড়া ছবিটাই শব্দের ওপর দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ গানে গানে সুরে সুরে মুখর তার প্রতিটি অংশ। বলবো কি, সে একেবারে ভিড়ে ভিড়। দর্শক নিলো খুব। তাতে প্রথম দিকের দোষ ত্রুটি বেশির ভাগই কাটানো গেছে। তখন শুরু হলো এক নতুন পর্ব। রাতারাতি প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহের সাজ বদল করে শব্দ ধারণ আর প্রক্ষেপণের জন্যে নতুন সাজ সরঞ্জাম বসানো হলো। নির্বাক ছবির সে যেন অস্তাচলের অধ্যায়। হবে না,—সবাক ছবি যে তখন তীরের বেগে এগোতে শুরু করেছে! সে অগ্রগতি রোধে সাধ্য কার। ইতিমধ্যেই জার্মানীর পরিচালক মারনো শব্দের ব্যাপারে দেখিয়েছেন আশ্চর্য কেরামতি। ভারী সফল তার প্রয়াস। আমেরিকার পরিচালকরাও উঠে পড়ে লেগেছে। হয় এসপার না ওসপার। আর পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে নির্বাক ছবি। তার নীরবতা তার নৈঃশব্দের মধ্যে যে একটা সার্বজনিক আবেদন ছিলো, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে নিতান্ত সাধারণ মানুষ সকলেরই কাছে—ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে সেই আবেদন। শেষ মুহূর্তের ঘণ্টাধ্বনি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি!

আর আমি? আমার জেদ চেপে গেছে—সবাক নয়, আমি নির্বাক ছবিই করবো একশোবার। কিসের ভয় আমার! কিসের সংশয়! সবাক ছবি যেমন প্রমোদের উপকরণ, নির্বাকও তো তাই। দর্শক মনে সবাকের স্থান থাকলে নির্বাকের জন্যেও থাকবে। তাছাড়া আমি মানুষটা যতটা না অভিনেতা, তার চেয়ে অনেক বেশি মূকাভিনয় শিল্পী। বলতে গেলে মূকাভিনয়ের জগতে আমি মস্ত এক কেউকেটা সে নিজেও বুঝি আমি, অন্যান্যরাও বোঝেন এবং জানেন। এ নিয়ে অহেতুক বিনয় প্রদর্শনের আমি কোন প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং নির্বাক ছবিই তুলবো আমি। ছবির নাম হবে 'সিটি লাইট্স'।

গল্পের মূল সূত্র সার্কাসের এক ভাঁড়। খেলা দেখাতে গিয়ে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। ছোট্ট মেয়ে আছে বাড়িতে, মা নেই, মেয়ে অসুস্থ। স্বভাবতঃই দুর্বল চিত্ত। নিজের চোখ নয় গেছে। মেয়েকে বাঁচানোটা এখন মূল দরকার। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় ডাক্তাররাও বারবার সাবধান করে দিয়েছেন, যেন ভুলেও টের পায় না মেয়ে বাবা অন্ধ। তবে কিন্তু মনের দিক থেকে সে আরো ভেঙে পড়বে সে অবস্থায় তার জীবন রক্ষা করা মুশকিল হয়ে পড়বে। বাবার তাই প্রাণপণ চেষ্টা

মেয়ের সামনে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার। পারে কি আর সব আগের মতো? হয়তো ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। মেয়ে হেসে ওঠে। ভাবে এটা বাবার এক নতুন রগড়। এই ভাবেই ঘটনা একের পর এক নতুন মোড় নেয়। 'সিটি লাইটসে' এই ভাঁড়কে আমি নায়িকায় রূপান্তরিত করি। সে গরীব। ফুল বেচে তার দিন চলে।

এরই সঙ্গে মিশিয়ে নিই আরেক কাহিনী। অনেকদিন ধরে ঘুরছিল আমার মাথায়। হোমরা চোমরা ধনী মহাজনদের এক ক্লাব। তার দুই সদস্য। বলাবাহুল্য তারাও বিপুল অর্থের মালিক। মানুষের চিত্তের অস্থিরতা নিয়ে প্রায়ই তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। একদিন ঠিক করলো, এক ভবঘুরের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে নিজেদের চিন্তা যাচাই করে নেবে। আচমকা পেয়েও গেলো একজন। দেখে পথের ধারে ফুটপাতে ঘুমিয়ে আছে। তুলে আনলো সেখান থেকে নিজের প্রাসাদে। বিলাসের সে একেবারে ছড়াছড়ি। খুব খাওয়া দাওয়া হলো। পরালো নতুন সাজ পোশাক। মদ গেলালো প্রচুর। বেচারী তখন বেহুঁশ। ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন গাড়িতে করে ফের নিয়ে গিয়ে রেখে এলো সেই ফুটপাতে। অর্থাৎ ঘুম ভেঙে যেন মনে হয় তার আগের রাতের যাবতীয় ঘটনা অলীক স্বপ্ন মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। 'সিটি লাইটস্' ছবিতে এই সূত্রেই সেই কোটিপতির সঙ্গে ভবঘুরের পরিচয়। মাতাল হলে তবেই তাকে কোটিপতি রেয়াত করে, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে চিনতেও পারে না। গল্পে ভবঘুরের এরকম বন্ধুত্ব দরকারও। নইলে মেয়েটির কাছে প্রমাণ করবে কিভাবে সে বিস্তর ধনী?

তা সারাদিন খাটাখাটুনির পর যেতাম ডগলাসের স্টুডিওতে, আরামে দু দণ্ড স্নান করে শরীরের ক্লান্তি দূর করতে। আসতো আরো অনেকে। বন্ধুর তো আর শেষ নেই ডগলাসের। অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালক প্রযোজক ফিল্মী দুনিয়ার নানান কেউকেটা—আসার যেন আর কামাই নেই। আড্ডা হতো খুব। সে নানান আলোচনা। আমি নির্বাক ছবি করছি শুনে অবাক হতো। বলতো, আশ্চর্য সাহস বটে আপনার! সবাকের যুগেও ভাবছেন নির্বাক নিয়ে বাজিমাৎ করবেন?

দেখতাম প্রযোজকদেরও। আগে কি করছি আমি কোন নতুন পরিকল্পনা আছে কিনা এই নিয়ে হাজারো প্রশ্ন হাজারো জিজ্ঞাসা। এখন দেখি পাত্তাও দেয় না। যেন রাতারাতি আমাকে সবাই ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতাম—তবে কি আমি একেবারেই দলছুট, আমার কি সব গোল্লায় যেতে বসেছে? আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি?

সবাক যুগের প্রথম পর্বে জো শেঙ্ক কাগজে সাক্ষাৎকারে বলেছিলো, চলবে না এ জিনিস, আমার মোটেই ভালো লাগছে না। এখন দেখি তারও মুখে অন্য কথা।

দেখা হলেই বলে, বুঝলেন মশাই, হিসেবে বোধহয় ভুলই হয়ে গেলো। দিন দিন দেখছেন তো কেমন জাঁকিয়ে বসছে। যাবে বলে আসে নি, থাকতেই এসেছে। বলতো, আপনিই পারেন একমাত্র নির্বাক যুগের রাশ টেনে রাখতে। আপনার সে ক্ষমতা আছে। প্রশংসা সন্দেহ নেই, কিন্তু তুষ্ট হতে পারতাম না। একলা আমি হলে পারবো কিভাবে? একি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব? এতো বড় এক ঐতিহ্য তাকে বজায় রাখা, তাকে জিইয়ে রাখা। কাগজেও ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। চ্যাপলিনের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, আদৌ তিনি আর ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন কিনা এ নিয়ে দেখি প্রতিদিনই একটা দুটো মনগড়া আলাপচারী কোথাও না কোথাও বেরোয়।

বেরোক। আমি থোড়াই কেয়ার। জেদ যখন চেপে গেছে মাথায়, করবোই ছবি। নিজের অবস্থান যাচাই করে নেবারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সমস্যা যে প্রচুর। সবাক যুগের সূচনার পর তিনবছর প্রায় শেষ হতে চললো, অভিনেতা অভিনেত্রীর হাবভাব দেখি প্রায় বদলে গেছে। অভিনয় কেউ আর করতে পারে না। সেই পুরনো দিনের মূকাভিনয়। শুধু কথার পর কথা সাজানো এখন, ভঙ্গি বা কাজ আগে যেসব করতে হতো, কথার বদলে প্রকাশ করতে হতো যেভাবে নিজের চরিত্রকে—সে যেন অলীক কল্পনা মাত্র। আর নায়িকা নিয়েও সে এক মহা দুশ্চিন্তা। এমন একটি মেয়েকেও দেখি না যে অন্ধ হয়ে অন্ধের মতো ভাব ভঙ্গি করবে কিন্তু সৌন্দর্যে এতোটুকু ঘাটতি হবে না। পাই না কাউকে। রোজ রাশি রাশি আবেদন পত্র জমা হয়। ডাকি তারই মধ্যে বাছাই করা কয়েকজনকে। অন্ধ হয়ে কিছু করতে বলি। মাথা ওপরের দিকে তুলে চোখের সাদা অংশ দেখিয়ে সে যা বিতিকিচ্ছিরি দেখতে লাগে! সব বাদ। ভারী মনমরা হয়ে পড়েছি এই একটা ব্যাপার নিয়ে। হঠাৎ সান্তা মনিকায় বেড়াতে গিয়ে দেখি সুটিং চলছে কি একটা ছবির, তাতে প্রচুর মেয়ে, স্নানের পোশাক পরে সবাই নেমেছে জলে। ওরই মধ্যে একজন আমাকে দেখে হাত নেড়ে বললো, আমি তো আজ অব্দি আপনার একটা ছবিতেও কাজ পেলাম ন। কবে পাবো?

দেখি ভার্জিনিয়া শেরিল। আমি আগে থাকতেই চিনি। ছোট খাটা ভূমিকায় অভিনয় করে। স্নানের পোশাকের আড়ালে নিটোল একটি শরীর। কিন্তু সেদিকে আমার তখন মন নেই। ভাবছি অন্য কথা।—আচ্ছা, একে নায়িকা করলে কেমন হয়! সৌন্দর্যের মধ্যে আছে আশ্চর্য কমনীয়তা। স্নিগ্ধ একটা ভাব। তাতে ছবির নায়িকার আত্মিক সৌন্দর্যের রূপটি ফুটে উঠবে। দেখাই যাক না একটু পরখ করে।

তখন সত্যি বলতে কি আমার একেবারে মরীয়ার মতো হাল। রীতিমতো

হতাশা যাকে বলে আর কি। বললাম শেরিলকে দেখা করতে। অবাক কাণ্ড, দেখি দস্তুরমতো পারে ঘমন্ধের মতো হাঁটাচলা করতে, সেই রকম ভাবভঙ্গি করতে। বললাম এক কাজ করো তো, আমার দিকে তাকাও। শুধু কিন্তু তাকানোই। দেখতে পাবে না আমাকে। যাকে বলে মনের গভীর থেকে উপলব্ধির মতো দেখা। পারলো বেশ। ক্যামেরায় দেখলাম, মুখের আদলটিও চমৎকার, ছবিতে অপূর্ব লাগবে। অভিনয়ে তেমন একটা পটু নয়। সেটা বরং আমার পক্ষে খানিকটা সুবিধাজনকই বলা যেতে পারে। শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো। নিজের কায়দা কানুন দিয়ে আমার ওপর খোদকারী করার সুযোগ পাবে না। এটা আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই পরখ করে দেখেছি। কম জানা বরং ভালো। বেশি জানলেই মুশকিল।

একটা দৃশ্য এইরকম। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার খুব ভিড়। ভিড় এড়িয়ে এক ধার থেকে আরেক ধারে যেতে আমি অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভবঘুরে মশাই সোজা সরল একটা পথ বেছে নিয়েছি। ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা গাড়ি। তারই ওধারের দরজা খুলে ঢুকে তারপর এধারের দরজা খুলে সটান রাস্তায়। নামবার সময় দরজা বন্ধ করতে ভুলিনি। তখন নায়িকা সেখানেই দাঁড়িয়ে। হাতে ফুল। দরজার শব্দ শুনে ভেবেছে বুঝি আমিই গাড়ির মালিক, তাই এগিয়ে এসেছে আশা নিয়ে আমার দিকে ফুল বেচবে বলে। আমি তো পকেটের শেষ আধ ক্রাউন দিয়ে কোটের বোতাম ঘরে গোঁজাবার মতো ছোট একটা তোড়া কিনলাম। কিনতে গিয়ে হাতের ধাক্কায় পড়ে গেলো মেয়েটির সব ফুল। অমনি বসলো হাঁটু গেড়ে। দেখি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। আমি তো হতবিহ্বল তখন। তুলে দিলাম ফুল। অবাক হয়ে দেখছি তখন তার মুখের দিকে। এ কি ভান, না আর কিছু? তখন হঠাৎ খেয়াল হলো—তাইতো, অন্ধ নাকি! হাতের ফুলের তোড়াটা নাড়লাম তার চোখের সামনে, দেখি পলক পড়ে না। তখন সে এক নিদারুণ লজ্জাকর পরিস্থিতি। কত ভাবে যে ক্ষমা চাইবো তার কাছ থেকে নিজের অপরাধের জন্যে—অনিচ্ছাকৃত যদিও, তার যেন আর শেষ নেই। হাত ধরে ধীরে ধীরে তুলে তাকে ফুটপাতের ওপর এনে দাঁড় করালাম।

মোট এক মিনিট দশ সেকেণ্ডের দৃশ্য। তুলতে লেগেছিল আমার ঝাড়া পাঁচটি দিন। শেরিলের কাজে কোন ত্রুটি নেই। আমাকে নিয়েই সমস্যা। অর্থাৎ পরিচালক আমি। কিছুতেই যেন মন ওঠে না। চাই প্রতিটি আচরণ নিখুঁত ভাবে করতে। হয় না। যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে তখন আমার। সারা ছবি জুড়েই মনের এই অবস্থা। তুলতে লেগেছিল তাই এক বছরেরও বেশি।

এদিকে ফাটকা বাজারে সে বছর ভীষণ দুরবস্থা। হু হু করে পড়তে শুরু করেছে শেয়ারের দাম। আমি আগে থেকেই সাবধান। ভাগ্যিস মেজর ডগলাসের 'সোসাল

ক্রেডিট' বইখানা পড়ে নিয়েছিলাম। তাতে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার চমৎকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রথম জানলাম সব লাভেরই মূলে বেতনের হ্রাস-বৃদ্ধি। বেকারী মানে লাভ কম। কেননা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ সেখানে কম। উনিশশো আঠাশ সালে আমেরিকায় মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়ালো গিয়ে এক কোটি চল্লিশ লাখ। বেচে দিলাম সব শেয়ার। কি হবে অহেতুক লোকসান খেয়ে। ফলে যা আমার সঞ্চয় সবই এখন নগদে। আমার আর ভয় কি?

চরম বিপর্যয়ের খবর বেরুবার আগের দিন আমি আর কোটিপতি আরভিং বার্লিন একসাথে বসে খাচ্ছি ডিনার। ভীষণ আশাবাদী বার্লিন শেয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমাকে বললো কোন্ এক হোটেলের বেয়ারা নাকি শেয়ার কিনে ফের বেচে চল্লিশ হাজার ডলার লাভ করেছে। তার নিজেরও কয়েক কোটি টাকার শেয়ার আছে। তাতে বছরে আমদানী লাখ দশেকেরও বেশি। আমাকে বললো, আপনার কত আছে? বললাম, কিছু না। শেয়ার বাজারে আমার মোটেই আস্থা নেই, বরং আপনারও উচিত লাভ থাকতে থাকতে সব শেয়ার বিক্রী করে টাকা তুলে এনে জমিয়ে রাখা। যে দেশে এক কোটি চল্লিশ লাখ বেকার সে দেশে শেয়ারের ভাগ্য আদৌ সুনিশ্চিত নয়। শুনে সে কী রাগ! কী তর্ক! আমাকে বললেন আমি নাকি আমেরিকা সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না। দেশপ্রেম বলতে বিন্দুমাত্র নাকি আমার মধ্যে নেই। চুপচাপ হজম করে গেলাম সব। পরদিনই কাগজে সেই বিপর্যয়ের খবর। আদ্দেক পড়ে গেছে প্রতিটি শেয়ারের দাম। আরভিংয়ের তো মাথায় হাত। গেলো সব সঞ্চয় ধুলিসাৎ হয়ে। পরের দিন শুনি আরো নামছে, আরো। দুদিন পরে আরভিং খোদ স্টুডিওতে হাজির। শুষ্ক হতবাক চেহারা, যেন মস্ত ঝড় বয়ে গেছে মানুষটার মনের ওপর দিয়ে। আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। শেষে যাবার সময় জিজ্ঞেস করলেন কোন্ সূত্র থেকে আমি আগাম খবর পেয়েছিলাম।

এদিকে সিটি লাইটস্‌ও শেষ। অর্থাৎ দৃশ্যগ্রহণের কাজ। এখন সঙ্গীত পর্ব বাকী। সে ব্যাপারে আমিই মোটামুটি সক্ষম। ছবিতে সুর সংযোজনার কাজে ইতিমধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মেছে। মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ বা বিস্তার বলতে যা বোঝায়, বুঝি। এমতাবস্থায় সুর আমিই দেবো ঠিক করলাম।

সুর হবে আগাগোড়া গাম্ভীর্যমণ্ডিত এবং রোম্যান্টিক। ছবির প্রধান চরিত্র ভবঘুরের সঙ্গে বা ছবির মেজাজের সঙ্গে সুরের থাকবে একটা আমূল বৈপরীত্য। এটা ছক বাঁধা হিসেবের বাইরে। পেশাদারী সুরকারদের দেখি একটা আশ্চর্য কৌশল—ছবি যেহেতু মজাদার, সুরও বাছে তারা রগুড়ে মেজাজের। এতে খোলে না গল্প। এখানেও তো সুরে আর ঘটনায় তীব্র এক প্রতিযেগিতার প্রশ্ন। দুজনেই চেষ্টা

করবে দুজনকে হারাতে। তবেই তো বেরিয়ে আসবে দুয়ের মিশ্রণে আসল মজা। আসলে সুরে আমি চাই ভবঘুরের মনের গভীরে যে অনুভূতি তাকেই রূপ দিতে। এই নিয়ে তো পেশাদারদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই লেগে যায় তর্কো। আমাকে নানান কথা বোঝাতে চেষ্টা করে। উঁচু নীচু পর্দার কথা বলে। আমি বলি, রাখুন তো ওসব বড় বড় বাত। সুর আসলে সুর, বাকী যা সবই তাকে প্রকট করবার তাকে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা মাত্র। এর বাইরে তো কিছু নয়। আমাকে আর অযথা ওসব বোঝাতে আসবেন না। মোটামুটি দাপটের সঙ্গেই বলি। দাপট, কেননা ততদিনে দু তিনখানা ছবিতে সুরারোপ করে আমিও যৎকিঞ্চিৎ বুঝতে শুরু করেছি। পেশাদারদের মতো আমারও সুরের ব্যাপারে শ্রবণ শাণিত হয়েছে। কোন্‌টা বাহুল্য কোন্‌টা অতিরঞ্জন আমাকে বুঝবার জন্য আর অযথা পরিশ্রম করতে হয় না। বাজছে একসাথে অনেক-গুলো যন্ত্র। শুধু সব ছাপিয়ে কানে এসে পৌঁছচ্ছে হয়তো ব্যাঙের তালের আওয়াজ। তখন ব্যাণ্ডবাদককে বললাম একটু আওয়াজ কম করতে। কিংবা হয়তো বাঁশিটা একটু অন্যরকম লাগছে। মিশছে না অন্য যন্ত্রের সঙ্গে। বাঁশিকে বললাম একটু সংযত হতে। ব্যস এই তো। এছাড়া নতুন আর কি! তবে একটা ব্যাপার। নিজের দেওয়া সুর যখন বেজে ওঠে যন্ত্রে—একটা দুটো নয়, একসাথে অনেকে বাজায় একই সুর, সব মিলে আশ্চর্য এক সুরলহরী, বেশ লাগে তখন শুনতে, নিজেকে নিয়ে বেশ গর্ব হয়।

তা সে পর্বও সাঙ্গ হলো। সুর সংযোজনের কাজ শেষ। এখন শুধু দর্শকের দরবারে যাচাই করিয়ে নেবার প্রশ্ন। কিভাবে হবে সে কাজ?

বলতে গেলে নীরবেই সারলাম কাজটা। থিয়েটার হয় সেখানে। শহরতলীর একটা অংশে। মস্ত এক প্রেক্ষাগৃহ। আচমকা সেখানেই হয়ে গেল প্রথম প্রদর্শনী।

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্রায় ফাঁকাই হল। দর্শকরা দেখতে এসেছে নাটক। হঠাৎ পর্দায় ছবি। তাতে আমি। তাতে ভার্জিনিয়া শেরিল। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক কমেডি। দর্শক তো থ'। হাসলো সেই মন নিয়েই। তেমন একটা হুল্লোড়ে হাসি নয়, চাপা। শেষ হবার আগেই অনেকে উঠে গেল। পাশে বসা আমার সহকারী পরিচালক। তাকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিয়ে বললাম, কি হে, সবাই যে চলে যাচ্ছে।

বললো, যাবে আর কোথায়। দর্শকের দৌড় বাথরুম অব্দি।

তখন ধাতস্থ হলাম খানিকটা। আবার মন দিয়েছি ছবি দেখায়। কিন্তু কই, যারা গেলো তাদের যে আর আসার নাম নেই।

ফের দিলাম কনুইয়ের গুঁতো।—কই হে, এলো না তো বাথরুম থেকে।

বললো, ট্রেন ধরবার তাগিদ আছে যে। তাই অনেকে চলে গেছে।

মুখ চুণ করেই বলতে গেলে হল্‌ থেকে বেরুলাম। হায় হায়, সব মাটি। দু বছরের

খাটুনি, তার ওপর সাকুল্যে প্রায় বিশ লাখের মতো খরচ। দিলাম কিনা সব ঢেলে নদীর জলে! দেখি হলের ম্যানেজার আমার দিকেই আছেন। বললেন, দারুণ হয়েছে ছবি চার্লি। তুখোড়। কিন্তু আর নির্বাক কেন। এবার সবাক কিছু একটা করুন। সারা দুনিয়া যে অধীর আগ্রহে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।

হাসতে চেষ্টা করলাম। এলো না হাসি। এ প্রশস্তি নয়, বরং নির্বাক সবাকের সূত্র টেনে নির্বাককেই হেয় করা। এগিয়ে গেলাম জোর কদমে। দেখি দলবল সবাই দাঁড়িয়ে আছে আমারই অপেক্ষায়। রীভ্স্ বললো ভালোই হয়েছে। দর্শক নেবে। তবু—

জানি আমি 'তবু' একটা থাকবেই। অর্থাৎ একই সংশয়। কিন্তু সংশয়ে ভয় পাই না আমি কোনদিন। বললাম, তবু বলে কিছু আর নেই রীভ্স। ফাঁকা হল্ বলে যেটুকু তোমাদের নজরে পড়লো, দেখবে বোঝাই দর্শকের মধ্যে তার আর বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকবে না। তবে হ্যাঁ, দু একটা দৃশ্যে ছাঁটকাটের দরকার আছে।

এলো তখন নতুন এক ভাবনা। তাইতো, ছবি তো তৈরী হলো, কিন্তু বিক্রীর ব্যবস্থা কই। কে কিনবে আমার ছবি।

অবিশ্যি এ ভাবনা আমার করার কথাও না। কোম্পানী আছে মাথার ওপর, আছে এসব ভাবনা চিন্তা করার আলাদা লোক। তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা ছবি আমার। আমিই এর পরিচালক সুরকার কাহিনীকার অভিনেতা। বিক্রীর প্রশ্নে এটুকুই কি যথেষ্ট নয়! মোটমাট সেরকমই ভাবনা আমার তখনো। আমাদের ইউনাইটেড আর্টিস্টসের বড় কর্তা তখন জো শেঙ্ক। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম তাকে একদিন বিক্রীর ব্যাপারটা। বললেন, না। আগের সেদিন আর নেই। প্রদর্শকেরা সেই গোল্ড-রাশের দাম আর দিতে চাইছে না। বলছে নতুন দাম ঠিক করতে হবে। তার ওপর বড় বড় প্রদর্শকের চিত্রগৃহে আগে থাকতেই অন্য ছবি ঠিক করা আছে। সেগুলো বাদ দিয়ে তারা এখন এ ছবি নিতে নারাজ। তেমন একটা আগ্রহও কারো নেই। নিউইয়র্ক নিয়েই যত যা ভাবনা। একটা হল্ও খালি নেই। এ অবস্থায় কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না।

নিজেকেই তখন তৎপর হতে হলো।

খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম, নিউ ইয়র্কে একটি মাত্র থিয়েটার হল্ পাওয়া যেতে পারে, তার মালিক জর্জ এম্. কোহান। আসন সংখ্যা সাকুল্যে সাড়ে এগারোশো। মুশকিল হলো সেখানে ছবি দেখাবার কোন ব্যবস্থা নেই। মূলতঃ থিয়েটারই হয়ে থাকে। অর্থাৎ হপ্তায় সাত হাজার ডলার ভাড়া দিয়ে আমাকে নিতে হবে শুধু চার দেয়ালের একটা ছাউনি। তাতে আসনের ব্যবস্থা আছে এই যা সান্ত্বনা। বাকী সব কিছু আমাদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। হলের ম্যানেজার থেকে শুরু করে টিকিট বিক্রীর লোক, ছবি প্রোজেকশনের মেসিন, সেটা চালাবার লোক, এমনকি পর্দা অব্দি। বিজ্ঞাপনের খরচ

খরচাও আমাদের। মোটমাট সবটাই একটা বিরাট ঝুঁকির প্রশ্ন। তা ডুবে তো রয়েছিই এক বুক জলে, নয় দেখা যাক শেষ অব্দি কি দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে রীভ্‌সের সঙ্গে লস এঞ্জেলেসে সদ্য খুলছে একটা চিত্রগৃহ, তারই মালিকের কথাবার্তা একদম পাকা। 'সিটি লাইটস্' দিয়েই শুরু হবে শুভযাত্রা। তা আইনস্টাইন তখন সস্ত্রীক লস এঞ্জেলেসে। আমাকে খবর দিলেন, উদ্বোধনের দিন তাঁরাও যাবেন ছবি দেখতে। বাড়িতে নেমন্তন্ন করলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়েছি সবাই একসাথে, খানিক দূর গিয়ে দেখি রাস্তা ভিড়ে ভিড়াকার। পুলিস সামলাচ্ছে ভিড়। জখমও হয়েছে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন। গাড়ি আর পারে না এগোতে। আমাদেরই দেখবার জন্যে প্রতীক্ষা। শেষে পুলিসের সাহায্য নিয়ে ভিড় সরিয়ে তবে অনেক কষ্টে ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছতে পারলাম।

যা মনের অবস্থা আমার তখন। সঙ্গী স্বয়ং আইনস্টাইন। এদিকে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ। চার পাশে মান্যগণ্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভিড়। সুগন্ধি আতরের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। আর লাগছে আমার যেন দমধরা ভাব। যেন বমি হলে বাঁচি। প্রথম উদ্বোধন রজনীতে এই কারণেই আমি আসতে চাই না। আমার বিরক্তি লাগে।

তা ভারী চমৎকার বানিয়েছে বটে প্রেক্ষাগৃহ। সুন্দর খোলামেলা। শুধু নেই যা তা হলো ছবি পরিবেশনের জ্ঞান। সেটা কি ব্যাপার একটু পরেই বলছি।

শুরু তো হলো ছবি। হল বোঝাই দর্শক। নাচ দেখানো থেকে শুরু করে হুল্লোড়ের ঘটা প্রথম দিনের প্রথম প্রদর্শনীতে যে কোন ছবির ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। এগোচ্ছে এবার ছবি। প্রথম দৃশ্য। বুক আমার ধড়ফড় করছে। এক মর্মর মূর্তি উদ্বোধনের দৃশ্য। দেখে সে যা হাসি! থামবার যেন আর নাম নেই। যাক, বুকের ধড়ফড়ানি আমার শান্ত। কী যে ভাবনায় পড়েছিলাম এতোদিন! সমানে হাসির ঢেউ। তিন রীল অব্দি একটানা। নিজের অজানতে আমিও কখন সকলের সঙ্গে হাসতে শুরু করেছি। তখনই ঘটলো সেই বিপর্যয়।

হঠাৎ পর্দা গেলো সাদা হয়ে। ছবি বন্ধ। আলো জ্বললো। অদৃশ্য কণ্ঠের ঘোষণা শুনতে পেলাম:—এই আশ্চর্য ছবির বাকী অংশ দেখবার আগে প্রিয় দর্শক পাঁচ মিনিট সময় আমি আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের এই নব নির্মিত বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহ সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা নিবেদন করবো।

অবাক আমি তখন। বিস্ময়ে মূঢ় মূক হতভম্ব স্তব্ধ। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। রক্ত ছলকে উঠেছে মাথায়। রাগে জ্বলছে সারা শরীর। উঠলাম এক লাফে আসন ছেড়ে। চিৎকার করে বললাম, কোথায় সেই হারামজাদা ম্যানেজার। আমি তাকে খুন করবো।

দর্শকও গলা মিলিয়েছে আমার সঙ্গে। পা ঘষটানি থেকে শুরু করে দাপাদাপি হৈ চৈ, গালিগালাজ—সে কিন্তু নির্বিকার। সমানে বলে যাচ্ছে তার সেই অদ্ভুত ঘোষণা। শেষে কোলাহল যখন তুঙ্গে উঠলো, আর পারলো না বোধহয় সাহস করে শেষ অব্দি বলতে। থামতে বাধ্য হলো। ফের শুরু হলো ছবি। দর্শক শান্ত হয়ে ফের ছবিতে মন দিলো। পার হয়ে গেলো গোটা একটা রীল। যাই হোক, ছবি সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা আমার কেটেছে। নিয়েছে দর্শক আগাগোড়া। শেষ দৃশ্যে আইনস্টাইন দেখি চোখের জল মুছছেন রুমাল দিয়ে। সার্থক আমি। সংশয়ের আর কিছু নেই। এবং সেই যে আমার সেই তত্ত্ব—বৈজ্ঞানিকদের কঠোর বহিরঙ্গের আড়ালে লুকিয়ে থাকে করুণ কোমল এক মন—সে ব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। নইলে চোখে জল আসবে কেন অধ্যাপকের!

পরদিন রওনা হলাম নিউইয়র্ক। বিস্তর কাজ সেখানে। কাগজে কি সমালোচনা বেরোয় দেখবার আর সময় নেই। হাতে মোট চার দিন সময়। তারপরই নিউইয়র্কে ছবির প্রদর্শনী শুরু হবে। পৌঁছে দেখি সে এক বিশ্রী অবস্থা। বলতে গেলে প্রচার মোটে কিছুই হয়নি। শুধু কাগজে দু এক লাইনের দুটো একটা বিজ্ঞাপন যেমন, 'আমাদের পুরনো বন্ধু আসছে আবার আমাদের মাঝখানে।' বা এই জাতীয় কিছু সরস উক্তি। সঙ্গী দলবলকে বললাম, ঘাবড়াবার কিছু নেই। সব ব্যবস্থা হবে। শুধু বারে বারে জানাতে হবে সবাইকে—ছবির প্রদর্শনী আমরা শুরু করছি চিত্রগৃহে নয়, থিয়েটার হলে। এবং সেটা স্বভাবতঃই চিরাচরিত প্রথার বাইরে।

সব কটা কাগজে পরদিন থেকে প্রায় আধপাতা জুড়ে বড় বড়হরফে দিতেশুরু করলাম বিজ্ঞাপন। বয়ানটা এই রকম—

কোহান থিয়েটারে
চার্লি চ্যাপলিনের
সিটি লাইটস্
দর্শনী এক ডলার এবং আধ ডলার

কাগজে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হলো মোট তিরিশ হাজার। নিয়ন আলোতে থিয়েটার হলের সামনে দিলাম আরেকটা বিজ্ঞাপন। তাতে খরচ আরো তিরিশ হাজার। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। সারা রাত জেগে ছবি প্রক্ষেপণের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হলো। পর্দা নতুন, মেশিন নতুন, মায় প্রদর্শকও নতুন। এতোটুকু ভুল ভ্রান্তি হলে চলবে না। এক অদ্ভুত পরীক্ষা বলা যেতে পারে। পরদিন সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হলাম।

কেন নির্বাক ছবি, কি আমার প্রত্যাশা তাই নিয়ে যথারীতি হাজারো প্রশ্ন। সব জবাব দিলাম। কাগজে ছেপে বেরুলো সে সব কথা। এদিকে সঙ্গীদের মনে টিকিটের

দাম নিয়ে ঘোর সংশয়। দামটা আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই খানিকটা বাড়িয়ে ধার্য করেছি। বড় বড় হলে নীচের টিকিটের দাম যেখানে পঁয়ত্রিশ সেণ্ট, আমি ধরেছি সেখানে আধ ডলার। বেশি দামের টিকিট ওরা নেয় পাঁচ'শ সেণ্টে, আমার দাম আরো পনেরো সেণ্ট বেশি। এটা খানিকটা ইচ্ছাকৃতই বলা যেতে পারে। এখানেও সেই যাচাইয়ের প্রশ্ন। নির্বাক ছবি বলে যে ভাববে হেঁজিপেঁজি সেটি চলবে না। বরং সবাকের চেয়ে নির্বাকের দামই বেশি। এটা দর্শক তোমরা আগে থেকে বুঝে নাও। সেই ভাবে ঠিক করো তোমার মন। আগ্রহ যদি থাকে তবে চলে এসো। সেক্ষেত্রে আগ্রহের তাড়নায় পনেরো সেণ্ট বেশি দিতে তোমার গায়ে লাগবে না।

অর্থাৎ কোন ক্রমেই নির্বাক বলে যে মাথা নীচু করা, গুরুত্ব কম দেওয়া তা নয়। এবং এখানে কিছুতেই কোনরকম সমঝোতা করতে আমি রাজী নই।

উদ্বোধনের দিন হল্ যথারীতি বোঝাই। ভালোই নিলো দর্শক। কিন্তু তাতে কি আর ছবির ভবিষ্যৎ কি হবে বুঝতে পারা যায়! বেশির ভাগই আমন্ত্রিত ব্যক্তি। তাদের মতামত সাধারণ ভাবে একপেশে। ফলে ধাতস্থ হওয়া গেলো না। আসল নজর আমার সাধারণ দর্শকের দিকে। কি বলে তারা কিভাবে নেয় সেটাই মাপকাঠি। নির্বাক ছবি দেখতে তাদের ভালো লাগবে তো? আসবে তো আমার হিসেব মিলিয়ে বেশি দাম দিয়ে টিকিট কাটতে?

বলতে গেলে এসব চিন্তায় মাঝরাত অব্দি নির্ঘুম। ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেরই খেয়াল নেই। বেলা তখন এগারোটা প্রায়, আমি তলিয়ে আছি ঘুমে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে একদম শোবার ঘরেই এসে হাজির আমার প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা। সে কী উত্তেজনা তার। আমাকে ঠেলে তুলে বলে কিনা—বাজিমাৎ! বুঝলেন হিসেব আপনার নির্ভুল। সকাল দশটা থেকে টিকিটের জন্যে লাইন পড়েছে। সে একেবারে লম্বা রেলগাড়ির মতো। গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হবার যোগাড়। পুলিস এসেছে ভিড় সরাতে। টিকিটের জন্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি। কিন্তু অতো টিকিট দেবো কোথা থেকে!

তার আমি কি জানি! মোটমাট খবর শুনে বেশ স্বস্তি লাগছে। যাকে বলে চিত্তের আরাম, মনের ফূর্তি। উঠে ধীরস্থির ভাবে হাত মুখ ধুলাম, পোশাক পরলাম, তারপর প্রাতরাশের হুকুম দিলাম। বললাম, কোথায় কোথায় বেশি হাসছে দর্শক আমাকে বলো। বললো সে। কোথায় হাসি, কোথায় হল্লোড়, কোথায় চিৎকার—সব। শেষে বললো, বরং চলুন না আপনি নিজের চোখেই নয় দেখে আসবেন। মন্দ কি।

প্রথমে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আপত্তি ছিলো। কিন্তু শুনলে তো! সে একেবারে

নছোড়বান্দা। গেলাম। আধঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে রইলাম দর্শকের ভিড়ে, হলের একেবারে পেছন দিকের দেয়াল ঘেঁষে। সত্যি সত্যিই কিন্তু ভালো লাগছে। এই যে হাসছে, দর্শক, আনন্দ পাচ্ছে—এতেই যেন বিরাট তৃপ্তি। বুকের বোঝাটা যেন একটু একটু করে হাল্‌কা হতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে আর কিছু ভালো লাগছে না। মন চাইছে না কিছু করতে কিছু ভাবতে। তখন চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম। যাবো না কোথাও। ঘুরবো এমনি পথে পথে। এই যে সামনে মাইলের পর মাইল পথ। অনির্দেশ যাত্রার একমাত্র আশ্রয়। হাঁটতে শুরু করেছি। টানা প্রায় চার ঘণ্টা। ঘুরতে ঘুরতে ফের এসে দাঁড়ালাম হলের সামনে। তখনও লাইন। পরের শো দেখবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। পাবে কি সকলে টিকিট? হয়তো না। আবার কাল আসবে। আসুক। আমি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবো না।

সব কাগজেই বেরুলো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। ছবি যে অপূর্ব অনবদ্য এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত নয়। পয়সাও পেলাম দু হাত ভরে। সাড়ে এগারোশো আসনের ছোট্ট একটুখানি হল, তাতে তিন হপ্তায় পেলাম আশি হাজার ডলার হারে মোট দু লাখ চল্লিশ হাজার। উলটো দিকেই তিন হাজার আসনের বিশাল প্রেক্ষাগৃহ প্যারামাউন্ট। তাতে চলেছে মরিস শেভ্‌লিয়ার অভিনীত সবাক ছবি। এক হপ্তায় বিক্রী সেখানে মাত্র আটত্রিশ হাজার। মোট বারো হপ্তা কোহান থিয়েটারে চললো সিটি লাইটস্। খরচ খরচা বাদ দিয়ে লাভ একুনে চার লক্ষ ডলার। তুলে নিতে হলো নিউইয়র্ক চিত্র প্রদর্শকদের তাগাদায়। তাদের হলে তখন মুক্তির দিন গুণছে 'সিটি লাইটস্'। কোহানে বেশিদিন চললে তারা পড়ে পড়ে মার খাবে। দাম মোটের ওপর ভালোই দিয়েছে। সে-ও সব মিলিয়ে অঢেল। তাদের অনুরোধ কি আর পায়ে ঠেলা যায়!

এবার যাবো লণ্ডন। সেখানেও ছবির উদ্বোধন রজনী আসন্ন। উদ্বোধনের দিন আমাকে হাজির থাকতে অনুরোধ করেছে। এদিকে নিউইয়র্কে আসা ইস্তক র‍্যাল্‌ফ বার্টনের সঙ্গে বলতে গেলে রোজই একবার না একবার দেখা হয়। র‍্যাল্‌ফ্ আমার পুরনো বন্ধু। নিউইয়র্কের কাগজের সঙ্গে ইদানীং যুক্ত। ছবি আঁকে দারুণ। হালফিল বালজাকের 'ড্রল স্টোরিজ' বেরিয়েছে নতুন করে। তার মলাট থেকে শুরু করে ভেতরের যাবতীয় অলংকরণ মায় ছবি—সব তার। সাঁইত্রিশ বছর মাত্র বয়েস। এরই মধ্যে পাঁচবার বিয়ে করেছে। পাঁচ বউই খারিজ। এদিকে আচার আচরণে অত্যন্ত সভ্য, অত্যন্ত ভদ্র, অত্যন্ত মার্জিতরুচি। শুধু একটু খেয়ালী প্রকৃতির এই যা। ইদানীং মনের রোগ ধরেছে। সর্বদা থাকে মনমরা হয়ে। একবার আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিল। একসাথে খেয়ে নিয়েছিল নাকি অনেকগুলো ঘুমের বড়ি। মরেনি তবু। বললাম, দরকার কি এখানে মন খারাপ নিয়ে পড়ে থাকার। চলো না আমার সাথে

ইওরোপ। খরচ খরচা আমার, তুমি আমার অতিথি। যাও নি তো আগে কোনদিন। বেড়িয়ে এলে মনও ভালো হবে।

তখন রাজী হলো। রওনা হলাম একসাথে দুই প্রাণের বন্ধু। এবারও সেই 'অলিম্পিক' জাহাজ। এই জাহাজে চেপেই সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম এসেছিলাম আমি এদেশে।

২২

ঠিক দশটি বছরের ব্যবধান। মাঝখানে অনেকগুলো দিন। কেমন হবে এবারকার অভ্যর্থনা? নিজের কাছে নিজেরই এই নিরন্তর প্রশ্ন। নাকি আদর আপ্যায়ন নিয়ে মাথা ঘামাবো না এবার, চুপি চুপি এসে চুপিচুপিই বিদায় নেবো? সেটা ভুল হবে। অন্ততঃ এবারকার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে। এসেছি 'সিটি লাইটস্' ছবির উদ্বোধনে যোগ দিতে। তার জন্য প্রচার চাই, চাই দারুণ একটা হৈ চৈ। চুপি চুপি এলে গেলে হবে কেন?

পৌঁছে দেখি সে ব্যাপারে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। লোকজন আগে থেকেই হাজির। সেই উপছে পড়া ভিড়। দেখে যা হোক আশ্বস্ত হলাম।

উঠেছি এবার কার্লটন হোটেলে। লণ্ডনে বলতে গেলে সবচেয়ে অভিজাত সবচেয়ে পুরনো রীতিমতো বিলাসবহুল হোটেল। আড়ম্বর আর প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। যে স্যুইটে আছি তার বিলাসের যেন আর শেষ নেই। ভয় হয়, এই বিপুল আড়ম্বরে বিলাসে আমি মানুষটা ক্রমশঃ না অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। পারবো তো প্রয়োজনবোধে এর ঘোর কাটাতে? যেন স্বপ্নপুরীর এক একটি গোপন অলিন্দ। হোটেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি দরজা আমার চোখের সামনে খুলে যায়। তার প্রতিটির আড়ালে নানান সুখের পশরা। সব সুখ আমি মেখে নিই শরীরে দুহাত দিয়ে। আহ্, অদ্ভুত। লণ্ডনের এটাই এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। ধনী না হলে এখানে সবই বরবাদ। পাবে না তুমি এখানে অনেক কিছু। জানতেও পারবে না তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। হও ধনী তো সব মিলবে। ধনীর সব কিছুতেই এখানে ছাড়। সব কিছুতেই খাতির। তার নমুনা পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেতে শুরু করলাম

জানলা দিয়ে সটান নজর পড়ে দূরে। ঐ তো রাস্তা। দেখি হাতে নানান মাপের অসংখ্য পোস্টার নিয়ে একদল মানুষ। একটাতে লেখা: আমাদের প্রিয় চার্লি— তোমায় আমরা ভুলিনি। আমি জবাবে হাত নেড়ে তাদের ভালবাসা জানালাম।

একটু পরেই সাংবাদিকেরা হাজির। অতি অমায়িক আচরণ। এটা ওটা নানান প্রশ্ন। প্রশ্নের মধ্যে কোন প্যাঁচ পয়জারের বালাই নেই। বললো, কবে যাবেন আমাদের এলস্ট্রীতে? আমি তো অবাক। সেটা আবার কি? তখন হাসলো মুখ টিপে। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। মানে কিন্তু এই নয় আমাকে প্যাঁচে ফেলছে কি নতুন

প্রশ্নে ঘায়েল করার মতলব আঁটছে। বললো, এলস্ট্রীতেই গড়ে উঠেছে ইংল্যাণ্ডের ফিল্ম শিল্প। যাবতীয় স্টুডিও সেখানেই। লজ্জা পেলাম। জানা উচিত ছিলো আমার। নিজেও আমি ছবির জগতের মানুষ। এটা নিজেরই অক্ষমতা। তবু তারা সহজভাবেই নিলো।

দশবছর আগের মতই সব। সেই রোমাঞ্চ সেই উত্তেজনা আর আগের বারের মতো এবারও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে শুধু ভোজ আর বৈঠক। দিনগুলো যে কিভাবে স্রোতের মতো হু হু করে কেটে যায় টেরও পাই না।

প্রথমেই ফোন করলেন স্যার ফিলিপ সাস্থন। কত ভোজ যে খেলাম তার বাড়িতে। হাউস অস কমন্সেও নিয়ে গেলেন একদিন আমাকে আর র‍্যালফ্‌কে। সেখানে দেখি লেডি অ্যাশটর হাজির। দেখা মাত্র আমাদের দুজনকেই এক নম্বর সেণ্ট জেমস্‌ স্কোয়্যারের বাড়িতে নেমন্তন্ন। যথা সময়ে গিয়ে হাজির হলাম।

সে তো বাড়ি নয় যেন রাজপ্রাসাদ। ঢুকেই মস্ত এক হলঘর। সেখানে দেখি জর্জ বার্নার্ড শ', জন মেনার্ড কেন্‌স্‌, লয়েড জর্জ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হাজির। ঘুরে ঘুরে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেডী অ্যাশটর। তারপর সে যে কত গল্প কত কথা। আসর জমিয়ে রাখতে শ্রীমতীর তো আর জুড়ি নেই। হঠাৎ ভেতর থেকে তলব। গেলেন চলে। তখন শুরু হলো বার্নার্ড শ'এর কেরামতি। কথা তো বলেন ভারী চমৎকার। আর ভাণ্ডারে শুধু গল্প আর গল্প। একটি কথাও বাদ দেওয়ার উপায় নেই। মাতিয়ে রাখলেন সারাক্ষণ। তারপর খাওয়ার ডাক পড়লো।

কেন্‌সের অগাধ টাকা। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের মালিক। খেতে খেতে করছিলাম তারই সাথে গল্প। বললাম, ব্যাপারটা কি বলুন তো? বাজারে তো শুনি ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড নিয়ে নানান অলৌকিক গল্প। ব্যক্তি মালিকানায় এতো বড় একটা প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধের সময় নাকি সোনা টোনা যা ছিল সব বিক্রী করে হাতে আর নগদ সঞ্চয় বলতে কিছু নেই। শুধু চারশো কোটি পাউণ্ডের বিদেশী মজুতের কাগজ। তখন সরকার এসে চাইলো পাঁচশো কোটি ধার। আপনারা দিলেন। শুধু একবার নয়, কয়েকবার। এ কি নিছকই গল্প না ঘটনা?

বললেন, ঘটনা। এর মধ্যে এতোটুকু মিথ্যে নেই।

—কিন্তু কি করে সম্ভব হলো? টাকার অঙ্কটা যে বিশাল।

বললেন, সেখানেই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের ওপর মানুষের অগাধ বিশ্বাস। তাদেরই সঞ্চিত টাকা তুলে দিয়েছি সরকারের হাতে। তাতে তারা কোন আপত্তি করে নি।

খাওয়া প্রায় শেষ তখন, এমন সময় দেখি লেডী অ্যাশটর নকল দু পাটি দাঁত

লাগিয়ে সে এক দারুণ রগুড়ে সাজ। মুখের আদলটাই গিয়েছে বদলে। ঠানদিদি গোছের ভাব। বললেন, জানো বাছারা, আমাদের সময় কুকুরের গলায় বকলস্ বেঁধে আমরা এইভাবে বেড়াতে বেরুতাম। ঠিক এইভাবে। বলে হেঁটে দেখালেন। আর আমেরিকার বেহায়া মেয়েগুলো কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে ঠিক এমনি ধারা হাঁটে। ঠিক এইরকম। বলে আবারও হাঁটলেন।—তা আমাদের হাঁটার মধ্যে একটা শালীনতার ভাব থাকতো। সে সব দিন কি আর আছে? সব গোল্লায় যেতে বসেছে।

বলবো কি সে হুবহু নকল। চোখের সামনে যেন দেখছি দুই প্রান্তের দুটি দেশের স্বতন্ত্র ভঙ্গি। অভিনয় করলে লেডী অ্যাশটর ভালো অভিনেত্রী হতে পারতেন। দেখতেও অপরূপ। ব্যবহারও চমৎকার। আর গিন্নী হিসেবে তো জুড়ি মেলা ভার। কত খাতির করে যে পারেন মানুষকে খাওয়াতে। আমাকে আর র‍্যাল্‌ফকে প্রায়ই ভোজের আসরে নেমন্তন্ন করতেন। ভারী ভালো লাগতো তার সাহচর্যে সময় কাটাতে।

ভোজের পর সবাই যে যার চলে গেছে। আমি শুধু একলা। লর্ড অ্যাশটর আমাকে নিয়ে চললেন মুনিংসের আঁকা নিজের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি দেখাতে। বসে কাজ করছেন তখন মুনিংস্। কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না স্টুডিওতে। তখন লর্ড অ্যাশটর বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করাতে রাজী হলেন। ঢুকে দেখি মস্ত ছবি। শিকারীর বেশে লর্ড, চারধারে একপাল শিকারী কুকুর। এতো জীবন্ত কুকুরগুলো যেন মনে হয় এখুনি লাফ দিয়ে পড়বে আমাদের ঘাড়ে। বললাম, অপূর্ব। এমন আশ্চর্য জীবন্ত কুকুর আমি দেখিনি। আপনার তুলির টানে কবিতার ছন্দ আছে। তখন বরফ গললো। আমাকে মুনিংস্ দেখালেন আরো অনেক ছবি। সামনা সামনি এঁকেও দেখালেন দু চারখানা। সে অদ্ভুত। তুলি নয় যেন জীবন্ত এক হাতিয়ার।

পরদিন বার্নার্ড শ'র বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের ডাক। খাওয়া দাওয়ার পর নিয়ে গেলেন আমাকে নিজের লাইব্রেরী ঘরে। সে যে কত বই, কত পত্রিকা! জানলা দিয়ে দূরে দেখা যায় টেম্‌স্। একটা তাকে দেখি সার সার শ' এর নিজের লেখা বই। আমি তো থ। এতো লিখেছেন মানুষটা! বলেও ফেললাম মুখ ফসকে কথাটা। বলেই প্রমাদ গণতে শুরু করেছি। এসব ক্ষেত্রে অনিবার্য যা ঘটে আমি জানি। এখুনি মেলে ধরবেন এক একখানি বই, তার পাতার পর পাতা পড়ে শোনাবেন, আমাকে ধৈর্য ধরে শুনতে হবে প্রতিটি ছত্র। শেষে মতামতও বলতে হবে। সেক্ষেত্রে আমার করণীয় কি? সেটাও অমনি ঠিক করে ফেললাম। দোহাই পাড়বো পাশের ঘরে অপেক্ষমান অতিথিবৃন্দের। বলবো বসে আছেন ওরা অনেকক্ষণ ধরে। এবং এই অবস্থায় আমাদের উচিত অবিলম্বে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়া।

অবাক কাণ্ড। একখানি বইও টেনে বের করলেন না। একটি লাইনও শোনালেন

না আমাকে। বললেন, চলুন পাশের ঘরে যাই। ওরা বসে আছেন অনেকক্ষণ একাকী। তখন দুজনে পাশের ঘরে এলাম।

শ্রীমতী শ'-এর সঙ্গেও অনেকবার দেখা হয়েছে। একদিন কথায় কথায় উঠেছিল শ' এর 'দি অ্যাপেল কার্ট' নাটকের প্রসঙ্গ। সে কী রাগ! বললেন, জানেন, বারবার বলেছি তুমি এবার নাটক লেখা বন্ধ করো। তোমার নাটক কেউ পছন্দ করে না। গালাগালি দেয়। তা শুনলে তো!

এরপর টানা তিন হপ্তা যেন আর দম ফেলার ফুরসুতটুকুও নেই। নেমন্তন্নের পর নেমন্তন্ন, ভোজের পর ভোজ। প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে ভোজ, উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে ভোজ। লেডী অ্যাশটর আর স্যার ফিলিপ তো রয়েছেনই সব সময়ের জন্য প্রস্তুত। সুযোগ পেলেই একটা না একটা ছুতো ধরে তলব।

মেরিয়ন ডেভিসের সান্তা মনিকার বাড়িতে চার্চিলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সে অনেকদিন আগের কথা। মস্ত ভোজের আসর। নাচঘরে বসে আছি আমরা প্রায় জনা পঞ্চাশের মতো অতিথি। এমন সময় কোটের পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে নেপোলিয়নের মতো বীরদর্পে দরজার সুমুখে চার্চিলের আবির্ভাব। সঙ্গী হার্স্ট। চলছিল তখন নাচ। দেখলেন তাই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। একটু যেন জড়তার ভাব। যেন পারছেন না পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। চোখাচুখি হতে হার্স্ট হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলেন।

গেলাম। পরিচয় করিয়ে দিয়ে কি একটা কাজে হার্স্ট ভেতরের দিকে গেলেন। দুজন আমরা মুখোমুখি। প্রাথমিক সৌজন্যমূলক আলাপের পর সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গেই পৌঁছে গেলাম। বললাম, একটা ব্যাপার আমার কিন্তু কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। ইংল্যাণ্ডে এই যে সমাজতান্ত্রিক সরকার আপনারা গড়েন ভোটের মাধ্যমে, কই তাতে রাজা রাণী তো দেখি ঠিকই থাকে।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে। ঠোঁটে চাপা হাসির ঝিলিক। বললেন, ঠিকই তো। থাকেই তো। বললাম, তাহলে আর সমাজতন্ত্র বলি কি করে। রাজতন্ত্রও থাকবে, পাশাপাশি সমাজতন্ত্র। দুটো তো আর একসাথে চলতে পারে না।

হাসতে হাসতে বললেন, আপনি যদি ইংল্যাণ্ডে বসে এই সব কথা বলতেন আপনাকে কোতল করা হতো।

পরদিনই হোটেলে নিজের স্যুইটে আমাকে নেমন্তন্ন। আমি ছাড়াও আরো দুজন অতিথি হাজির। ছেলে র‍্যানডলফ্‌ও আছে। ষোল বছর মাত্র বয়েস। কথাবার্তায় ভারী ওস্তাদ। দেখতেও সুপুরুষ। অতি জটিল বিষয় নিয়ে অক্লেশে মতামত দিতে

পারে। বাবার ভারী গর্ব। বলতে গেলে সেদিনকার বেশির ভাগ কথাবার্তা বাপ ছেলেতেই হলো, আমাদের কাজ চুপচাপ শোনা আর মাঝে মধ্যে হ্যাঁ হুঁ বলা। তারপরেও আমেরিকায় থাকাকালীন বেশ কদিন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে।

লণ্ডনে এসেছি শুনে নিজেই যোগাযোগ করলেন। চার্টওয়েলে গ্রাম্য পরিবেশ পুরনো ধাঁচের ছোট্ট বাড়ি। সেখানে র‍্যালফ্ আর আমার নেমন্তন্ন হলো শনি রবির ছুটি কাটিয়ে আসার। বড় ভালো লাগলো গিয়ে। চমৎকার ঘরোয়া পরিবেশ। চার্চিলকেও পেলাম একান্ত আপন করে।

তখনও হাউস অফ কমন্সে পেছনের সারিতে আসন। সুবক্তা। মানুষ হিসেবে অতি চমৎকার। মার্জিত রুচি। জীবনের নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আজ এসে পৌছেছেন সম্মানের শিখরে। জীবনকে উপভোগ করেছেন নানান ভাবে। তাতে এতোটুকু কার্পণ্য নেই। পরবর্তী কালে দেখেছি চরিত্রের আরো নানান বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতার শীর্ষে পৌছেও দেখেছি ক্ষমতার এতোটুকু অপব্যবহার না করতে। আর শখও বটে। এতো ব্যস্ত সারাদিন, তবু ওরই মধ্যে সময় করে ছবি আঁকা, ঘোড় দৌড় মায় রাজমিস্ত্রীর কাজ অব্দি। খাবার ঘরে দেখি দেয়াল জোড়া মস্ত এক ছবি। আমি তাকিয়ে আছি একদৃষ্টে, দেখে বললেন, এটা আমারই আঁকা।

বললাম, সুন্দর এঁকেছেন তো।

—হ্যাঁ। হাসলেন।—ফ্রান্সে বেড়াতে গেছি, দেখি এক শিল্পী বসে বসে ছবি আঁকছে। দেখে মনে হলো তাইতো, পারি কিনা দেখি না একবার পরখ করে। অমনি এঁকে ফেললাম।

পরদিন সকালে বেরোলেন আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ির চারধার দেখাতে। পাঁচিল ঘেরা নাতিদীর্ঘ এলাকা। বললেন, এই পাঁচিল আমার নিজের হাতে তৈরী। শুনে আমি তো হাঁ। ইটের পর ইট গেঁথে পাঁচিল তোলা সোজা কাজ নয়। সে কথা বলতে বললেন, সোজা বৈকি। ভীষণ সোজা। আপনাকে শিখিয়ে দেবোখন। শুধু ভাগটা জানতে হয়। সিমেণ্ট আর বালির। জানলে আপনিও করতে পারবেন।

প্রথম দিন নৈশ ভোজের আসরে উপস্থিত ছিলেন পার্লামেণ্টের কয়েকজন তরুণ সদস্য। চার্চিলের ভারী অনুগত। বুথ্ বি আর ব্র্যাকেনের নাম মনে আছে। পরবর্তী কালে এরা লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ব্র্যাকেন মারা গেছেন হালফিল। খুব মিশুকে। বললাম, ভাবছি গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো। এখন লণ্ডনেই আছেন।

ব্র্যাকেন বললেন, যথেষ্ট আস্কারা দিয়েছি আমরা এই মানুষটাকে। অনশন ধর্মঘট করুক কি না করুক, উচিত হলো ওকে জেলে পুরে রাখা। এছাড়া ভারতের অধিকার বজায় রাখার কোন রাস্তা নেই।

—কিন্তু সত্যি সত্যিই কি এটা কোন রাস্তা হতে পারে? আমি বললাম,—একজন গান্ধীকে জেলে ভরলে আরেকজন গান্ধীর যে উদয় হবে না তার প্রমাণ কি। গান্ধী কোন মানুষ নয়, আসলে একটা প্রতীক। ভারতের অগণতি মানুষের অভাব অভিযোগের প্রতীক। যতদিন না তাদের চাহিদা পূরণ হয় এরকম শয়ে শয়ে গান্ধী জন্ম নেবে।

চার্চিল হাসতে হাসতে বললেন, আপনি তো মশাই দারুণ বলেন। শ্রমিক দলের হয়ে দাঁড়ালে আপনি জিতে যেতেন।

এটাও চার্চিলের আরেক গুণ। অন্যের মতামত মন দিয়ে শোনেন, প্রতিটি মন্তব্যকেই উপযুক্ত মর্যাদা দেন। এমনও দেখেছি, চিন্তায় আকাশ পাতাল ফারাক, তবু তার কথারও গুরুত্ব দেন। রাগ বা বিদ্বেষের ভাব দেখিয়ে মানুষটাকে হেয় করেন না।

ব্র্যাকেন আর বুথ্‌বি বিদায় নেবার পর অতিথি বলতে আমি আর র‍্যাল্‌ফ। ঘরোয়া পরিবেশে এই প্রথম দেখবার সুযোগ হলো মানুষটাকে। আদর্শ গৃহকর্তা বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। নজর চারিদিকে। তারই মধ্যে নানান ধরনের কাজ। বিষয় রাজনীতি। ফোন আসছে একের পর এক। তখন ভোটের সময় তো। তাই চলছে ভীষণ কর্মতৎপরতা। এদিকে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। তলে তলে কোমর বাঁধছে বিরোধী দল।

বাড়ির সবাই মিলে বসেছি খাবার টেবিলে। দেখি সবাই চুপচাপ। কথা বলছেন শুধু চার্চিল। এটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। রাজনীতিকের বাড়ি। রাজনীতির লোকজনই আসেন হামেশা। সে অবস্থায় আলোচনায় অংশগ্রহণের চেয়ে চুপচাপ থাকাই মঙ্গল।

বললেন, মন্ত্রীসভা বলছে বাজেটের হিসেব নাকি মেলানো যাচ্ছে না। বাড়তি কর বসাবার আর কোন জায়গা নেই। শুধু চা টাই যা বাকী।

—আপনি কি মনে করেন চায়ে কর ধার্য করলেই বাজেটের হিসেব মিলে যাবে?

বললেন, মিলতে পারে। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

বললেন বটে তবে তেমন জোর দিয়ে নয়। যেন নিজেরও ব্যাপারটা নিয়ে সংশয় আছে। হয়তো মনের গভীরে নিজেও বোঝেন, এভাবে কর বাড়িয়ে অনন্তকাল ধরে বাজেটের হিসেব মেলানো যায় না, যাওয়া সম্ভবও নয়।

থাকেন ভারী সাদাসিধে ভাবে। চার্টওয়েলের বাড়ির এটাই বৈশিষ্ট্য। কোন আড়ম্বর নেই, নেই কোন লোক দেখানো চমক। নিজের জন্য বড়সড় একখানি শোবার ঘর। তাকে লাইব্রেরী বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু বই আর বই। দেয়ালে তাকে মেঝেয় বিছানার ওপর শুধু বইয়ের গাদা। আলমারীর একটা তাক জুড়ে দেখি নেপোলিয়ানকে নিয়ে লেখা অসংখ্য বই। জিজ্ঞেস করতে বললেন, আমি নেপোলিয়নের একজন অন্ধ ভক্ত।

আমি যে নেপোলিয়নকে নিয়ে ছবি করার কথা ভাবছি হয়তো সেটাও শুনে থাকবেন। বললেন, করুন ছবি। দারুণ জমবে। মজার খোরাকও পাবেন প্রচুর। একদিনের একটা ঘটনা বলি। নেপোলিয়ন স্নান করছেন কলঘরে। বাথটবে বসে আছেন চুপচাপ। এমন সময় আচমকা ভাইয়ের প্রবেশ। নাম জেরোম। দারুণ জেল্লাদার পোশাক পরনে। সোনালী সুতোর নকশা কাটা। কি যেন একটা ব্যাপারে দাদার কাছ থেকে কিছু আদায় করার মতলব নিয়ে এসেছে। নেপোলিয়ন উঠতে গিয়ে তো জলটল লেগে পোশাকের যাচ্ছেতাই অবস্থা। নাকি ইচ্ছে করেই জল ছিটিয়ে ছিলেন নেপোলিয়ন? উঠে বললেন, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। ভাই অমনি সুরসুর করে দে চম্পট। দৃশ্যটা করতে পারলে দারুণ জমবে।

আরেকদিন মনে আছে কোয়াগলিনো রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছেন চার্চিল আর তার স্ত্রী। ঘটনাচক্রে আমিও সেসময় সেখানে উপস্থিত। দেখি ভারী মনমরা ভাব। মুখ চুণ করে চুপচাপ বসে আছেন। কাছে গিয়ে বললাম, কি ব্যাপার গম্ভীর যে? সারা দুনিয়ার যাবতীয় ঝামেলা বুঝি গিলে বসে আছেন। এখন আর হজম হচ্ছে না?

স্ত্রী বললেন এই মাত্র হাউস অফ কমন্সে মস্ত এক বিতর্ক সেরে এলেন। জার্মানী নিয়ে হৈ চৈ। মেজাজ তাই খিচড়ে আছে।

আমি প্রসঙ্গ লঘু করার জন্যে কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, হাতের ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, হাল্‌কা করে ভাববার মতো ব্যাপার মোটেই নয়। এর গুরুত্ব অসীম। ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে।

এর কদিন পরেই গেলাম গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে।

মানুষটার প্রতি বরাবরই আমার শ্রদ্ধা। অদম্য ক্ষমতা আর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। আশ্চর্য, লণ্ডনে তিনি এসময় এলেন কেন! ঠিক হয় নি তো আসা। নিজেকে হেয়ই করলেন বলা চলে। দূর থেকে এতোদিন যা শুনেছি তার সম্বন্ধে—কোথায় রইলো সে সবের গুরুত্ব? আর ঐ দৈনন্দিন ঈশ্বর ভজনা—তারও তো দেখি আর কোন আকর্ষণ নেই। ইংল্যাণ্ডের এই প্রচণ্ড শীতে হাঁটু অব্দি তোলা কাপড়। যেন মানায় না এখানে, যেন বড্ড চোখে লাগে। মনে হয় যেন রগড়। অতিরিক্ত যেন সব কিছুই। বরং দূরে থাকলেই আকর্ষণ আমাদের বাড়তো। কাছে বলেই এই রকম। তা এহেন ব্যক্তির সঙ্গে বললো যখন একজন দেখা করার কথা, আমি তো এক পায়ে খাড়া। ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনা। রাজী হলাম।

সে ইস্ট ইণ্ডিয়া ডক রোড ছাড়িয়েও আরো অনেকখানি পথ। ঘিঞ্জি এলাকা। বস্তী বলাই ভালো। থাকে সেখানে নিম্ন আয়ের মানুষ। ছোট্ট একটা বাড়ি। দোতলা।

যেতে যেতে দেখি পথের দু ধারে অগণিত মানুষ আর ছবি তুলিয়ের ভিড়। দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। এমনকি বাড়িতেও ঠাসাঠাসি ভিড়। দেখা হবে আমার সঙ্গে দোতলার ঘরে। বারো ফুট বর্গাকার ঘর। চাপা দেয়াল! মহাত্মা তখনও এসে পৌছননি। আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালো। আসা ইস্তক তো ভাবছি মনে মনে কি ভাবে কোন্ প্রসঙ্গ টেনে কথা শুরু করা যায়। শুনেছি তো অনেক কিছুই। তার অনশন ধর্মঘট, তার গ্রেপ্তার বরণ, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। গল্প কথার মতো ঘোরে সবার মুখে মুখে। তবে যন্ত্র বর্জনের ব্যাপারে সম্মতি কেন সেটা ভালো করে বুঝি না। শুনিও নি এ সম্বন্ধে তেমন কিছু। দেখা যাক।

অবশেষে এলেন। নামলেন ট্যাক্সি থেকে। জনতার মধ্যে বিপুল আলোড়ন। ধ্বনি দিলো। সাবাস দিলো। গায়ে সেই এক ফালি কাপড় আর পরনে হাঁটু অব্দি তোলা কৌপীন। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য বটে। জনমণ্ডলীর মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসছেন, ধ্বনি দিচ্ছে জনতা, হাঁটছে তার পেছন পেছন, আর তিনি কোনদিকে দৃকপাত না করে সোজা আসছেন বড় বড় পা ফেলে। জানলা দিয়ে সব আমি দেখতে পাচ্ছি। ঢুকলেন বাড়িতে। তারপর সিধে দোতলা। গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার সামনে। ধ্বনি দিচ্ছে তখনো জনতা। আমাকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরার হাজারো ক্লিক। সোফায় এসে বসলাম। আমি ডাইনে। ছবি নেওয়া হলো। বুক ধুক পুক করছে। কথা বলতে হবে এবার। অহেতুক কিছু বললে মুশকিল। বেশ ভেবে চিন্তে এমন কিছু বলা উচিত যাতে অন্ততঃ প্রমাণ হয় আমি খোঁজ খবর কিছুটা রাখি। যদিও জানিনা তেমন কিছুই। সেটা তো আর বুঝতে দেওয়া যায় না। অতএব মস্ত সমস্যা আমার সামনে। এদিকে বসা ইস্তক আমার ডাইনে বসা এক মহিলা কত কি বলতে শুরু করে দিয়েছে। ঘাড় নাড়ছি শুধু। বুঝি না তার এক বর্ণ। তখন একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে—কি বলবো গান্ধীকে। কিভাবে আলোচনা শুরু করবো। মোটমাট শুরুটা আমাকেই করতে হবে। তাই বলে তো আর বলা যায় না আমার শেষ ছবিটা কেমন লাগলো? ছবি কোনদিন দেখেন কিনা সেটাই সন্দেহ। তখন আরেক মহিলা বসেছিলেন গান্ধীর বাঁ দিকে। আমার ডাইনে বসা মেয়েটিকে বললেন, আপনি এবার একটু থামুন। ওঁকে গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে দিন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ। এতো নিঃশব্দ চারধার যেন একটা ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। গান্ধী চুপ। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি বটে। মনে হলো সারা পৃথিবী যেন থমকে আছে আমাদের কথা শোনার জন্যে। গলা ঝাড়লাম। ভীষণ

অস্বস্তি লাগছে। বললাম, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। শুধু একটা ব্যাপারে ছোট্ট একটা প্রশ্ন। যন্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত আপনারা কেন নিলেন ?

মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো গান্ধীর মুখ।

বললাম, যন্ত্র যদি সঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে সেটা তো জনগণের পক্ষে আশীর্বাদই বলা যেতে পারে। দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। সারাদিন ধরে মুখে রক্ত তুলে খাটতে হবে না। খাটবে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। বাকী সময় আনন্দ করবে ফুর্তি করবে। এতে আপনাদের অসুবিধে কি ?

বললেন, ঠিকই। আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ভারতের এখনও সে লক্ষ্যে পৌছবার সময় হয় নি। আগে মুক্তি তারপর যন্ত্র। ইংরেজ আগে আমাদের দেশ থেকে চলে আসবে। যন্ত্রের ব্যবহার তো এতোদিন বিস্তর দেখলাম। যন্ত্র আমাদের দিনকে দিন করে তুলছে ইংল্যাণ্ডের মুখাপেক্ষী। আমরা আর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চাই না। তাই আহ্বান জানিয়েছি যন্ত্রজাত যাবতীয় জিনিস বর্জন করতে। সবাইকে বলেছি নিজের কাপড় নিজেকে বুনে নিতে। এই ভাবেই সংগঠিত করছি আমাদের আক্রমণ। ইংরেজ অতি শক্তিশালী জাতি আমরা জানি। তবু লড়বো তার বিরুদ্ধে। এ আমাদের সংকল্প। তাছাড়া যন্ত্র বর্জনের আরো অনেক কারণ আছে। ভারত আর ইংল্যাণ্ডের জলবায়ু ভিন্ন প্রকৃতির। ইংরেজ আর ভারতীয়ের আচার আচরণেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যে জিনিসটা এখানে দরকার সেটার প্রয়োজন আমাদের ওখানে যে থাকবেই এমন কোন কথা নেই। সেক্ষেত্রে জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার একটা ব্যাপার আছে। যেমন ধরুণ খাদ্য গ্রহণের জন্য আপনাদের এখানে দরকার কাঁটা-চামচ। আমরা হাত দিয়েই খাই। কাঁটা চামচের প্রয়োজন আপনারা যতটা অনুভব করেন আমরা একেবারেই নয়। এরকম আরো অনেক বৈপরীত্য আছে।

ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হলো এতোক্ষণে। কৌশলের দিক এটা—লড়াইয়ে জিতবার এক প্রধান অবলম্বন। এই যন্ত্র বর্জন। বিলিতী পণ্য বর্জন। বাস্তব জ্ঞান আছে মানুষটার। আর আছে লৌহ কঠিন সংকল্প। পারবেন অবশ্যই শেষ অব্দি চালিয়ে নিয়ে যেতে এই লড়াই। প্রসঙ্গতঃ বললেন, চরম মুক্তির অর্থ হলো সর্বত্যাগ। অপ্রাসঙ্গিক অহেতুক সব কিছু বর্জন। হিংসায় মুক্তি লাভ করা যায় না। হিংসা সব দেয় নষ্ট করে।

একটু পরে ফাঁকা হয়ে গেলো ঘর।

শুধু আমি আর গান্ধী আর তার অনুগত ভক্তের দল। বললেন, প্রার্থনা শুরু হবে। আপনি কি দেখতে আগ্রহী ? বললাম, দেখবো বলেই তো আমি এসেছি। তখন

বসলেন মেঝেতে পা মুড়ে। চারপাশে গোল হয়ে বসলেন আরো পাঁচজন। বেশ লাগছে দেখতে। স্থান লণ্ডন। তারই একধারে এই এলাকা। ছোট্ট একখানা ঘর। জানলার বাইরে অস্তায়মান সূর্যের ফিকে লাল আভা। অনেকটা গেরুয়া সেই রঙ। আর ঘরে বসা এই ছটি মানুষ। ত্যাগের প্রার্থনায় কণ্ঠ মিলিয়েছেন। চার পাশের প্রচণ্ড বৈভবের মধ্যে ত্যাগ! তাতে নেই লৌহ কঠিন সংকল্পের ইশারা। নেই গভীর রাজনীতি বোধ। আইন পড়েছিলেন আগে শুনেছি। নেই গানে আইনের এতোটুকু গন্ধ। শুধু সুর। শুধু গান। শুধু প্রার্থনা। তাতে সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

'সিটি লাইটস্' উদ্বোধনের দিন বৃষ্টি হলো মুষলধারে। তাতে অবিশ্যি ভিড়ের কিছু কমতি নেই। ছবি নিলো দর্শক। বার্নার্ড শ'র পাশে বসে আমিও আগাগোড়া দেখলাম মুহুর্মুহু উঠছে হাস্যরোল আর হৈ হৈ চিৎকার। ছবির শেষে আমি আর শ' উঠে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালাম। তাতে আরো এক দফা হাসি। মোটের ওপর ভালোই কাটলো সারাক্ষণ।

চার্চিলও এসেছিলেন ছবি দেখতে। ছবির শেষে ভোজসভা। সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি দিলেন এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ। তাতে আমার ছোট বেলা থেকে শুরু করে আমার সংগ্রাম আমার বর্তমান সবই বলা হলো। শেষে বললেন, সারা দুনিয়ার ভালোবাসা লাভে ধন্য আমাদের চার্লি চ্যাপলিন, আমি তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

জবাবে আমারও কিছু বলা উচিত। উঠে দাঁড়ালাম, গলা ঝেড়ে যথোচিত গাম্ভীর্য সহকারে শুরু করলাম, সমবেত ভদ্রমহোদয় ভদ্রমহিলা এবং অতিথিবৃন্দ, আমার বন্ধু রাজস্ব দপ্তরের বিগত চ্যান্সেলার সম্মানীয় শ্রীযুক্ত····

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাস্যরোল। দেখি চার্চিলও হাসছেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, এটা ভালোই বলেছেন। বিগত চ্যান্সেলার। বি-গ-ত। বলে আবারও হাসি।

তখন খেয়াল হলো। শুধরে নিয়ে নতুন করে গলা ঝেড়ে আবার শুরু করলাম, —সমবেত ভদ্রমহোদয়, ভদ্রমহিলা এবং অতিথিবৃন্দ, আমার বন্ধু রাজস্ব দপ্তরের প্রাক্তন চ্যান্সেলার সম্মানীয় শ্রীযুক্ত চার্চিল যে কথা বললেন········

সে যাত্রা আর হাসির হুল্লোড় উঠলো না।

শ্রমিক দলের প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। তার ছেলে ম্যালকম। আমাকে আর র‍্যালফ্‌কে নেমন্তন্ন করলো তাদের বাড়িতে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হতে। পৌঁছে দেখি সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। এটা নৈমিত্তিক অভ্যাস। মাথায় টুপি, কান ঢাকা মাফলার, ঠোঁটের কোণে দাঁতে কামড়ে ধরা পাইপ, হাতে লাঠি—অনেকটা গাঁয়ের মোড়লদের মতো চেহারা। শ্রমিক দলের নেতা বলে চট করে চিনে নিতে অসুবিধে হয়।

তবে প্রচণ্ড রাশভারী মানুষ আর নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কথাবার্তায় অত্যন্ত সপ্রতিভ। কিছুটা পরিহাসপ্রিয়ও বটে।

আস্তে আস্তে ভেতরের মানুষটাকে চিনতে পারলাম।

প্রথম দিকে গাম্ভীর্যের খোলসে আঁটা কথাবার্তা। ভীষণ মাপা, ভীষণ সংক্ষেপ। নৈশভোজের পর বসেছি ঐতিহাসিক লং রুমে কফির কাপ হাতে। ঘরেব চারধার ইতিহাসের নানান নিদর্শনে বোঝাই। তাই নিয়েই কথাবার্তা চলছে। ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ছে দেশের বর্তমান অবস্থার কথা। বললাম, একুশ সালে প্রথমবার এসেছিলাম যখন এখন তার চেয়ে অনেক উন্নতি নজরে পড়ছে। বিশেষ করে দারিদ্র্যের প্রশ্নে। সেবার দেখেছিলাম টেম্সের ধারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে রাশি রাশি মানুষ, তাদের মধ্যে বুড়ো বুড়ির সংখ্যাই বেশি। এবার দেখছি বুড়িরা আর নেই। শুধু বুড়োর দল। সেটা উন্নতির একটা নিদর্শন সন্দেহ নেই। তাছাড়া দোকানেও মালপত্র প্রচুর। বেশ সাজানো গোছানো লাগছে এবার। নির্ঘাৎ শ্রমিক সরকার আসার ফলেই এতোটা উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

শুনলেন প্রতিটি কথা মন দিয়ে। মুখে গম্ভীর্যের সেই অটুট আবরণ। বলা তখনও শেষ হয়নি আমার। এবার মোক্ষম সেই প্রশ্ন। বললাম, এই যে সরকার আপনাদের—যাকে আপনারা নিজেরাই বলেন সমাজতান্ত্রিক—ক্ষমতায় আসার পর পেরেছো কি শাসনতন্ত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন করতে? বললেন, না। এবং সেটাই ব্রিটিশ রাজনীতির একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতায় এলে সবাই আমরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ি। তখন সব জারিজুরি বন্ধ হয়ে যায়।

বলে প্রথমদিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ দর্শনের অভিজ্ঞতা বললেন।

—তা গিয়ে তো পৌঁছলাম প্রাসাদে। সাদর অভ্যর্থনা করলেন মহারাজ। বললেন, এবার বলুন দেখি আপনাদের সমাজতান্ত্রিক সরকার আমার ব্যাপারে কি ভেবেছে?

—বললাম, নতুন আর কি ভাববে? যা চিরাচরিত তাই। একই সাথে আপনার এবং জনগণের সেবা করে যাবো।

তখন ভোটের হাওয়া খুব উঠেছে। লেডী অ্যাশটর দাঁড়িয়েছেন এবারও ভোটে। আমাকে আর র‍্যালফকে একদিন নিয়ে গেলেন তার ভোটকেন্দ্রে। সভা সেখানে সেদিন। জাহাজঘাটার কাছে ধীবর সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা। আমাকে বললেন তার হয়ে কিছু বলতে। কি বলবো? আমি তো শ্রমিক দলের সমর্থক। বললাম সেকথা। আমার চিন্তা ভাবনা যে তার দলের কর্মসূচীর পরিপন্থী সে কথাও জানালাম। বললেন, কিছু যায় আসে না তাতে। আপনি যা মনে চায় বলবেন। মোটামুটি আপনার উপস্থিতিটাই বড় ব্যাপার।

গিয়ে দেখি খোলা মেলা একটা মাঠ। তাতে বিস্তর মানুষ। বিশপ এসেছেন

আমাদের সঙ্গ দিতে। এটা প্রথা। খোলা একটা ট্রাক দাঁড়ানো এক ধারে। সেটাই মঞ্চ। তারই ওপর দাঁড়িয়ে দিতে হবে বক্তৃতা। সভা শুরু হলো।

সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে লেডী অ্যাশটর নেমে এলেন। এবার আমার পালা। উঠলাম আমি ট্রাকে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে বিশপ।

আশ্চর্য, একটা ব্যাপার, এসে ইস্তক লক্ষ্য করছি, মানুষটা যেন খুশী নন আমাদের দেখে। গোঁজ হয়ে আছে মুখ। যেন আসাটা নিয়ম তাই এসেছেন দায়ে পড়ে নিয়ম রক্ষা করতে।

শুরু হলো আমার বক্তৃতা।

বললাম, বন্ধুগণ কেমন করে ভোট দিতে হয় এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। না জানলে শিখিয়ে দিতে পারি আমরা। অর্থাৎ আমাদের মতো এই কোটিপতির দল। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক। আপনাদের আর আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান।

বিশপ দেখি চকিতে চোখ তুলে দেখছেন আমাকে। মুখে হাসির ঝিলিক। বললেন চমৎকার! তারপর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

বললাম, বন্ধুগণ লেডী অ্যাশটর এবং আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন বিষয়ে মিল আছে। আবার অমিলও অনেক। সেগুলো কি আমার চেয়ে আপনারা ভালো জানেন। নতুন করে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার আর দরকার আছে বলে মনে করি না।

বিশপ বললেন, অপূর্ব! চমৎকার! দারুণ বলেছেন কথাটা। দারুণ!

—তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে বলতে গেলে এটুকুই বলতে হয়, লেডী অ্যাশটর তার কেন্দ্রে ভালোই কাজ করেছেন। সেটা আপনাদের না জানার কথা নয়। মানুষ হিসেবেও তিনি অতি চমৎকার। এর বেশি আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মনেপ্রাণে তার সাফল্য কামনা করি।

বলে বক্তৃতা শেষ করতে বিশপের সে কী করমর্দনের ঘটা! সারা মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। হয়তো আশা করেন নি এতটা। শুনে খুব আনন্দ হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের ধর্মপ্রচারকদের দেখেছি এই একটা বড় গুণ। অকপট সারল্যে নিজেদেরকে তারা তুলে ধরতে পারেন। ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়ে যে কোন দায়িত্ব পালন করতে। পারেন। এই নিষ্ঠা নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিলেন ডঃ হিউলেট জনসন, ক্যানন কলিন্স্ এবং আরো অনেকে। বারেবারে প্রেরণা জুগিয়েছেন গীর্জার কর্মপ্রবাহে। তারই ধারায় নতুন ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে মানুষের ধর্মীয় জীবন।

র‍্যালফ কে কদিন ধরে একটু যেন কেমন লাগে। একদিন দেখলাম বাইরের ঘরে টেবিল

ঘড়িটা বন্ধ। বিদ্যুতে চলে। দেখলাম তার-টার সব কাটা। জিজ্ঞেস করতে বললো, সেই কেটেছে। ঘড়ির টিকটিকানি নাকি তার অসহ্য।

ধাক্কা খেলাম। এটা তো স্বাভাবিক আচরণ নয়। নির্ঘাৎ কোথাও কিছু গোলমাল হচ্ছে। খেয়ালীপনাও হতে পারে। এমনিতে তো বড্ড খেয়ালী। তবে সেটা নিউইয়র্কে থাকতেই বেশি বেশি করে টের পেতাম। এখানে আসা ইস্তক একদিনের তরেও দেখিনি। দেখা যাক শেষ অব্দি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আগেই ফিরে যাবে দেশে। আমি থাকবো। বললো মেয়ের সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাবে। ব্যাপারটা আমি জানতাম। মেয়ে হ্যাকনিতে থাকে। খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা নেবার পর মঠের সন্নিসী হয়েছে। এই সবে গেলো বছর। বয়েস এখন মাত্র উনিশ। র‍্যালফের প্রথম স্ত্রীর সন্তান। নাকি চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই ধর্মে কর্মে মতি। র‍্যালফ্ বলেছে আমাকে। স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে বিস্তর চেষ্টা করেছে নিবৃত্ত করতে। পারেনি। ছবি দেখালো একখানা। তিন বছর আগের তোলা। অপূর্ব সুন্দর দুটি চোখ। ভরাট মুখ। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক। আশ্চর্য, এতো সুন্দরী দেখতে মেয়েটি—কি তার দুঃখ, কেন সংসার ত্যাগ করে চায় সন্ন্যাস নিতে!

চেষ্টার ত্রুটি করেনি র‍্যাল্ফ। নিয়ে গেছে প্যারিসে। সেখানে নাচের আসর নাইট ক্লাব ঘুরিয়ে এনেছে সব। হাসি খুশী হৈচৈ হুল্লোড় দিয়ে ভরিয়ে রাখতে চেয়েছে প্রতিটি মুহূর্ত। পারেনি তবুও। ফেরেনি মন ধর্মের দিক থেকে। শেষে মত দিতে বাধ্য হয়েছে। আঠারো মাস মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। সেই গেছে কবে ঘর ছেড়ে। তারপর মঠে শিক্ষানবিশী। এখন পুরোদস্তুর সন্ন্যাসিনী। ঘরের টান বলতে এখন আর কিছু নেই।

হ্যাকনি জায়গাটা শহরের সেই একেবারে শেষ প্রান্তে। বস্তি এলাকা। তারই মাঝখানে মাথা তুলে আছে গীর্জা। বসালো আমাদের ছোট্ট বৈঠকখানায়। অধ্যক্ষ এলেন দেখা করতে। মনের অভিপ্রায় জানালাম। চলে গেলেন ভেতরে। তারপর শুধুই প্রতীক্ষার লগ্ন। এলো সে। দেখে এমন কষ্ট পেলাম! সেই ছবির মতো হুবহু মুখখানি। সেই কালো কাজল দুটি চোখ। হাসিটুকুও সেইরকম। শুধু দেখি দু পাশের দুটো দাঁত তুলে দেওয়া হয়েছে। আর কোন পরিবর্তন নেই।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তিনজন বসে আছি আমরা ঘরে। সাঁইত্রিশ বছরের র‍্যাল্ফ একের পর এক খেয়ে চলেছে সিগারেট। কথা নেই মুখে। পাশে আমি। উলটো দিকে উনিশ বছরের পূর্ণ যুবতী এক সন্ন্যাসিনী। সেও বেশির ভাগ সময়ই নির্বাক।

অসহ্য লাগছে। উঠলাম। বললাম, আমি বরং গিয়ে গাড়িতে বসি। বাধা দিলো দুজনেই। ফলে বসে থাকতে হলো।

ফুল শুকিয়ে গেলে ঠিক যেমন হয়। যেন শুকিয়ে যাচ্ছে যৌবন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বড় দুর্বল লাগছে। কথা বলতে যেন ভীষণ কষ্ট। মাস্টারী করে এখন গীর্জার স্কুলে। বললো, বড় দুষ্টু ছেলেগুলো। পারি না সামলাতে। আর একেবারে নতুন তো। ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে যাবে।

আর র‍্যালফ ? কি বলবো তার মনোভাব কেমন। এই বসে আছে চুপচাপ, এই দেখি পড়াবার কথা শুনে ঝিকিয়ে উঠলো চোখ। যেন ভারী অহংকার তার মেয়েকে নিয়ে। এদিকে একটার পর একটা অবিরাম খেয়ে চলেছে সিগারেট। সেটা কি মনের চঞ্চলতা চাপা দেবার জন্যে ?

আর বাবা মেয়েতে যেন দুস্তর এক ব্যবধান। সংসার সম্বন্ধে মেয়ের আর কোন আগ্রহ নেই। চায় না সে পুরনো সম্পর্কের সুতো আকড়ে থাকতে। মুখে আশ্চর্য এক প্রশান্তির ছাপ। তবে ভেতরে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে নিদারুণ এক দুঃখবোধ। বললো, আমাদের লণ্ডনে আসা ইস্তক যাবতীয় খবর সে কাগজে খুঁটিয়ে খুটিয়ে পড়েছে। র‍্যাল্‌ফকে জিজ্ঞেস করলো জার্মেনের খবর। র‍্যাল্‌ফের পাঁচ নম্বর বৌ। র‍্যালফ বললো, সে আর নেই, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো,—জানেন বাবার এই বৌগুলোর সাথে আমি মোটেই মানিয়ে নিতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, তবুও।

শুনে আমরাও হেসে উঠলাম।

র‍্যাল্‌ফ জিজ্ঞেস করলো কতদিন হ্যাকনিতে তাকে থাকতে হবে। বললো, ঠিক নেই। কিছুই আগে থেকে বলে না। তবে শুনছি আমাকে নাকি আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবে।

বললাম, বেশ তো, পৌছে তাহলে তুমি বাবাকে চিঠি দিও।

বললো, আমাদের বাইরের কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বারণ।

—বাবা মার সঙ্গেও না ?

—হ্যাঁ। বলে ইতস্ততঃ করলো। সহজ হবার চেষ্টা করলো। পারলো না।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। আমরা উঠলাম।

এগিয়ে এসে ধরলো বাবার হাত। সে যে কত আপন কত অন্তরঙ্গ। যেন কত কি বলতে চায়। বোঝাতে চায় কত কিছু। শুধু ভাষা নেই তার। শুধু মৌনতা। শুধু নৈঃশব্দ।

চলেছি ফিরে। গাড়িতে সারা রাস্তা র‍্যালফ চুপ। আমিও পারছি না কিছু বলতে। তারপর ফিরে গেলো র‍্যালফ আমেরিকায়। দু হপ্তা পরে শুনি আত্মহত্যা করেছে নিজের বাসায়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মাথায় জড়িয়ে নিয়েছিলো সাদা একফালি কাপড়। তারপর গুলি করেছে কপাল ...ক করে।

মাঝে মাঝেই যাই এইচ. জি. ওয়েলসের সাথে দেখা করতে। বেকার স্ট্রীটে আছে নিজস্ব

ফ্ল্যাট। যখনই যাই দেখি চার চারটি মহিলা সেক্রেটারী হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে এটা ওটা নানান বইয়ের ওপর, মাঝে মাঝে টুকছে কি সব খাতায়, আবার পড়ছে খানিকটা, পাতা ওলটাচ্ছে, এই কাজ। জিজ্ঞেস করতে ওয়েলস্ বললেন, 'দি অ্যানাটমি অফ মানি' বইয়ের কাজ চলছে। এ তারই প্রস্তুতি।

বললাম, আছেন বেশ! নিজের কাজ করে দিচ্ছে অন্যে। আর আপনি শেষে বসে বসে জোড়া দেবেন।

হালকা ভাবেই বলা, তবু কথাটা মিথ্যে নয়। দেখি তাকের ওপর সাজানো সারি সারি টিনের বাক্স। তার কোনটাতে লেখা 'জীবনী', কোনটাতে 'ব্যক্তিগত চিঠিপত্র,' কোনটায় 'দর্শন,' কোনটায় 'বৈজ্ঞানিক তথ্য' ইত্যাদি। এক একটা বাক্সে এক এক রকম লেখা। মেয়েরাই গোছগাছ করে রেখে দেয়। পরে তাই নিয়ে বেরোয় এক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

ডিনারের পরে আসতো বন্ধুরা। আসতেন অধ্যাপক ল্যাস্কি, হ্যারল্ড প্রভৃতি নামকরা পণ্ডিতের দল। ল্যাস্কি তখন নেহাতই ছোকরা। হ্যারল্ড বক্তা হিসেবে অনবদ্য। ক্যালিফোর্নিয়ায় আইনজীবীদের সভায় শুনেছি আমি ওর বক্তৃতা। টানা একঘণ্টা বলেছিলেন, থামেননি একবারও, লেখাজোকাও কিছু ছিল না সামনে। আর বলবার সে কী চমৎকার কায়দা! ওয়েলসের বাড়িতে বৈঠকে একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন আমাকে সমাজতান্ত্রিক দর্শন সম্পর্কে তাঁর নবতম তত্ত্বের কথা। গতিটাই হলো সবচেয়ে বড় ব্যাপার। গতির এতোটুকু হেরফের সমাজ জীবনে প্রচণ্ড ব্যবধানের সূচনা করে। এছাড়াও কত যে আলোচনা হতো। চলতো ওয়েলসের ঘুমোতে যাবার আগের মুহূর্ত অব্দি। ঘুমোবার সময় হলেই ঘন ঘন ঘড়ি দেখতেন। আমাদের দিকে বারে বারে তাকাতেন। অর্থাৎ আর কেন এবার ভাগো। আমরাও যে যার উঠে পড়তাম।

১৯৩৫ সালে গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা আমি পড়েছি। খুব দু কথা শুনিয়ে দিলাম। অপমানজনক কিছু মন্তব্য করেছেন। বললাম বলুন কেন লিখেছেন ঐ সব অহেতুক কথা? কি দেখে এসেছেন আমাকে হুবহু বলুন।

বললেন যা, আমি তো শুনে থ। রূঢ় নির্মম কিছু সমালোচনা! তিক্ততার স্বাদই তাতে বেশি। রাশিয়া সম্পর্কে কোন মোহই আর তাঁর নেই।

—কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি ঠিক? আমি প্রশ্ন করলাম,—বাস্তব অবস্থাটাও আপনাকে ভেবে দেখতে হবে। সামনে কঠোর দায়িত্ব। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ। তার ওপর বাইরে 'ভেতরে দু রকমের চক্রান্ত। আরো কিছুদিন আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা দরকার।

ওয়েলস্ তখন রুজভেল্টের নয়া ফরমান নিয়ে খুব মেতে উঠেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ধনতন্ত্রের বিনাশের মধ্যে দিয়ে আমেরিকায় গড়ে উঠবে আধা সমাজতান্ত্রিক অবস্থা। স্ট্যালিনকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করলেন। রাশিয়ায় গিয়ে দেখা করে এসেছেন স্ট্যালিনের সঙ্গে। বললেন স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়া অত্যাচারী একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

বললাম, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি। আপনি নিজে সমাজতন্ত্রী হিসেবে বিশ্বাস করেন ধনতন্ত্রের যুগ শেষ হতে চলেছে। পাশাপাশি যদি সমাজতন্ত্রও রাশিয়ায় ব্যর্থ হয়, তাহলে গোটা দুনিয়ার সামনে আশা বলতে কি রইলো?

বললেন, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হবার নয়। কি রাশিয়ায়, কি অন্য কোথাও। কিন্তু এ জিনিস ব্যর্থ হতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রের এই বিশেষ ধরনের বিকাশ। যেটা রাশিয়ায় এখন চলছে। একে একনায়কতন্ত্র বললে ভুল হয় না।

—নয় মেনেই নিলাম ভুল করেছে রাশিয়া। এবং ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রতিটি দেশেরই শাসন পরিচালনায় কিছু না কিছু ভুল দেখা যায়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে মস্ত বড় ভুল তার বিদেশের যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করা। এটাকে বলছে ওরা জারের ঋণ। তাই যদি হয় তবে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব তাদের নয়। সেদিক থেকে ভুল নয়, বরং হাজারবার ঠিক। প্রতিফলটা অবশ্য মোটেই সুবিধার নয়। সারা দুনিয়াকে করে তুলেছে শত্রু। তারা একঘরে করছে, যাবতীয় লেনদেন বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ ভয় দেখাচ্ছে আক্রমণের। ভবিষ্যতে হয়তো এমনও দেখা যেতে পারে ঋণ শোধ করতে হলে যা দিতে হতো এর ফলে ক্ষতি হবে তার দুগুণ কি তিনগুণ।

মেনে নিলেন ওয়েলস্। বললেন, তত্ত্বের দিক থেকে নির্ভুল আপনার বিশ্লেষণ। কিন্তু বাস্তব মতে নয়। আসলে এই যে যাবতীয় ঋণ এরা অগ্রাহ্য করছে, এটা সমাজতন্ত্রের অন্যায় বিকাশেরই ফল। সস্তা লোভ দেখিয়ে জনগণকে পক্ষে টানা হচ্ছে। বোঝানো হচ্ছে, ঋণ শোধ করতে হলে তাদের নিজের ভাণ্ডারেই টান পড়বে। তা কি আর কেউ চায়?

বললাম, ঋণ শোধের সিদ্ধান্ত নিলে অবিশ্যি একটা মস্ত সুবিধে হতো। বিদেশ থেকে বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে বিস্তর ধার নিয়ে তাই দিয়ে গড়ে তুলতো নতুন রাশিয়া। সেক্ষেত্রে অবশ্য ধনতন্ত্র টিকিয়ে রাখারও একটা পরোক্ষ মদত হতো। সে ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

বললেন, যা হয়নি তা নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই। মোটমাট ভুল যা হয়েছে তা আর এখন সারাবার উপায় নেই।

অদ্ভুত এই মানুষ। কত যে রূপ। ফ্রান্সের দক্ষিণে ছোট্ট বাড়ি ছিলো একখানা,

তাতে রাশিয়ান এক মহিলা থাকতেন। ওয়েলসের তিনি রক্ষিতা। গল্প শুনেছি বিস্তর। নাকি বড্ড মেজাজী। শোবার ঘরে আগুন পোয়াবার চুল্লীর ওপর ছোট্ট একফালি পাথরের ফলক, তাতে খোদাই করে লেখা—দুই প্রেমিকের নীড়।

মাঝে মাঝেই জায়গা বদল হতো ফলকের। সে-ও সেই মেজাজ। ওয়েল্‌স্‌ই গল্প করেছেন। বলতেন, জানেন, খুব তো ঝগড়া হলো একচোট। আমিও অমনি কাজের লোককে হুকুম দিলাম, এটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। নিলো সরিয়ে। খানিক পরে ভাবসাব হলো। আবার সব স্বাভাবিক। তখন আবার বলতাম, যাও আবার এনে জায়গা মতো রেখে দাও। তাই দিতো। শেষে এতো ঘন ঘন ঘটতে লাগলো ঘটনা, তাকে বললে সে আর গা করে না। জানে তো একটু পরে মিটে যাবে। তবে আর মিথ্যে খাটুনি খেটে কি দরকার।

একত্রিশ সালে বেরুলো 'দি অ্যানাটমি অফ মানি'। দু বছর লেগেছে বইখানা শেষ করতে। ভারী ক্লান্ত ওয়েলস্‌। বললাম, কি করবেন এবার?

বললেন, কি আবার আরেকখানা বই লিখবো।

বললাম, অবাক কাণ্ড। আপনার কি একটু বিশ্রাম নেবারও দরকার হয় না? শুধু কাজ আর কাজ?

হাসতেন। বলতেন, কাজ ছাড়া আর কি করবার আছে বলুন।

অবাক মানুষ। ভদ্র বিনয়ী নীতিনিষ্ঠ। আর ততোধিক লাজুক। একবার মনে আছে কি একটা কথা লিখতে গিয়ে একটি মাত্র অক্ষর বসাতে ভুলে গেছেন। কী লজ্জা সেই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। আমি তো অবাক! কত অক্ষর দিই আমরা হেলায় উড়িয়ে। আর উনি কিনা তাই নিয়ে কত ভাবিত, কত চিন্তিত। বলতেন, জানেন আমার কাকা ছিলেন বাগানের মালি। আজীবন সেই কাজই করে গেছেন। আমাকেও বলতেন কাজে লেগে পড়তে। ভাগ্যিস পড়াশুনোটা মাঝখান থেকে শিখে ফেললাম!

আমাকে জিজ্ঞেস করতেন সমাজতন্ত্রের প্রতি আসক্তি আমার কিভাবে জন্মালো। বলতাম। সেই তো যেবার এলেন আপটন সিনক্লেয়ার আমেরিকায়। তার মুখ থেকেই তো শুনলাম সব, মনে শ্রদ্ধা এলো, বিশ্বাস এলো, ভালবাসা জন্মালো। বলতেন, এই যে লাভ লোকসান—একজন করে লাভ আরেকজনের লোকসান ঘটিয়ে—এ আপনি ভালো বলেন কি মন্দ বলেন। আমি বলতাম, এমন দুরূহ প্রশ্নের জবাব দিতে প্রথমে চাই একজন হিসাব পরীক্ষক। ভালো করে আগাপাস্তলা পরীক্ষা করে সে আগে বলবে লাভ হয়েছে এবং লাভটা যথার্থই প্রচুর এবং তাতে আর কারো ক্ষতি হয়নি কি লোকসান হয়নি, তবে তো বলবো সেটা ভালো কি মন্দ। বললাম বটে ঐভাবে,

মনে মনে প্রশ্নটা আমাকেও যথেষ্ট ভাবাতো। লাভই হলো অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এবং এটা ভালো করে বুঝলে রাজনীতি আর ইতিহাস নয়। তখন জীবনের অর্থ নৈতিক সমস্যার গভীর রূপ। রাজনীতি আর অর্থনীতি তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আমাকে জিজ্ঞেস করতেন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছু কখনো দেখেছি কিনা। বলতাম, দেখিনি, তবে একটা দুটো ঘটনা নিজের জীবনেই ঘটেছে যেটাকে ঠিক অলৌকিক বলে চিহ্নিত করা যায় না, আবার কাকতালীয় বলাও যায় না। যেমন হেনরি কোশেটের সঙ্গে সেই একদিন পানশালায় যাবার ঘটনা। টেনিস খেলোয়াড় হেনরি। সে, আমি আর আরেক বন্ধু গিয়েছি একসঙ্গে। ঢুকতেই দেখি পর পর তিনটে চাকতি, তাতে এক থেকে দশ অব্দি নম্বর, সেখানে নম্বরের ঘরে পয়সা দিয়ে চাকতি ঘোরাতে হয়। যদি থামে চাকতির কাঁটা সেই ঘরে তবে জিত, নইলে হার অর্থাৎ পুরো বাজির টাকাটাই মাটি। তো দেখেশুনে বললাম, আমার মন বলছে চাকতি ঘোরালে প্রথমটা থামবে ন নম্বরে দ্বিতীয়টা চারে আর তৃতীয়টা সাতে। বলে বাজি ধরলাম। তারপর ঘোরালাম চাকতি। বলবো কি, যা ভেবেছি হুবহু ঠিক তাই। প্রথমটা থামলো এসে নয়ে, দ্বিতীয়টা চারে, তৃতীয়টা সাতে। বিস্তর জিত হলো। সবাই বললো এমন নাকি লাখে একটা হয়। অতো নিঁখুত নাকি কখনো মেলে না।

ওয়েলস্ বললেন, ব্যাপারটা কাকতালীয়। এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তখন আরেকটা ঘটনা বললাম। সেই আমার ছেলেবেলার গল্প। ক্যাম্বারওয়েলের রাস্তা দিয়ে চলেছি একদিন, তাকিয়ে দেখি একটা মুদীর দোকানের বাইরের ঝাঁপ অর্দ্ধেক তোলা। অবাক কাণ্ড। এমন তো কখনো দেখিনি। বুকটা কেন জানি হঠাৎই ধক করে উঠলো। ভেতর থেকে কে যেন ঠেলছে তখন আমায়, হয়তো আমারই বিবেক। বললো, যাও উঁকি দিয়ে দেখো ভেতরে। ঐ তো জানলা। গিয়ে উঁকি দিলাম। দোকানের ভেতরটা অন্ধকার। কেউ নেই। মালপত্র যেমন সাজানো তেমনি আছে। শুধু ঘরের মাঝ বরাবর মস্ত একটা কাগজের বাক্স রাখা। যেন ভারী বেমানান। আর কোন পরিবর্তন নেই।

খটকা লাগলো খুব। জানলা থেকে সরে এসে পথে আবার হাঁটা ধরলাম। খচখচ করতে লাগলো মনটা। তাইতো, অতো বড় একটা কাগজের বাক্স কেন? কি আছে ওতে? ঝাঁপটাই বা আধ খোলা কেন?

এর কদিন পরেই ধরা পড়লো এডগার এডওয়ার্ডস। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো। ভারী নম্র শান্ত স্বভাব। তার কাজই নাকি বেছে বেছে মুদী দোকানের মালিককে খতম করা। তারপর নামমাত্র দামে কিনে নিতো তার দোকান। এই ভাবেই নাকি পাঁচ-পাঁচটা দোকানের মালিক হয়ে বসেছে। ছ নম্বর দোকান যেটা আমি দেখেছি সেইটা।

কাগজের বাক্সে ছিলো তিনটে তাজা লাশ। স্বামী স্ত্রী আর ছেলের। স্বামীর নাম মিঃ ডার্বি। তিনিই ছিলেন ঐ দোকানের মালিক।

ধোপে টিকলো না এ গল্পটাও। ওয়েলস বললেন, এটাও কাকতালীয় ছাড়া কিছুই নয়। আমার নজর পড়েছে সন্দেহ হয়েছে সন্দেহ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল কেননা ঝাঁপ আধখোলা। পরে হত্যার ব্যাপারটা মিশিয়ে সন্দেহটাকে অর্থবহ করার চেষ্টা হচ্ছে। এর পেছনে অলৌকিক বলতে কিছুই নেই।

তখন আরেকটা গল্প ঠোঁটের গোড়ায় এসে গিয়েছিল, বললাম, না। সেটাও আমার ছোট বেলাকার। চুপি চুপি এক ফাঁকে সবাইকে বলে নিই। ব্রিজ রোড দিয়ে চলেছি একদিন, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, পাশেই দেখি চুল দাড়ি কাটার একটা দোকান, মালিক রাশভারি চেহারার সদাশয় দেখতে এক ভদ্রলোক। তাকে বললাম, আমাকে একগ্লাস জল খাওয়াবেন? অমনি ভেতর থেকে জল এনে আমাকে দিলেন। বলবো কি, খাবার জন্যে তুলেছি ঠোঁটের কাছে, ভেতর থেকে কে যেন বললো, খেয়ো না। অমনি নামিয়ে নিলাম গ্লাস। তখন ভদ্রলোক কথা বলছেন এক খদ্দেরের সঙ্গে। সেই দিকেই মন। এই ফাঁকে অমনি গ্লাসের সবটুকু জল মাটিতে ফেলে গ্লাস রেখে আমি তো চম্পট। দু হপ্তা পরে কাগজে দেখি সেই ভদ্রলোক—নামটা মনে আছে এখনো আমার, জর্জ চ্যাপম্যান—নাকি হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। পাঁচ পাঁচটি খুনের অভিযোগ এক সাথে। পাঁচটিই বউ। পাঁচ বিয়ে তো মোট। সেঁকো বিষ জলের সাথে মিশিয়ে তাই খাইয়ে পাঁচজনকেই মেরেছেন। আমি যেদিন গিয়েছিলাম জল চাইতে, সেদিনই ঘটে পঞ্চম হত্যা। সময় মিলিয়ে দেখি, সে তখনই প্রায়। দোতলার ঘরে বিষের দাহ নিয়ে মরছে একজন, আর তখন এক বুক তেষ্টা নিয়ে আমি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তাই কি ভেতর থেকে সেই মানা? তাই কি ঢেলে ফেলে দিয়েছিলাম জল? জানি না। তবে এটুকু জানি, চ্যাপমান এবং এডওয়ার্ডস্ দুজনকেই ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়েছিল।

এবার একটা ভূতের গল্প বলি।

বেভারলি হিল্‌সে বাড়ি করার ঠিক এক বছর পরের ঘটনা। অনামী একখানা চিঠি পেলাম। লেখক জানিয়েছে সে নাকি ভূত-ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। গুণে গেঁথে কবে কি ঘটেছিল নাকি ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। সঙ্গে সে একটা বাড়ির নক্সা দিয়েছে। তাতে চল্লিশটা জানলা। নাকি একটা টিলার ওপর তৈরী। সামনে বাগান। বাগানটা আবার নৌকার মতো দেখতে। বাড়ির মধ্যে মস্ত একখানা ঘর আছে। তাতে উঁচু ছাদ। সেখানে গান বাজনার আসর বসে মাঝে মাঝে। সবই ভালো। শুধু একটাই মস্ত অমঙ্গল। যেখানে বাড়ি, জায়গাটা আগে নাকি ছিলো

বলিদানের স্থান। সে প্রায় দু হাজার বছর আগে। আদিবাসীরা নাকি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে জ্যান্ত মানুষ ধরে এনে ওখানেই বলি দিতো। তাদেরই আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায় বাড়ির আনাচে কানাচে। অন্ধকারে অশরীরীরা শরীর ধারণ করে। খবরদার বাড়ি যেন ভুলেও অন্ধকারে না রাখি। অন্ধকার অবস্থায় যেন আমি নিজে কখনো বাড়ির ভেতর না থাকি। থাকলে বিপদ, ঘোর বিপদ।

গুরুত্ব দিলাম না। কতরকম পাগলামিই তো কত কে করে, তাতে তাল দেবো —আমিও কি পাগল! তো পড়ে খুব মজা লাগলো। রেখে দিলাম দেরাজের ভেতর। তারপর বেমালুম ভুলে গেছি সেই চিঠির কথা।

বছর দুই পর। একদিন কি কাজে নাড়াচাড়া করছি দেরাজের কাগজপত্র, দেখি চিঠিখানা হাতে উঠে এলো। পড়লাম আবার। তাইতো। এ যা লিখেছে এ তো আমারই বাড়ি। চল্লিশটা জানলাই তো আমার বাড়িতে। আর সামনে নৌকোর মতো বাগান। টিলার ওপরে বাড়ি সেটাও ঠিক। তাহলে কি এখন করণীয়।

তা ভূত প্রেতে তো মোটে বিশ্বাস নেই, ভাবলাম নয় নাই রইলো, একবার বাজিয়ে দেখতে দোষ কি। বুধবারটাই আদর্শ। কাজের লোকেদের ছুটি। বাড়িতে থাকি শুধু আমি একলা। বাইরে রাতের খাবার খেয়ে চটপট বাড়ি ফিরে এলাম। ঢুকলাম হলঘরে। যেটার সেই উঁচু ছাদ আর যেখানে গানবাজনার আসর বসে। দুদিকের দেয়াল দৈর্ঘের তুলনায় একটু চাপা। চেয়ার টেনে বসলাম। জানলা দরজার পর্দা দিলাম সরিয়ে। চারধারে সব খোলা। বাতি নিভিয়ে দিলাম। এক দুই করে দশটা মিনিট কাটলো। ততক্ষণে চোখ সওয়া হয়ে উঠেছে অন্ধকার। সবই নজরে পড়ছে। দেখি জানলা দিয়ে ভাসতে ভাসতে ঢুকছে অজস্র অশরীরী। এলো একেবারে আমার সুমুখে। আচ্ছা জ্বালাতন তো! তখন উঠে আলো জ্বাললাম। দেখি জলের একটা বড় কাঁচের পাত্র। তাতে বাইরের এক ফালি চাঁদের আলো পড়েছে ঠিকরে। বাতাসে থিরথির করে কাঁপছে জল। তাতেই লাগছে যেন ভূত প্রেতের শরীর।

হলো না। মাঠে মারা গেলো এতোক্ষণের যাবতীয় চেষ্টা। তখন পর্দা টেনে ফাঁক ফোকর সব ঢেকে দিলাম। বাতি নেভালাম ফের। বসলাম গিয়ে চেয়ারে। অপেক্ষা। তখন মরীয়া হয়ে হাঁক পাড়লাম, কই হে বাবাজীবন এসো এবার তোমরা। আর দেরী করে লাভ কি? আমার তো ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। অন্ততঃ আওয়াজ ফাওয়াজ দাও। দেখা দিতে অনেকের লজ্জা করে আমি জানি। তাহলে জানলায় টোকা দাও বরং। নয়তো আমার ঘাড়ে চেপে আমার হাত দিয়ে কিছু লেখাও কিংবা ঘাড়ে সুড়সুড়ি দেবার মতো নিদেন পক্ষে এক চিলতে হিম হিম ফুঁ দাও।

দিলো না কিছুই। না টোকা না ফুঁ। না আমার ঘাড়ে চাপা। পাঁচ মিনিট

আরো কাটলো। তখন আর ধৈর্য্য বলতে কিছু নেই। গেলাম বাইরের ঘরে। দেখি জানলার পর্দা সব হাট করে খোলা। বাইরে মৃদু চাঁদের আলো। তাতে পিয়ানোটা দেখা যাচ্ছে। বসলাম পিয়ানোর সামনে। বাজাতে শুরু করলাম।

বাজাতে বাজাতে হঠাৎ দেখি ঘুরে ফিরে আঙুল একটা জায়গায় গিয়েই থামছে। বারবার। তখন সেই রীডটাই প্রাণপণে চেপে ধরলাম। কে জানে যদি কিছু অলৌকিক ব্যাপার থাকে এর মধ্যে। যদি অশরীরী আমার আঙুল দিয়ে এই পর্দাটাই বাজাতে চায়।

তো বসে আছি টিপে, হঠাৎ দেখি সাদা এক ফালি আলো এসে জড়িয়ে ধরলো আমার কোমর। ধক করে উঠলো বুকটা। এক লাফে উঠে পড়লাম। কি এই আলো! কে!

বুক নয়তো যেন হাপর। ধড়াস ধড়াস করে পড়ছে হাতুড়ির ঘা। সম্বিত ফিরতে সময় লাগলো। তখন যুক্তির অন্বেষণ। চোখ গেলো সিধে জানলা দিয়ে বাইরে। দেখি একটা গাড়ি আসছে। তারই আলো এসে ঠিকরে পড়ে মুহূর্তে আবার অদৃশ্য হলো। এটা গাড়ি চলাচলেরই পথ। অর্থাৎ তখনও গিয়েছিল কোন গাড়ি। বাজনায় তন্ময় থাকার জন্য আমি খেয়াল করিনি। তারই আলো এসে মুহূর্তের জন্য জড়িয়ে ধরে ছিল আমার কোমর। আমি ভয় পেয়েছিলাম।

কিন্তু ঐ যে সেই বিশেষ সুর আর সেই আলো তার কি কোন যোগাযোগ আছে?

তখন ফের বসে টিপে ধরলাম সেই রীড। বাজতে লাগলো একটানা। একমিনিট দুমিনিট করে অনেকক্ষণ। আর কোন গাড়িও এলো না বা কোন আলোও এসে পড়লো না।

তখন নিতান্ত ভগ্নোদ্যম অবস্থায় সে ঘর থেকে বেরিয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

যেতে হয় ঢাকা একটা বারান্দা দিয়ে। খাবার ঘরের দরজা খোলা। হঠাৎ দেখি কি একটা বেরিয়ে ছুটে গেলো আমার পাশ দিয়ে। গোল গোল চোখ। অন্ধকারে জলজ্বল করছে। কি এটা? দেখে তো মনে হয় কোন জন্তু। তবে কি জন্তুর রূপ ধরেই এলো অশরীরী? কিন্তু গেলো কোথায়?

আলো জ্বাললাম। ভয়ের চেয়েও জিনিসটা কি সেটা দেখার আগ্রহ বেশি। কিন্তু কোথায় সে? সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমার গলদঘর্ম অবস্থা, তার দেখা নেই। তখন বুঝলাম আসলে কিছু না, আমার চোখের ভুল। মনের মধ্যে সাত পাঁচ কত কি তো ঘুরপাক খাচ্ছে। তারই সঙ্গে মিলিয়ে হয়তো ভুল দেখে থাকবো।

দের হলো। এবার শুতে হবে। তার আগে স্নান দরকার। ঢুকলাম গিয়ে কলঘরে। পোশাক ছেড়ে নামতে যাবো টবে, আমার তো চক্ষুস্থির। আরেকটু হলে দিয়েছিলাম

আর কি লাফ। ঐ তো বসে আছে টবের এক কোণে ঘাপটি মেরে। একটা ভোঁদড়। আমাকেই আড়চোখে দেখছে। সে যা ভয় ভয় করুণ কাতর চোখ। দাঁড়াও বাছাধন, দেখাচ্ছি তোমায় মজা!

জানলা দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম। কাটলো সে রাত। পরদিন ভোর না হতেই কাজের লোকজন হাজির। খাঁচা কিনে আনা হলো। তাতে বন্দী করা হলো তাকে। ছিলো সেই ভাবে অনেকদিন। পোষ মেনে উঠেছিল প্রায়। কিন্তু মানুষ তো নয়। জীব যে। জলের জীব। একদিন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে দে চম্পট। আর সে কোনদিন ফিরে আসে নি।

লণ্ডন থেকে আসবার আগে ইয়র্কের ডিউক একদিন নেমন্তন্ন করলেন। বড় অন্তরঙ্গ সেই পরিবেশ। ভোজের টেবিলে আমরা মোটে কজন—ডিউক তার স্ত্রী বাবা মা আর তেরো বছরের ছোট এক ছেলে। স্যর ফিলিপও এসে যোগ দিলেন একটু পরে। পরিপাটি খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলো। বিদায় নেবো এবার। গৃহিণী বললেন ফেরার পথে ইটনের স্কুলে ভাইটিকে নামিয়ে দিয়ে যেতে। তো চললো সঙ্গে ভাই। ভারী লাজুক চেহারা। কথা বলে কম। স্কুলের বাইরে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে নিয়ে এলো দুই শিক্ষককে। সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গের বিরাট এক বাহিনী। ঘুরে ঘুরে দেখলাম স্কুলের চারধার। তারপর আমাদের চা পানের নেমন্তন্ন করলো।

পাশেই দোকান। সেখানে মেঠাই আর চা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো আমাদের সঙ্গী ছেলেটি। ঢুকলাম দল বেঁধে দোকানে। চা এলো। চুমুক দিতে দিতে শুধু গল্প আর গল্প। সে যে কত প্রশ্ন কত জিজ্ঞাসা। তখন অনুরোধ এলো—আরেক পেয়ালা করে হবে নাকি? বললাম আপত্তি কিসের। দেখি মুখ চাওয়া চাউয়ি করছে সবাই। সবচেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমাদের ক্ষুদে সঙ্গীটি। আগের বারের তাবৎ চায়ের দাম তো কম নয়। সে-ই দিয়েছে। ফের চা। নির্ঘাৎ পয়সা নেই অতো। তাই ইতস্ততঃ ভাব। স্যর ফিলিপ বললেন ফিস ফিস করে, দিলেন তো ওদের মুশকিলে ফেলে। দেখুন দিকি, মুখ চোখের ভাব কেমন বদলে গেছে!

তা ব্যবস্থা শেষমেশ হলো। চেয়ে চিন্তে সবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে যোগাড় হলো দাম। তাই দিয়ে ফের এলো আরেক পাত্র চা। কাপ তুলেছি মুখের গোড়ায় অমনি ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়লো। ছুটলো ছেলের দল পড়ি কি মরি করে। বিরতির পর স্কুল আবার শুরু হবে। আমি, স্যর ফিলিপ আর সেই দুই শিক্ষক শুধু রয়ে গেলাম।

দোকান থেকে বেরোতে প্রধান শিক্ষক এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

স্কুলের ভেতর নিয়ে গেলেন। বললেন, চলুন, আমাদের হলঘর দেখে আসবেন। শেলী থেকে শুরু করে নানান মান্যগণ্য ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে একটা খাতায়। আমাদের বিরাট সম্পদ বলতে পারেন।

সম্পদই বটে। পাতা উলটে উলটে দেখলাম। নানান জ্ঞানী গুণী মানুষের হস্তাক্ষর। নীচে সই। হয় তো মারা গেছেন। তবু চির অম্লান হয়ে আছে তার অস্তিত্ব।

প্রধান শিক্ষক চলে গেলেন নিজের কাজে। আমরা গেলাম শেলী যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘর দেখতে।

সঙ্গী হিসেবে রয়েছে সেই ছাত্রটি। অনুমতি পেয়েছে আমাদের সঙ্গ দেবার। তো ঢুকলাম ঘরে। দেখি সে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরের তত্ত্বাবধানে এক একটি যুবক। সে বললো, এখানে কি চাই তোমার? স্যর ফিলিপ বললেন, ও আমাদের সঙ্গে এসেছে। বলে লণ্ডন থেকে এতে অব্দি আগমনের বিবরণ শোনালেন।

যুবক বললো, ঠিক আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভেতরে এসো।

স্যর ফিলিপ আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বললেন, এদের নিয়ম কানুন বড্ড কড়া। এই যে ঢোকালো ওকে এ ঘরে, এটা খাতায় লেখা থাকবে। ছাত্রদের এখানে ঢোকার অনুমতি নেই।

কড়াকড়ির চোট যে কতো সেটা কিছুদিন পরেই মালুম পেলাম। যেতে হলো ফের। এবার সঙ্গী লেডী এ্যাশটর। ছেলে পড়ে স্কুলে। এদিকে শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। গেলেন ছেলেকে ছুটি করিয়ে নিজের কাছে কদিন এনে রাখতে। আমাকে বললেন, চলুন না আমার সঙ্গে। তো গেলাম।

স্কুলের তখন ছুটি হয়ে গেছে। সন্ধ্যে। ঠাণ্ডা যেন এ দিকে আরো বেশি। হাত পা জমে যাবার দাখিল। লম্বা একটা বারান্দা। তার দুধারে সারি সারি ঘর। ছায়া ছায়া অন্ধকার। লেডী গিয়ে থামলেন ছেলের ঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিলেন।

দরজা খুললো ছেলেই। শুকনো মুখ। ঢুকে দেখি তিনজনের থাকার মতো ঘর। একধারে জ্বলছে আগুন পোয়াবার চুল্লী। তাতে হাত সেঁকছে আর দুজন। ভারী নির্জন থমথমে ভাব চারিদিকে।

লেডী বললেন, তোকে নিয়ে যেতে এলাম। কদিন আমার সঙ্গে গিয়ে থাকবি।

তারপর এটা ওটা খোঁজখবর। নানা কথা। নানা প্রশ্ন। হঠাৎ দরজায় ঘা। অনুমতির অপেক্ষা নয়, সটান খুলে ঘরে ঢুকলেন এক শিক্ষক। শক্ত সমর্থ গড়ন। মাথার চুল কটা রঙের। দেখতে সুন্দরই বলা চলে। শুধু ভীষণ গম্ভীর মুখ। আর থম থমে ভাব। ঠোঁটের কোণে পাইপ। কোন কথা নয়, নীরবে আমাদের পাশ কাটিয়ে একধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।



ব্যাংকোয়েট পার্টি, মরিসন, ডেভিস আর আমি



ক্যাবারে নাচের আসরে উইনস্টন চাচিলের সাথে



আমেরিকায় তোলা শেষ ছবি লাইম লাইটে ক্লেয়ার বুম ও আমি



গ্রেট ডিক্টেটরে পলেট গদার



স্বেচ্ছাচারী গ্রেট ডিক্টেটর



চু এন লাইয়ের সাথে



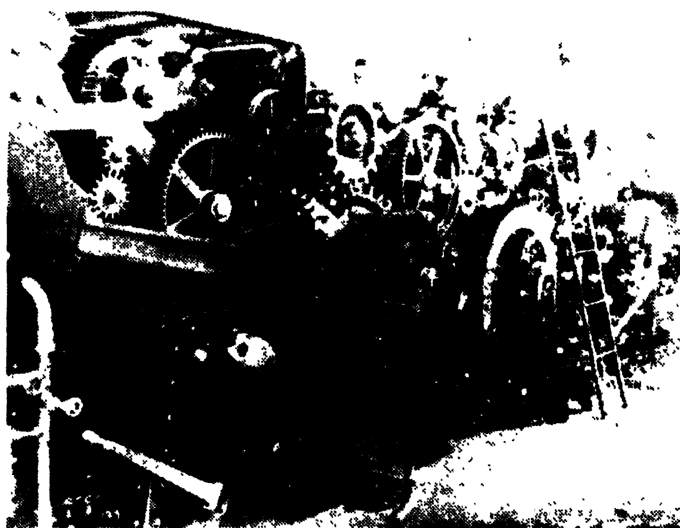
জলরঙে আমার আঁকা উনা



গোল্ডরাশে জর্জিয়া হেল



ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের সঙ্গে শেষ দেখা



মডার্ণ টাইমস্



লণ্ডনে তোলা প্রথম চিত্র দি কিং ইন নিউ ইয়র্কে ডন আদামস্

মসিয়ে ভার্দু ছবিতে মেরিলিন ন্যাশের সাথে



উনা



উনার ক্যামেরায় আমি



আলি উলা আর দুই নবাগত

সে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। কি বলবো আমরা বুঝতে পারছি না। বা কি বলা উচিত সেটাও মাথায় ঢুকছে না। তখন লেডী অ্যাশটরই আমতা আমতা করে শুরু করলেন,—কদিন ভাবছি ছেলেকে নিয়ে কাছে রাখবো। তাই নিতে এলাম। এখন যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে…

—দুঃখিত। এই প্রথম কথা শুনবার সৌভাগ্য হয়ে বড় প্রীত হলাম।—অনুমতি তো আমরা দিতে পারবো না।

লেডী অ্যাশটর, হেসে বললেন,—এমন ভাবে বলছেন, শুনে আমার অব্দি বুক দুরু দুরু করছে।

—আমি আপনাকে ভয় পাওয়াবার জন্যে কিছু বলছি না লেডী অ্যাশটর। যা ঘটনা সেটাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু দেখুন না, কেমন শুকিয়ে গেছে ছেলে। রোগা রোগা লাগছে।

—আপনার দেখার ভুল। আমরা ডাক্তার দিয়ে কদিন আগেও পরীক্ষা করিয়েছি। ওর কিছু হয় নি।

এবার শেষ অস্ত্র। উঠলেন লেডী অ্যাশটর। মিটিমিটি হাসিতে মুখ আলো করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর কত বন্ধু যেন কত পরিচিত সেইভাবে আলতো করে ঠেলা দিলেন যুবকটির কাঁধে—আপনি এমন রাগ দেখান…হোন্ না একটু রাজী। ওকে নিয়ে যাই।

এরকম আব্দার আমি আগেও দেখেছি। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ঘায়েল হয়েছে এই আল্‌গা ধাক্কায়। অনেক দুরূহ কাজ চোখের নিমেষে হাঁসিল হয়েছে।

কিন্তু এ যেন এক আলাদা পদার্থ দিয়ে গড়া। দাঁতে কামড়ে রইলো পাইপ। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর তির্যক দৃষ্টিতে দেখলো লেডী অ্যাশটরের দিকে। বললো, একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। এই যে ধাক্কা দেওয়া—লোককে অসচেতন মুহূর্তে টাল খাইয়ে ফেলে দেওয়া—এটা আপনার অতি কদর্য অভ্যেস। এরকম আর কখনো করবেন না। আমার ভারী বিশ্রী লাগে।

বলে আর জবাবের প্রত্যাশা নয়। যেমন এসেছিল অকস্মাৎ, তেমনি হঠাৎই গটমটিয়ে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে আমরা তখন পাঁচটি প্রাণী। নির্বাক হতভম্ব। লেডী অ্যাশটর বললেন, কি রকম অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ দেখেছেন?

ছেলে বললো, মোটেই নয়। ভারী মিষ্টি স্বভাব। তুমি রেগে আছো তাই। আমাদের ভারী ভালবাসেন।

হয়তো বাসেন। তবু প্রশংসা করতে পারছি না। মেয়েদের দুচোখে দেখতে

পারেন না, এটা ঠিক। এক একজন থাকেন ঐরকম। তা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। অটুট নিয়মনিষ্ঠ। সেটা গুণই বলতে হবে। কিন্তু ঐ যে এক দোষ—হাসতে পারেন না একদম, কোনো কথাটাকেই খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন না,—এটা গুণ নয়, চরম দোষ।

কতদিন যে দেখিনা সিডনীকে। বছরের হিসেবে এক দুই তিন করে অনেকগুলো বছর। এখন থাকে নিসে-তে। আমাকে বলতো, আড়াই লাখ ডলার জমাতে পারলেই নাকি ছেড়ে দেবে অভিনয়ের কাজ, অবসর নেবে। বাড়ি করবে ছোট্ট একখানা। তাতে বাগান। থাকবে সেখানে ছেলে বৌ নিয়ে। ব্যস্, ঝঞ্ঝাট বলতে কিছুই আর নেই।

তো নির্ঝঞ্ঝাটেই আছে। সঞ্চয় আড়াইয়ের চেয়ে অনেক বেশি। ব্যবসা বুদ্ধি তো তুখোড়। তাছাড়া কৌতুক অভিনেতা হিসেবেও নাম করেছে খুব। 'ডুবোজাহাজের পাইলট', 'বাক্সের মধ্যে মানুষ' 'চার্লির খুড়ো' ইত্যাদি বেশ কিছু ছবির সফলতম অভিনেতা। টাকাও পেয়েছে প্রচুর। স্বামী স্ত্রীর ছোট্ট সংসার। বেশ আছে দুটিতে।

সিডনীর সাথে দেখা করতে যাবো বলে ঠিক করলাম।

এদিকে ফ্রাঙ্ক জে গোল্ড তখন নিসেতেই থাকেন। শুনলেন যেই আমার যাওয়ার খবর অমনি তার পাঠালেন—সিধে আমার এখানেই এসে উঠবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

যাওয়ার পথে প্যারিসে কাটিয়ে গেলাম দুদিন। গেলাম একদিন ফোলিয়ে বার্জারে। আট খোকার দলের আলফ্রেড সেখানে এখন কাজ করে। দেখা হতে তো ভীষণ খুশী। কত গল্প বললো। পুরনো দিনের কত কথা। দলের মালিক জ্যাকসনদের এখন নাকি অঢেল পয়সা। আটটা মোট দল। বেঁচে আছেন এখনও জ্যাকসন। বয়েস প্রায় আশির মতো। মহড়ার সময় এখনও রোজ নিজে হাজির থেকে তালিম দেন। দেখা হলো। পরিচয় দিলাম, ভীষণ খুশী। বললেন মনে আছে তোমাকে। এখনও কথায় কথায় তোমার নাম বলি। আমি তখনই জানতাম, একদিন তুমি বড় হবে নাম করবে। প্রতিভা চিনতে আমার ভুল হয় না।

তোষামোদ জিনিসটার আয়ু খুবই কম। যদি তুমি ভাবো অনন্তকাল কেউ তোমাকে তোষামোদ করবে ভালবাসবে তবে ভুল। চলতে পারে না এইভাবে দীর্ঘদিন। একসময় ধস নামে। তখন পায়ের নীচে মাটি যায় সরে। শুরু হয় নিন্দা। যেমন ঠিক আমার ক্ষেত্রে হয়েছিলো।

তখন আমি ফিরে এসেছি প্যারিস থেকে। প্রথম দিকের হৈ চৈ উত্তেজনা এখন আর নেই। এখন আমি কাগজের শিরোনাম নই। সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলই বলা যেতে পারে। এখন চাই বিশ্রাম। ক্লান্ত লাগে ভীষণ। তাই চুপচাপ জুয়ানলেস-পিন্‌সে এসে আস্তানা গেড়েছি। আছি ভালোই। হঠাৎ এক জরুরী তলব। লণ্ডনের প্যালেডিয়ামে আমাকে হাজির হতে হবে, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। মন চাইছে না। ঐ যে বললাম ক্লান্তি। তাই দুশো পাউণ্ডের একখানা চেক পাঠিয়ে দিলাম কর্তৃপক্ষের নামে। শুরু হলো ঝড়। এটা নাকি রাজাকে অপমানেরই মতো। তথা রাজ-নির্দেশ অমান্য করারই দাখিল। দেখুন দিকি কাণ্ড! প্যালেডিয়ামের ম্যানেজার লিখে পাঠিয়েছে চিঠি, তাতে যোগদান না করা। তার উত্তরে সাহায্য বাবদ যৎসামান্য কিছু পাঠিয়ে দেওয়া, এতে রাজার সম্মান অসম্মানের কি প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে? তাছাড়া হুকুম করলো অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমিও গিয়ে শুরু করে দিলাম অনুষ্ঠান—এটাও তো হতে পারে না। তার জন্য প্রস্তুতি চাই তালিম চাই—এটা কর্তৃপক্ষের খেয়াল রাখা উচিত ছিলো।

কয়েক হপ্তা পরেই আরেক ঝঞ্চাট। টেনিস মাঠে গিয়েছি খেলতে। আমার জুড়ি তখনও এসে পৌঁছয় নি। বসে আছি একধারে চুপচাপ। এক ছোকরা এসে হাজির। তা কে তুমি বাপু? বলে, আপনার বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু। মোটামুটি চিনতে পেরেছি বলে মনে হলো। শুরু হলো এটা ওটা নানান কথা। তা ঐ যে মানুষের এক বদরোগ—শ্রোতা পেলে শুরু করে প্রাণ খুলে কথা বলতে—আমারও সেই হাল। সে যে কত কি বললাম। তাতে দুনিয়ার হালচাল থেকে শুরু করে টেনিস খেলা সিনেমা কি নেই। বললাম, দেখুন দুনিয়ার পরিস্থিতি যে দিকে এগুচ্ছে তাতে আমার একান্ত বিশ্বাস আরেকটা যুদ্ধ আসন্ন।

সে বললো, তা যদি হয় তবে এবার আমি মরে গেলেও সৈনিক দলে নাম লেখাবো না।

বললাম, সেক্ষেত্রে আপনাকে দোষ দেবো না আমি। যুদ্ধ যারা বাঁধায় তারা মহা সুখে থাকে, মাঝখান থেকে মরে আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ। এটা ওদের স্বার্থের ব্যাপার। আমাদেরকে মারা যাবার পর ওরা দেশপ্রেমিক বলে খুব খাতির করে।

এইটুকুই মনে আছে। আর কি সব বলেছি খেয়াল নেই। ঝগড়া ঝাঁটি বা তর্ক বিতর্কের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কথাবার্তা আগাগোড়া আমাদের যথেষ্ট হার্দ্য পরিবেশেই হয়েছিল। পরদিন সন্ধ্যেবেলা দুজনের একসাথে ডিনার খাবার কথা। এলো না সে। তার পরদিন দেখি কাগজে বড় বড় হরফে বেরিয়েছে আমার নিন্দাবাদ।

শিরোনামটা এইরকম :—চ্যাপলিন দেশপ্রেমিক নয় !! সে নাকি কোন্ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি। কথা বার্তা ইচ্ছে মতো তাই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছে।

ঘোরপ্যাঁচের অতো দরকার ছিলো না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেই আমি সিধেসিধি বলে দিতে পারতাম। হ্যাঁ, এক অর্থে সত্যি সত্যি আমি দেশপ্রেমিক নই। স্বীকার করতে এতোটুকু আমার অসুবিধে নেই। এর পেছনে নৈতিক বা বুদ্ধিগত অন্য কোন কারণ নেই। দেশপ্রেমিক বলে নিজেকে জাহির করতে আমি একান্তই অনিচ্ছুক। মনের কোন সায় পাই না। কিভাবে পাবো? দেশপ্রেমিকতার দোহাই দিয়ে ষাট লক্ষ ইহুদীকে নির্বিচারে হত্যা করা হলো। এ কেমনতরো দেশ প্রেমের নমুনা? কেউ কেউ হয়তো বলবে, সেটা এখানে তো হয়নি, হয়েছে সুদূর জার্মানিতে। কিন্তু সেটা যে এখানেও কোন না কোন সময় ঘটতে পারে হতে পারে, এটাও তো মনে রাখা দরকার।

জাত্যভিমানের ব্যাপারটা নিয়ে হৈ চৈ করে পাঁচজনকে শুনিয়ে কিছু বলতে আমার বাধে। এটা এক ধরনের অনুভূতির ব্যাপার। বলা যায় একটা ধারা। যেমন ঘর গেরস্থালি সামলানো বাগান করা ছেলেবেলার কথা মনে ভাবা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব—সবই জাত্যভিমান। সবই একটা অভ্যাসের মতো। আমার তো সেরকম কোন অভ্যেস নেই। যখন যেখানে থাকি, সেখানকার যা যা নিয়ম যা ধারা—আমি মনে করি সেটাকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলার মধ্যেই থাকে দেশপ্রেমিকতার বীজ। যেমন ঘোড় দৌড় দেখতে যাওয়া দেশপ্রেম, শিকার করা এক অনুরূপ দেশপ্রেম, কিংবা ইয়র্কশায়ারের পুডিং খাওয়া, আমেরিকার হ্যামবুর্গার খাওয়া কোকা কোলা খাওয়া—এ সবই আমার হিসেবে দেশপ্রেম। এসবে একটা মস্ত অসুবিধে যে আজকাল এর সব কটাই প্রায় প্রতি দেশের নিজস্ব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এগুলো প্রতিপালন করার ব্যাপারটা তাই আজকাল আর আলাদা করে নজরে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, এতৎ সত্ত্বেও একটা কথা জোর গলায় বলতে পারি—যদি যেখানে আমি বাস করি সে দেশ কখনো আক্রান্ত হয়, তবে চরম এবং চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করতে আমার বাধবে না। তাই বলে মাতৃভূমিকে তেমন করে নিদারুণ ভাবে ভালবাসতে আমি নারাজ। তাহলে নাৎসী বাহিনীর দেশপ্রেম আর আমার দেশপ্রেমের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। সেরকম করলে প্রতি দেশেই গড়ে তুলতে হবে নাৎসী কায়দায় সংশোধনী কারাগার, প্রতি দেশেই অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিতে হবে। মোটমাট রাজনৈতিক কোন কারণে কোনরকম স্বার্থত্যাগ করতে আমি নারাজ যতক্ষণ না রাজনীতিটার প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মায়। উৎকট জাতীয়তাবাদের শহীদ আমি হতে চাই না। চাই না কোন রাষ্ট্রপতি বা কোন প্রধানমন্ত্রী বা কোন স্বৈরতান্ত্রিক নেতার স্বার্থে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে।

পরদিন স্তার ফিলিপ সাসুনের সঙ্গে গেলাম ভ্যাণ্ডারবিল্ট বাল্‌সানের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ খেতে। ভ্যাণ্ডারবিল্ট মন্ত্রীপরিষদের সদস্য। ফ্রান্সের দক্ষিণে বাড়ি। জায়গাটা ভারী চমৎকার। অতিথি এসেছেন আরো কজন। একজনকে কেন জানিনা খুব চোখে লাগলো। পাংলা ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল কুচকুচে কালো, ছাঁটা দাড়ি, সদাপ্রসন্ন মুখ। খাবার টেবিলে কথা বলতে বলতে যতবার তাকাই, দেখি হাঁ করে গিলছেন আমার প্রতিটি বাক্য। মেজর ডগলাসের 'ইকনমিক' ডেমোক্রাসি থেকে বেশ অনেকখানি বললাম। আন্তর্জাতিক সংকট দূরীকরণের উপায় হিসেবে ঋণ দান পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি যে চিন্তা রেখেছেন সেটা ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দিলাম। পরদিনই কাগজে বেরুলো খবর। বাল্‌সান আমার সম্বন্ধে কাগজের সাংবাদিকের কাছে যে মন্তব্য করেছেনতা হুবহু এই—"বক্তা হিসেবে চ্যাপলিন অতুলনীয়। এবং ভীষণ রকমের সমাজতন্ত্র-ঘেঁষা।"

মনে নেই সঠিক কি কি বলেছিলাম। তবে মনে আছে সেই মানুষটিকে, যিনি প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন আমার কথা। কখনো দেখি শুনতে শুনতে ঝিকিয়ে উঠছে তার চোখ, আবার কখনো ভয়। তখন একই চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক আর উদ্বেগের ছাপ। হয়তো হতাশ হয়ে থাকবেন আমার সেই বিশেষ কথাগুলি শুনে। নামে জানবার সুযোগ হয়েছিল পররবর্তী কালে। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত 'ব্ল্যাক শার্ট' গোষ্ঠীর নেতা শ্রীযুক্ত অস্‌ওয়াল্ড মস্‌লী। যখন খুব নাম ডাক তার, আমার মনে পড়তো সেই চোখ দুটোর ছবি—ভালো লাগছে যখন আমার কথা চোখের পূর্ণ সাদা অংশ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আবার উদ্বেগ যখন তখন চোখ প্রায় বন্ধ, শুধু মাঝখানে মণিদুটো আধবোজা অবস্থায় থমকে আছে। আনন্দ এবং ভয়ের যুগপৎ এই জাতীয় অভিব্যক্তি আমি আর কখনো দেখিনি।

একদিন এমিল লুড্‌উঈগের সঙ্গেও দেখা হলো। সেও ফ্রান্সে থাকাকালীন। নেপোলিয়ন থেকে শুরু করে বিসমার্ক, বাল্‌জাক ইত্যাদির জীবনীকার। নেপোলিয়নকে নিয়ে লেখাটা অপূর্ব, আমি পড়েছি। তবে বড় বেশি মনন প্রধান। মনটাকে নিয়ে ভেঙেচুরে শুধু বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যা। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে অতিরিক্ত। বর্ণনার ব্যাপারটা এতে করে হালকা হয়ে যায়।

আমাকে খবর পাঠালেন, সিটি লাইটস্‌ দেখে নাকি মুগ্ধ, সুতরাং আমাকে একবার স্বচক্ষে দেখতে চান। গিয়ে দেখি মানুষটার যে ছবি এতোদিন মনে মনে এঁকে রেখেছিলাম, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আরেক মানুষ। অসকার ওয়াইল্ডেরই কিছুটা পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। ভরাট মুখ, লম্বা লম্বা চুল। খানিকটা মেয়েলী ভাব আছে চেহারায়। দেখা হতেই আমার হাতে তুলে দিলেন হাল্‌কা সবুজ রঙের সুন্দর একটা গাছের পাতা,

বললেন, এটা রোমান আমলের রীতি। রোমের কেউ শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হলে তাকে কচিপাতার মুকুট পরিয়ে দিতো মাথায়। আমিও আপনার শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার হিসেবে দিলাম এই কচি পাতা।

বেশ নাটকীয় লাগছিল গোটা ব্যাপারটা। খানিকটা অবাকও বলা যেতে পারে। কি বলবো জবাবে বুঝতে পারছি না। দেখি আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে যেন একটু লজ্জা পেয়েছেন। বললাম, আপনার লেখা আমি পড়েছি। চমৎকার। তবে একটা প্রশ্ন,—এই যে জীবনী লেখেন আপনি, মূল কোন্ ব্যাপারটার ওপর জোর দেন ?

বললেন, সেই বিশেষ মানুষটির মনোভাবের ওপর।

—তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে জীবনী মানেই ছাঁটকাট করা একবগগা একটা ব্যাপার। তাই নয় কি ?

বললেন, দেখুন জীবনীতে যেটুকু লিখি তা নিতান্তই সামান্য। বেশির ভাগটাই থেকে যায় না-বলা। শতকরা হিসেবে প্রায় পঁয়ষট্টি ভাগ। কেননা তাতে নানান মানুষের নামধাম বিবরণ থাকে। তাই বাদ দিতে হয়।

খেতে বসে জিজ্ঞেস করলেন এ পর্যন্ত আমার দেখা সবচেয়ে চমৎকার দৃশ্যটি কি। বললাম, হেলেন উইলসের টেনিস খেলার ভঙ্গি। খুব মাপা কাজ, প্রতিটি মার দেখবার মতো, আর সবচেয়ে বড় কথা, দেহ ভঙ্গিমার মধ্যে অপূর্ব এক ধরনের মাদকতা আছে। আরো একটা দৃশ্যের কথা বললাম। ছবি দেখতে গিয়ে একবার একটা নিউজ রীল দেখেছিলাম। সন্ধি প্রস্তাবের ঠিক পরে। ফ্লাণ্ডার্সে এক কৃষক জমি চাষ করছে। ঐ জমিতেই যুদ্ধে মারা গেছে হাজার হাজার মানুষ। লুডউইগ বললেন, ফ্লোরিডার সমুদ্র উপকূলে একবার একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলাম। সূর্য অস্তায়মান, সামনে দিয়ে চলেছে খোলা একখানা গাড়ি, খুব ধীরে ধীরে, তাতে বোঝাই স্নানের পোশাক পরা একপাল মেয়ে, একজন শুয়ে আছে পেছনদিকে গুটিয়ে রাখা ছাউনিটার ওপরে, মড়ার মতো হুবহু, পা দুটো ঝুলছে নীচে, এক পা বালির সঙ্গে লাগানো, তাতে গাড়ি এগোবার সঙ্গে সঙ্গে দাগ পড়ছে বালির বুকে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

সেই থেকে সুযোগ পেলে পথ চলতি আমিও থমকে যাই মাঝে মাঝে। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে অপরূপ দৃশ্য খুঁজি। একদিন ফ্লোরেন্সের এক মাঠে দেখি বেন্‌ভেনুতো সিলিনির হাতে গড়া পার্সিউসের মূর্তি। রাত তখন। চারপাশ আলোয় ঝলমল। মাইকেলেন্‌জেলোর 'ডেভিড'-ও রয়েছে একধারে। তবে পার্সিউসের তুলনায় তা যেন নগণ্য। অপূর্ব সেই ভাস্কর্য। মেডুসার মাথাটা তার দু হাতে ধরা, শরীর দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে পায়ের কাছে, সে যে কী দুঃখ কী বেদনা প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে, আমি বলে বোঝাতে পারবো না। মনে পড়ে অসকার ওয়াইল্ডের সেই অনবদ্য কথাটি—মানুষ

যাকে ভালবাসে তারই জীবন নেয় ছিনিয়ে। এ যেন সেই ভালবাসার হত্যা, চিরন্তন সেই রহস্য—ভালো আর মন্দের নির্মম সন্নিবেশ, সব প্রশ্ন সব যুক্তি এখানে তুচ্ছ, অর্থহীন।

আল্‌বার ডিউক তার পাঠালেন—কদিন যেন স্পেন ঘুরে আসি। যাবো বলে সব ঠিক ঠাক। পরদিন কাগজে দেখি স্পেনে বিদ্রোহের খবর। যাওয়া বাতিল হলো। চলে গেলাম সিধে ভিয়েনা।

ভাল লাগে নি একদম। বড় থমথমে চতুর্দিক। কেমন যেন দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থা। কেমন যেন বিষণ্ণ ভাব। আর কিছু মনে নেই। শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে খুব খাতির হয়েছিল সেইটুকুই মনে আছে। ঠিক যেন উপন্যাসের একটা গোটা অধ্যায়। তাকে চুমু খাওয়া, তার কাছে দিব্যি গেলে শপথ, তার সঙ্গে বেড়ানো—ব্যস্‌। একদিন হঠাৎই সব শেষ। যবনিকা পাত। উপন্যাসটা আর পুরোপুরি শেষ হবার সুযোগ পেলো না।

ভিয়েনা থেকে গেলাম ভেনিসে। তখন শরৎকাল। ফাঁকা ফাঁকা ভাব। ভালো লাগলো না একদম। ভিড় যে আমি পছন্দ করি। গিজগিজ করবে চতুর্দিকে মানুষ, দেখবো দু চোখ ভরে, কত তাদের রঙ বেরঙের পোশাক, কত হাসির ঘটা—বেড়াতে আসে তো এখানে বিস্তর মানুষ, তখন চতুর্দিক জমজমাট হয়ে ওঠে। এখন যেন শ্মশানপুরী। খাঁ খাঁ শূন্য চারিধার। বড় নির্জন, নিরিবিলি। এমন ভেনিস দেখবো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। রইলাম মোটে দু' রাত। তাও যে কত কষ্ট। করার তো আর কিছু নেই। চোরাগোপ্তা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে রেকর্ডের গান শুনি, তা-ও খুব আস্তে আস্তে। জোরে চালাবার উপায় নেই। মুসোলিনি হুকুমনামা জারি করে বন্ধ করে দিয়েছে সব। রোববার নাচ গান সম্পূর্ণ বন্ধ। এর যে ব্যতিক্রম ঘটাবে, তার কপালে কঠোর দুর্ভোগ।

ভেবেছিলাম ভেনিস থেকে যাবো আবার ভিয়েনায়। সেই মেয়েটির সঙ্গে আবার কদিন ঘুরবো ফিরবো বেড়াবো। হলো না যাওয়া। প্যারিসে আরিষ্টিদ ব্রায়াঁদের সঙ্গে দেখা করার কথা। বিখ্যাত মানুষ। ইওরোপকে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার চিন্তার অন্যতম প্রবক্তা। তা গেলাম যখন, শরীরটা তাঁর ভালো নয়। মঁসিয় বাল্‌বি নেমন্তন্ন করলেন দুজনকেই। বাল্‌বি নামকরা প্রকাশক। তা আমি তো ফরাসী মোটে বলতে পারি না। ভাগ্যিস নোয়েলসের কাউন্টেস ছিলেন হাজির। ভারী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, কথাবার্তাতেও খুব তুখোড়। ইংরিজী ভালোই জানেন। আর দেখে সে কী রসিকতা ব্রায়াঁদের। —বলি তোমার ব্যাপার স্যাপার কি। দেখা নেই সাক্ষাৎ নেই। বহুদিনের পুরনো হয়ে গেলে রক্ষিতারা ঠিক এইরকম করে। তাই বলে আবার ভেবে বোসো না তোমাকে আমি আমার রক্ষিতা ঠাওরাচ্ছি।

প্যারিস থেকে গেলাম বার্লিনে। সে কী আপ্যায়নের ঘটা, কী ভিড়! প্রথম বার এসেছিলাম—কেউ আমাকে চেনেও না। মোটামুটি ভালোই লাগলো এবার বার্লিনে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মেরী আর ডগলাসের একখানা ছবির কথা। বেড়াতে গিয়েছিল একবার দুজনে বাইরে, তারই ছবি তুলে এনেছে। আমাকে ডেকে এনেছে দেখাবে বলে। স্থান—ডগলাসের বাড়ি।

ছবির শুরু তাদের লণ্ডনে হাজির হওয়া থেকে। স্টেশনে সে যা ভিড়! হোটেলের বাইরে যা হৈ হুল্লোড়! মাথা ছাড়া আর কিছু যেন নজরেই পড়ে না। তারপর প্যারিস। সেখানেও একই অবস্থা। লোক এখানে লণ্ডনের তুলনায় বরং কিছু বেশি। হোটেলের বাইরের ছবি দেখাচ্ছে একবার, একবার স্টেশনের। এইভাবে মস্কোর ছবি দেখলাম, ভিয়েনার ছবি। বুদাপেস্টও দেখালো। শুধু ভিড় আর ভিড়। শেষে থাকতে না পেরে বললাম, কিন্তু শহর কোথায়? গ্রামের ছবি কই? হেসে উঠলো দুজনই। ভাবখানা এমন—যেন গ্রাম শহর দেখাবো বলে তো তোমাকে ডাকিনি, ডেকেছি আমাদের অভ্যর্থনার ঘটা দেখাতে। আর কি চাই।

ছবির কথাটা মাথায় রেখেই বার্লিনের জনসমুদ্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া স্থগিত রাখলাম।

বার্লিনে গণতান্ত্রিক সরকারের আমি অতিথি। ভারী সুন্দরী একটি মেয়ের ওপর আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার। নাম ইয়র্কে। জাতিতে জার্মান। উনিশশো একত্রিশ সেটা। রাইখস্ট্যাগে নাৎসী বাহিনী তখন রীতিমতো ক্ষমতাশালী দল। কাগজে খুব যাচ্ছেতাই করে লিখছে আমার নামে। আমি তো ছাই পড়তে পারি না ভাষা। কেউ কেউ অবিশ্যি প্রশংসাও করে। নিন্দাতেই বা কি এসে যায় আমার। সত্যি সত্যি নিন্দা করার মতো তো কিছু আমি করিনি। খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম কাগজের মালিকরা নাকি নাৎসী বাহিনীর পেটোয়া। ওরা কি আর আমার প্রশস্তি গাইতে পারে!

তা কাটছে বেশ সুখেই। কাইজারের এক খুড়তুতো ভাই আমাকে নিয়ে গেলো একদিন পটস্‌ডাম আর সানস্‌ সুসির রাজপ্রাসাদ দেখাতে। জানি না কি ব্যাপার —পুরনো দিনের এই সব প্রাসাদগুলো দেখলেই মনে হয় মানুষকে বঞ্চনা প্রতারণার এক একটি জলন্ত নিদর্শন। কোন তফাৎ নেই একটার সঙ্গে আরেকটার। সে ভার্সেলিসেরই হোক কি ক্রেমলিনের কিংবা ইংল্যাণ্ডের বাকিংহাম প্রাসাদ—সব সমান। শুধুই আড়ম্বরের ঘটা। আড়ালে তার দুঃখ আর দুর্দশার ছবি। সঙ্গী বললো, এদের মধ্যে সানস সুসিরটাই যা অন্যরকম। ছোটখাটো দেখতে। বড়গুলোর মতো অতো জাঁকজমক নেই।

হয়তো নেই। তবু এটা ঠিক যে এটাও একটা রাজপ্রাসাদ। অর্থাৎ সেই একই কথামালা। দেখে খুব একটা আকৃষ্ট হতে পারলাম না।

গেলাম একদিন বার্লিন পুলিসের সংগ্রহশালা দেখতে। সে যে কত ছবি—কত হত্যা, কত আত্মহনন, মানুষের কতরকম অস্বাভাবিকত্ব। গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

'দি মিরাকল্‌ এর লেখক ডঃ ভন ফুলমুলার একদিন নিয়ে গেলেন আমাকে তার বাড়িতে। গিয়ে দেখি শিল্প সাহিত্যের নানান দিকপাল হাজির। আলাপ হলো সবার সঙ্গে। ভারী ভালো লাগলো। গেলাম এরপর একদিন আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। কী খুশী যে আমাকে দেখে। হিণ্ডেনবার্গের সঙ্গেও একদিন নৈশভোজে মিলিত হবার কথা ছিলো। হলো না শেষ অব্দি। ভীষণ অসুস্থ সেদিন তিনি। পারলেন না হাজির হতে।

পরদিনই আমি ফ্রান্সের দিকে রওনা দিলাম।

আর এই নারী। তাদের সঙ্গ সাহচর্য সংসর্গ। নতুন করে বলার কিছু নেই। কেননা এ ব্যাপারে এতো কথা বলা হয়েছে পৃথিবীতে আমার নতুন সংযোজন করার মতো কিছু আর নেই। নারী সঙ্গলাভের গোটা ব্যাপারটা আমার জীবনে এসেছে প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে। নারী দেখলেই মানুষের মনে জাগে এক ধরনের যাচাই করে নেবার প্রবৃত্তি। সেটা নিজের শক্তিই হোক কি অন্য কিছু। দেখেছি যুবক থেকে শুরু করে বয়স্য মানুষটিরও এই একই মনোবৃত্তি। আমি নিজেই বা এর থেকে আলাদা হবো কিভাবে।

তবে হ্যাঁ, কাজের সময় নারী আমার কাছে নিছকই একটি মানুষ। সে তখন এতোটুকু আগ্রহ জাগাতে পারে না আমার মনে। কাজ যখন শেষ হয়, অর্থাৎ ফাঁকা আমি—ফাঁকা আমার মন আমার নিজস্ব জগৎ, তখনই নারী সঙ্গলাভের ইচ্ছা মনের মধ্যে পেয়ে বসে। এইচ জি. ওয়েলস্‌ও দেখেছি এ ব্যাপারে একমত। একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—বুঝলেন, সারাটা দিন হয়তো আপনি নিদারুণ পরিশ্রমের মধ্যে কাটালেন। সকালে লিখলেন বেশ অনেকখানি, দুপুরে চিঠিচাপাটি যা এসেছে দেখলেন, জবাব দেবার হলে জবাব দিলেন, বিকেলে সভাসমিতিতে যোগদান পর্বও হলো। তারপর রাত। তখন আর কিছু করার নেই। হাত একদম ফাঁকা। বড় একঘেঁয়ে লাগে। নারী সংসর্গের কথা তখনই বড় বেশি করে মনে পড়ে।

ফ্রান্সে আমারও একই অবস্থা। করবার মতো কাজ বিশেষ নেই। এদিকে ভারী সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মোটামুটি আমারই মতো ছন্নছাড়া

জীবন। গল্প করেছে আমার কাছে। কদিন আগে অব্দি মিশরীয় এক ছোকরার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। খুব দহরম মহরম। সেটা আপাততঃ নেই। নাকি নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করেছে সেই ছোকরাই। আমার নিজের কথা আমি তাকে খুলে বলেছি। এখানে চিরকাল থাকতে আমি আসিনি। আমেরিকা আমার কর্মস্থল। সেখানে কদিন পরেই চলে যেতে হবে। সুতরাং ভাব ভালবাসা যা কিছু সব এই কদিনের জন্য। সেটা সে মোটামুটি মেনে নিয়েছে। টাকা দিই তাকে ফি হপ্তায়। এটা তার মাইনে। এছাড়া সঙ্গে নিয়ে সর্বত্র বেড়াতে যাই। সেখানে খাওয়া দাওয়া, এটা ওটা কেনা। সব খরচ আমার। কিন্তু মুশকিল হলো জীবনের ক্ষেত্রে এতো হিসেব কি চলে? এতোদিন একসঙ্গে থাকা ঘোরাফেরা, ভালবাসা তো একটু একটু করে হৃদয়ের ভাঁজে ভাঁজে জমবেই। কে পারে তাকে রুখতে? একটা সময় তাই এলো যখন আমি প্রায় ঠিক করেই বসলাম, ওকে সাথে না নিয়ে আমেরিকা ফেরা অসম্ভব। আমি পারবো না ওকে ছেড়ে থাকতে। কিছুতেই না।

একদিন নাচছি হোটেলে দুজন। হঠাৎ চেপে ধরলো শক্ত মুঠোয় আমার হাত। দেখি সেই ছোকরা। সাক্ষাৎ তো চিনি না তাকে, শুনেছি এতো গল্প এতো কথা—চিনে নিতে অসুবিধে হয় নি। তো একটা ধাক্কা খেলাম। বেরিয়ে এলাম একটু পরেই। বাসার কাছাকাছি পৌঁছেছি প্রায়, হঠাৎ বলে কিনা দস্তানা নাকি ফেলে এসেছে। বললাম, চলো তাহলে নিয়ে আসি। বললো, তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমিই গিয়ে নিয়ে আসছি। এটা আমাকে এড়াবার ফন্দি। বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। তবু বাধা দিলাম না। ফিরে এলাম বাসায়। তার আর ফেরার নাম নেই। দেখতে দেখতে দুটি ঘণ্টা কাবার। এদিকে আমার আবার এক জায়গায় নৈশ ভোজের নেমন্তন্ন। ওকে নিয়েই বেরুবো। কি করি এখন! শুধু দস্তানা আনতে তো এতো দেরী হবার কথা নয়। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ মুখ ফ্যাকাসে—এসে হাজির।

খুব রাগ তখন আমার। বললাম, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই? এতো দেরী করলে? নেমন্তন্ন আছে তোমাকে তো জানিয়ে রেখেছিলাম। যাও শুয়ে পড়ো গিয়ে বিছানায়। তোমার আর যাওয়ার দরকার নেই। আমি একলাই যাবো।

তখন প্যানপ্যানানি শুরু হলো। এটা ওটা নানান সাফাই। ধোপে টিকছে না কোনোটাই। কেন যে দেরী হলো এর আর কোন যুক্তি দিতে পারে না। আসল কারণ তো সেই ছোকরা, তা কি আর আমার বুঝতে বাকী আছে। রাগে বলতে গেলে শরীর জ্বলে যাচ্ছে আমার। শেষ অব্দি ওকে বাদ দিয়েই আমি বেরিয়ে পড়লাম।

ভোজের আসরে কত কথা, কত প্রশংসা, কত মিষ্টি সুরের বাজনা বাজছে

গ্রামোফোনে—আমার বুকে বইছে ঝড়। কিছুতে পারছি না মন বসাতে। অপমান যে ভীষণ। আমাকে গোপন করে অবহেলা করে ও কিনা যাবে সেই ছোকরার পেছন পেছন। এ তো আমার পৌরুষের প্রতি অপমান। পারে কোন সুস্থ মানুষ সইতে। উঠে পড়লাম খানিক পরে। শরীর খারাপের অজুহাত দিলাম। এলাম বাসায়। দেখি নেই। তবে কি চলে গেলো? আমাকে না জানিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে? চুপিচুপি? গেলাম তার শোবার ঘরে। দেখি জামাটামা সব রয়েছে। তাহলে গেলো কোথায়? একটু পরে দেখি এসে হাজির। ভারী হাসিখুশী ভাব। বললাম, কি ব্যাপার কোথায় গিয়েছিলে? বললো, ছবি দেখতে। বললাম, শোনো কাল আমি প্যারিসে চলে যাবো। তোমার হিসেব নিকেশ মিটিয়ে নাও। শান্তভাবে শুনলো। ভেতরে ভেতরে আমার যে তখনও ঝোড়ো রাগ নির্ঘাৎ সেটাও বুঝতে পেরেছে। যেতে মানা করলো। থাকতে বললো আরো কটা দিন। কিন্তু একবারও ত্রুটি স্বীকার করার নাম নেই। বললো না একবারও সত্যি কথা।

তখন বললাম, দেখো বন্ধুত্ব যেটুকুও বা থাকবার কথা ছিলো আমাদের মধ্যে তোমার দোষেই সেটা নষ্ট হতে বসেছে। তুমি আমাকে ঠকিয়েছো, প্রতারণা করেছো। আমি বলিনি তোমাকে, আমি নিজে পেছন পেছন অনুসরণ করে গিয়েছিলাম হোটেল অব্দি, তোমাকে আর তোমার সেই প্রেমিক ছোকরাকে একসাথে দেখে এসেছি।

বলাবাহুল্য কথাটা মিথ্যে। পরীক্ষা করবার জন্যেই বলা। চাপ দিলে যাতে সত্যিটা বেরিয়ে পড়ে। শুনে সে কী ভয়! স্বীকার করলো সব। দিব্যি কাটলো। বললো, এই শেষ, আর কোনদিন ওর সাথে দেখা করবো না।

পরদিন সকালে সব জিনিসপত্র গোছাচ্ছি, দেখি ঘরে ঢুকে কাঁদতে শুরু করেছে। সে যা কান্না! কেবলই বলে, আমাকে ফেলে রেখে যেও না। তোমার সঙ্গে অন্ততঃ প্যারিস অব্দি নিয়ে চলো। দোহাই তোমার। আমার এই একটা অনুরোধ রাখো।

প্যারিস যাবো আমি আমার এক বন্ধুর গাড়িতে। সেরকমই ঠিকঠাক। একটু পরে সে আসবে। একলা যে যাবো তাকেও সেই মর্মে জানিয়ে দিয়েছি।

বললাম, কি আশ্চর্য ব্যাপার, প্যারিস অব্দি গিয়ে তুমি কি করবে? কি লাভ তোমার?

বললো, আমার সাধ। তোমার কাছে আমার শেষ চাওয়া। আমি কথা দিলাম প্যারিস পৌঁছে তোমাকে আমি আর জ্বালাতন করবো না।

সে এমনই চোখ মুখের ভাব, সঙ্গে ঝরঝর কান্না—পারি কি আমি আর মন শক্ত করে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে। রাজী হলাম। উঠলাম দুজন গিয়ে গাড়িতে। গাড়ি ছাড়লো।

আমি তো গুম হয়ে বসে। সে-ও তাই। কিন্তু কতক্ষণ থাকা যায় ঐভাবে? হয়তো অদ্ভুত কিছু একটা পড়ছে নজরে, একটা কিছু মন্তব্য করছি, ও সায় দিচ্ছে তাতে—এইভাবেই চললো গোটা রাস্তা। প্যারিস পৌঁছে ওকে ওর হোটেলের দোর গোড়ায় নামিয়ে দিলাম, আমরা গিয়ে উঠলাম অন্য হোটেলে।

পরদিন ভোর সকালে ফোন, দুপুরে খাবে কোথায়? আমি কি যাবো? বললাম, না। বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম। একটু পরে বন্ধু আর আমার বেরুবার কথা। দেখতে যাবো নানান দর্শনীয় স্থান। বেরিয়ে দেখি হোটেলের দোরগোড়ায় সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে আছে। অগত্যা সঙ্গে নিতেই হোলো। গেলাম মাল-মাইজোঁ দেখতে। নেপোলিয়নের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর জোসেফাইন এখানে থাকতেন। এখানেই মারা যান। তো ঘুরে ঘুরে দেখছি। কোথায় গেছে ও জানিনা। হঠাৎ দেখি বাগানে একটা বেদীর ওপর বসে কাঁদছে একলা। জানিনা হয়তো জোসেফাইনের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল পেয়ে থাকবে। তাই অশ্রু। ভারী খারাপ লাগলো মনটা। হয়তো আগ বাড়িয়ে কিছু একটা করে ফেলতাম, হঠাৎ স্মৃতিপটে ফুটে উঠলো সেই ছোকরার মুখ। অমনি ফিরে এলো সেই রাগ। সংযত করলাম নিজেকে। তার পরের দিনই প্যারিস থেকে লণ্ডনে ফিরে এলাম।

লণ্ডনে ফিরে বেশ কয়েকবার প্রিন্স অফ ওয়েলসের সাথে সাক্ষাৎ হলো।

প্রথম পরিচয়ের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন বিয়ারিৎজে। প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় কোশেট আর দুই বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছি একদিন নামকরা এক রেস্তোরাঁয়। হঠাৎ দেখি লেডী ফার্নেসের সঙ্গে স্বয়ং প্রিন্স। আমাদেরই টেবিলের পাশ কাটিয়ে একটু দূরে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন। লেডী আমার পুরনো বান্ধবী। একটু পরে বেয়ারা এসে একখানা চিরকুট দিলো। লেডী লিখেছেন আমি যেন এখান থেকে সিধে রাশিয়ান ক্লাবে যাই। প্রিন্সের সাথে সেখানেই পরিচয় হবে।

পরিচয় হলো। বলবার মতো এমন কিছু নয়, নিছকই সৌজন্যমূলক কুশল বিনিময়। পানীয়ের অর্ডার দিলেন প্রিন্স। তারপর লেডী ফার্নেসের সঙ্গে নাচলেন খানিকক্ষণ। ফিরে এসে বসলেন আমার পাশে। শুরু হলো প্রশ্নোত্তরে পর্ব।

আমাকে বললেন, আপনি তো আমেরিকান তাই না?

বললাম, না আমি ইংরেজ।

—সে কি! আমি তো জানতাম অন্যরকম। কতদিন আছেন আপনি আমেরিকায়?

—১৯১০ সাল থেকে।

—তার মানে যুদ্ধেরও আগে?

—হ্যাঁ।

শুনে এই প্রথম এতোক্ষণে প্রাণ ভরে হাসলেন।

বললাম শালিয়াপিন আমার সম্মানে পার্টি দিচ্ছে। একটু পরে আমাকে সেখানে যেতে হবে। বললেন, আমাকে নিয়ে চলুন আমিও যাবো। সে একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো আব্দার আর কি। বললাম, এ আর এমন কথা কি? আপনি গেলে শালিয়াপিন বরং হাতে স্বর্গ পাবে, খুশী হবে। চলুন না।

তা গিয়েছিলেন সেদিন। সে যে কী আনন্দ! আশি বছর বয়েস শালিয়াপিনের মার। তার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করলেন অনেকক্ষণ। শুতে গেলেন মহিলা। তখন এলেন আমাদের টেবিলে। তারপর তো কত গল্প কত কথা কত হৈ চৈ। মনে থাকবে সে স্মৃতি আমার চিরদিন।

এবার লণ্ডনে আসতেই আমাকে তলব। বেলভেডিয়ারের দুর্গে ভোজের আসর। বহু পুরনো দিনের বাড়ি। নতুন করে রং করা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। শোবার ঘরখানাও দেখালেন। এমন কিছু আহামরি নয়। তবু চমৎকার। বোধহয় ছিমছাম সহজ সরল বলেই ভালো লেগেছিল অতোটা। ধপধপে দুধের মতো সাদা বিছানা। মাথার কাছে লাল মখমলের কাপড়ে আঁকা রাজপরিবারের স্মারক চিহ্ন। হালকা গোলাপী রঙের দেয়াল। গদীটা পুরোপুরি পালকের আর খাটের চারটে পায়া পালক দিয়ে মোড়া। এরই নাম বোধহয় যথার্থ অর্থে সুখশয্যা।

ভোজের পর সবাই মিলে একটা নতুন খেলা খেললাম। এ খেলা আমেরিকায় হয়, ইংল্যাণ্ডে আগে কখনো দেখিনি। নিজেকে নিয়েই খেলা। নিজের মূল্যায়ন নিজেকে করতে হবে। বলাবাহুল্য খোলা মনে। এতোটুকু রাখঢাক কি চাপাচুপি চলবে না সবাইকে একটা করে কাগজ দেওয়া হলো। তাতে দশটা ঘর। এক একটা ঘরের পাশে এক এক রকম লেখা: যেমন সৌন্দর্য, বুদ্ধি, বিবেচনা-শক্তি ব্যক্তিত্ব, নারীকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা, একাগ্রতা, রসবোধ, ধীশক্তি ইত্যাদি। পাশের ঘরগুলো ফাঁকা, সেখানে নিজের হাতে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী নম্বর বসাতে হবে। দশ হলো সর্বোচ্চ নম্বর। আমাকে দিতে আমি টকাটক বসিয়ে গেলাম। রসবোধে সাত, নারী আকর্ষণে ছয়, সৌন্দর্যে ছয়, ধীশক্তিতে আট, একাগ্রতায় চার। আরো কি কি বসিয়েছিলোম মনে নেই। আছেন একজন সভাপতি। তারও হাতে প্রত্যেকের নামে নামে একখানা করে কাগজ। মোটের ওপর নিরপেক্ষ তার দৃষ্টি ভঙ্গি। তিনিও নম্বর বসাবেন সবার কাগজে। সেটা নিজের বিবেচনা অনুযায়ী। খেলার নিয়ম হলো—সেটা পড়ে শোনাবেন তিনি, আমি আমারটা। দুটো যেখানে যেখানে মিলবে বা কাছাকাছি হবে সেটা ঠিক। অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের বিচার সে সব ক্ষেত্রে নির্ভুল।

এলো প্রিন্সের পালা। সে তো আচ্ছা মুশকিল। কোনটাই আর মেলেনা। নারী আকর্ষণের ঘরে তিনি বসিয়েছেন তিন, সভাপতি দিয়েছেন চার। সৌন্দর্যে নিজের দেওয়া নম্বর ছয়, সভাপতি দিয়েছেন আট। আচার ব্যবহারে সভাপতি দিয়েছেন আট, নিজে দিয়ে রেখেছেন মাত্র পাঁচ। দশে দশ দিয়েছেন একাগ্রতায়, সভাপতির দেওয়া নম্বর মাত্র মাত্র সাড়ে তিন! শুনে সে কী রাগ। বললেন, অসম্ভব। এ হতেই পারে না আমি জানি আমার কতটা নিষ্ঠা আছে। আপনাদের নেই আপনারা কি করে বুঝবেন?

ম্যাঞ্চেস্টার এখনও আমাকে টানে। সে এক আশ্চর্য মোহ। ছেলেবেলা কাটিয়েছিলাম অনেকগুলো দিন এই ম্যাঞ্চেস্টারে। লণ্ডনে এসেছি কতবার। যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। তা এবার হাতে যেহেতু কাজ বিশেষ নেই, কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি একখানা লিমুজিন ভাড়া করে একদিন বেরিয়ে পড়লাম।

পথে স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ অ্যাভন। থামলাম। তখন রাত। শনিবার। শেকস্পীয়ারের বাড়ি এইখানে। জানিনা তো কোথায়। জিজ্ঞেস করবো এমন কাউকেও দেখি না। তখন হাঁটতে শুরু করলাম। অনির্দেশ। থামলাম এসে একটা বাড়ির সামনে। অন্ধকার। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বাললাম। ফটকে নামের ফলক। দেখি আশ্চর্য, এ তো শেকস্পীয়রেরই বাড়ি! অন্ধকারেই বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িখানা দেখলাম।

ভোরবেলা দেখি হোটেলে স্ট্র্যাট্ফোর্ডের মেয়র স্যর আর্চিবাল্ড ফ্লাওয়ার সশরীরে হাজির। অর্থাৎ খবর ততক্ষণে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। নিয়ে গেলেন আমাকে শেকস-পীয়রের বাড়ি দেখাতে। দিনের আলোয় সে এক অন্যরকম দৃশ্য। ঝলমল করছে চারধার। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নাকি চাষীর ঘরে জন্মেছিলেন শেকসপীয়র। ভাগ্যান্বেষণে লণ্ডনে যান। সেখানে নাটকের দলে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন। পরে নাকি নাট্যালয়ের মালিকও হয়েছিলেন। এগুলো স্বাভাবিক। এর মধ্যে অলৌকিক বা অতিরিক্ত আমার কিছু নজরে পড়ে না। অবাক করার মতো তার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি তথা নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি। প্রতিটি নাটকে রাজসভার নিপুণ বর্ণনা, তাদের আচার আচরণ, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান—এর মতো বিস্ময়কর আর কি থাকতে পারে? শেকসপীয়রের যাবতীয় রচনা তার নিজস্ব কিনা এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু মূলে তো সেই স্ট্র্যাটফোর্ডের চাষীর ছেলে। এ ব্যাপারে তো দ্বিমত নেই। প্রতিটি রচনায় পাই এক আশ্চর্য আভিজাত্যের ইঙ্গিত। ব্যাকরণের প্রতি চরম অনীহা—সেও যেন এই আভিজাত্যেরই ধারক। এমন প্রতিভা

কজনের থাকে? ছেলেবেলায় নাকি স্কুলের পড়াশোনাও সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। ভাবতে অবাক লাগে সেই মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি। জানিনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনের সূচনা এই ভাবেই হয় কিনা। কেননা এরকম প্রমাণ আরো অনেকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু প্রতিভার বিচারে শেকস্‌পীয়রের ধারে কাছেও তারা পৌঁছতে পারেন না। এ কথা যে কেউ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করবেন।

স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড থেকে সোজা এলাম ম্যাঞ্চেস্টারে। বেলা তখন তিনটে। রবিবার। ছুটির দিন। যেন শহর নয়, খাঁ খাঁ শ্মশানপুরী। ক্বচিৎ কখনো পথে চোখে পড়ে দুটি একটি মানুষ। সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলই বলা চলে। ভিড় হবে না অহেতুক। পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়বে না রাশি রাশি মানুষ। অতএব নিশ্চিন্তে ব্ল্যাকবার্ণের পথ ধরলাম।

'শার্লক হোমস্‌' নাটকে অভিনয়ের সময় ছোটবেলা সেই যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম, ব্ল্যাকবার্ণ লাগতো আমার সবচেয়ে ভালো। থাকতাম সেই এক শুঁড়িখানায়। থাকা খাওয়া মিলিয়ে খরচ ফি হপ্তায় মাত্র চোদ্দ শিলিং। তাতেই ফাউ হিসেবে বিলিয়ার্ড খেলা। বিলিংটন আসতো মদ খেতে শুঁড়িখানায়। পেশায় সরকারী জল্লাদ। তারই সাথে খেলতাম বিলিয়ার্ড। সে গল্প আমি কত মানুষের কাছে করেছি। জল্লাদের সঙ্গে খেলা সে যেন আমার পরম সৌভাগ্য।

সেই শুঁড়িখানারই বাইরে গাড়ি থামালাম। বেলা মোটে পাঁচটা, এরই মধ্যে নেমেছে সন্ধ্যের ঘোর। ঢুকলাম ভেতরে, কেউ চিনতে পারলো না। না পারাটাই স্বাভাবিক। পুরনো মালিক আর নেই। হাত বদল হয়েছে। সব নতুন। শুধু একধারে পড়ে আছে সেই বিলিয়ার্ড খেলার টেবিল। আমার প্রাচীনতম বন্ধু।

গেলাম বাজারের লাগোয়া সেই মাঠটায়। তিনটি কি চারটি মাত্র আলো, তাতে থম মেরে আছে অন্ধকার। বক্তৃতা চলছে। ছোট ছোট দল, এক এক দলের সামনে এক একজন বক্তা। বলাবাহুল্য বিষয় রাজনীতি,—ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন অর্থ নৈতিক অবস্থা। মন্দা চলছে ভীষণ। ঘুরে ঘুরে শুনলাম প্রতিটি বক্তব্য। কেউ বলছে তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায়, তাতে সমালোচনার ভাগই বেশি। কেউ বা সমাজতন্ত্রের উদাহরণ পাড়ছে। একজনকে শুনলাম সাম্যবাদের কথা বলতে। একজন ব্যাখ্যা করছে 'ডগলাসের পরিকল্পনা'। যা কিনা আমার ধারণায় সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে।

বক্তৃতার পর দেখি ছোট ছোট ভিড়, ছোট ছোট জটলা। খুব তর্ক আর কথা কাটাকাটি। এক বৃদ্ধ বললেন, ওসব বক্তৃতায় কিসসু হবে না। ইংল্যাণ্ডে মরতে বসেছে খয়রাতি দিতে দিতে। যতদিন এই খয়রাতি সাহায্য না বন্ধ হবে, ইংল্যাণ্ডের বাঁচবার আর আশা নেই। খুব লাগলো মনে। ছেলেবেলা সেই পেতাম দু পেনী করে সাহায্য সেটাই গায়ে যেন কাঁটার মতো বিঁধছে। বললাম, খয়রাতি সাহায্য দিতে পারি বলেই

আমরা ইংরেজ। সারা ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর চোখে এই একটি কারণে মহান্ হয়ে থাকবে। শুনে চারিদিক থেকে ধ্বনি দিয়ে সবাই আমাকে সমর্থন করলো।

অবিশ্যি একটা কথা ঠিক, এই যে এতো রাজনৈতিক কচকচি, এগুলো এক অর্থে অর্থহীন। চল্লিশ লাখ বেকার আজ ইংল্যাণ্ডে। সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে। এ অবস্থায় নতুন কি দিতে পারে শ্রমিক দল? রক্ষণশীল দলেরই বা নতুন কি করার আছে?

উলউইচে গিয়ে শুনলাম লিবার‍্যাল দলের নেতা শ্রীযুক্ত কানিংহাম রীডের এক দীর্ঘ নির্বাচনী ভাষণ। ভারী কুশলী বক্তা, রাজনীতি অর্থনীতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। কিন্তু ঐটুকুই। নতুন কোন প্রস্তাব তার ভাষণে নেই। তাই নিয়ে শ্রোতাদের মধ্যেও দেখি নানান প্রশ্ন। আমার পাশে বসা একটি মেয়ে তো চিৎকার করে উঠলো আচমকা,—অতো ধানাই পানাই শুনতে আমরা আসিনি। আপনারা কি করবেন সেটা আগে বলুন। দেশের চল্লিশ লাখ লোক বেকার। আমিও বেকার। আগে বলুন কি করবেন। তারপর ভোট দেবো কি দেবো না সেটা ভেবে দেখবো।

এটাকে যদি সর্বসাধারণের মতামতের নজির হিসেবে ধরি, তবে বলতে হয় শ্রমিক দল এবারও ভোটে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাবে। কিন্তু ভুল। পেলো না তারা। রেডিওতে স্নোডেন ছিলেন এক দারুণ বক্তৃতা। তাতেই বাজিমাৎ। বিপুল ভোটে জয়ী হলো রক্ষণশীল দল। আমেরিকা রওনা হবার আগের মুহূর্তে শুনে এলাম তারা অচিরেই সরকার গড়বে। পৌঁছে শুনি, কি নাকি এক বিপর্যয় ঘটে গেছে, তারই ভিত্তিতে রক্ষণশীল দল সরকার গঠনের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

ছুটি মানেই একটা ফাঁকা ভাব। ফাঁকা মন, হাতে অফুরান সময়—তোমার যা খুশী যা ইচ্ছে করে নাও। বলতে গেলে সেই মেজাজ নিয়েই ইওরোপে আছি। এই যে এতোগুলো দিন কাটিয়ে দিলাম—আসলে করবার কিছু নেই তাই। কাজ থাকলে কি আর এইভাবে শুয়ে বসে দিন কাটাই। সত্যি বলতে কি, মনের মধ্যে একটা নৈরাশ্য বোধও আছে। সেটা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে। কি করবো আগামী দিনে তাই নিয়ে মনে বিস্তর সংশয়। 'সিটি লাইটস্' অঢেল পয়সা দিয়েছে। খ্যাতির শীর্ষে আজ তার নাম। পাশাপাশি সবাক চিত্র পারেনি এতো টাকা ঘরে ফিরিয়ে আনতে। শীর্ষে ওঠার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে কি আরেকটা নির্বাক ছবি করা যায়? সেটা কি পিছিয়ে পড়ার সমগোত্রীয় বলে গণ্য হবে না? আসলে লোকে বলবে আমি প্রাচীনপন্থী, সময়ের সঙ্গে পারছি না তাল মিলিয়ে চলতে—এতে আমার ভীষণ ভয়। তবে একথা আমি বিশ্বাস করি যে শিল্পের উপাদান যা কিছু সেটা একমাত্র নির্বাক

ছবিতেই পাওয়া যায়। শব্দের দৌলতে সবাক চিত্র শিল্প সুষমা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে।

কিংবা ধরাই যাক না, নয় আমি একটা সবাক ছবি করলাম।

ভাবনাটুকুই সার, ভাবনা মাথায় আসা মাত্র ভারী অস্বস্তি বোধ করি, নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হয়। নির্বাক ছবির সেই মাধুর্য—তা কি সবাক ছবিতে সম্ভব? সবাক মানে ভবঘুরে পুরোপুরি খারিজ। কথা তো আর সে বলে না। কয়েকজন বলেছে আমাকে, দিন না ভবঘুরের ঠোঁটে ভাষা, কথা বলুক স্বাভাবিক আর পাঁচটা মানুষের মতো। বোঝাতে পারিনি আমি তাদের—এ হয় না হতে পারে না। প্রথম শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে সে যে ভিন্ন আরেক সত্তায় পরিণত হবে। কি করে করবে তখন আগের মতো আচরণ? তাছাড়া সে তো জন্মেছেই নির্বাক হয়ে। বোবা নয়, আসলে প্রতিবাদ করার সাধ্য তার নেই। সব দেখা তার কাজ, সব কিছুর অনুভূতি গ্রহণ করা। এগুলোকে ভাষায় রূপ দিলে যে চরিত্রের মূল সুরই নষ্ট হয়ে যাবে।

অর্থাৎ স্থির করতে পারছি না মন। পারি না পুরনোকে ছাড়তে, আবার নতুনের প্রতি মোহ থেকেও মুক্ত নই। এইসব ভাবনা সর্বক্ষণ মনে পাক খেয়ে বেড়ায়। তাই তো ছুটি আর শেষ হয় না।

কিন্তু আর নয়। ভেতরে ভেতরে ভীষণ একটা তাগিদ মন তোলপাড় করে বেড়ায় অহোরাত্র। কে যেন বলে বারবার, ফিরে যাও হলিউডে, কাজ শুরু করো। আজ কদিন ধরে তাগিদটা ভীষণভাবে টের পাচ্ছি।

মোটামুটি সেইভাবেই মন স্থির করে ফেলেছি। যাবো এখান থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া। পথে নিউইয়র্কে কটা দিন কাটিয়ে যাবো। যাত্রার দিনক্ষণও সব ঠিক। এমন সময় ডগলাস পাঠালো তার—সেণ্ট মোরিৎসে আছি। চারদিকে পাহাড়। আর সাদা বরফ। আমি একা। তুমি এলে নির্ঘাৎ আরো বরফ পড়বে। তখন দেদার মজা। চলে এসো দেরী করো না। ইতি ডগলাস।

পড়া শেষ করেছি কি করিনি দরজায় শুনি ঠুক ঠুক ঠুক। কে আবার এলে বাপু এমন অসময়ে? তা দ্বিধা কিসের। ভেতরে এসো।

দেখি সে। সেই মেয়ে। প্যারিসে বিদায় জানিয়ে এসেছি যাকে। আমি তো থ। খানিকটা বিরক্তিও লাগছে। আবার বলতে পারছি না ভাগো এখন। বললাম, বলো কি তোমার সমাচার।

আধঘণ্টা পর। দুজনে আমরা বাজারে। দোকান হাটকে কিনছি এটা ওটা শীতের নানান পোশাক। আর স্কি করার সরঞ্জাম। একছড়া হারও কিনে দিলাম। এটা বাড়তি। দেখি ভারী আহ্লাদ। মাঝখানে কাটলো একটা দিন। সব গোছগাছ হলো। তারপর

সিধে সেন্ট মোরিৎজ। দেখে কী খুশী ভগলাস। আসলে আমারই মতো ভাবনায় পড়েছে যে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাই তো ছুটি কাটাতে এই এতোদূরে আসা। মেরী সঙ্গে নেই। কানাঘুষোয় শুনেছি দুজনের মধ্যে নাকি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

সে হোক, গোল্লায় যাক। আমাদের কিছু যায় আসে না। যেদিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। আর স্কি করি আমরা। সকাল থেকে সারাদিন। সে যে কী খুশী কী আনন্দ।

কাইজারের ছেলে জার্মানীর পূর্বতন যুবরাজও আমাদের হোটেলেই আছে। এখন তো আর যুবরাজ নয়, তাই আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের কোন ব্যাপার নেই। একদিন শুধু ওঠা-নামার চলমান সিঁড়িতে দেখতে পেলাম। দুজন দুটোতে। হাসলাম মুখের দিকে তাকিয়ে। যুবরাজ বলে নয়। আমার 'শোলডার আর্মস্' ছবিতে যে ওরই একটা চরিত্র আছে। সে ভীষণ মজার। সেই মজাদার কথা মনে পড়তেই হাসি এলো।

সিডনীকে তার পাঠালাম। বললাম, তুই চলে আয়। খুব আরাম। বেভারলি হিল্‌সে ফেরার কোন তাড়া নেই। আপাততঃ জাপান অব্দি যাবো।

সিডনী রাজী। অমনি এসে হাজির। নেপ্‌লসের জাহাজে উঠলাম। মেয়েটিকে নিয়ে এবার আর কোন সমস্যা নেই। গয়না পেয়ে টাকা পেয়ে দেখি ভীষণ খুশি তাছাড়া মনের টান বলতে যা সেটা এবার যেন একদম নেই। এবার কিছুটা দায়িত্ব বোধ, কিছুটা সম্প্রদান—এটা দুজনেরই মনের অবস্থা। আসলে অদেখা হলেই কিনা টান অনেকটা কমে। জাহাজ যখন ছাড়লো দেখি দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই—ভবঘুরে হাঁটে যেমন করে ছবিতে, সেইভাবে হেঁটে আমাকে দেখাচ্ছে। আর হাসি হাসি মুখ।

বাস্, তারপর আর কোনদিন তাকে দেখি নি।

২৩

ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেবো না। পাঠক নির্ভয় থাকতে পারেন। কেননা আমি জানি, বাজারে প্রাচ্য ভ্রমণের ওপর বিস্তর বই আছে। সেগুলো পড়লেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। আমি যে বইখানা পড়েছিলাম জাপান যাবার আগে সেটা লাফ্‌কাডিও হার্ণের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। জাপানে গিয়ে ভারী একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেটা বলার আগে সামান্য একটু গৌরচন্দ্রিকা করে নিই।

জাপানী জাহাজে চড়েই চলেছি। জাহাজ ঠিক বলা যায় না, ছোট ষ্টীমার। শীত শীত ভাবটা ক্রমশঃ কাটছে। সুয়েজ খালে পৌঁছে দেখি ঝকমক করছে রোদ, আবহাওয়া মোটের ওপর উষ্ণ। আলেকজান্দ্রিয়ায় থামলো ষ্টীমার। কিছু যাত্রী নামলো, উঠলো বেশ কিছু নতুন মুখ। মুসলমান আর হিন্দুর সংখ্যাই বেশি। যেন নতুন একটা জগৎ। সূর্যাস্তের সময় দেখতাম ডেকের ওপর সার সার বসে গেছে মুসলমান যাত্রীর দল, মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছে।

এরপর লোহিত সাগর। ভারী জামা আর শরীরে রাখা যাচ্ছে না। পালটে ছোট প্যান্ট আর পাৎলা সিল্কের জামা পরলাম। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কিনেছি প্রচুর ফল আর নারকেল। তার মধ্যে আম আছে। আম দিয়ে আর নারকেলের হিম-শীতল দুধ দিয়ে প্রাতরাশ খাওয়া যে কী অপূর্ব। একদিন জাপানী খানাও খেলাম। ডেকের ওপর সারবন্দী বসে সে এক মহাভোজ। একজন বললো, একটু চা মিশিয়ে নিন ভাতের সঙ্গে, দারুণ খোশবু ছাড়বে। মিশিয়ে নিলাম তাই। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। ক্যাপ্টেন বললেন, পরদিন সকালে আমরা কলম্বোতে পৌঁছে যাবো। অর্থাৎ পুরোদস্তুর প্রাচ্যের দরবারে ঢুকে পড়েছি প্রায়। ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনা—কতদূর, আর কতদূর বালী।

বালী আর জাপান আমাদের লক্ষ্য। শুনেছি অনেক কথা বালী সম্বন্ধে। আর জাপান তো আছেই। পথে পড়লো সিংগাপুর। ঘুরে এলাম একচুমুক। চীনেরই মতো অনেকটা। সেই উইলো গাছ, সেই ঢেউ খেলানো ছাদের বাড়ি। একটা মস্ত মাঠ মতো, সেখানে নাটক হয় চীনা রীতিতে। আর বাচ্চাদের জন্য হরেক খেলার সামগ্রী আছে। মঞ্চ বলতে কিছু নেই। মাঠের মাঝ বরাবর মস্ত একটা প্যাগোডা। চারধার খোলা। ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে সেখানে অভিনেতার দল। আর সে মস্ত বড়

বড় নাটক। দু দিন তিনদিন লাগে এক একটা শেষ হতে। একটা দেখেছিলাম পর পর তিন রাত। বছর পনেরোর একটি মেয়ে, সে মুখ্য চরিত্র। অর্থাৎ জনৈক রাজকুমার। ভারী দরাজ গানের গলা। আর সে যে কত গান। যেন, গানেরই নাটক। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ রাতে মূল ঘটনাটি চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে যায়। কি যে মূল সমস্যা নাটকের জানিনা। অনেক সময় ভাষা না বোঝাটা একদিক থেকে মঙ্গল। বুদ্ধি খাটিয়ে বিশেষ কিছু বুঝবার দরকার পড়ে না। দেখলাম চরম মুহূর্তে পৌঁছে অভিনেতার গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। গান চলছে আরো উঁচু পর্দায়, সঙ্গে নানান বাজনা। মাদল থেকে শুরু করে তারের বাদ্যযন্ত্র কিছুই বাদ নেই। কান একেবারে ঝালাপালা হবার দাখিল। এরই মধ্যে রাজপুত্রকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। সেই অবস্থাতেই একসময় অতিলৌকিক কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে একসময় দৃশ্য থেকে বেরিয়ে গেল। অমনি নেমে এলো যবনিকা।

এবার চলেছি বালীর দিকে। বালী দেখার পরিকল্পনা পুরোপুরি সিডনীর। তথাকথিত সভ্যতার ছাপ এখনো এখানে পড়েনি। সেই রকমই একটা পরিমণ্ডল নাকি সারা দ্বীপ জুড়ে। মেয়েরা নাকি এখনো আদুর গায়ে ঘুরে বেড়ায়। শুনে আমি তো রীতিমতো অবাক। দেখতে হবে তাহলে! আর সে কী মনোরম দৃশ্যপট! স্টীমার যতো এগোয়, দেখি সারি সারি পাহাড়, তাতে ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি, ওপরে ভাসছে হাল্কা তুলোর মতো মেঘ, আর চারিদিকে নীল টলমল জল। যেন ভাসছে গোটা দ্বীপটা জলের ওপর। ইচ্ছে করলে ঠেলে সরিয়ে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়।

নেমে দেখি মস্ত উঁচু উঁচু দেয়ালে ঘেরা খানিকটা করে জায়গা। এর মধ্যে ঘর বাড়ি। থাকে একসাথে একাধিক পরিবার। যত ভেতর দিকে এগোই তত অবাক করা প্রাকৃতিক দৃশ্যসজ্জা। পাহাড়ের প্রায় মাথা অব্দি উঠে গেছে ধাপে ধাপে শস্যক্ষেত। সমতলে ধানের গাছ দুলছে থির থির হাওয়ায়। নদী বইছে মাঝখান দিয়ে। অপূর্ব! হঠাৎ কনুই দিয়ে খোঁচা দিলো সিডনী। দেখি একদল মেয়ে। মাথায় ফলের ঝুড়ি। উর্দ্ধাঙ্গ পুরোপুরি অনাবৃত। শুধু কোমর অব্দি জড়ানো ছোট্ট একফালি কাপড়। তাতে চিত্র বিচিত্র নানান নকসা। সেই শুরু। কনুই দিয়ে গোত্তা দেওয়ার সূচনাও সেই থেকে। একবার দেয় সিডনী আমাকে, একবার আমি সিডনীকে। রূপেও কিছু কম যায় না। আর সব থেকে মজা লাগছে আমাদের গাইডকে দেখে। গাড়ির সামনের আসনে সে আর চালক। পেছনে আমরা দুজন। যতবার সামনে দিয়ে মেয়ে যায়, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে আমাদের মুখের দিকে, আমাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। যেন গোটা ব্যাপারটা দেখাবার যাবতীয় কৃতিত্ব তারই।

দেন্‌পাসারের হোটেলে উঠলাম। তৈরী হয়েছে নতুন। চারপাশে ঘোরানো বাইরের

ঘর। সামনেটা আগাগোড়া খোলা। ঠিক বারান্দায় দাঁড়ালে যেমন দেখা যায়। শোবার ঘর পেছনদিকে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আলো বাতাসও প্রচুর।

হার্সফিল্ড আর তার বৌয়ের সঙ্গে দেখা। জলরঙের নামকরা শিল্পী। আমেরিকান। দুমাস ধরে আছে এখানে। বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সেই বাড়িতেই নাকি কদিন আগে থেকে গেছেন মেক্সিকোর শিল্পী মিগুয়েল কোভারুবিয়াস। গোটা বাড়িখানার ভাড়া নাকি মাত্র হপ্তায় পনেরো ডলার। একদিন ডিনারের নেমন্তন্ন করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর বেরুলাম হাঁটতে হাঁটতে। চারদিক থমথম নির্জন। একটু হাওয়া নেই। দমধরা ভাব। হঠাৎ দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে বাজি। ছুটে আসছে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে। সে যেন অন্ধকারের বুকে আলোর রোশনাই। এরই মধ্যে একসময় বেজে উঠলো মাদল। সঙ্গে ঘুঙুরের আওয়াজ। হার্সফিল্ড বললো, চলুন নাচ হবে এখন। দেখে আসি।

একটুখানি এগোতেই দেখি একদল মানুষ। দাঁড়িয়ে আছে কেউ, কেউ বসা। মশালের আলোয় আলো হয়ে আছে চারি দিক। অনেকটা মেলা গোছের। দোকান বসে গেছে ছোটখাটো অনেকগুলো। তাতে ফলের পশরা। ভিড় ঠেলে সামনে যেতে দেখি দুটি বছর দশেকের বালিকা নাচছে। গায়ে ফুলকাটা পোশাক। মাথায় বিনুনী। তাতে সোনালী জরির ফিতে। উন্মাদ উদ্দাম সেই নাচ। ঠিকরে উঠছে চোখ। হাতের ভঙ্গিতে নানান মুদ্রা। বাজছে মাদল। গম্ভীর ভরাট তার শব্দ। আর নাচ। সারা শরীর জুড়ে নাচ। শেষটা ভারী অদ্ভুত। আচমকা নাচ বন্ধ করে মেয়েরা গিয়ে বসলো ভিড়ের মধ্যে। অমনি মাদল বা ঘুঙুরের তালও বন্ধ হলো।

অবাক কাণ্ড, কেউ দিলো না সাবাশ। কেউ দিলো না হাততালি। এদের স্বভাবই এই। উচ্ছ্বাস ব্যাপারটা জীবন থেকে একেবারে বাদ। ধন্যবাদ জানালে একটু হাসেও না। ভালবাসা দেখালে চুপ করে থাকে।

সংগীতশিল্পী ওয়াল্টার স্পাইসের সঙ্গে পরিচয় হলো। চিত্রশিল্পীও বটেন। একনাগাড়ে পনেরো-বছর আছেন এখানে। একদিন দুপুরের ভোজে হোটেলে নেমন্তন্ন করলাম। গুণী মানুষ। বালীদ্বীপের ভাষা বলতে পারেন। এখানকার লোকগীতির বিস্তর সুরের স্বরলিপি করেছেন। পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনালেন কয়েকটা। অপূর্ব। বাখ্-এর বাজনার চাইতে কোন অংশে কম নয়। বললেন, আমাদের সুর এদের তুলনায় যথেষ্ট লঘু মেজাজের। ছন্দও লঘু। শুনিয়েছিলেন আমাদের সুর। এদের ভালো লাগে নি। মোৎজার্টের সুর শুনে বলেছে নাকি ন্যাকা ন্যাকা। বাখ্ বরং তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা সঙ্গতি আছে তালে ছন্দে। বলবো কি সে এক আশ্চর্য সুর। সম্পূর্ণ নিজস্ব অথচ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। উন্মন করে তোলে

মন। আর ভীষণ ভরাট। কোথাও ফাঁক নেই যে মুহূর্তের জন্য সব থেমে যাবে, সুর কেটে যাবে। এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

স্পাইসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম খাওয়াদাওয়ার পর। বেলা দুপুর। হেঁটে চলেছি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। প্রায় চার মাইল। ধর্মীয় কি এক অনুষ্ঠান আছে। তাই দেখবো। এদের ভাষায় পেটানো-পুজো। দেখি পাহাড়ের কোলে ফাঁকা মতো একটা জায়গায় ভীষণ ভিড়। এসেছে দলে দলে মানুষ। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী সবাই। মেয়েদের পরনে কোমর অব্দি কাপড়। উর্দ্ধাঙ্গ খোলা। মাথায় ফলের ঝুড়ি। সামনে একটা বেদী। তার ওপর নামিয়ে রাখলো ফল। পুরোহিত দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। অনেকটা ফকিরের মতো চেহারা, মাথার চুল কোমর প্রমাণ লম্বা। সব ফল রাখা হলো। উৎসর্গ হলো সব ফল। তখন জঙ্গলের দিক থেকে ছুটে এলো আচমকা এক দল তরুণ। নিলো সব ফল লুঠ করে। আর সেই ফাঁকে পুরুতের হাতে বেতের চাবুকে শুধু একের পর এক ঘা। যাকে বলে একধারসে পেটানো। চাবুক খেয়ে ফল ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলো কয়েকজন। কয়েকজন পড়ে কাতরাতে লাগলো। নাকি চুরি করেছিল এরা সকলে। এ তারই শাস্তি। চুরির পাপ এখানে এইভাবে খণ্ডন।

কোনো বিধি নিষেধের বালাই নেই। যত্রতত্র ঘুরি আমরা যেখানে যে মন্দিরে খুশি ঢুকে পড়ি। সে যে কত রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান! তাতে মুরগী লড়াই হয়। গান বাজনা হয়। সারা রাত ধরে চলে এমন অনুষ্ঠানও দেখলাম। শেষ হলো ভোর পাঁচটায়। অদ্ভুত সে সব রীতি। নাচ গান হৈ হল্লা কিছু না কিছু থাকবেই অনুষ্ঠানে। এদের দেবতা নাকি এসব ভালবাসেন। তাই খুশি করে তাঁকে। সন্তুষ্ট করে। অবশ্য ভয়ের কোন ব্যাপার নেই। ভয় করে না এরা ভগবানকে। ভালবাসে হৃদয় দিয়ে। নাচগান অনুষ্ঠান তারই অভিব্যক্তি।

আর ভারী সরল সাদা মনের প্রতিটি মানুষ। জানে না হিসেব নিকেশের কারচুপি। একজনকে স্পাইস একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়েস কত হলো?

বললো, কবে যেন সেই ভূমিকম্পটা হয়েছিল?

—বারো বছর আগে।

—মনে পড়েছে। তখন আমার তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বলেই কি জানি কি ভাবলো একটুক্ষণ। যেন জবাব দিয়ে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। বললো, আমার বয়েস এই সব মিলিয়ে দু হাজার ডলার।

আমরা তো অবাক! স্পাইস বললেন, এটা ওর সারা জীবনের খরচ। খরচের মাপে বয়েসের হিসেব করে এরা।

কয়েকটা বাড়ির সামনে দেখি আনকোরা লিমুজিন গাড়ি। তাতে মুরগী থাকে। কাঁচ তুলে দিলে সাক্ষাৎ একটি খাঁচা বিশেষ। স্পাইসকে বললাম, ব্যাপার কি? লিমুজিনে পোষে মুরগী! বললেন, এটা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এই চৌহদ্দির সকলেই এই গাড়িখানার মালিক। মোটের ওপর সাম্যবাদী কায়দায় এরা জীবন যাপন করে। গরু মোষ চালান দেয় বাইরে, ধান চাল বেচে, তাইতে বিস্তর পয়সা পায়। একবার তো এক গাড়ির সেলসম্যান হাজির। কিভাবে কি বোঝালো জানিনা, দেখি জমানো টাকা দিয়ে কিনে ফেললো বেশ কয়েকখানা গাড়ি। খুব চড়লো কদিন হৈ হৈ করে। তারপর তেল শেষ। তখন বসলো হিসেব কষতে। নতুন করে তেল কিনে একদিন গাড়ি চড়তে যা খরচ, সেটা তাদের এক মাসের খাটুনির রোজগার। ফলে গাড়ি হলো মুরগীর খাঁচা। বাড়ির উঠোনের একধারে থিতু হলো।

স্বর্গ তখন বালী। ফুলে ফলে সবুজ গাছপালায় ভরা মাটির স্বর্গ। চারমাস অক্লান্ত পরিশ্রম। ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান, বাকী আটমাস ছুটি। তখন শুধু গান বাজনা নাচ আর শিল্প চর্চার অবকাশ। সে এক সুখের দিন। এখন সব নষ্ট হয়ে গেছে। ঢুকেছে শিক্ষা। ঢুকেছে অঙ্কের হিসেব। মেয়েরা এখন সারা গা কাপড় দিয়ে ঢাকে। পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে বালীর অঙ্গে। সব মাধুর্য এখন হারিয়ে গেছে।

এবার জাপানের পথে। আমার সেক্রেটারীর নাম কোনো। জাপানী। বললো, আপনারা আসুন, আমি আগে গিয়ে আপনাদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে রাখি। সরকারী অতিথি আমরা। সে রকমই সব ঠিকঠাক। চলে গেলো কোনো। আমাদেরও জাহাজ ছাড়লো। কোবে বন্দরে পৌঁছে দেখি মাথার ওপর চক্কর দিয়ে উড়ছে এরোপ্লেন। তা থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো ফুল আর স্বাগতম জ্ঞাপক বার্তা। সে ভারী রোমাঞ্চকর পরিবেশ। জাহাজঘাটায় হাজারে হাজারে মানুষ। সার দিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা পরেছে রঙ বেরঙের কিমোনো। যেন রাশি রাশি ফুলের পাপড়ি। দূর থেকে লাগছে ভারী চমৎকার। ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা উত্তেজনা টের পাচ্ছি।

কোবে থেকে যাবো টোকিও। তার জন্যে সরকার একখানা বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু আমাদেরই জন্যে। স্টেশনে স্টেশনে সে যে কত মানুষ, কত ভিড়! রঙ বেরঙের বাহারী সাজ মেয়েদের পরনে। ট্রেন থামতে এগিয়ে এসে উপহার দিলো নানান জিনিস। টোকিও স্টেশনে প্রায় হাজার চল্লিশের মতো মানুষ। সে যা ভিড়! ঠেলাঠেলির চোটে সিডনী তো পড়েই গেলো মাটিতে। আরেকটু হলে ভিড়ের চাপে চিঁড়েচ্যাপ্টা হতে হতো।

প্রাচ্যের সব ব্যাপারেই কেমন এক রহস্যের ছোঁয়া। শুনে আসছি আবহমান কাল

ধরে। আগে ভাবতাম এ বোধহয় আমাদেরই বাড়াবাড়ি। বাস্তবে হয়তো কিছুই এরকম নেই। তখন কি জানি রহস্যের জালে আমাদেরও জড়িয়ে পড়তে হবে। একটু একটু করে আষ্টেপৃষ্ঠে আমাদেরও জড়িয়ে ধরবে রহস্য।

মোটমাট কোবে ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই রহস্যের জালটা ছড়াতে শুরু করেছে। আমরা টের পাই নি। টোকিও স্টেশন থেকে হোটেলের পথে যেতে যেতে প্রথম খানিকটা আন্দাজ পেলাম। গাড়ি চলেছে শহরতলীর নিরালা নির্জন পথ ধরে। অদূরে সম্রাটের প্রাসাদ। কেউ বলে নি কিছু। দেখি গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। কোনোর চোখে উদ্বেগ। বললো, কিছু মনে করবেন না, একবার দয়া করে গাড়ি থেকে নামুন।

বললাম, কেন?

—এটা প্রথা। যে, যায় এ পথ দিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে তাকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করতে হয়। আপনার মাথা নোয়াবার দরকার নেই। শুধু নামলেই হবে।

আশ্চর্য! ত্রিসীমানায় আমরা কজন আর আমাদের পেছনে তিন চারখানা গাড়ি ছাড়া কেউ কোথাও নেই। নামলাম কি নামলাম না এটার প্রমাণ হবে কিভাবে! কোনো বললো, প্রমাণ হবে। দয়া করে আপনি এ নিয়ে আর তর্ক করবেন না।

তখন নামলাম। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে বিরাট এক ধাঁধার মতো। মাথা নুইয়ে যথারীতি অভিবাদন জানালাম। সিডনীও। দেখি কোনোর দৃষ্টিতে উদ্বেগের ছাপ এখন আর নেই। যেন নিশ্চিন্ত অনেকখানি। সেই ভাবে গিয়ে গাড়িতে বসলো।

সিডনী বললো, ভারী গোলমেলে ঠেকছে। বিশেষ করে তোর ঐ কোনোর আচরণ। যেন কি একটা গোপন করতে চায় আমাদের কাছে।

আমি বললাম, এটা এখানকার প্রথা। আমরা রাজী হই কিনা এ নিয়ে কোনোর মনে সংশয় ছিলো। সেটাকেই গোপনীয়তা ভেবে ভুল করেছি। আসলে এমন কিছু নয়। এসব চিন্তা বাদ দে।

সে রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটলো। পরদিন সকালে ছুটতে ছুটতে সিডনী এসে হাজির। ভীষণ উত্তেজিত।—বলি ব্যাপারটা কি? আমার ব্যাগ হাটকেছে। আমার কাগজপত্র ওলোটপালোট করেছে। এর মানে কি? আমরা অতিথি না আর কিছু?

বললাম, অতিথি তো বটেই। কিন্তু ব্যাগ হাটকেছে তাই নিয়েই বা এতো সোরগোলের কি দরকার। বাইরে বেড়াতে গেলে এরকম হয়েই থাকে। কিছু হারায় নি তো!

বললো, হারায় নি। তবু আমি বলবো ভেতরে ভেতরে কি যেন একটা চক্রান্ত চলছে। চোখ কান আমাদের খোলা রাখা দরকার।

হেসে উড়িয়ে দিলাম তার কথা। বাতিকগ্রস্ত বলে দোষ দিলাম। চলে গেলো সিডনী।

একটু পরে সরকারী দপ্তরের এক কর্মচারী এসে হাজির। বললেন, সরকার থেকে আমাদের দেখাশোনা করবার ভার তারই ওপর ন্যস্ত হয়েছে। এরপর থেকে আমরা যেখানে যাবো যেন কোনোর মাধ্যমে তাকেও আগেভাগে জানিয়ে দিই। তিনি যাতে আমাদের কোনরকম অসুবিধে না হয় দেখবেন।

শুনে সিডনী তো ক্ষেপে লাল। বললো, তুই তো মানলি না আমার কথা, আমি হলফ করে বলতে পারি আমাদের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। তোর কোনো সব জানে। বলবে না কিছু। এই চক্রান্তে ওরও হাত আছে।

তা সত্যি বলতে কি কোনোর ভাবগতিক আমারও কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে। যেন স্বাভাবিক নয়। চোখে সর্বদা উদ্বেগের ছাপ। যেন খুব বিপদে পড়েছে বা বাধ্য হচ্ছে ইচ্ছার বিপরীত কোন কিছু করতে এরকমই চকিত ত্রস্ত আচরণ।

সিডনীর সন্দেহটা যে আদৌ অমূলক নয় তার প্রমাণ সেদিন দুপুরেই পেলাম। কোনো বললো, এক ব্যবসায়ী নাকি এসেছিল দেখা করতে। সিল্কের ওপর ছাপানো কিছু অশ্লীল ছবি তার কাছে আছে। সেগুলো সে বিক্রী করবে। আমরা যেন তার বাড়িতে গিয়ে অতি অবিশ্যি ছবি দেখে আসি।

বললাম, অসম্ভব। এ ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। তুমি বলে দাও তাকে সরাসরি।

কোনোর দেখি ইতস্তত: ভাব। বললো, বেশ তো নয় বলি বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়, ওরা হোটেলেই দিয়ে যাক।

বললাম, না। স্পষ্ট বলে দাও, বৃথা সময় নষ্ট না করে যেন অন্য খদ্দেরের খোঁজ করে।

তবু দেখি নড়ে না। বললো, কিন্তু মুশকিল হলো এদের খুব দাপট। না বললে ভীষণ রেগে যায়!

—তার মানে?

—আমাকে কদিন ধরেই ভয় দেখাচ্ছে। যদি ছবি বিক্রীর ব্যবস্থা না করে দিই, বলছে আমাকে খুন করবে।

—বেশ তো তাহলে এ অবস্থায় পুলিসে যোগাযোগ করি।

কোনো নীরবে শুধু মাথা নাড়লো। তারপর চলে গেলো ঘর থেকে।

ঠিক তার পরের দিনের কথা। সিডনী আমি আর কোনো ডিনার খাচ্ছি রেস্তোরাঁয়। ছোট্ট একখানা ঘরে আমাদের জন্য বিশেষ আয়োজন। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, দুটি যুবক ঢুকলো ঘরে। একজন বসলো কোনোর পাশে। বাকীরা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনোর দেখি ভীষণ উদ্বেগ। পাশে বসা যুবকটি কি যেন বলছে জাপানী ভাষায়, গলায় ঝাঁঝ। দেখি ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হচ্ছে কোনোর চোখ মুখ।

ভেবে দেখুন অবস্থা। একটা কিছু দুরভিসন্ধি আছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এদিকে সঙ্গে অস্ত্র বলতে কিছু নেই। একেবারে ঝাড়া হাত পা। দিলাম কোটের পকেটে ডান হাত ঢুকিয়ে। যেন রিভলবার আছে আমার সাথে, সেরকমই ভাব। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এসবের মানে কি ? আমি জানতে চাই।

কোনো মাথা না তুলেই বললো, ওরা বলছে ছবি না দেখে আপনি ওদের অবহেলা করেছেন, অপমান করেছেন।

হাত আমার পকেটেই। সেই অবস্থায় হাত তুলে ধরলাম বসে থাকা যুবকটির দিকে। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য আমি তখন। বললাম, অপমান কি অপমান নয় সেটা আমি ভালো বুঝি। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। কোনো, তুমি গিয়ে ট্যাক্সি ডাকো।

বলে সেইভাবেই কোনো আর সিডনীকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। পাওয়া গেল ট্যাক্সি। উঠে নিশ্চিন্তি। ছুটে চললো হু হু বেগে হোটেলের দিকে।

চক্রান্ত যে কত গভীর তার পরিচয় পরদিনই পেলাম।

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে কেন্ ইমুকাইয়ের আমন্ত্রণে গিয়েছি মল্লযুদ্ধ দেখতে। দেখছি বসে চুপচাপ। হঠাৎ পরিচারক এসে কি যেন কানে কানে বললো কেন্‌কে। দেখলাম ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আমাদের বললেন, একটা জরুরী প্রয়োজনে আমাকে এখুনি চলে যেতে হচ্ছে। আমি দুঃখিত। আপনারা দেখুন। আমি শেষ হবার আগে আবার আসবো।

বলে চলে গেলেন। কেন কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানি না। আসতে আসতে বেশ দেরী। মুখ চোখ কাগজের মতো সাদা। এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে বয়েসটাও যেন বেড়ে গিয়েছে অনেকখানি। জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন ? বললেন, না অসুস্থ নয়। বলে দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, একটু আগে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে আমার বাবা প্রাণ দিয়েছেন।

সে যে কী দুঃসংবাদ! নিয়ে গেলাম হোটেলে। ব্র্যাণ্ডি দিলাম। ধাতস্থ হলেন। বললেন আগাগোড়া ঘটনা। নৌ বিভাগের ছয় রক্ষী অতর্কিতে প্রাসাদের প্রহরীকে হত্যা করে সিধে ওপরে উঠে যায়। প্রধানমন্ত্রী তখন স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে কথা বলছিলেন। সিধে বুকের দিকে তাক করে ধরে রিভলবার। গুলি করবে বলে হুমকি দেয়। তখন প্রধানমন্ত্রী তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। সব নিষ্ফল। বলে সেখানেই নাকি হত্যা করবে। তখন প্রধানমন্ত্রী বলেন অন্ততঃ দয়া করে তারা যেন তাঁকে মেয়ের সামনে স্ত্রীর সামনে হত্যা না করে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে। তাতে রাজী হয় তারা। নিয়ে যায় পাশের ঘরে। একটু পরে গুলির শব্দ শোনা যায়। পরপর কয়েকটা। ব্যস্ সব শেষ।

কেন্ বললেন, যদি সে সময় তিনি খেলার মাঠে না থেকে বাড়িতে থাকতেন তবে হয়তো বাবার সাথে তাঁকেও মরতে হতো।

গেলাম তার সঙ্গে বাড়িতে। ত্ব'ঘন্টা আগেও জীবিত ছিলেন মানুষটা। এখন শুধু খানিকটা রক্তের ছোপ। মৃতদেহ নিয়ে গেছে অন্যত্র। ক্যামেরা কাঁধে দেখলাম একদল মানুষ। সাংবাদিকও প্রচুর। ঘোরে ফেরে, দেখি ছবি তোলার নাম নেই। আমাকে প্রশ্ন করার প্রয়োজনও কেউ বোধ করলো না। একবার শুধু একজন জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যাপারে আমার মনের অবস্থা। বললাম, ভীষণ ত্বঃখ পেয়েছি। সমগ্র দেশ তথা পরিবারের সকলের পক্ষে অত্যন্ত মর্মন্তুদ ঘটনা।

পরের দিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা। তা আর হবার সুযোগ হলো না।

সিডনী বললো, এটা সেই রহস্যেরই অংশ বিশেষ। সেই যে ছ' জন গিয়েছিল রেস্তোরাঁয়—তারাই খুনী। নির্ঘাৎ আমাদের ওপরও কিছু একটা করার মতলব ছিলো।

ছিলো যে সেটা তখন বুঝিনি, বুঝলাম আরো অনেকদিন পরে হিউ বিয়াসের 'আততায়ী এবং সরকার' বইখানা পড়ে। প্রকাশক আলফ্রেড এ. নফ্। তাতে গোটা চক্রান্তের ইঙ্গিত আছে। এমন কি আমিও যে এই চক্রান্তের কেন্দ্রবিন্দু, সেটাও স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে। সবই ব্ল্যাক ড্রাগন দলের কীর্তি। প্রাসাদের সামনে মাথা নীচু করে সম্মান দেখাবার হুকুমও তাদের। ভারী সক্রিয় তারা তখন জাপানে। প্রধানমন্ত্রী হত্যার ব্যাপারে পরে যে বিচার হয়েছিল সেখান থেকে সওয়াল এবং অন্যান্য বিবরণ হুবহু তুলে দিয়েছেন লেখক।

দলপতি লেফটেন্যান্ট সাইশি কোগা। তিনিও নৌ বিভাগের কর্মচারী। গোটা পরিকল্পনা তারই। তিনি নিজে আদালতের কাছে স্বীকার করেছেন, নাকি এরকম ঠিক ছিলো বোমা মেরে গণপ্রতিনিধি ভবন উড়িয়ে দেওয়া হবে। দেশে কায়েম হবে সামরিক শাসন। বোমা ছুঁড়বে সাধারণ মানুষ। সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে থাকবে গণ ভবনের সামনে। প্রতিনিধিরা ভয়ে আতঙ্কে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে একের পর এক। এটা কার্যকরী হয় নি। আরেকটা পরিকল্পনা ছিল এইরকম। সরকারী আমন্ত্রণে যাবো আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, অমনি একসাথে আমাদের ত্বজনকেই খুন করা হবে। এইভাবে কায়েম হবে নতুন শাসন ব্যবস্থা।

বিচারক প্রশ্ন করেছিলেন, চ্যাপলিনকে হত্যা করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য কি?

কোগা—চ্যাপলিনের আমেরিকায় খুব নামডাক। ধনতন্ত্রীদের চোখের মণি। খুন করার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এটা আমার বিশ্বাস। এই সুযোগে আমেরিকাকে আমরা টিট করতাম।

—তা হঠাৎ এই পরিকল্পনা ত্যাগের কারণ?

—কারণ কাগজে লিখলো, সরকারী আমন্ত্রণের দিনক্ষণ নাকি ঠিক হয় নি তখনও।

হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

—প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ঐ জাতীয় হামলার পেছনে মতলব কি ?

—ক্ষমতা দখল। প্রধানমন্ত্রী তার দলের নেতাও বটেন। একই সাথে তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে আমরা দল এবং ক্ষমতা দুইই বানচাল করতাম।

—কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে কি সত্যি সত্যি খুন করার মতলব আপনাদের ছিলো ?

—ছিলো। আমি নিজে বলেছি খুন করার কথা। কোন ব্যক্তিগত রাগ বা অভিযোগের প্রশ্ন ওঠে না। ব্যক্তিগত যে কোন ব্যাপার থেকে আমি মুক্ত।

পরে বন্দী অবস্থায় কোগার জবানবন্দী থেকে জানা যায়, চ্যাপলিনকে হত্যার পরিকল্পনা তারা খারিজ করেন। কেননা সামান্য কৌতুকাভিনেতাকে হত্যার ফলে একটা দেশ যুদ্ধ ঘোষণা করবে এটা অনেক আগ বাড়িয়ে ভাবনা। এবং যুদ্ধে জয়ের প্রশ্নেও সন্দেহের অবকাশ আছে। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনার সিংহভাগ দেশের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ রাখা শ্রেয়।

আমার মনে হয়, আমি যে ইংরেজ এটা হয়তো শেষ মুহূর্তে ওরা জানতে পেরেছিল। তাই আমেরিকার পরবর্তী ভূমিকা নিয়ে মনে সংশয় জাগে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা খারিজ করতে বাধ্য হয়।

সে যাই হোক, এগুলো জাপানে আমার অভিজ্ঞতার একটা দিক। অন্য একটা দিকও আছে।

রহস্যের ঘটনাটুকু বাদ দিলে ছিলাম যে কদিন বেশ আনন্দেই কাটিয়েছি বলা যায়। দেখেছি কাবুকি অভিনয়। এ আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। অভিনয় যে এতো বলিষ্ঠ এতো চমৎকার হতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। পুরনো ধারার সঙ্গে নতুনকে মিশিয়ে কাবুকি অভিনয় কলা। অভিনয়ে আগাগোড়া অভিনেতারই কেরামতি, নাটক তার অভিনয় বিকাশের মাধ্যম মাত্র। পাশ্চাত্ত্য ধারার সাথে বিরাট ফারাক। বাস্তবতাকে কখনো কখনো অতিক্রম করে যায় অভিনয়। যেমন মঞ্চে তরবারী যুদ্ধ। আমরা যে ভাবেই করি না কেন, কিছুটা অপ্রাকৃতের ছোঁয়াচ থাকে। অর্থাৎ সত্যি যুদ্ধ কোন অবস্থাতেই দেখাই না। কিন্তু যুদ্ধ হয়। এবং সেটা দুই যোদ্ধার তরবারির ঘর্ষণেই প্রকাশ পায়। এরা ধার ধারে না বাস্তবের। যুদ্ধ করে দুজন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। নিজের অংশে দাঁড়িয়ে যে যার তরবারি ঘোরায়, গলা কাটবার ভঙ্গি করে, আঘাতের ভান করে অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটাই ভনিতা। আলাদাভাবে দেখলে প্রত্যেক যোদ্ধাই স্বীয় ক্ষেত্রে অনবদ্য। কিন্তু দুয়ের সংমিশ্রণ কখনো হয় না। অনেকটা ব্যালে ধর্মী। এতে ভঙ্গিই প্রাধান্য পায়। দেহজ শৈলী যাকে বলে। সেখান থেকে কখনো কখনো বাস্তবতার রাজ্যে প্রবেশ ঘটে। অর্থাৎ তরবারির একটি ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ে যখন

অপরজন তখন বুঝি মৃত্যুটা বাস্তব। লোকটা তরবারির আঘাতেই মারা গেছে। দুটোকে মিশিয়ে ভাবতে তখন আর কোন অসুবিধে হয় না।

আর প্রতিটি নাটকের মূলেই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ। রোমিও জুলিয়েট ধরনের একটা নাটক দেখেছিলাম মনে আছে। দুই প্রেমিক। বিয়ে করবে। বাবা মার ঘোর আপত্তি। ঘূর্ণায়মান মঞ্চে চলছে নাটক। এ জাতীয় মঞ্চ রীতির ঐতিহ্য প্রায় তিনশো বছরের। প্রথম দৃশ্যে দেখলাম সদ্য বিয়ে হয়েছে জনের। দুটি কপোত কপোতী। যথারীতি বাবা মায়ের অমতে। লোক পাঠিয়েছে বাবা মার কাছে, মত যাতে ফেরানো যায়। কিন্তু না, সব চেষ্টা বিফল। কোন দিকেরই মন আর টলবার নাম নেই। তখন ঠিক করলো তারা আত্মহত্যা করবে। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলো সারা ঘরে। যেন ফুলের শয্যা। আগে মেয়েটিকে হত্যা করবে স্বামী, তারপর সে নিজে ঝাঁপ খেয়ে পড়বে তরবারীর ওপর।

দেখি ফুল ছিঁড়ে ছড়ায় আর কথা বলে যুবকটি, দর্শক হো হো করে হাসে। আশ্চর্য, এমন এক বিষাদের দৃশ্য, কোথায় থমথম করবে পরিবেশ—দোভাষীকে বললাম, কি ব্যাপার, হাসছে কেন সবাই ? বললো, কথাটাই যে হাসির। বলছে, আজ এই ভালবাসার রাতের পরে বেঁচে থাকা চরম একটা ছন্দপতন, এটা সে কিছুতেই হতে দেবে না। দশমিনিট ধরে চললো এই জাতীয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কারচুপি। তারপর হাঁটু গেড়ে মেয়েটি বসলো মেঝেয়। ছেলেটি বেশ খানিকটা দূরে। গলা তুললো মেয়ে। ছেলেটি তরোয়াল হাতে নিয়ে এগোলো পায়ে পায়ে। অমনি মঞ্চ ঘুরতে শুরু করেছে। সে অংশ চোখের আড়ালে গিয়ে এলো নতুন আরেক অংশ। বাড়ির সামনের উঠোন। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। দর্শক চুপ। নিস্তব্ধ চারধার। কথা শুনতে পেলাম। কারা যেন কথা বলতে বলতে এদিকে আসছে। পাত্রের বন্ধুর দল। ভারী খুশী। খবর নিয়ে এসেছে সুখের। মা বাবা রাজী। সেটাই এসেছে বন্ধুকে শোনাতে। কে শোনাবে আগে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। শেষে যা হোক নিষ্পত্তি হলো। দরজায় ঘা দিলো। ভেতরে সাড়া নেই। আবার ঘা। আবারও চুপ।

একজন বললো, এই বিরক্ত করিস না। হয় ঘুমে অচেতন নয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত। চল পরে আসবো।

তখন চলে গেলো সবাই। আবার নৈঃশব্দ্য। সেই নৈঃশব্দ্য ভেদ করে ঘড়ির টিক টিক শব্দ। শব্দটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। পর্দা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে।

অনবদ্য। এক কথায় অপূর্ব। জানি না জাপান কতদিন পারবে পাশ্চাত্যের প্রভাব ঠেকিয়ে রাখতে। মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখি জ্যোৎস্নার সেই আশ্চর্য দৃশ্যটিকে। তার নৈঃশব্দ্য হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করি। শুধু আমি নই, প্রতিটি দর্শক। এ এক আশ্চর্য গীতিময়তা।

মঞ্চের একধারে ছোট্ট একটি চেরী গাছ—গাছ নয় সে যেন অবিস্মরণীয় এক কাব্য। পাশ্চাত্যের জীবাণু একবার ঢুকলে কি আর রক্ষে আছে? সব দেবে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে।

সে যাই হোক, ছুটি এবার শেষ। আর নয়। অনেক হলো ঘোরা। অনেক হলো দেখা। দেখলাম খাদ্য নিয়ে হাহাকার। পাশাপাশি বস্তা বস্তা মজুত খাদ্য পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তবু দেবে না তা সাধারণের মধ্যে বিলিয়ে। শেষ কণাটুকু নিয়ে ব্যবসা করবে।

দেখলাম লাখো লাখো বেকার। একজন খাবার টেবিলে একদিন বললেন, জাপানের সমস্যা একমাত্র মিটতে পারে যদি আমরা এই মুহূর্তে অঢেল সোনা পাই। বললাম, সোনা দিয়ে কি হবে। যন্ত্র যে নিচ্ছে মানুষের সব কাজ কেড়ে। বললেন, এটা কোন ব্যাপার নয়। যন্ত্রের চেয়ে কায়িক শ্রম যেদিন সুলভ হবে, সেদিন মানুষ আর যন্ত্র নয়, মানুষকেই ডাকবে কাজ করার জন্যে। বেকার সমস্যা বলতে আর কিছু থাকবে না।

মনে মনে হাসলাম। এ এক অদ্ভুত যুক্তি। কি জানি, এ-ও হয়তো চরম যে মন্দা চলছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারই ফল। নইলে এমন উদ্ভট যুক্তি কেউ রাখে!

২৪

বেভারলি হিলসের বাড়িতে ফিরে বলবো কি আমার মুখে কমিনিট যেন কোন ভাষা নেই। আমার শোবার ঘরের ঠিক মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। তখন বিকেল। সন্ধ্যে প্রায় ছুঁই ছুঁই। বিকেলের রাঙা রোদ লুটিয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর, তার স্থির দীর্ঘ উজ্জ্বল আভা, আমার ঘর ভাসছে সেই আশ্চর্য দীপ্তিতে, ঘরের মাঝখানে আমি—কী যে পবিত্র কী যে সুন্দর সেই পরিবেশ! কাঁদতে মন চাইছে আমার। আট মাস ছিলাম সব ছেড়ে ছুড়ে বাইরে। তবে কি ফিরে এসেছি বলে আমি আনন্দিত? জানিনা আনন্দ কি নিরানন্দ কিছুই মাথায় নেই। আসলে ফেরা মানে কাজ। কিন্তু কি কাজ করবো আমি? কিছুই যে পারিনি ঠিক করতে। তাই ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা। একটা ছটফটানি। আর ঘরে ফেরার সেই সুখ। মিলেমিশে সব গেছে একাকার হয়ে।

একাও বটে। ইওরোপ থেকে শুরু করে ঘুরে এলাম সে কত পথ। পেলাম না তো কই এমন কাউকে যে পারে আমার জীবনের সাথে এক হয়ে মিশে যেতে। শুধু নিছকই অন্বেষণ। নিছকই মিথ্যে আশার পেছনে পাগলের মতো ছোটাছুটি। আমার পরিচিত জগতটা চারপাশে ভেঙে পড়ছে। ক্যালিফোর্নিয়া নয়, এ যেন শ্মশান পুরী। সব বদলে গেছে এই ক মাসে। ছবির জগতে বদল, বদল আমার প্রিয় বন্ধু ডগলাসের জীবনে—মেরীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে কবে! কি করি এখন আমি? চারদিকে যে অপার শূন্যতা আমার।

একলাই খেতে হবে নৈশভোজ। বোধহয় জীবনে এই প্রথম। কোনদিন খাইনা। আজ তবে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে? অসম্ভব। বেরিয়ে পড়লাম হলিউডের দিকে। ঘুরবো অনির্দেশ। কাউকে না কাউকে জুটিয়ে নেবো। হাঁটবো। মোটমাট একাকীত্ব আমি সহ্য করতে পারি না।

হাঁটছি। ঐ তো সেই দোকান—সেই একতলা বাড়ি, ঐ ডাক্তারখানা। ঐ তো উলওয়ার্থের দোকান। ঐ রেস্তোরাঁ। নাঃ, কেমন যেন দুঃখী দুঃখী ভাব। যেন আমারই মনের মতো। আলোর জোরও যেন কম। এ কেমন চেহারা হলো এই কমাসে?

চেনা পরিচিত কাউকেও দেখছি না। ঘুরে ফিরে সেই একলা। কি করা উচিত এ অবস্থায়? তবে কি সব ছেড়ে ছুড়ে বিক্রী করে দিয়ে চলে যাবো চীনে? নতুন করে ঘর বাঁধবো? এছাড়া রাস্তাই বা কি? হলিউড আমার কাছে অর্থহীন। নির্বাক ছবি এখন আর কেউ করে না। এ অবস্থায় সবাকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজেকে

অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার চেষ্টা নিরর্থক। পারে না কেউ এইভাবে বাঁচতে। বিরাট একটা দোটানার মধ্যে পড়ে আমি শুধু এপাশ ওপাশ করছি। কি যে করবো ঠিক করার মতো বুদ্ধিভাগ্যও আমার নেই। এই তো এখন। কাকে নিয়ে ডিনার খাবো কি খাবো না, না কি সটান বাড়ি ফিরে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়বো—এটুকু অব্দি পারছি না হিসেব করে ঠিক করতে। ফোন করতে পারি। এমন কাউকে ডাকবো যে ফোন পেয়েই রাজী হয়ে যাবে, চলে আসবে আমাকে সঙ্গ দিতে। কিন্তু কই, এমন কারুর নামও তো যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করে এতোক্ষণে বের করতে পারলাম না। তবে কি সঙ্গী বলতে কেউ নেই আমার? আমি একা?

মনের প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে ফিরে গেলাম বাড়িতে। শুনলাম রীভ্‌স্ নাকি ফোন করেছিল। এমনিই। খবরাখবর নিতে। ব্যস সারাক্ষণে আর দ্বিতীয়বার ফোন বাজে নি বা কেউ দেখা করতেও আসেনি।

এদিকে নতুন বিপদ। স্টুডিওতে যেতে হয় রোজ তাই যাই। করবার মতো কোন কাজ নেই। গিয়ে শুধু নৈমিত্তিক হাজিরা দিয়ে ফিরে আসা। এরই মধ্যে আশার আলো সিটি লাইটসের বিক্রী বাবদ প্রাপ্তি। নাকি তিরিশ লাখ ডলার ইতিমধ্যেই লাভ হয়েছে। আরো হবে। হপ্তায় আমদানীর হার এখনো একলাখের মতো। রীভস্ বললো, আমি যেন এক ফাঁকে গিয়ে হলিউড ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে আসি। কোন কারণ নেই। এমনিই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। তা সাত বছর হলো ব্যাঙ্কের চৌকাঠ তো আর মাড়াই না। ভেতরটা কিরকম দেখতে বলতে গেলে প্রায় ভুলেই গেছি। অতএব যাওয়া আর হয়ে উঠলো না।

কাইজারের নাতি লুই ফার্ডিনাণ্ড কদিন পরে স্টুডিওতে এলো দেখা করতে। নিয়ে গেলাম বাড়িতে। ভারী চটপটে চতুর ছেলে। কথাবার্তায় তুখোড়। শোনালো জার্মানীতে বিপ্লবের কাহিনী। সে ভারী মজার গল্প। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরেকার ঘটনা। ওর জবানীতেই বলি।—তা তখন দাদু আমার হল্যাণ্ডে। এদিকে আত্মীয় স্বজনের বেশির ভাগই পটস্‌ডামের রাজপ্রাসাদে। ভয়ে তো জড়সড় সবাই। বিপ্লব হলো, নাজানি কোত্থেকে কি হয়, কি ফরমাস আসে রাজপরিবারের ওপর। এমন সময় খবর পেলাম বিপ্লবীর দল খোদ রাজপ্রাসাদে হাজির। বুক তো দুরু দুরু। চিরকুটে লিখে পাঠালো, তারা এসেছে, আমরা কি তাদের অভ্যর্থনা জানাতে রাজী? দুরু দুরু বক্ষেই গেলাম। তখন বলে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কোন বিপদের আশংকা নেই। যে কোন অবস্থায় আপনাদের পুরো রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের। আপনারা এখানেই থাকুন। বিপদ বা বেগতিক কিছু দেখলে ফোন তুলে সমাজবাদী সদর দপ্তরে শুধু একবার জানিয়ে দেবেন। তারপর যা করার আমরা করবো। সম্পত্তি ইত্যাদির প্রশ্নে বললেন,

কোন চিন্তা নেই। আমরা সব ঠিক ঠিক ভাবে বিলি বণ্টন করে দেবো। সে এক মজাই বটে। রাশিয়ার ব্যাপারটা ছিলো দুঃখের দুর্দশার, আর আমাদেরটা শেষ হলো রগড়ে। দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক।

ফেরা ইস্তক নানান ঘটনা ঘটছে আমেরিকায়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিরাট এক তোলপাড়। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন নির্দেশ জারি। তাতে নানান ব্যাপারে নিত্যি নতুন রদবদল। রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা যাচ্ছেতাই। গচ্ছিত সম্পদের বাইরেও নতুন নোট ছাপাতে হচ্ছে। হুভারের অর্থনৈতিক নীতি দারুণভাবে মার খেয়েছে। এদিকে ভোটের আসরও সরগরম। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চলছে—যদি রাষ্ট্রপতি পদে তিনি নির্বাচিত হন, তবে দেশ রসাতলে যাবে।

এতৎসত্ত্বেও রুজভেল্টই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন। দেশ রসাতলে গেলো না। নতুন ভাবে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। দিলেন এক আশ্চর্য বক্তৃতা। মনে আছে সেদিন আমি স্যাম গোল্ড্‌ইনের বাড়িতে বসে। জো স্বেঙ্ক, ফ্রেড্‌ অ্যাস্টেয়ার, কলম্বিয়া দূর-ভাষণ কেন্দ্রের বিল্‌ প্যালি সবাই হাজির। মনে আছে বক্তৃতার শেষ কথা কটি—ভয়ের কিছু নেই। ভয় পাবেন না কেউ। ভয়ের ভূতটাকেই এখন যত ভয়। তাকে তাড়ান। শুনে সবাই নড়ে চড়ে বসলো। আমি শুধু বললাম, দারুণ। অপূর্ব।

আর সে যেন বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। শুধু কথা নয়, কাজ। প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ। রাষ্ট্রপতির নির্দেশে দশ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ রইলো। জানিনা সেদিন এই সিদ্ধান্ত না নিলে হয়তো প্রতিটি ব্যাঙ্কেই লাল বাতি জ্বালতে হতো। দশটা দিন শুধু ধারের পরে ধার। দোকানে ধার, বাজারে ধার, শাড়ি গয়নার দোকানে ধার, এমনকি সিনেমার টিকিটও ধারে বিক্রী হয়। পয়সা নেই যে কারুর হাতে। এই অবসরে রাষ্ট্রপতির দরবার থেকে 'নয়া কর্মসূচী' প্রচারিত হলো। বিপুল সাড়া পড়ে গেলো জনসাধারণের মধ্যে।

প্রশাসনকে বলা হলো প্রতিটি সমস্যাকে জরুরী ভিত্তিতে দেখতে। কৃষি ঋণ ফের চালু হলো। সরকারী বড় বড় প্রকল্পে অর্থ লগ্নী হলো। নিম্নতম মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলো। কাজের সময় কমিয়ে আরো বেশি বেশি লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হলো। পুনরুজ্জীবিত হলো প্রতিটি শ্রমিক ইউনিয়ন। এক কথায় সে এক এলাহী ব্যাপার। চারিদিকে নতুন উদ্যমে সাজো সাজো রব। তখন বিরোধী দলের লোকেরা বললো, এ সমাজতন্ত্র। রুজভেল্ট দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা করছে। আমরা দেখলাম, সমাজতন্ত্র নয়, মুমূর্ষু অবস্থা থেকে ধনতন্ত্রকে রক্ষার এক আপ্রাণ চেষ্টা। রক্ষা পেলো। গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলো সারা দেশবাসী, উপযুক্ত সরকারী মদৎ পেলে কত কি করতে পারে তারা।

পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে হলিউডেও। নির্বাক ছবির বাজারে মন্দা, শিল্পীরা অব্দি তল্পিতল্পা গুটিয়ে উধাও, পড়ে আছি আমরা মোটে কয়েকজন। সবাকের এখন খুব রমরমা। নিত্যি চলছে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা। শব্দযন্ত্রীর দল স্টুডিওর খোল নলচে বদলের কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। নতুন এক ধরনের ক্যামেরা এসেছে, দেখতে ছোটখাটো একখানা ঘরের মতো প্রায়। আর সে কত যে তার! তারে তারে যেন ছয়লাপ। এদিক থেকে ওদিক থেকে সেদিক থেকে কেবল তারের কাটাকুটি খেলা। কানে শব্দগ্রাহক যন্ত্রের ঠুলি লাগিয়ে বসে আছে শব্দগ্রাহকের দল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত কোন অদ্ভুত জীব। দৃশ্য গ্রহণের সময় অভিনেতার নাকের প্রায় ওপরে ঝোলে মাইক্রোফোন, দেখতে লাগে যেন মাছ ধরার ছিপ। আমার কাছে মনে হয় গোটা ব্যাপারটাই বড্ড জটিল আর জবড়জং। কিছুতে পারি না বুঝতে এর রহস্যময় কারিকুরি। এতো সব ঝুটঝামেলার মধ্যে পারে কেউ কোন সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা করতে? প্রশ্ন। বারবার মনকে নাড়া দেয়। এরই মধ্যে একদিন শুনলাম নাকি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমন ক্যামেরা বেরিয়েছে। সেটা আকারেও ছোট। তবু নয় একটা ফ্যাসাদ দূর হলো। কিন্তু ঐ শব্দ! ঐ তারের ঝঞ্ঝাট! পারবো কিভাবে এই গোলমেলে ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে মেশাতে?

বরং আগের চিন্তাই ভালো। করবো না ছবির কাজ। সব বিক্রী করে চলে যাবো হংকং কি চীনে। নিরিবিলি থাকবো। চুলোয় যাক হলিউড। আমার কি আসে যায়!

তিন হপ্তা এই ভাবেই কাটলো। মনের এই দোটানা ভাব। হঠাৎ ফোন জো স্কেঙ্কের। বজরা নিয়ে বেরুবে দরিয়ায়। আমি যেন সঙ্গ দিই। প্রস্তাবটা লোভনীয়। ভারী চমৎকার বজরা কিনেছে স্কেঙ্ক। একশো আটত্রিশ ফুট লম্বা। তাতে মোট চোদ্দটা কামরা। ঢালাও ব্যবস্থা পান ভোজনের। যাবে সেই ক্যাটালিনা অব্দি। সেখানে গিয়ে নোঙর ফেলবে। মাছ ধরা হবে রাশি রাশি। ফুর্তি। জো'র এক মহৎ গুণ, সঙ্গে সর্বদা নিয়ে যায় একগাদা সুন্দরী মেয়ে। যাত্রার আকর্ষণ তাদের জন্যই বাড়ে। তো মন্দ কি। নয় কটা দিন সুন্দরীদের মধ্যে কাটিয়ে আসা যাবে!

পলেট গদারের সঙ্গে আমার বজরাতেই পরিচয়। তার আগে দেখিনি কোনদিন। ভারী চনমনে হাসিখুশী স্বভাব। আমাকে বললো পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে ওর সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে সেই বাবদ পাওনা, সেটা সে এখন ছবির ব্যবসায় লাগাতে চায়। মোটামুটি কথাবার্তা অনেকখানি এগিয়েছে। কাগজপত্র তৈরী। এখন সই সাবুদ করলেই হলো। এ ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলো।

বললাম খবরদার, এমন কাজ ভুলেও করবে না। এরকম বহু কোম্পানী আজকাল হলিউডে গজিয়েছে। তারা বিস্তর টাকা এপাশ ওপাশ করছে। তারপর ঝাঁপ বন্ধ। তাছাড়া ব্যবসায় টাকা তো লাগালেই হলো না, তার অগ্র পশ্চাৎ ভাবতে হবে। খতিয়ে দেখতে হবে।. হার্স্ট এ পর্যন্ত লোকসান দিয়েছেন মোট সত্তর লাখ ডলার। অতো নামকরা মানুষ, কাগজের মালিক, সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক সব হাতের মুঠোয়—তারও কিনা এই হাল। কখন যে কি হবে কেউ কি বলতে পারে। এমনকি আমি যদি নিজেও কোন ছবি করি, বলবো না তাতে টাকা লাগাও। ছবি যে বাজারে লাগবেই, এমন কথা কি হলফ করে আগে থেকে বলা যায়!

মোটমাট এই ভাবেই শুরু। গভীর নিটোল বন্ধুত্ব। পলেট বড় একা। আমিও তাই। সদ্য নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে। সব অচেনা অজানা এখানে। স্যাম গোল্ড্‌ইনের ছবিতে কাজ পেয়েছে। তাই নিয়েই আপাততঃ ব্যস্ত। আমিও আমার কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকবার চেষ্টা করি। শুধু রবিবার এলেই যেন সময় আর কাটতে চায় না। তখন পলেটকে তলব। তারও তো একই হাল। গাড়িতে করে দুজন তখন বেরিয়ে পড়া। চলো না সমুদ্রের ধার ঘেঁষে যতদূর চোখ যায়। সান পেড্রো অব্দি আমাদের দৌড়। বন্দর সেটা। সারি সারি বজরার ভিড়। নানান তার আকৃতি, নানান কায়দার গঠন। অবাক চোখ নিয়ে তাই শুধু দেখতাম। ছটফট করতো মনটা। হঠাৎ দেখি একদিন, একটা বজরা বিক্রী হবে। পঞ্চান্ন ফুট লম্বায়, মোটরে চলে, সঙ্গে আবার ছোট্ট একখানা পান্‌সী মতো। এরকম একখানা বজরার মালিক হবো এ আমার বহু দিনের সাধ। দেখে পলেট বললো, ইস্ তোমার যদি হতো এইটা! ছুটির দিনে যেতাম সিধে ক্যাটালিনায়। শুধু আমরা দুজন। নোঙর ফেলে বসে থাকতাম।

তখন খোঁজখবর নিলাম। মালিকের নাম মিচেল, ছায়াছবির জন্য ক্যামেরা তৈরীর ব্যবসা। কিনতে আগ্রহী শুনে বজরায় নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সাত দিনের মধ্যে আরো দুবার এসে দেখে গেলাম। প্রত্যেকবারই এক কথা—এখনও মন ঠিক করতে পারি নি। শেষে অবস্থা এমন, আবার যে যাবো দেখতে নিজেরই লজ্জা লাগে। মিচেল অবিশ্যি উদার মনের মানুষ। বললেন, বেশ তো আসুন না আপনি। কিনবার আগে হাজার বার বাজিয়ে তো দেখবেনই। তাতে আপত্তি কি।

পলেটকে জানালাম না কিছু। চুপি চুপি একদিন লেনদেন করে বজরা কিনে নিলাম। নতুন করে এক পলেস্তারা রং চড়ানো হলো। রান্নার জিনিসপত্র তুললাম। সঙ্গে এণ্ডারসন, আমার পাচক। লাইসেন্সধারী ক্যাপ্টেনও বটে। পরের রোববার পলেটকে বললাম, চলো, আজ খুব সকাল সকাল বেরুবো। বললাম না কিন্তু আর কিছু। তারপর সিধে সান পেড্রো। সেই বন্দর। পলেটের তো আমার ভাবগতিক দেখে

ভীষণ ভয়,—সে কি, তুমি বুঝি আবারও বজরা দেখতে যাবে ?

বললাম, মোটে একবার। তোমাকে কথা দিলাম। এবার ঠিক মন স্থির করে ফেলবো।

—তবে তুমি একলা যাও। পলেট বললো, আমি যাচ্ছি না। বারবার গিয়ে ঘুরে আসতে আমার বিশ্রী লাগে। আমি বরং গাড়িতে বসে থাকবো।

সে নাছোড়বান্দা। কিছুতেই যাবে না আমার সঙ্গে। বললো, না না, তুমি যাও। আমি বসে আছি। চটপট ঘুরে এসো। তারপর কিছু খেতে হবে। সকাল থেকে খাই নি কিছু। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

একলাই গেলাম। দু মিনিট পরে ফিরে এসে একরকম জোর করেই নিয়ে গেলাম তাকে। সিধে কেবিন। চমৎকার করে সাজানো। টেবিলে হাল্কা লাল রঙের ঢাকনা। বসতে না বসতে গরম গরম প্রাতরাশ হাজির। ভারী সুন্দর খোশবু ছড়াচ্ছে। পলেট তো অবাক। বললাম, অবাক হওয়ার কিছু নেই, আমি আসতে ক্যাপ্টেন আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। অমনি ক্যাপ্টেন অর্থাৎ ধড়াচুড়ো পরা শ্রীযুক্ত এণ্ডারসনও সশরীরে হাজির। চিনতে পেরেছে পলেট। বললাম, তোমার তো খুব শখ ছুটির দিনে ক্যাটালিনায় গিয়ে সাঁতার কাটবে। তো বেশ—চলো আজ শখ মিটিয়ে নেবে।

পলেট চুপ।

তখন এটা যে আমি কিনে ফেলেছি সে কথা বললাম।

বললো, দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি। বলেই একলাফে বজরা থেকে নেমে সোজা দৌড়। ছুটতে ছুটতে চলে গেল সেই হুই দূরে। তারপর ফিরে এলো পায়ে পায়ে। আমি তো অবাক।

বললাম, কি হলো। হঠাৎ যে ঐ ভাবে ছুটতে শুরু করলে ?

বললো, খুব খুশী হয়েছি তো। তাই আনন্দটা ছুটে খানিকটা কমিয়ে এলাম।

ততক্ষণে ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। নোঙর তুলে আমরা ক্যাটালিনার দিকে রওনা হলাম।

এগুলো আদতে নেই কাজ তো খই ভাজ। মাথা ফাঁকা। কি করবো কিছু ঠিক নেই। শুধু ঘুরে ফিরে এখানে গিয়ে সেখানে গিয়ে সময় কাটানো। যাকে বলে কালহরণ। কেবল পলেট আর আমি। ঘোড় দৌড় থেকে শুরু করে জন্মদিনের আসর, জনসভা কোথাও বাদ নেই। ডাক পেলেই হলো। আমরা ঠিক সময় মতো গিয়ে হাজির। এ যেন জোর করে পাছে কোন ভাবনা মাথায় ঢুকে পড়ে। সেটাকেই ঠেকিয়ে রাখা। আর

মনের আনাচে কানাচে সতত এক অপরাধ বোধ,—এ আমি কি করছি? সময় নষ্ট করছি এই ভাবে? জীবনের মূল্যবান এক একটি মূহূর্ত? তবে কি কাজ করার আমার আদৌ ইচ্ছে নেই?

মনটা দমিয়ে দেবার মতো আরো একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। তা হলো ছোট্ট একটুখানি সমালোচনা। করেছে এক নবীন সমালোচক। সিটি লাইটস্ প্রসঙ্গেই। ছবি ভালো সে ব্যাপারে তার কোন দ্বিমত নেই। তবু শেষটা বড্ড বেশি ভাবপ্রবণ। খারাপ করে বললে ন্যাকামিও বলা যায়। এটা তারই উক্তি। আগামী ছবিতে আমি যেন এ ব্যাপারে সতর্ক হই, ভাবপ্রবণতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করি। যেন বাস্তবকে বাস্তব বলেই দেখাই। কথাটা ঠিক। আমারও এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বাস্তব বলতে সে যা বোঝাতে চেয়েছে সেটা আমার কাছে কৃত্রিম একটা কিছু। তার মধ্যে খাঁটি ব্যাপারটা নেই। ছবি করতে গিয়ে আমার চিন্তা যে ভাবে ধাবিত হয়, সে ভাবেই আমি শেষ করি। তাতে কি হলো কি না হলো অতো চুলচেরা বিচার করার আর প্রয়োজন থাকে না।

তবু বলবো, সমালোচনা যেহেতু, কথাটা সব সময় মনে কাঁটার মতো বেঁধে। ভাবি সর্বদা, নতুন একটা ছবি করতে পারলে দেখিয়ে দিতাম বুঝিয়ে দিতাম কোনটা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল।

আর অবাক কাণ্ড, এই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ হদিশ পেয়ে গেলাম আমার পরবর্তী ছবির কাহিনীর। নির্বাক ছবিই করবো। হ্যাঁ, আবারও নির্বাক। নায়িকা হবে পলেট। আগে কি প্রসঙ্গে চিন্তাটা এলো সেটা বলে নিই।

মেক্সিকোতে গিয়েছি আমি আর পলেট। তিজুয়ানা ঘোড়দৌড়ের মাঠ। বিজয়ী ঘোড়ার মালিককে দেওয়া হবে পুরস্কার। পলেটকে ধরে বসলো—পুরস্কার তাকেই দিতে হবে। সঙ্গে ছোটোখাটো বক্তৃতা। তো পলেট গেলো মঞ্চে। সামনে লাউড-স্পীকার। বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেবার পর মেক্সিকোর কথা বলার ঢঙে দিলো এক তুখোড় বক্তৃতা। শুনে তো আমি থ'। এ মেয়ে তো যা তা নয়। পারবে ভালো অভিনয় করতে। পারবেই। এ ব্যাপারে আমার এতোটুকু সন্দেহ নেই।

চিন্তাটা তখনই তোলপাড় খেতে শুরু করেছে। আসছে একটু একটু করে একটা গল্পের ছক। পলেট পথের মেয়ে, নাম গামিন; আর আমি ভবঘুরে। দুজনের দেখা পুলিসের গাড়িতে। দাঁড়িয়ে আছে গামিন; আমি বসা। উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা দেবো, বসতে বলবো। সে এক ভারী মজার ব্যাপার। গোটা ছবিটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

এরই সঙ্গে মেশাবো আমার ডেট্রয়িট বেড়াবার সময় সাংবাদিকের মুখে শোনা সেই

কাহিনী। সেখানে এক কারখানার ফিতে ঘোরে বাঁই বাঁই করে, সেই সঙ্গে সমান তালে ঘুরতে হয় শ্রমিককে। একটু এধার ওধার হলে কাজে পিছিয়ে পড়বে। চার পাঁচ বছর এই ভাবে কাজ করার পর শ্রমিকের স্নায়ুর ওপর নাকি ভীষণ চাপ পড়ে, সে আধপাগল গোছের হয়ে যায়।

দুইয়ে মিলে 'মডার্ন টাইমস্'। কর্মরত অবস্থায় শ্রমিককে খাইয়ে দেবার একটা যন্ত্র বানালাম। তাতে করে কাজের সময় নষ্ট হবার ব্যাপার নেই, কাজ করতে করতেই যন্ত্র দেবে মুখে খাবার পুরে। কারখানার গোটা ব্যাপারটা জমে উঠবে ভবঘুরে পাগল হয়ে যাবার পর। ঘটনার পরম্পরার মধ্যে এতোটুকু অস্বাভাবিকত্ব নেই। সুস্থ হবার পর পুলিসের হাতে ধরা পড়বে, গাড়িতে যেতে যেতে গামিনের সঙ্গে দেখা। সেই থেকে দুজনের আপ্রাণ চেষ্টা বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার। বর্তমান অর্থাৎ ধর্মঘট, দাঙ্গা, বেকারী, দুঃসময়—সব কিছু। প্রতিটি অবস্থার মধ্য দিয়ে তারা ঘর বাঁধবার একটু ভাল ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করবে। পারবে না।

পলেটকে পরতে হয়েছিল ছেঁড়া খোড়া পোশাক। তার ওপর মুখে কালচে ছোপ। যাতে নোংরা লাগে দেখতে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। আমি বলেছিলাম, কেঁদো না। কালো কালো ছোপগুলোই তোমার সৌন্দর্য দশগুণ বাড়িয়ে তুলবে। তুমি দেখে নিও।

অভিনেতা অভিনেত্রীকে পোশাক পরানো বা তাকে তার চরিত্রের অনুগামী করে সাজানো আমার কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। রং চঙ দিয়ে সুন্দর দেখানো যায় সকলকেই, এটা আদৌ কোন সমস্যা নয়। কিন্তু ফুলওয়ালীকে ফুলওয়ালীর মতো করে সাজানো, সেই সাথে তাকে সুন্দর করে দর্শকের সামনে তুলে ধরা,—এটা যথেষ্ট সমস্যার ব্যাপার। সিটি লাইটসে সেই সমস্যার সমাধান আমাকে করতে হয়েছিল। গোল্ড রাশে অবিশ্যি মেয়েদের পোশাক নিয়ে তেমন কোন ঝামেলা পোয়াতে হয় নি। মডার্ন টাইমসে বিশেষ করে গামিনের পোশাক নিয়ে ভাবতে হয়েছিল আমাকে বিস্তর। পোশাকের ওপর এতোটুকু যত্ন নেই এটা প্রমাণ করার চেষ্টা ছিলো। অর্থাৎ পোশাকের দিকে মনোযোগ দেবার সে অবকাশ পায় না। তার সামনে অন্য অনেক সমস্যা। পোশাককে চরিত্রানুগ করে তোলার মধ্যে আমি কাব্যের ইঙ্গিত পাই। সেটাই আপ্রাণ চেষ্টা করি ফুটিয়ে তুলতে।

ছবি মুক্তি পাবার আগেই কাগজে বেরুলো জোর সমালোচনা। ছবির কাহিনী ইতিমধ্যেই ছেপে বেরিয়েছে। কেউ বললো, এটা পুরোপুরি কম্যুনিষ্ট ধর্মী। কেউ বললো, না, কম্যুনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়, তবে তার বিরুদ্ধে ছবিতে কিছু বলাও নেই। দুইয়ের ঠিক মাঝখানে এর অবস্থান। অর্থাৎ ত্রিশঙ্কু যেরকম।

প্রথম হপ্তার বিক্রী অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করলো। দ্বিতীয় হপ্তায় একটু

কম। নিউইয়র্ক লসএঞ্জেলেস্ থেকেও আসছে একই ধরনের খবর। স্নায়ুর ওপর বড্ড চাপ পড়েছিল শেষ কদিন। সেটা একটু একটু করে কাটছে। এখন হালকা অনেক খানি। এখন আমার ছুটি। অন্ততঃ বেশ কিছুদিনের জন্য। যাবো হনলুলু। সঙ্গে থাকবে পলেট আর পলেটের মা। যাবার সময় বলে যাবো সবাইকে যেন ভুলেও খোঁজ খবর না করে। যেন বিরক্ত না করে এতোটুকু।

এখন কদিন শুধু নিশ্চিন্তে নিরালায় বিশ্রাম আর বিশ্রাম।

লস এঞ্জেলেস থেকে জাহাজে চড়লাম। যাবো সানফ্রান্সিস্কো। সেখান থেকে বদলী ষ্টীমার। বৃষ্টি খুব। তবু উৎসাহে আমাদের এতোটুকু কমতি নেই। সামান্য কেনাকাটার মাত্র ফুরসুৎ হলো।

কোথায় যাবো তখনো সঠিক করে জানা নেই। দেখি একটা ষ্টীমারে বড় বড় হরফে লেখা 'চীন'। বললাম, চলো চীনেই যাই।

—কোথায়? পলেট অবাক।

—চীনে।

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

—মোটেই না। আমি সুস্থ মনেই আছি। চলো এখন। নইলে ভবিষ্যতে হয়তো আর কোনদিন সুযোগ হবে না।

—কিন্তু জামাটামা কিচ্ছু তো নেই আমার সঙ্গে।

—চলো এখন। হনলুলু থেকে কিনে নেওয়া যাবে।

ভারী অপরূপ লাগে সমুদ্রের বুকে ভাসতে। দুনিয়া থেকে অনেক দূর। দুনিয়া অর্থে মানুষের এই জগৎ। নেই কোন কারখানার শব্দ, নেই গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ। হৈ চৈ চিৎকার সব কিছু থেকে অনেক অ-নে-ক দূর। শুধু ভাসতে ভাসতে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলা। এর মতো সুখ আর কোথায় আছে!

হনলুলুতে পৌঁছে দেখি সব হিসেব গোলমাল। জাহাজঘাটায় মস্ত বড় বিজ্ঞাপন। বলাবাহুল্য মডার্ন টাইমস্ ছবির। দাঁড়িয়ে আছে রাশি রাশি মানুষ। সাংবাদিকের দল সবার সামনে সার বেঁধে। নামবার সাথে সাথে আমাকে যেন পারলে একেবারে গিলে খায় এই ভাব।

সেখান থেকে টোকিও মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট। যাত্রী তালিকায় আমার নাম পালটে অন্য নাম দেওয়া হয়েছে। সেটা আমার পক্ষে মঙ্গল। শুধু নামবার সময় কাগজপত্র যাচাই করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের তো চোখ কপালে ওঠার দাখিল।—সে কি! আপনি

আসছেন একথা আগে জানান নি কেন? সরকারী তরফে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাতাম।

কদিন আগেই জাপানে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। মারা গেছে হাজারে হাজারে মানুষ। সর্বত্র থমথমে ভাব। যে কদিন রইলাম সারাক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন সরকারী তরফের জনৈক কর্তাব্যক্তি। এছাড়া আর কিছু বলার নেই। গেলাম সেখান থেকে হংকং। বলতে গেলে এ পর্যন্ত মন খুলে কথা বলার মতো একজন লোকেরও দেখা মেলে নি। হংকং বন্দরে পৌছে এক আমেরিকান ব্যবসায়ীর সাথে দেখা। দীর্ঘ দেহী ভরাট গলার অধিকারী। চিনি না তাকে। বললো, চার্লি, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি এখানকার গীর্জার পাদ্রী। পাঁচ বছর ধরে আছেন। কুষ্ঠ রোগীদের জন্য এখানে একটা কলোনী মতো আছে। তাদেরই দেখাশোনা করেন। বড় একলা থাকেন। আপনি আসছেন শুনে ছুটে এসেছেন দেখা করতে।

দেখলাম পাদ্রীকে। বয়েস ত্রিশের কিছু বেশী। দীর্ঘকায়। চেহারায় তদ্গত ভাব। চোখ দুটি ভারী সুন্দর। ততোধিক সুন্দর মুখের হাসিটুকু। পরিচয় হলো। সেদিন রাতেই পানাহারের আসরে ফের দেখা। আমি একপ্রস্থ পানীয়ের হুকুম দিলাম। সেটা শেষ হতে তিনিও দিতে বললেন আরেক প্রস্থ। শেষ হতে ফের আমি। তারপর ফের তিনি। দেখতে দেখতে আরো লোক হাজির। সাকুল্যে প্রায় পঁচিশ জন। সবাই দেয় পানীয়ের অর্ডার। সমানে কিন্তু গলায় ঢেলে চলেছেন পাদ্রী। আমি গুটিয়ে নিলাম নিজেকে। আর নয় এবার উঠতে হবে। বিদায় জানালাম। হাত বাড়িয়ে দিলেন। করমর্দন করতে গিয়ে দেখি ভারী রুক্ষ খরখরে হাত। আলোর দিকে ফেরালাম হাতখানা। দেখি তালুর মাঝখানে ফাটা ফাটা, তাতে সাদা একটা দাগ মতো। বললাম, কুষ্ঠ নাকি? হাসতে হাসতে হাসতেই বললাম, খানিকটা নেশার ঝোঁকেও। তিনি মাথা নাড়লেন। হাসলেন। এক বছর পরে শুনি, মারা গেছেন। ঐ কুষ্ঠ রোগেই।

মোট পাঁচ মাস ঘুরে বেড়ালাম। এরই মধ্যে এক ফাঁকে পলেটকে বিয়ে করে ফেললাম। এবার ফেরার পালা। সিংগাপুর, থেকে উঠলাম জাহাজে। আর নামবো না কোথাও। যাবো সিধে আমেরিকা।

প্রথম দিনই পেলাম একখানা চিরকুট। লিখেছে যে তার আর আমার নাকি বহু দিনের পরিচয়, মাঝখানে বেশ কয়েক বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই। এখন যেহেতু সমুদ্রের মাঝামাঝি, দেখা করার বা আলাপ ঝালিয়ে নেবার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কখনো হতে পারে না। আমি রাজী হলেই আমার কেবিনে সে আসতে পারে। অবশ্যই ডিনারের আগে। নীচে সই রয়েছে 'জ' কক্তু।'

আমি ধরেই নিলাম ব্যাপারটা ভুয়ো। কেউ মজা করছে আমার সাথে বা ধোঁকা দিয়ে দেখা করার চেষ্টা করছে। খবর নিয়ে দেখি, ধারণা ভুল। ককৃতু সত্যি সত্যিই আমারই মতো জাহাজের একজন যাত্রী। ফরাসী কাগজে কি একটা লেখা করে দিতে হবে, সেই জন্য নিরিবিলি লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে জাহাজে চড়ে বসেছেন।

মুশকিল হলো কথাবার্তা বলা নিয়ে। ককৃতু জানে না এক বর্ণ ইংরাজী, আমি জানি না ফরাসী ভাষা। ককৃতুর সেক্রেটারী একটু আধটু যা ইংরাজী বলেন, যেটুকুই আমাদের দুজনের মধ্যেকার ভাব বিনিময়ের সেতু। প্রথম রাত্রে বিস্তর আলোচনা হলো শিল্প সাহিত্য বিষয়ে। সেক্রেটারী উভয় পক্ষে তর্জমা করে শোনাবার দায়িত্ব নিলেন। হলো কি সব তর্জমা? আমার এ ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ আছে। ককৃতু তো সমানে বুকের ওপর দুহাত রেখে বকর বকর করেই চলেছেন। যেন মুখ নয়, হুবহু একখানা মেসিন-গান। তাকালো একবার আমার দিকে। ভারী পেলব চোখের দৃষ্টি। দোভাষী বললেন, উনি বলছেন, আপনি কবি—রৌদ্রের, আর উনিও কবি—অন্ধকার রাত্রের।

বলা শেষ হতে না হতে ফের শুরু হয়েছে বকবকানি। কী যে ভীষণ তার গতিবেগ! যেন ঝড়। এক বর্ণও বোঝবার উপায় নেই। কি আসে যায়। আমিও অমনি শুরু করে দিলাম। বিষয় এবার দর্শন। দোভাষীর আর তখন কোন ভূমিকা নেই। সে শুধু অবাক হয়ে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বড় বড় করে তাকাচ্ছে। কথা শেষ করে এগিয়ে গিয়ে ককৃতুকে আলিঙ্গন করলাম। তিনিও দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। এইভাবে চললো রাত চারটে অব্দি। সে রাত্রির মতো বৈঠক শেষ। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম, কাল আবার বেলা একটায় দ্বিপ্রাহরিক ভোজের সময় আমাদের দেখা হবে।

বলাবাহুল্য দুজনের উৎসাহে যথেষ্ট ভাঁটা পড়েছে, তাই দুপুরে আর দুজনের কেউ কাউকে দেখতে পেলাম না। বিকেল। ইতিমধ্যে দেখা করতে পারিনি এই মর্মে ক্ষমা চেয়ে চিঠি পাঠালাম। তিনিও পাঠালেন অনুরূপ একখানা চিঠি। আমি এক কলম বাড়তি লিখে দিলাম—সাক্ষাতের জন্য আগে থেকে দিনক্ষণ ঠিক করার আর প্রয়োজন নেই। যে কোন সময় আসতে পারেন তিনি। আমি বরং খুশীই হবো।

ডিনার খেতে গিয়ে দেখি, বসে আছেন এক কোণে। দরজার দিকে পিঠ। আমি ঢুকে দরজার কাঁছের আসনেই বসলাম। দোভাষী কিন্তু দেখেছে আমাকে। হাসি হাসি মুখে ককৃতুকে আমার কথা বললো। দেখি ইতস্ততঃ করলেন একটু, তারপর পেছন ফিরে হঠাৎই যেন দেখতে পেয়েছেন আমাকে এমন একটা ভাব। পকেট থেকে আমার পাঠানো চিঠিখানা বের করে নাড়ালেন। আমিও নাড়ালাম তার চিঠিখানা। হাসলেন তখন। দেখাদেখি আমিও হাসলাম। তারপর দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম খাবারের

তালিকা দেখার কাজে। কক্‌তুর খাওয়া শেষ হলো আগে। আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখেও না দেখার ভান করলাম। কি মনে হতে ফিরে এসে ইশারায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, বাইরে দেখা করবেন একটু পরে। আমি প্রচণ্ড ভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। খাওয়া শেষ হতে বেরিয়ে দেখি নেই তিনি। যাক স্বস্তি!

পরদিন সকালবেলা। ডেকে পায়চারী করছি, দেখি কক্‌তু আসছেন এদিকেই। সর্বনাশ! পালাবার যে রাস্তা নেই! তখন দেখি নি এমন ভান করে আপন মনে ঘুরতে লাগলাম। একটু পরে আমাকে দেখতে পেলেন। দেখে ভীষণ হতভম্ব। অমনি পেছু হটে একটা দরজা দিয়ে সুট করে ঢুকে পড়লেন। আমি আড়চোখে সব দেখলাম। ফিরে এলাম কেবিনে। সেই থেকে শুরু হলো দুজনের মধ্যে লুকোচুরি খেলা। মুখোমুখি পড়ে গেলেই এ ওকে এড়াবার পথ খুঁজি। নেহাৎ অপারগ হলে, এই যে কেমন আছেন, ভালো তো?—চললো এই ভাবে হংকং অব্দি।

প্রথম দিন ভারী একটা অদ্ভুত গল্প বলেছিলেন কক্‌তু। বলতে ভুলে গেছি। চীনের কোথায় যেন দেখে এসেছেন জ্যান্ত এক বুদ্ধ। পঞ্চাশের মতো বয়েস। বিরাট এক গামলা তেলের মধ্যে নাকি সারা জীবন ডুবে আছে। শুধু মাথাটুকু বাইরে। তেলে ভিজে ভিজে শরীরের এমনই তুলতুলে অবস্থা আঙুল দিয়ে চাপ দিলে আঙুল নাকি মাংসের মধ্যে ঢুকে যায়। আমার বিশ্বাস হয় নি। বলেন নি একবারও কোথায় দেখেছেন এমন মানুষ, চীনের ঠিক কোন অংশে। চেপে ধরেছিলাম খুব। বললেন, দেখি নি নিজের চোখে। শুনেছি।

টোকিও থেকে কিনলেন একটা ঘাসফড়িং। এত্তো বড়। খাঁচায় ভরা জীব। আমার কেবিনে আসতেন কালে ভদ্রে, সঙ্গে নিয়ে আসতেন খাঁচাটা। তখন আর অন্য কোন আলোচনা নয়, যাবতীয় কথাবার্তা ফড়িংটাকে কেন্দ্র করে।

বলতেন, ভারী বুদ্ধিমান জীব। কথা বললে কথা শোনে। শিস দিয়ে গান গায়। ওর নাম দিয়েছি পিলু।

একদিন দেখি মুখ খুব থমথমে। বললাম, কি ব্যাপার, আপনার পিলু কেমন আছে?

বললেন, ভালো না। শরীর খারাপ। আসলে খাওয়া দাওয়ায় গোলমাল হচ্ছে। আমি ওর পথ্য ঠিক করে এলাম।

সান ফ্রান্সিস্কোতে পৌছে বললাম, চলুন না আমাদের সাথে গাড়িতে লস্ এঞ্জেলেস অব্দি। অসুবিধে কিসের। রাজী হলেন। উঠলেন পিলুর খাঁচা সমেত। শিস দিয়ে গান গেয়ে শোনালো পিলু। কক্‌তু বললেন, দেখছেন আমেরিকা দেখে কত খুশী! গান গাইছে। বলে হঠাৎ জানলা খুলে খাঁচার দরজা ফাঁক করে পিলুকে ছেড়ে দিলেন বাইরে।

বললাম, এ কি এ আপনি কি করলেন ?

দোভাষী বললো, মুক্তি দিলেন জীবকে। স্বাধীন ভাবে বিচরণের অধিকার দিলেন।

বললাম, কি মুশকিল বলুন দেখি। অচেনা অজানা জায়গা। ভাষা জানে না এখানকার। কেমন করে মিশবে জীবজগতে ?

বললেন, পারবে। ও বুদ্ধিমান। অল্প দিনের মধ্যেই সব শিখে নেবে।

বেভারলি হিল্‌সে পৌঁছে শুনি খবর ভালো, মডার্ন টাইমস্‌ সার্থক। ভালো পয়সা এনেছে ঘরে।

আবারও সেই সমস্যা। নতুন কাজের প্রশ্ন। কি করবো এবার ? আরো একটা নির্বাক ছবি ? সেটা অনেক বেশি ঝুঁকির কাজ হবে। সারা হলিউড থেকে নির্বাক ছবি নির্বাসিতপ্রায়। একলা আমি জ্বালিয়ে রেখেছি ধুনী। এতো দিন মোটামুটি ভাগ্যের বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয় নি, সব ছবিই সার্থক। দর্শক সারা মন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে। কিন্তু মূকাভিনয়ের ব্যাপারটা যেখানে ধীরে ধীরে ছবির দুনিয়া থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, সেখানে সেই মূকাভিনয়কে নির্ভর করে নতুন ছবি—এ যেন ভাবতেও কষ্ট হয়। তাছাড়া আট হাজার ফুট ফিল্ম জুড়ে প্রতি কুড়ি ফুট অন্তর একটা করে মজার ব্যাপার ভেবে বের করা—এটাও কম ঝামেলার বিষয় নয়। বিশেষ করে সবাক যুগে দর্শক যখন অন্যরকম দেখতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। সেক্ষেত্রে সবাক ছবি তোলা একমাত্র বাঁচবার পথ। কিন্তু সবাক ছবিতে নির্বাক ছবির সৌন্দর্য আমি আনতে পারবো না সেটা আমি ভালো করেই জানি। পারবো না আমারই করা অন্য ছবির শিল্পকুশলতা অতিক্রম করে যেতে। ভব ঘুরেকে নিয়েও বিরাট সমস্যা। তার বলার কায়দা গলার স্বর এসব নিয়েও আমি যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করেছি। সংক্ষেপে হ্যাঁ হুঁ করে জবাব দেবে কিংবা বিড়বিড় করে অস্পষ্ট অশ্রুত কিছু একটা বলবে ? তাতে লাভ নেই। ভবঘুরে আর সেই ভবঘুরে থাকবে না। সে তখন যে কোন সাধারণ কৌতুকাভিনেতার পর্যায়ে পড়ে যাবে। সে অবস্থায় মনে দাগ কাটার মতো কোন কিছু সৃষ্টি করা তার পক্ষে অসম্ভব।

মোটের ওপর এই আমার সমস্যা। নতুন কাজের আশা দূর-অস্ত। এদিকে পলেট আর আমার মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। টের পাই আমি। কারণ এক হতে পারে, আমি যেহেতু নিজের চিন্তা নিয়ে মশগুল তাই বিশেষ সময় দিতে পারি না ওর জন্যে। দ্বিতীয়তঃ ও নিজেও ব্যস্ত। মডার্ন টাইমসের সাফল্যের পর প্যারামাউন্টের বেশ কয়েকখানা ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কাজ চলছে তাতে। সে-ও দিতে পারে না।

আমার জন্যে সময়। মোটমাট ফের সেই ফাঁকা ভাব। ফের সেই নির্জনতা। একটু করে গ্রাস করছে আমায়। কি করি এখন ? কোথায় যাই ?

টিম ডুরাণ্ট বললো, চলো না পেবল্ বীচে। ভারী চমৎকার জায়গা। কদিন বেশ ঘুরে আসবে।

চমৎকার জায়গাই বটে। আমার মনের মতো। সান ফ্রান্সিস্কো থেকে একশো মাইল দূরে দক্ষিণে। জংলা জায়গা। একটেরে। সাধারণ লোকালয়ের পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবু লোকালয়। দিনের বেলা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে গা ছম ছম করে। সবাই বলে ভূত প্রেত পিশাচের আস্তানা। কাঁটা ঝোপে বোঝাই। পাহাড় ঠিক নয়, মস্ত একটা টিলা মতো। তারই ওপর ছড়ানো ছিটোনো কয়েকখানা বাড়ি। সেখানে থাকে কিছু নির্জনতা প্রিয় মানুষ। সামনে সমুদ্র। এখানকার বেলাভূমির রঙ কাঁচা সোনার মতো হলদেটে। সবাই তাই বলে স্বর্ণ বেলা।

টিমের পরিচয় এই প্রসঙ্গে দিয়ে রাখি। ভারী ভালো টেনিস খেলে। আমার সঙ্গে জমে খুব দারুণ। ই. এফ. হাটনোর মেয়েকে বিয়ে করেছিল। সম্প্রতি বিচ্ছেদ হয়েছে। তাই মন মেজাজ খুব খারাপ। এসেছে এই অবস্থায় ক্যালিফোর্নিয়া। কদিন ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে নতুন পরিবেশে থেকে মনের ভার লাঘব করবে এই ইচ্ছা।

পৌঁছে বাড়ি ভাড়া নিলাম। সমুদ্র থেকে প্রায় আধ মাইলের মতো দূর। ছোট বাড়ি। ঘিঞ্জি ঘর। বাতি জ্বালতাম যেই রাত্রে—সেজের বাতি, অমনি ধোঁয়ায় ঘর একেবারে বোঝাই। নীচু ছাদ যে। তা টিম আগেও এসেছে এখানে। চেনা পরিচিতি বিস্তর। বেরুতো রোজ সন্ধ্যে নাগাদ এর তার সঙ্গে দেখা করতে। একলা ঘরে বসে আমি কাজ করতাম। করার চেষ্টা বলাই ভালো, কেননা লাইব্রেরীর রাশিকৃত বইয়ের মাঝে বসেও কিছু ভাবনা আসতো না মাথায়। শুধু ব্যর্থ কালহরণ। তখন বেরিয়ে পড়তাম আমিও। খুঁজে খুঁজে বের করতাম টিমকে। সেখানে সেই বাড়ির লোকজনেদের নিয়ে বসতো আড্ডা। সে যে কত বিচিত্র চরিত্র সব! মোপাসাঁর মতো লিখবার ক্ষমতা থাকলে অসংখ্য ছোট গল্প লিখে ফেলতাম। এক বাড়িতে গিয়ে দেখি মস্ত বড় বড় ঘর, বড় উঠোন। ততোধিক বড় দরদালান। দুটি মাত্র বাসিন্দা। স্বামী আর স্ত্রী। স্বামী কথা বলেন খুব জোরে জোরে, স্রোতের মতো অর্গল শুধু কথা। স্ত্রী শান্ত চুপচাপ। 'ঢোকার সময় একবার বলেন 'আসুন', চলে যাওয়ার সময় বলেন 'আবার আসবেন'—ব্যস্, এ ছাড়া তাকে আর তৃতীয় কোন কথা বলতে শুনিনি। হাসতেও দেখিনি কখনো। একমাত্র সন্তান মারা যাবার পর থেকেই এই ভাব।

আরেক বাড়িতে থাকেন মাত্র একজন। এক ভদ্রলোক। স্ত্রী মারা গেছেন। সাহিত্যচর্চা করেন। বাড়িটা টিলার ওপর। স্ত্রীর মৃত্যুর গল্পও করলেন। ছবি

তুলছিলেন বাগানে। হঠাৎ পিছু হটতে গিয়ে বা যে কোন কারণেই হোক পড়ে যান ওপর থেকে। টিলার ঠিক নীচেই সমুদ্র। তার আর চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

উইলসন মিজনারের বোনও থাকেন এখানে। বাড়ির সামনে ভারী চমৎকার টেনিস খেলার মাঠ। মোটে মিশুকে নন। কারুর সঙ্গে আলাপ করেন না। কেমন যেন এক ধরন। শুধু তাই নয়। যদি কেউ মাঠে খেলতে আসে টেনিস, কাঠ কুটো জেলে এমন এক আগুন তৈরী করেন, তার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে মাঠে। ফলে খেলা বন্ধ করে খেলোয়াড়রা চলে যেতে বাধ্য হয়।

আরেক বাড়িতে আছেন সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত ফ্যাগান। প্রচুর অর্থের মালিক। বৃদ্ধ। প্রতি রোববার অঢেল খরচ করে বাড়িতে পার্টি দেন। তাতে আসে দূর দূর থেকে নানান মানুষ। নাৎসী বাহিনীর জনৈক অফিসারের সঙ্গে এরকম একটা পার্টিতেই আলাপ হলো। সুন্দর দেখতে, মাথার চুল লাল, আবার আচরণেও চমৎকার। খুব চেষ্টা করলো নিজে কতো ভালো কত সৎ সেটা জাহির করতে। আমি বিশেষ একটা পাত্তা দিলাম না।

জন স্টেনবেকের বাড়ি একটু দূরে। মন্তারীর কাছাকাছি। যেতাম সেখানে শনিবার। একদিন থেকে ফিরে আসতাম। ছোট্ট বাড়ি। স্বামী স্ত্রী দুজনের সংসার। 'টর্টিলা ফ্ল্যাট' তখন শেষ করেছেন মোটে। সঙ্গে আরো অনেক ছোট গল্প। সকালবেলা লিখতেন। একটানা প্রায় দু হাজার শব্দ। মুক্তোর মতো এক একটি অক্ষর। ভুল নেই একটাও। দেখে আমার ভারী হিংসে লাগতো।

এই যে লেখেন লেখকেরা। কিভাবে লেখেন, কি দিয়ে লেখেন, কখন লেখেন এসব ব্যাপারে আমার বরাবরই ভীষণ কৌতূহল। এ প্রসঙ্গে বিস্তর খবর আমি সংগ্রহ করেছি। টমাস মান দিনে চারশো শব্দের বেশি কিছুতেই লিখবেন না। লিওঁ ফুটওয়াঙ্গার গড় গড় করে বলে যাবেন একটানা দু হাজার শব্দ, সেক্রেটারী লিখে নেবে। হিসেব করলে এটা দৈনিক ছশো লিখিত শব্দের সমান। সমারসেট মম যে কোন অবস্থাতে দৈনিক চারশোটি শব্দ লিখবেনই লিখবেন। এটা তাঁর অভ্যাস জীইয়ে রাখার ব্যাপার। ওয়েলস্ লেখেন হাজার শব্দ। ইংরেজ সাংবাদিক হ্যালেন সোয়াকার চার থেকে পাঁচ হাজার শব্দ অব্দি দৈনিক লিখে থাকেন। আমেরিকার বিখ্যাত সমালোচক উলকটুকে দেখেছি পনেরো মিনিটে ঝর ঝর করে সাতশো শব্দ লিখতে। লেখার পর পরম নিশ্চিন্তে জুয়া খেলতে বসলেন। হার্স্ট লেখেন দু হাজার শব্দের সম্পাদকীয়। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা। এটা তার নৈমিত্তিক কাজ। জর্জ সিমেনঁ এক মাসে একখানা উপন্যাস লিখেছিলেন—সে অতি চমৎকার। সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের হাতে কফি বানিয়ে খান, তারপর টেবিলে বসেন, বাঁ হাতে থাকে টেনিস

বলের সমান মাপের সোনার একটা বল, তাই হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবনার কাজ সারেন, আর ডান হাতে চলে কলম। জর্জ নিজে আমার কাছে এ গল্প করেছেন। ক্ষুদে ক্ষুদে হরফ। কলম দিয়ে লেখেন। বলেছিলাম, আশ্চর্য, আপনি এতো ছোট্ট ছোট করে লেখেন কেন? বলেছিলেন, এতে কব্জিতে কম জোর লাগে। সেটা হাতের পক্ষে মঙ্গল। আমি লেখক নই, তবু ক..টা কি পারি সেটা এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা দরকার। দৈনিক এক হাজার শব্দ আমি বলে যাই। লেখে আরেকজন। তাতে মোট তিনশোর মতো সংলাপ হয়। পুরো তিনশো। আমার নিজের ছবির জন্য।

স্টেনবেকের বাড়িতে কোন কাজের লোক নেই। সব কাজ স্ত্রী করেন নিজের হাতে। খুব শান্ত স্বভাব। আমার ভীষণ ভালো লাগতো।

রাশিয়া নিয়ে কথা হতো স্টেনবেকের সঙ্গে। বলতেন, একটা দারুণ কাজ করেছে ওরা। দেশ থেকে গণিকাবৃত্তি দূর করে দিয়েছে। বলতাম, ব্যক্তি মালিকানার সর্বশেষ অবস্থা যাকে বলে। এই গণিকাবৃত্তি তবু বলবো পেশা হিসেবে দারুণ। এমন আর কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে নেই। টাকা দিলে তার আয়টুকু উশুল হয়। ঠকবাজির কোন ব্যাপার নেই। এটাকে সরকারী মালিকানায় আনলে কি অসুবিধে ছিলো বলুন দেখি?

জনৈক মহিলা একদিন আমাকে একলা বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। শুনেছি তাঁর সম্বন্ধে। নাকি স্বামীর স্বভাব ভালো নয়, মোটে দেখে না তাকে। এদিকে দেখতে ভারী সুশ্রী। বাড়ি নয়তো যেন প্রাসাদ। আমার তো মনের মধ্যে নানান কু চিন্তা পাক খাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে কত গল্প করলেন আমার সঙ্গে। নাকি দীর্ঘ আট বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে সহবাস বন্ধ, তবু মনে প্রাণে ভালবাসেন তাকে। শ্রদ্ধা করেন। শুনে মনের সংকল্প মনে রেখেই এক পা দু পা করে বেরিয়ে এলাম। আসার আগে বিরাট বিজ্ঞের মতো নানান দার্শনিক উপদেশও দিতে ভুললাম না। পরে শুনি মহিলা নাকি সমকামী হয়ে গেছেন।

কবি রবিনসন জেফারস্ পেবল্ বীচেই থাকতেন। এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা। টিম আর আমার সেদিন সেখানে নেমন্তন্ন। তো খুব হৈ চৈ করলাম। একলাই মাতিয়ে রাখলাম আসর। জেফারস্ চুপ। সারাক্ষণ একটা কথাও বলাতে পারলাম না তাকে। না একটু হাসি। ঘাবড়ে গেলাম ভীষণ। তবে কি অপছন্দ করলেন আমাকে? প্রগলভ বলে কু-চোখে দেখলেন?

ভুল ধারণা। এক হপ্তা পর টিম আর আমাকে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন জেফারস্। গিয়ে দেখি খুব ছোট্ট বাড়ি। গড়নটা অনেকটা দুর্গের মতো। টিলার ওপর। নীচে সমুদ্র। বড় ঘরের মাপ খুব বেশি হলে লম্বায় চওড়ায় বারো ফুট। বাড়ির একটু দূরেই একটা গম্বুজ। চার ফুট মতো ব্যাস। উঁচু প্রায় আঠারো ফুট। সিঁড়ি আছে

ওপরে ওঠবার। ভেতরে। মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। তা দিয়ে চতুর্দিক দেখা যায়। এখানে বসেই লেখেন। 'রোয়ান স্ট্যালিয়ন' নামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ এই গম্বুজে বসেই লেখা হয়েছে। টিম ফেরার পথে বললো, লোকটা এতো নির্জনতা পছন্দ করে, এটা ভালো নয়, আত্মহত্যার ঝোঁক আছে। তুমি দেখে নিও। আমি বরং দেখলাম উলটোটা। আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন। সঙ্গে পোষা কুকুর। হাসি হাসি মুখ। অপূর্ব সন্তুষ্টির ছাপ চোখের দৃষ্টিতে। এ তো জীবনের ভালবাসার ছবি। গভীর মমত্ববোধের। ভুল বলেছে টিম। এ মানুষ মরতে পারেন না। কিছুতে না।

২৫

যুদ্ধের রণ দামামা আবার বেজে উঠছে। খুব ফিকে হলেও সেই শব্দ শুনতে পাই। শুনতে পাই। নাৎসী তৎপরতার নানা কাহিনী। প্রস্তুতি চলছে। ভুলে গেছি এরই মধ্যে আমরা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সেই আতঙ্কময় দিনগুলির কথা। মৃত্যুর আর জীবন নাশের সেই চার চারটে বছর। হাত নেই পা নেই দৃষ্টি নেই কারুর চোয়ালটা হয়তো পুরেপুরি ভেঙে গেছে পঙ্গু অথর্ব কত মানুষ—ভুলে গেছি সেই সব মর্মান্তিক স্মৃতি। মরেছে অনেকেই। যারা মরে নি তাদেরও নিস্তার নেই। কেউ হয়তো পঙ্গু নয় উন্মাদ। সেই ভাবে বেঁচে আছে এখনও আমাদের মধ্যে। যুদ্ধ ছিনিয়ে নিয়েছে যৌবনের তরতাজা অনেকগুলি প্রাণ। অবশিষ্ট বলতে রয়ে গেছে কিছু বৃদ্ধ, কিছু বিশ্ব-নিন্দুক মানুষ। যুদ্ধে মোট লাভ লোকসানের হিসেবটা এইরকম।

যুদ্ধকে কেউ কেউ মহান করেও বর্ণনা করেন। গান রচনা করেন বীরদের নিয়ে। তাদের মরণোত্তর সম্মান দেন। অনেকে বলেন, ভালোই তো যুদ্ধ। দেশে শিল্পের অগ্রগতি হয়। নানান উন্নত শিল্প কুশলতার নজির মেলে। চাকরীও পায় অজস্র বেকার। লাখো লাখো যুবকের মৃতদেহের মিছিলের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে লাখো লাখো যুবকের নতুন চাকরী। মৃত্যুর বিনিময়ে শেয়ার বাজারের তেজী ভাব। কি বলবো একে—প্রবঞ্চনা? নাকি মনের সঙ্গে চোখ ঠারা? হার্স্টের 'এক্সামিনার' কাগজে আর্থার ব্রিসবেন লিখেছেন, যুদ্ধ লাগলে আমেরিকার যাবতীয় ইস্পাত কোম্পানীর শেয়ার তরতর করে পাঁচশো ডলারে পৌঁছে যাবে। সেটা যে নিছকই কল্পনা নিয়ে জুয়ো খেলা তার প্রমাণ কদিনের মধ্যেই পেলাম। তখন এই সব ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারা আর পালাবার পথ পান না।

মোটমাট যুদ্ধের মেঘ আকাশে ঘনিয়ে উঠেছে এটা ঘটনা। আর আমিও বসে গেছি পলেটকে নিয়ে নতুন একটা ছবির গল্প লিখতে। কিন্তু বসাই সার। কাজ আর মোটে এগোয় না। এগোবে কি করে? আকাশে বাতাসে শুনি যুদ্ধের মাদল, হিটলারের উন্মাদনা ভয়াল ভীষণ রূপ ধরে আমাদের গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসে—এর মধ্যে বসে কি লেখা যায় প্রেমের কোন মনোহর কাহিনী? না কি ভালবাসার মহিমা সম্পর্কে আশ্চর্য সুন্দর সারগর্ভ কোন গল্প?

১৯৩৭ সালে আলেকজাণ্ডার কোরদা আমাকে হিটলার নিয়ে একটা ছবি করতে বলেছিলেন। হিটলারের জীবনী নয়, হিটলার এবং তারই মতো দেখতে আরেকটি মানুষের পরিচিতির বিভ্রান্তি জনিত কাহিনী। ভবঘুরের গোঁফ আছে, হিটলারেরও।

দুটি চরিত্রে আমিই সেক্ষেত্রে অভিনয় করতে পারি। তা ব্যাপারটা নিয়ে তখন আর কিছু ভাবিনি। এখন আবার নতুন করে ভাবনাটা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। এই তো সময় সেই ছবি করার! উপযুক্ত সময়। দুটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে আমার কাজও হাঁসিল হবে। হিটলার হিসেবে হিটলারের যাবতীয় খেয়াল খুশী শয়তানী আমি তুলে ধরবো জনসমক্ষে, আবার ভবঘুরে হিসেবে থাকবো মোটামুটি চুপচাপ। নির্বাক আর সবাকের সংমিশ্রণ হবে এইভাবে। অভিনয় আর মূকাভিনয় দুইয়েরই থাকবে সমান প্রাধান্য। মোটামুটি সব দিক থেকেই চমৎকার। এখন দরকার শুধু গল্পটা ঠিক ঠিক ছকে ফেলা, তার সংলাপ রচনা। লেগে পড়লাম চিত্রনাট্য রচনার কাজে। শেষ হতে হতে লাগলো প্রায় দুটি বছর।

শুরুর দৃশ্যটা এইরকম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা। বিশাল একটা কামানের মুখ দেখা যাচ্ছে। ভীষণ তার সংহার ক্ষমতা। আসলে নিয়ে এসেছে মিত্রপক্ষকে ভয় দেখিয়ে শ্রদ্ধা আদায়ের উদ্দেশ্যে। এটা দিয়ে রাইমসের গীর্জা ধ্বংস করা হবে। ছুঁড়লো গোলা। একচুলের জন্যে এ পাশ ও পাশ হয়ে মস্ত একটা জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে সমস্ত জল ঝরঝর করে পড়তে শুরু করলো।

ছবিতে পলেটকেও রাখতে হবে। দু বছরের ব্যবধানে পলেট এখন কেউকেটা অভিনেত্রী। প্যারামাউন্টের প্রায় সব ছবিরই নায়িকা। ব্যক্তিজীবনে দুজনে আমরা কিছুটা ছাড়াছাড়া। দূরত্ব যাকে বলে। তবু বিচ্ছেদ হয় নি। আমরা স্বামী স্ত্রী এখনো, বন্ধু ত বটেই। তবে জানিনা বন্ধুত্ব কতদিন টিকবে। বড় একরোখা স্বভাবের মেয়ে। জিদ খুব। আসলে মানুষকে যতদিন দূর থেকে দেখা যায় ততদিনই সে সুন্দর, ভালো। তার মতো মানুষ আর হয় না। কাছের গোড়া থেকে, একদম ভেতর থেকে দেখতে গেলে অন্যরকম। তখন নানা রকম দোষত্রুটি তার বেরিয়ে পড়ে। সেটাই আসল পরিচয়। পলেটের উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করি। স্টুডিওতে নিজের সাজঘরে বসে একদিন চিত্রনাট্য লিখছি, হঠাৎ ঝড়ের বেগে পলেটের আবির্ভাব। সঙ্গে এক ছোকরা। টিঙটিঙে রোগা চেহারা, পোশাক আশাকে ভারী ধোপ দুরস্ত শুধু মুশকিল এই বড্ড রোগা। মনে হচ্ছে পোশাক সে পরেনি, পোশাকটাই তাকে পরে আছে। এদিকে আমার তখন ভাবনায় চিন্তায় নাজেহাল অবস্থা। কিভাবে গল্প গুছিয়ে তুলবো তাই নিয়ে অথৈ সাগরে কেবল ঘুরপাক খাওয়া। ভারী বিরক্ত হলাম। বললামও পলেটকে, আমি এখন ব্যস্ত, পরে শুনবো। তা সে সব কি আর বিচার বিবেচনার তার সময় আছে। রোখ চেপেছে এটাই বড় কথা। একটা হেস্ত নেস্ত এখুনি করতে হবে। বললো, ভীষণ জরুরী দরকার। বলে নিজে বসলো চেয়ার টেনে, সেই ছোকরাকেও বসালো। বললো, ইনি আমার সেক্রেটারী। হিসেব

নিকেশ সব দেখাশোনা করেন।

বলে ইঙ্গিত করলো তাকে। সে নড়েচড়ে বসলো। শুরু হলো তার বকবকানি। —কথাটা আপনাকে জানানো একান্ত দরকার মিঃ চ্যাপলিন, অনেকদিন পার হয়ে গেলো। সেই কবে উঠেছে মডার্ন টাইমস, তারপর থেকে এই এতোগুলো দিন। হপ্তায় পলেটকে আপনি দেন আড়াই হাজার ডলার। বড্ড কম টাকা। কুলোচ্ছে না। নানান ধরনের খরচ খরচা আছে। আমরা ভেবে দেখলাম, পলেটের ছবি সমেত যে সব বিজ্ঞাপন দেন, তার ওপরও শতকরা পচাত্তর হারে কমিশন এর পর থেকে নেবো আমরা।

অসহ্য। হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম,—বলি ব্যপারটা কি? আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আপনি এসেছেন এই সব ধানাই পানাই হিসেব শোনাতে? আপনার চেয়ে ঢের ঢের ভালবাসি আমি পলেটকে। এটা আপনার মনে রাখা উচিত। পলেট আমার স্ত্রী আর আপনি ওর মাইনে করা চাকর। নিন এবার কেটে পড়ুন।

দি গ্রেট ডিক্টেটরের কাজ তখন আধাআধি প্রায়, এমন সময় নানান খবর আসতে শুরু করলো ইউনাইটেড আর্টিস্টসের অফিস থেকে। বললো ছবি নিয়ে সেন্সরের ঝামেলায় আমাকে পড়তে হবে। হবেই। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। ইংল্যাণ্ডের অফিস থেকেও এলো অনুরূপ হুশিয়ারী।—হিটলার বিরোধী ছবি, ব্রিটেনে কি দেখানো সম্ভব হবে? আমার তখন আর ফেরার কোন রাস্তা নেই। চাইও না ফিরতে। জেদ চেপে গেছে আমার। হিটলারকে পাঁচজনের চোখে উপহাসাস্পদ করে তুলতেই হবে। কোথা থেকে যে এতো জোর পেয়েছিলাম জানি না। কিংবা হয়তো যাই নি নাৎসী বাহিনীর শিবিরে, তাদের অত্যাচার নিজের চোখে দেখি নি—তাই এতো জোর। দেখলে হয় তো এ চিন্তা আদৌ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। মোটমাট হিটলারের পবিত্র আর্য রক্তের ব্যাপারটাকে হাস্যাস্পদ করে তোলার ইচ্ছে আমার ঐকান্তিক। এতে এতোটুকু খাদ নেই।

ছবির কাজ চলছে, এমন সময় রাশিয়া ফেরত ক্যালিফোর্নিয়ায় এলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌। নৈশ ভোজের টেবিলে সঙ্গে নিয়ে এলেন অক্সফোর্ডের এক ছোকরাকে তার নামটা আমার মনে নেই। কিন্তু বলেছিল একটা দামী কথা, সেটা মনে আছে। বললো, জার্মানীতে ব্যাপার যা চলছে আমার মনে হয় আমার আয়ু খুব বেশি হলে মাত্র পাঁচ বছর। অর্থাৎ যুদ্ধ লাগবে সে জানে, তাকেও শহীদ হতে হবে। স্যার স্ট্যাফোর্ড শোনালেন রাশিয়া নিয়ে নানান গল্প। গিয়েছিলেন দেখতে, কিছুটা তথ্যানুসন্ধানের তাগিদে। মুগ্ধ তিনি। বিস্ময়ে বিমূঢ়। বললেন, দারুণ কাজ চলছে, অসম্ভব অগ্রগতি। তবে সমস্যাও বিস্তর। তার মধ্যে যুদ্ধ একটা। যুদ্ধ হবেই হবে।

নিউ ইয়র্ক অফিস থেকে আকুল ভাষায় লিখে পাঠালো, :আমি যেন ছবি করা স্থগিত রাখি। এর কোন ভবিষ্যৎ নেই। ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় এ ছবি দেখানো হবে না। কানে তুললাম না উপদেশ। জেদ আরো চেপে বসেছে। হোক একটা হেস্ত নেস্ত। যদি কেউ না দেখাতে চায় আমি নিজে হল্ ভাড়া করে ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবো। তাতে যা হবার হবে।

ছবি শেষ করার আগে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। আমি তখন ক্যাটালিনায়। সেদিন রবিবার। রেডিওতে শুনলাম সেই মর্মন্তুদ সংবাদ। গোড়ার দিকে তেমন একটা গুরুত্ব দিই নি। বলতাম, যাই করুক না কেন, ম্যাগিনট সীমারেখা ওরা লঙ্ঘন করবে না। তখন শুরু হলো ব্যাপক হত্যালীলা। বেলজিয়ামে ঢুকলো। ম্যাগিনট্ সীমারেখার আর অস্তিত্ব বলতে কিছু রইলো না। ফ্রান্স হস্তগত হলো। শুধু দুঃখ আর হতাশা। ইংল্যাণ্ড তখন দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করছে। আর নিউ ইয়র্ক অফিস থেকে কেবল আসছে নিত্যি নতুন টেলিগ্রাম—কই, ছবি কোথায়? ছবি পাঠান। অধীর আগ্রহে সবাই যে অপেক্ষা করছে।

ছবি করতে আমাকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। খরচও। ছোট ছোট মডেল লেগেছে বিস্তর, সঙ্গে নানান এটা ওটা উপকরণ। এই সব যোগাড় করতে সময় গেছে প্রায় একবছর। খরচ পাঁচ লাখ। ছবির মূল কাজ শুরু করার আগেই। সব মিলিয়ে টাকার অঙ্কটা বিরাট।

এদিকে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলো। সে যে উন্মাদ এটা তারই প্রমাণ। আমেরিকা এখনও যুদ্ধে যোগদান করেনি। করবার দরকার হয় নি তাই। হিটলারের যাবতীয় নজর রাশিয়ার ওপর পড়তে ইংল্যাণ্ড আমেরিকা দু দেশই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

শেষ হয়ে এসেছে প্রায় ছবি। একদিন ডগলাস এলো শুটিং দেখতে স্ত্রী সিলভিয়াকে নিয়ে। পাঁচ বছর ধরে স্রেফ হাত পা গুটিয়ে বসে আছে ডগলাস, নতুন ছবি করেনি একটাও। ইদানীং আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও কালে ভদ্রে হয়। খুব বেড়িয়ে বেড়ায় তো আজকাল। প্রায়ই শুনি ইওরোপ গেছে। বয়েসের ছাপ পড়েছে চেহারায়, একটু যেন মোটাও হয়েছে। সেই হাসিখুশী উদার ভাবটা আর নেই। কি যেন এক চিন্তায় সদা সর্বদা আচ্ছন্ন। খুব তারিফ করলো দৃশ্যটার। হো হো করে গলা ফাটিয়ে হাসলো। আমার কাজ ও এই ভাবেই চিরদিন তারিফ করে এসেছে। বললো, চার্লি, হয়তো শেষটুকু দেখে যাওয়ার ফুরসুত আমার আর হবে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের দেখা। চলে যায় যখন, আমি দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। দেখছি পেছন থেকে। হাত ধরে বৌকে তুললো খাড়াই ঢাল বেয়ে রাস্তায়। সেই

ডগলাস। আমার প্রিয় বান্ধব। হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। দূরত্ব একটু একটু করে বাড়ছে। দূরে। কেন জানি না সহসা ভীষণ দুঃখে ভরে উঠলো মন। ফিরে হাত নেড়ে বিদায় জানালো। আমিও নাড়লাম। চোখ আমার ভারী। কেবলই মনে হচ্ছে এই হয়তো শেষ দেখা আমাদের। আর কোনদিন দেখতে পাবো না ওকে। ঠিক তাই। এক মাস পর। আমি তখন বাড়িতে। ছেলে ফোন করে বললো, বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। জীবনে এই আরেকটা মস্ত বড় ধাক্কা খেলাম।

ডগলাসের কথা বড় মনে পড়ে। নেই আর ডগলাস। তার ভালবাসা তার আন্তরিকতা তার মাধুর্য আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। প্রতি রবিবার সকালে বেজে উঠতো টেলিফোন। তার মিষ্টি গলায় আদরের আমন্ত্রণ,—আসছো তো সকাল সকাল ? দুপুরের খাবার খাবো একসাথে। তারপর সাঁতার। তারপর রাতের ভোজ। সব শেষে ছবি দেখা। যাবে তো ? এমন করে কেউ আর আমায় ডাকবে না, ফোন করবে না।

কোথায় গেলে পাবো আমার মনের মানুষ ? মানুষের এ এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা। স্বভাবতই সকলে বেছে নেয় তার নিজস্ব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে, তাকেই পরম সুহৃৎ করে। স্ব স্ব পেশায় নিযুক্ত প্রতিটি মানুষই এই অর্থে পরম বান্ধব। আশ্চর্যের ব্যাপার ডগলাস ছাড়া সারা ছায়াছবির দুনিয়ায় আমার দ্বিতীয় কোন বন্ধু নেই। পরিচিতি আছে প্রায় সবারই সাথে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। তবু বন্ধু হয় না কেউ। একটা প্রতিযোগিতার আভাস টের পাই। আর হিংসে। সবাই ব্যস্ত নিজেকে জাহির করতে, প্রকাশ করতে। সেখানে অনিবার্য কারণেই বন্ধুত্ব আর গড়ে ওঠে না।

লেখকরা মানুষ হিসেবে অপূর্ব, আমার শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু মন খুলে তাঁরা মিশতে পারেন না। যেটুকু প্রকাশ করেন তারা লিখে, তার অনেক বেশি থেকে যায় অপ্রকাশ্য। এটা তাঁদের স্বভাব। বন্ধু হবার পক্ষে এটা আমি মনে করি একটা দুস্তর বাধা। বৈজ্ঞানিকেরা সঙ্গী হিসেবে দারুণ। কিন্তু ভীষণ ভয় করে মানুষগুলোর সামনে দাঁড়াতে। অসীম জ্ঞান যে। দেখলেই কেমন বুক ধড়ফড় করতে শুরু করে। শিল্পীদের আমি খুব একটা পছন্দ করি না। ছবি যা আঁকে তার চেয়ে নিজেকে অনেক বেশি দার্শনিক বলে প্রতিপন্ন করার দিকেই ঝোঁক। এটা আমার কাছে অসহ্য। কবিরা অপূর্ব মানুষ। আমার খুব পছন্দ হয়। চিন্তা ভাবনার দিক থেকেও যথেষ্ট উন্নত। খুব সহনশীল। এবং সাথী হিসেবে অনবদ্য। সব থেকে অবাক করে আমাকে সঙ্গীত শিল্পীর দল। আমার মনে হয়, যে কারুর চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল, অনেক বেশি সহযোগী তারা। যে কোন অর্কেস্ট্রা শুনতে গেলেই জিনিসটা বুঝতে পারা যায়। একই

সাথে বাজছে প্রতিটি যন্ত্র, একই সুর, পরিচালক ইঙ্গিত করলেন, অমনি সবাই চুপ। এর চেয়ে বন্ধুত্ব সুলভ পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব আর কোথায় আছে? মনে আছে হোরোউইৎসের কথা। বিখ্যাত পিয়ানো বাদক। আমার বাড়িতে পার্টিতে এসেছেন। নানান আলোচনা চলছে। তার মধ্যে বেকারী আছে, মন্দা আছে, আছে দেশের আরো নানান দুরবস্থার ছবি। কে যেন বললেন, সব কেটে গিয়ে আসবে এক নতুন দিন, নবজীবনের সূচনা হবে। উঠে পড়লেন হোরোউইৎস। বললেন, আপনাদের কথা শুনে আমার মনে পড়ছে সুর। শুমানের দু নম্বর সোনাটা। আমি একটু সবার অনুমতি নিয়ে বাজাতে পারি কি?

বাজালেন। কারুর আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। আমার মনে হয় এই সুর এমন আশ্চর্য সুন্দর করে আর কোন দিন কেউ বাজাতে পারবে না। এমনকি তিনি নিজেও না।

যুদ্ধের আগে নেমন্তন্ন করলেন আমাকে তাঁর বাড়িতে। স্ত্রী তোস্‌কানিনির মেয়ে। রাথমানিনক্ আর বার্বারিলিও সেদিন বাড়িতে হাজির। আশ্চর্য মানুষ এই রাথ্‌মানিনক্। অপূর্ব সুন্দর দেখতে, অনেকটা সাধু সন্তের মতো চেহারা। ভারী ভাল লেগেছিল সেদিনকার নৈশভোজের আসর।

মনে আছে শিল্প নিয়ে আলোচনা উঠছিল বারবার। আমার মতামত সবাই জানতে চান। আমি বলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কথা। বলেছিলাম, দেখুন শিল্প হলো মানুষের বাড়াত আবেগের ফসল। তাকে অসীম দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করতে হয়। তবেই তা জনমনে দাগ কাটতে পারে। কে একজন তখন যেন ধর্মের প্রসঙ্গ তুললেন। আমি বললাম, ধর্মে আমার আদৌ কোনো বিশ্বাস নেই। রাথমানিনক বললেন, ধর্ম ছাড়া শিল্পের কথা আপনি ভাবেন কি করে?

মুহূর্তের জন্য থমকে গেছি আমি। কি বলবো ভেবে পাই না। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললাম, ব্যাপারটা হয়তো আমরা গুলিয়ে ফেলছি। ধর্ম নিয়ে আমি কোন কথা বলতে চাই নি। ধর্ম বলতে আমি বুঝি এক ধরনের স্থির স্থবির বিশ্বাস, তারই প্রতি আস্থা। শিল্প সেই অবস্থার উর্ধ্বে অন্য কিছু।

তিনি বললেন, ধর্মটাও তাই। সীমার বাইরে অসীম। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

আইগর স্ত্রাভিন্‌স্কি এলেন দেখা করতে। বললেন, আসুন না দুজনে মিলে একটা ছবি করি। বললাম, গল্প তো আছে, বাস্তবের সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপার মিশিয়ে একটা নতুন ধরন। বলে গল্পের রূপরেখা তাকে বললাম।

বহু প্রাচীন একটা হোটেল। টেবিল গুলো চারপাশে গোল করে সাজানো। মাঝখানে

নাচের জায়গা। এক এক টেবিলে বসে আছে এক এক ধরনের মানুষ। কেউ লোভী, কেউ নিষ্ঠুর, কেউ ভণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝখানে নাচের আসরে চলছে এক নাটক—তাতে যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করার ঘটনা দেখানো হবে। সেদিকে কারুর মন নেই। যে যার নিজের চিন্তায় মশগুল। গল্প করছে, খাচ্ছে। এদিকে নাটকের পাত্র পাত্রী হাজির। পাদ্রী এসেছে। এসেছে তার সাঙ্গোপাঙ্গো। ক্রুশে তোলা হয়েছে যীশুকে। পাদ্রী বলছে, তুমি যদি ঈশ্বরের সন্তান হও, তবে রক্ষা করো নিজেকে, দেখি তোমার কত শক্তি! একটা টেবিলে তখন ব্যবসায়িক আলোচনা চলছে। ক্রমে আলোচনা থেকে তর্ক তারপর পরস্পরকে গালমন্দ। সিগারেট টানছে একজন নিস্পৃহ ভাবে, যীশুর দিকে তাকিয়ে। ধোঁয়া ছাড়ছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী সাপের মতো এগিয়ে চলেছে যীশুর দিকে।

আরেক টেবিলে সস্ত্রীক জনৈক ব্যবসায়ী। কি খাবার দিতে বলা যায় সেইজন্য তালিকা দেখছে নিবিষ্ট চিত্তে। হঠাৎ স্ত্রীর চোখ গেল যীশুর দিকে। চেয়ারটা ঘুরিয়ে সেই দিকে পেছন করে বসলো। আপন মনেই বিড়বিড় করলো, আশ্চর্য কেন যে মরতে মানুষ এখানে আসে। কি এমন আহামরি! যত রাজ্যের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে ন্যাকাপনা।

স্বামী মুখ তুললো।—কেন মন্দ কি! খেতে খেতে গান শোনার চেয়ে তো ভালো। এরা এইসব করছে বলে তবু টিকে আছে। নইলে তো লালবাতি জ্বালার অবস্থা হয়েছিল।

—না না এ বড্ড বিশ্রী। ধর্মের কত বড় একটা ব্যাপার, কত পবিত্র, এরা তাকে হেয় করছে। ছোট করছে।

—আরে বাপু ঘটনাটা তো সত্যি। গীর্জায় যারা কোনদিন যায় না তারাও বুঝতে পারবে খ্রীষ্ট ধর্ম ব্যাপারটা কি, কোথা থেকে এর শুরু।

চলছে নাটক। এক মাতাল বসে আছে একধারে। একলা। হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলো। চিৎকার করে উঠলো, যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করছে, এদিকে কারুর খেয়াল নেই! দেখুন আপনারা সবাই দু চোখ ভরে দেখে নিন। টলতে টলতে উঠে গিয়ে সে ক্রুশের সামনে দাঁড়ালো। এক মন্ত্রীর বৌ বসে ছিলেন কাছাকাছি। ঘন্টি বাজিয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে ডাকলো। বললো, ওকে বের করে দিন। তখন দুটি আর্দালী টানতে টানতে নিয়ে গেলো তাকে দরজার দিকে। সে তখনও কাঁদছে ভেউ ভেউ করে। আর সেই চিৎকার—কেউ দেখছে না, এদিকে কারুর খেয়াল নেই। দেখুন আপনারা, দেখুন কি অবস্থা!

স্তাভিনস্কিকে বললাম, মাতালকে বের করে দেবার কারণ নাটকটা সে পণ্ড করতে

বসেছিলো। আর হোটেলে নাচের বদলে ঐ যে নাটক—এটা খ্রীষ্টধর্মের ওপর মানুষের বর্তমান আকর্ষণের প্রতিরূপ। সারা দুনিয়া ধর্মকে আজ এই চোখেই দেখে।

ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। বললেন, বুঝেছি ব্যাপারটা। তবে ঠিক সায় দিতে পারছি না। ধর্মকে খানিকটা হেয় করা হচ্ছে বৈকি।

আমি তো থ'। বললাম, তাই নাকি? হলে দুঃখিত। এটা আমার অভিপ্রায় নয়। আমি সমালোচকের চোখ দিয়ে ধর্মের গোটা ব্যাপারটাকে তুলে ধরতে চাই। দেখাতে চাই দুনিয়ার মানুষের খ্রীষ্টধর্মের ওপরে টান আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। হয়তো গল্প বলার ঢঙে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয় নি।

এরপর আর এ প্রসঙ্গে কোন কথা হয় নি। ক হপ্তা পর চিঠি লিখলেন আমাকে—কি ব্যাপার, আমাদের এক সাথে ছবি করার কি হলো? ব্যাপারটাতে আমারও আর তেমন আগ্রহ নেই। জবাব দিলাম না। এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ।

শোনবার্গকে সাথে নিয়ে হান্‌স্ আইলার এলেন একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে। হান্‌সের গুরু। এর সুর আমার খুব ভালো লাগে। লস্ এঞ্জেলেসে টেনিস খেলা দেখতে গেলেই দেখা পেতাম শোন্‌বার্গের। একধারে বসে আছেন একলা। মাথায় সাদা একটা টুপি আর পরনে বুক খোলা হাফ শার্ট। মর্ডান টাইমস্ দেখেছেন। বললেন, দারুণ হয়েছে, অপূর্ব। তবে সঙ্গীত ভালো নয়। আরো উন্নত হওয়া দরকার। আমি এক মত এ ব্যাপারে। আমারই সুর। নিজের সৃষ্টি নিয়ে নিজেরই কাছে ছিল বিরাট প্রশ্ন। তিনি বলতে সেটা আরো স্পষ্ট হলো। বললেন, সুরের ব্যাপারটা কি জানেন? সুর হলো সৌন্দর্য। সুন্দর কয়েকটি ছন্দের সমন্বয়।

হানস্ একটা মজার গল্প বললেন। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পাঁচ মাইল হেঁটে তালিম নিতে যেতেন রোজ গুরুর কাছে। শোনবার্গের মাথায় তখন টাক পড়তে শুরু করেছে। পিয়ানো বাজাতেন গুরু, শিষ্য পেছনে দাঁড়িয়ে শুনতেন, শিস দিয়ে তুলতেন সুর। গুরু বলতেন, হানস্ অতো শিস দিয়ো না। বড্ড ঠাণ্ডা। আমার টাকে লাগে আর মনে হয় টাক যেন জমে যাবে।

এদিকে চিঠিতে চিঠিতে ছয়লাপ। ভালো মন্দের মিশেল। কেউ করে প্রশংসা কেউ দেয় গালাগালি। ইদানীং ছবি যেহেতু শেষ, ভয় দেখানো চিঠি আসতে শুরু করেছে রোজ। নাকি বোমা মারবে পর্দায়, ছবি বন্ধ করে দেবে। কেউ লিখেছে, ছবি বাজারে বেরুবার সাথে সাথে দাঙ্গা বাঁধবে। আমি যেন ছবি না বের করি। মহা মুশকিল। কি করি? পুলিসকে জানাবো? তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির ভাগই বেশি। ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে পড়বে, দর্শক ছবি দেখতে আসতে ভয় পাবে। একজন বন্ধু বললো, ওসব কিসসু দরকার নেই, তুমি হ্যারি ব্রিজেসের সঙ্গে কথা বলো, জাহাজী

শ্রমিক ইউনিয়নের পাণ্ডা। যা ব্যবস্থা করার সেই করবে।' তখন হ্যারিকে আমি একদিন বাড়িতে ডিনার খাবার নেমন্তন্ন করলাম।

বললাম খুলে তাকে আমার মনের কথা। এতোটুকু রাখঢাক করে নয়, স্পষ্টাস্পষ্টি। জানি আমি হ্যারি নাৎসী-বিরোধী। চিঠি দেখালাম। বললাম, এক কাজ করলে কেমন হয়। ধরুন আপনার দলের বিশ ত্রিশ জনকে আমি নেমন্তন্ন করলাম ছবি দেখতে। ছড়িয়ে রইলো তারা দর্শকের মধ্যে। যেই দেখবে গোলমাল অমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনি কি বলেন ?

বললো, কিস্‌সু হবে না, আপনি দেখে নেবেন, আমি এদের ভালো করেই চিনি। আপনার ভক্তের সংখ্যা হিটলারের গোটা নাৎসী বাহিনীর চেয়ে কিছু কম নয়। তারাই দেবে সব ঠাণ্ডা করে।

কথায় কথায় বললো স্যান ফ্রান্সিস্কোতে হরতালের দিনের গল্প। তারাই ডেকেছে হরতাল। সারা শহরে জনজীবন স্তব্ধ। হাসপাতাল আর দুধ শুধু হরতালের আওতা থেকে বাদ।—তা মোদ্দা ব্যাপারটা কি জানেন, আপনি যে কারণে যা করছেন, সেটা যদি মিথ্যে না হয়, সবাই এগিয়ে আসবে আপনার দিকে, দুহাত তুলে আপনাকে সমর্থন জানাবে। প্রথমটায় হরতাল করতে আমি রাজী হই নি। দেখি ইউনিয়নের সবাই চায় হরতাল। বললাম, বেশ তো ভোট নাও। ভোট নিলো। হরতালের পক্ষে নিরঙ্কুশ সায়। তখন বললাম বেশ, তবে করো। সবাইকে বোঝাও। প্রচার করো। তাই হলো। হরতাল সার্থক।

নিউইয়র্কে ক্যাপিটল আর অ্যাস্টরে মুক্তি পেলো 'দি গ্রেট ডিক্টেটর'। অ্যাস্টরে হলো মুক্তির আগের দিনের বিশেষ প্রদর্শনী। তাতে রুজভেল্টের প্রধান উপদেষ্টা হ্যারি হপকিন্সকে আমন্ত্রণ করলাম। গোড়াতে দুজনের একসাথে ডিনার খাওয়ার কথা। দেরী হয়ে গেলো তাতে। যখন পৌঁছলাম, ছবি বেশ খানিকটা হয়ে গেছে।

হ্যারি দেখে বললেন, অপূর্ব। সুন্দর হয়েছে। তবে খরচের খাতায় লিখে রাখুন। টাকা আপনার উঠবে না।

বলে কি! আমার নিজের পকেট থেকেই খরচ হয়েছে কুড়ি লাখ। এছাড়া দুটি বছরের পরিশ্রম। টাকা না উঠলে চলে! ভারী দমে গেলাম কথাটা শুনে। তখনকার মতো মাথা নেড়ে সায় দিলাম। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, তার কথা ফলে নি। একটানা পনেরো সপ্তাহ চলেছে নিউইয়র্কে। প্রথমে মুক্তি হল্। পরে সারা শহর জুড়ে। টাকা যা পেয়েছি, বলতে দ্বিধা নেই, আমার আগের সব কটি ছবির চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

তবে মিশ্র সমালোচনা। নানা মুনীর নানা মত। বেশির ভাগ সমালোচকেরই

শেষের বক্তৃতাটাতে খুব আপত্তি। 'ডেলি নিউজ' কাগজে লিখলো আমি নাকি সরাসরি সাম্যবাদের কথা বলেছি। হোক সাম্যবাদ। সাধারণ দর্শক তো আন্তরিক ভাবে শুনলো। শেষ অব্দি। অজস্র চিঠি এসেছে তাদের কাছ থেকে। অকুণ্ঠ প্রশংসা আর স্তুতি। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি তাদের ভালবাসা দেখে।

আর্চি এল্ মেয়ো তখন হলিউডের নামকরা পরিচালকদের একজন। আমার কাছে এলেন সম্মতি নিতে—ছবির শেষ বক্তৃতা তিনি খ্রীষ্টমাস কার্ডে ছাপিয়ে বিলি করবেন। মত দিলাম। কার্ড পাঠিয়েছিলেন আমাকেও। প্রথম পাতায় নিজের লেখা ভূমিকা। ঠিক এইরকম :

'প্রিয় বন্ধু, যদি আমি লিংকনের যুগে জন্মাতাম, আপনাকে উপহার দিতাম তার সেই বিখ্যাত গটিসবার্গ বক্তৃতা যা প্রচণ্ড উদ্দীপনায় ভরপুর, যথেষ্ট আলোড়ন আনতে পেরেছিল তখনকার মানুষের জীবনে। দিন পালটে গেছে। আজ নতুন দিন, নতুন তার সংকটের চেহারা। এরই মাঝখানে হৃদয়ের গভীর থেকে জন্ম দিয়েছে আর এক অনবদ্য ভাষণ। বক্তা চার্লি চ্যাপলিন। তেমন করে চিনি না মানুষটাকে। তবু অবাক বিহ্বল হয়ে গেছি তার ভাষণ শুনে। আমার চোখে এ এক অনবদ্য আশার আপনাদের দরবারে পাঠালাম। যাতে সেই আগামী ভবিষ্যতের আপনারাও স্বাদ পেতে পারেন।

স্বেচ্ছাচারীর শেষ বক্তৃতা

'আমাকে মার্জনা করবেন। আমি সম্রাট হতে চাই নি। সম্রাট হওয়া আমার পেশা নয়। আমি শাসন করতে চাই না, চাই না কিছু দখল করতে। আমি সবাইকে সাহায্য করতে চাই—যতটুকু সম্ভব আমার ক্ষমতায়—সে ইহুদী হোক, অ-ইহুদী হোক, কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ—সকলকে।

'প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করতে চায়। এটা মানুষের সহজাত ধর্ম। সবাই সুখী হবে এটাই সবাই চায়, কারুকে দুঃখী দেখতে কেউ অভ্যস্ত নয়। ঘৃণা নয়। ঘৃণা আমরা ঘৃণা করি। হিংসা করতে আমাদের বাধে। এই দুনিয়ায় সকলেরই আছে বেঁচে থাকার অধিকার। প্রকৃতির অপার সম্ভার সবার জন্য দুহাতে উজাড় করে দেয় জন্মভূমি। যাতে সবাই বেঁচে থাকে। সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারে।

'জীবন হবে সুন্দর সহজ। হবে মুক্ত। সেটাই কাম্য। কিন্তু সে পথ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। এসেছে লোভ। লোভ দিয়েছে মানুষের মন বিষিয়ে। দুনিয়াকে করেছে টুকরো টুকরো। পাঁচিল তুলে দিয়েছে চতুর্দিকে—ঘৃণার

পাঁচিল, তাতে দুঃখ আর রক্তপাতের ইতিহাস। গতিময় হয়েছি আমরা, কিন্তু গতি দিয়েছে আমাদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আটক করে। যন্ত্র আবিষ্কার করেছি। যন্ত্রে আসে প্রাচুর্য। আমাদের জন্যে এসেছে অভাব। জ্ঞান দিয়েছে আমাদের মনে বিশ্ব-নিন্দার বীজ। করেছে আমাদের শঠ, নিষ্ঠুর আর নির্দয়। ভাবি আমরা অত্যধিক, কিন্তু অনুভূতির ঘরে শূন্য। যন্ত্র নয়, আমরা চাই মানবতা। শঠতা নয় আমরা চাই দয়া, চাই নম্রতা। এগুলো নেই অর্থাৎ জীবনও নেই। সব হারিয়ে যাবে। আমরা ক্রমে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবো।

'দূরকে করেছি আমরা নিকট। বেতার করেছে আমাদের ঘনিষ্ঠ, উড়োজাহাজ দিয়েছে দূরত্বের সীমা দূর করে। এগুলির সদ্ব্যবহার চাই। মানুষের সততার জন্যে এরা আজ আর্তনাদ করে ফেরে। চাই সারা দুনিয়ার সম্প্রীতি। ভাই হতে চাই সবার। এই তো বেতারে শুনছেন আপনারা আমার ভাষণ—সারা দুনিয়ার লাখো লাখো মানুষ—দুঃখী মানুষ, দুঃখী বোন আমার, দুঃখী ভাইটি—তোমরা সবাই আজ এই ব্যবস্থার শিকার। এই নিয়ম। মানুষকে এ নিয়ম অত্যাচার করে। নিরীহ নির্দোষ মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। সকলকে বলি, হতাশার কোন কারণ নেই। মাথা তুলে দাঁড়ান আপনারা। এই যে দুর্দশা এর মূলে মুষ্টিমেয়ের লোভ। তারা চায় না সভ্যতা এগিয়ে যাক। তারা চায় না দশের উন্নতি। ঘৃণা একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। স্বেচ্ছাচারীর পতন হবে। জনগণের কাছ থেকে যে ক্ষমতা তারা একদিন কেড়ে নিয়েছে তা আবার জনগণের হাতেই ফিরে আসবে। জন্ম হবে মানুষের। মৃত্যু হবে। কিন্তু স্বাধীনতার বিনাশ নেই। স্বাধীনতা চিরন্তন সত্য।

'সৈন্যদল, দিয়ো না নিজেদের এই সব শয়তানের হাতে তুলে। এরা ঘৃণা করে তোমাদের। তোমাদের দাস বলে মনে করে। তোমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তোমাদের জীবনের গতিপথ স্থির করে দেয়। বলে এই ভাবে ভাবো এইভাবে অনুভব করতে শেখো। এরা তোমাদের কুচকাওয়াজ শেখায়, তোমাদের খাদ্য দেয় নামমাত্র, গরু ছাগলের মতো তোমাদের সঙ্গে আচরণ করে। এবং ব্যবহার করে তোমাদের, কামানের গোলা হিসেবে। এরা অস্বাভাবিক। মনুষ্য পদবাচ্য নয়। এদের হাতে তুলে দিয়ো না নিজের সত্তা। এরা যন্ত্র। যন্ত্রের মতো এদের মন, যন্ত্রের মতো শুষ্ক নির্দয় হৃদয়। তোমরা তো যন্ত্র নও। মানুষ তোমরা। তোমাদের হৃদয়ে আছে ভালবাসা, তোমরা মহান্। ঘৃণা কোরো না। ঘৃণা করে যারা ভালবাসাহীন যারা অস্বাভাবিক। তোমরা স্বাভাবিক। তোমরা মানুষ।

'সৈন্যদল। দাসত্বের জন্য যুদ্ধ কোরো না, যুদ্ধ করো স্বাধীনতার জন্যে। সেন্ট লিউকের চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে—ঈশ্বরের রাজ্য মানুষের মধ্যেই বর্তমান। কোন

ব্যক্তিমানুষের জন্য নয়, কোন দলের জন্যে নয়। সকলের জন্য, সব মানুষের জন্যই এই সুবিশাল রাজ্যের বিস্তৃতি। তুমিও সেই রাজ্যের একজন অংশীদার। তোমারই হাতে শক্তি, যন্ত্রের জন্ম তুমিই দিয়ে থাকো। এই শক্তির বিনিময়ে তুমি অর্জন করতে পারো সুখ। জীবনকে সুন্দর সার্থক মুক্ত করার সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই নিহিত। জীবন হলো এক অপূর্ব সুন্দর অভিযান। এসো গণতন্ত্রের নামে সেই শক্তিকে আমরা ব্যবহার করি। সবাই ঐক্যবদ্ধ হই। নতুন এক দুনিয়া গড়ে তুলি। অপূর্ব অনবদ্য এক জগৎ। সেখানে কাজের অধিকার থাকবে সকলের, যুবকদের থাকবে সুন্দর ভবিষ্যতের প্রেরণা, বৃদ্ধ মানুষদের জন্যে থাকবে আগামী জীবনের নিরাপত্তার ইঙ্গিত।

শয়তানও এই সব শপথ শোনায়। এইভাবেই তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তার সেই শপথ মিথ্যা। তাতে সত্যের স্থান নেই। কখনো পারে না তারা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে। পারবে না কোনদিন। স্বেচ্ছাচারী নিজেকে করে স্বাধীন, কিন্তু মানুষকে করে দাস। যুদ্ধ করো তাই। আনতে হবে মুক্তি। জাতীয় সব বাধা দূর হোক। লোভ ধ্বংস হোক। ঘৃণা দূর হটুক। অসহনীয়তার স্থান নেই এই পৃথিবীতে। এসো নতুন জগতের সূচনা করি। সেখানে মুক্তি হবে বিচারের মূলমন্ত্র। সেখানে বিজ্ঞান মানুষকে দেখাবে সুখের মুখ। সুখ আসবে সকলের। সৈন্যদল, এসো গণতন্ত্রের নামে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।

'হানা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? কোথায় তুমি? মুখ তুলে তাকাও। দেখো একবার। মেঘ একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। দেখো চেয়ে, সূর্য উঠছে ঐ। অন্ধকার থেকে আমরা ক্রমশঃ আলোর দিকে এগোচ্ছি। নতুন এক জগৎ আমাদের সম্মুখে। বড় সুন্দর অপরূপ এই জগৎ। এখানে লোভ নেই। লালসার উর্দ্ধে প্রতিটি মানুষ। এখানে ঘৃণার স্থান নেই। নিষ্ঠুরতার স্থান নেই। তাকিয়ে দেখো হানা। মানুষের আত্মা পেয়েছে মুক্তির আহ্বানবাণী, ডানা মেলে উড়ছে সে মুক্ত আকাশে। ঐ আকাশ। ঐ রামধনু। ঐ আশার আলোক রেখা। মুখ তোলো হানা। তাকিয়ে দেখো।'

ছবির মুক্তির পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের মালিক আর্থার সাল্‌জবার্জার আমাকে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। টাইমস্ অফিসের একেবারে ওপরের তলা। সেখানেই থাকেন আর্থার। বাইরের ঘরখানি চমৎকার করে সাজানো। রুচির তারিফ করতে হয়। একধারে আগুন পোয়াবার চুল্লী। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন হার্বার্ট হুভার। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। ক্ষুদে ক্ষুদে দুটি চোখ। ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে জরীপ করলেন।

পরিচয় করিয়ে দিলেন আর্থার—প্রেসিডেন্ট, ইনি চার্লি চ্যাপলিন।

আরো ছোট ছোট হলো দুই চোখ। কপালে ভাঁজ। হাসলেন। বললেন, চিনি আমি। একবার পরিচয় হয়েছিল। সে অনেকদিন আগে।

আমি অবাক। মনে আছে তাহলে। ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে আছেন তখন। অ্যাশটর হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক। রাষ্ট্রপতি পদে সন্ত নির্বাচিত হয়েছেন। আমিও আমন্ত্রিত। হুভারের বক্তৃতার আগে আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করলো। কি বলেছিলাম তার মাথামুণ্ডু কিছু মনে নেই। কয়েক মিনিটের মামলা, বসে পড়লাম। পরিচয় করিয়ে দিলো। হুভারের সঙ্গে। করমর্দন হলো। তখনই যা সৌজন্য মূলক দুটি একটি কথা।

ভারী ব্যস্ত তখন। হাতে রাশিকৃত কাগজ। তাই দেখে বক্তৃতা দেবেন। সে মস্ত বিরাট। প্রায় দু ঘণ্টা লাগলো শেষ করতে। নানান পরিসংখ্যানে বোঝাই। এক একটা পাতা তোলেন আর গড়গড় করে পড়ে যান। তারই মাঝে একবার পাতাগুলো গেলো হাত থেকে পড়ে। ছত্রখান অবস্থা। গুছিয়ে তুলতে সময় লাগলো অনেকখানি। বক্তৃতা শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন আমার পাশ দিয়ে, চোখাচুখি হতে মুচকি হাসলাম। খেয়াল করেন নি বোধহয়। আত্মমগ্ন অবস্থা। হাসির বিনিময়ে ফেরত হাসিটুকু দেখার সৌভাগ্য আর হলো না।

মুহূর্তের সেই পরিচিতি আজ এতোদিন পরেও মনে আছে। লাগছে বেশ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। একসঙ্গে খাবো আজ ডিনার। বারোজন বসলাম আমরা টেবিল ঘিরে।

ইদানীং একজাতীয় ব্যবসায়ীকে আখছার দেখি। দীর্ঘ সুঠাম গড়ন, দেখতে সুন্দর, আরো সুন্দর করে পরা থাকে পোশাক, চিন্তায় জড়তা নেই, প্রতিটি পরিসংখ্যান দেয় নির্ভুল ভাবে—কেন জানিনা এদের দেখলেই ভারী অস্বস্তিতে পড়ে যাই। গলার স্বরটাও বানিয়ে নেয় ওরা অদ্ভুত রকমের। জ্যামিতির ছকের মতো কথা। তাতে জীবন যৌবন মানুষ ব্যবস্থা সব একাকার। এরাই বসে আছে টেবিল ঘিরে। মাঝখানে আমি এক নিতান্ত অব্যবসায়ী মানুষ। আরো আছেন একজন। মহিলা। নিউ ইয়র্ক টাইমসের রাজনৈতিক ভাষ্যকার। নাম শ্রীমতী অ্যারি ম্যাকবরমিক। ভারী সুন্দরী দেখতে। লেখেনও চমৎকার। আমি পড়েছি। জীবনের যোগাযোগ টের পাই।

আর অবাক কাণ্ড, হুভারকে সবাই ডাকছে মাননীয় প্রেসিডেন্ট বলে। কোন প্রতিবাদ নেই। না হুভার স্বয়ং না অন্য কেউ। কিন্তু আমাকে হঠাৎ আমন্ত্রণের কারণ কি? বুঝিনা কিছু। এদের মধ্যে আমি—কোন যোগাযোগই নেই আমার এদের সাথে। হঠাৎ আর্থার বললেন, প্রেসিডেন্ট, আপনার ইউরোপ-মিশনের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলুন।

হাত থেকে কাঁটা চামচ নামিয়ে কয়েকমুহূর্ত ভাবতে সময় নিলেন হুভার। আমার দিকে তাকালেন। তারপর আর্থারের দিকে। বললেন, এই মুহূর্তে ইওরোপের কি

মর্মান্তিক অবস্থা আপনারা সকলেই তো জানেন। দুর্ভিক্ষের ভাব দেখা দিয়েছে। নিদারুণ সংকট। দেরী করার আর সময় নেই। আমি ওয়াশিংটনে খবর পাঠিয়েছি যত শীঘ্র যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। ওয়াশিংটন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব—ইওরোপকে এই সংকট থেকে মুক্ত করা—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারি না। একটু থেমে নানান পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যুদ্ধ-পরবর্তী সারা ইওরোপের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।—তাই সাহায্য নিয়ে চলেছি। সবরকম সাহায্য। এর পেছন কোন রাজনীতি নেই। মানবতার খাতিরেই আমাদের এই অভিযান। অভিযানই বলতে পারেন আপনারা। আমাকে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই শুনে খুশী হচ্ছেন।

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম।

আর্থার বললেন, কবে বেরুবেন সে ব্যাপারে কিছু ঠিক হয়েছে কি?

—ঠিক বেঠিকের কি? ওয়াশিংটনের সম্মতি পেলেই বেরিয়ে পড়বো। তবে এমনিতে তো কর্তাদের টনক নড়ে না, চাপ সৃষ্টি করতে হয়, জনমত তৈরী করতে হয়। তবেই সম্মতি দিতে দেরী করবে না। সেটা করার দায়িত্ব তো আপনাদের।

বলে ফের আমার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন। আমি ফের ঘাড় নুইয়ে সম্মতি জানালাম।

বললেন, ফ্রান্সে কোটি কোটি মানুষ অভাবে দিশেহারা হয়ে রয়েছে। ফ্রান্স এখন জার্মানীর দখলে। হল্যাণ্ড বেলজিয়াম ডেনমার্ক নরওয়ে সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে দেখা দিতে শুরু করেছে। দরকার এখন সাহায্যের। খাদ্য দিয়ে বস্ত্র দিয়ে সাহায্য। একমাত্র সাহায্য দিয়েই পারি আমরা ইওরোপের দৈন্যদশা দূর করতে।

ঘর চুপ। অটুট নিস্তব্ধতা। আমি বললাম, অবস্থা সত্যিই খারাপ। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের চেয়ে আরো বিশ্রী। ফ্রান্স সহ আরো অনেক দেশই জার্মানীর কবলে। এ অবস্থায় সাহায্য বণ্টনের সময় আমাদের নজর রাখতে হবে, যেন সেটা আবার নাৎসী বাহিনীর হাতে গিয়ে না পড়ে।

নড়েচড়ে বসলো সবাই। হুভার ভ্রূ কোঁচকালেন। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন সবার মুখের ওপর। তারপর স্থির করলেন আমার দিকে।

বললেন, দলমত নির্বিশেষে আমাদের এই সাহায্য মিশন। একথা আমি আগেও বলেছি। হেগ চুক্তির ভিত্তিতে আমেরিকান রেড ক্রশ সোসাইটির সহায়তার আবেদন করে আমি দরখাস্ত করেছি। চুক্তির সাতাশ নম্বর ধারার তেতাল্লিশতম বিভাগে আছে, যে কোন দেশ যে কোন দেশকে সাহায্য এবং দয়ার সংকল্প নিয়ে সংকটের সময় তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সংকটটাই এখানে বড় কথা। এবং সাহায্য।

আমার মনে হয়, মানবতার স্বার্থে ব্যাপারটাকে আমরা সহজেই মেনে নিতে পারি।

বললাম, এতোটুকু বিরোধিতা আমি করছি না। একটাই আমার কথা। সাহায্য যেন উপযুক্ত হাতে যায়, যেন নাৎসী বাহিনীর কুক্ষিগত না হয়ে পড়ে।

আবারও নতুন করে নড়ে চড়ে বসলো সবাই।

হুভার বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিঃ চ্যাপলিন, এরকম কাজ আমরা আগেও করেছি।

এগারো জোড়া চোখ এখন আমার দিকে। সবাই লক্ষ্য করছে আমাকে। একজন অর্থপূর্ণ ভাবে হাসলো। বললো, আমাদের উদ্বেগের কারণ নেই। প্রেসিডেণ্ট সব কিছু সুস্থ ভাবেই সম্পন্ন করবেন।

আর্থার বললেন, ভারী সৎ প্রচেষ্টা। আমাদের সকলের একবাক্যে সমর্থন করা উচিত।

বললাম, সমর্থনে একটুও দ্বিধা নেই আমার। শুধু একটাই শর্ত। সাহায্যের আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন ইহুদীদের হাত দিয়ে হয়। তবেই এর সুষ্ঠু বিলি বণ্টন সম্ভব।

হুভার বললেন, আমি দুঃখিত মিঃ চ্যাপলিন। সেটা হয়তো সম্ভব হবে না।

অবাক লাগে আজকাল। মাঝে মাঝেই দেখি ফিফথ এভিনিউর এধারে ওধারে হিটলারের সমর্থনে সভা হয়। ছোট টুলের ওপর দাঁড়িয়ে হিটলারের গুণকীর্তি জাহির করে তরতাজা যুবকের দল।—শিল্প যুগের গভীর তাৎপর্যময় দর্শনের সার সংকলন করেছেন হিটলার। এককথায় অনবদ্য। এতে ইহুদীদের কোন ভূমিকা নেই। ইহুদীদের স্থান নেই এই পৃথিবীতে।

এক মহিলা বললেন, এ আবার কি ধরনের কথা? এটা আমেরিকা। তুমি বাছা কথা বলছো এমন যেন এটাও জার্মানী।

ছেলেটি বললো, জানি আমি এটা আমেরিকা। জেনেশুনেই বলছি। আমি নিজেও আমেরিকার নাগরিক।

—আমিও তো তাই। মহিলা বললেন, আমি ইহুদী। স্থান হবে না পৃথিবীতে তবে আমরা যাবো কোথায়? ছেলে হলে এখুনি এক চড়ে তোমার দাঁত কটা উড়িয়ে দিতাম।

দু একজন সমর্থন করলো মহিলাকে। বাকীরা নীরব। পুলিস এগিয়ে এসে মহিলাকে শান্ত করলো। সরে এলাম আমি। অবাক লাগছে। পারছি না যা শুনলাম বিশ্বাস করতে।

আর একদিন। একজনের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। সেখানে এক ফরাসী ছোকরা, পিয়ের লাভালের জামাই, সে কী পীড়াপীড়ি আমাকে নিয়ে। গ্রেট ডিক্টেটর দেখেছে। এখন মতামত চায় আমার। কি দেবো নতুন করে মতামত! বললো, আপনি কি

বলেন যা যে ভাবে বলেছেন আপনি সেটাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে ?

বললাম, সেটা আপনার মর্জি। আমি আসলে মজার একটা ছবি করেছি।

শান্ত ভাবেই বললাম। জানিনা তো নাৎসী শিবিরের কথা, বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা নেই। অত্যাচার দেখিনি স্বচক্ষে। কী নিষ্ঠুর কী নির্দয়! তাহলে আর অতো শান্ত ভাবে জবাব দিতাম না। আসরে সেদিন প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো অতিথি। চারজন চারজন করে বসেছি এক এক টেবিলে। সে ছোকরাও এসে আমাদের টেবিলেই ঠাঁই নিলো। ফের সেই টানা পোড়েন। কেবল আমাকে দিয়ে রাজনীতির কথা বলিয়ে নিতে চায়। বলবো কেন আমি? বললাম, রাজনীতির চাইতে ভালো খাবারে আমার আগ্রহ বেশি। হঠাৎ শুনি পাশের টেবিলে দুই মহিলার ভীষণ ঝগড়া। চুলোচুলি লাগে প্রায়। উঠে দাঁড়িয়েছে চেয়ার ছেড়ে। সেখানেও বিষয় নাৎসী। একজন আরেকজনকে চিৎকার করে বললো, খবরদার বলে দিচ্ছি, এসব কথা ভুলেও আমাকে কখনো বলবি না। তুই নাৎসী। তুই হিটলারের দলে নাম লিখিয়েছিস।

এক ছোকরা আমাকে বললো, আপনি এতো নাৎসী বিরোধী কেন?

বললাম, নাৎসীরা যেহেতু জনগণ বিরোধী, তাই।

—আপনি ইহুদী তাই না?

—নাৎসী বিরোধী হতে গেলে ইহুদী হবার দরকার পড়ে না। মানুষ হলেই যথেষ্ট।

এর কদিন পরে ওয়াশিংটনে এক সভায় আমার ভাষণ দেবার কথা। ছবির শেষ অংশের সেই বক্তৃতাটা পড়বো, বেতারে প্রচারিত হবে। একটু আগেই ঘুরে এসেছি রুজভেল্টের কাছ থেকে। ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমায়। ছবি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। হোয়াইট হাউসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ছবির একটা প্রিণ্ট। দেখেছেন। তারপর আমায় তলব। গেলাম। সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, বসুন। আপনার ছবি আর্জেন্টিনায় আমাদের বড্ড মুশকিলে ফেলেছে। ছবির ব্যাপারে এই একটি মাত্র কথা।

পরে শুনে বলেছিলো এক বন্ধু, তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা করেছেন মাত্র, আলিঙ্গন তো করেন নি। দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক।

সে যাই হোক, প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো বসে ছিলাম রাষ্ট্রপতির মুখোমুখি। পানীয়ের দেদার ব্যবস্থা। বারে বারে গেলাস ভরে দিয়ে যায়। আমিও শেষ করে ফেলি চটপট। বেরুলাম যখন পা আমার রীতিমতো টলছে। তখন মনে পড়ে গেলো—এই যাঃ, দশটায় তো ওয়াশিংটন হলে আমার ভাষণ পড়ে শোনাতে হবে। চটপট হোটেলে ফিরে স্নান করে কড়া করে কফি খেয়ে তবে খানিকটা ধাতস্থ হওয়া গেলো। বেতারে প্রচার হবে। টালমাটাল হলে তো চলবে না।

তখনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নি আমেরিকা। হল লোকে লোকারণ্য। নাৎসী সমর্থক অনেকেই এসেছে আমাকে বেকায়দায় ফেলতে। আগে তো আর বুঝি নি। শুরু হয়েছে ভাষণ পাঠ তো অমনি কাশির খক্কর খক্কর শব্দ। রীতিমতো জোরে জোরে। একে খানিক আগের সেই টলোমলো অবস্থা, তার ওপর এতোগুলো মানুষের বেকায়দায় ফেলার ফন্দী। ঘাবড়ে টাবড়ে আমি তো অস্থির। গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভ লেগে যায় টাগড়ায়। স্বর আর মোটে বেরোয় না। ছ মিনিটের বক্তৃতা। তিন মিনিটের মতো একটানা কোনক্রমে বলে তারপর বললাম, এক গ্লাস জল দিন, নইলে আমি আর পড়তে পারছি না। ছুটলো অমনি কর্তাব্যক্তিরা। দুঃখের বিষয়, হলের এমাথা থেকে ওমাথা কোথাও জলের চিহ্নমাত্র নেই। তখন বাইরে থেকে এনে আমাকে দিলো। সর্ব সাকুল্যে নষ্ট হলো মোট দু মিনিট সময়। এতোক্ষণ ঠায় চুপ করে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। শান্ত হয়ে রেডিওর সামনে কান পেতে রইলেন লাখে লাখে মানুষ। কাগজের গেলাসে আনা জল। তাই ঢক ঢক করে খেয়ে তবে বাকীটা শেষ করলাম।

২৬

অনিবার্য হয়ে উঠেছে পলেট আর আমার মধ্যে বিচ্ছেদ। এমন নয় যে এই প্রথম একথা জানতে পারলাম। জানি অনেক আগে থেকেই—দি গ্রেট ডিক্টেটর ছবির শুরু হবারও আগে। এবার সিদ্ধান্ত নেবার পালা। পলেট এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় প্যারামাউন্ট কোম্পানীর নতুন কি একটা ছবিতে কাজ করতে গেছে। আমি নিউ ইয়র্কে আরো কটা দিন থেকে গেলাম। একদিন আমার খানসামা টেলিফোন করে বললো, নাকি গিয়েছিলো একদিন বেভারলি হিলসের বাড়িতে, থাকে নি। জিনিসপত্র গুছিয়ে অমনি কিছুক্ষণের মধ্যেই চম্পট। ফিরে এলাম বাড়িতে, খোঁজ নিয়ে শুনি, গেছে মেক্সিকো, সেখান থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করবে। বড় একা আবার। সেই নির্জনতা, সেই দুঃখ। এতোবড় বাড়িটা যেন খা খা করে। স্বাভাবিক। আট বছরের যৌথ জীবন। প্রতিটি ঘরে প্রতিটি অলিন্দে ছড়িয়ে আছে তার ছাপ। দুঃখবোধ তো জাগবেই।

ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে গ্রেট ডিক্টেটর। সবার মুখে মুখে ফেরে ছবির কথা। তবে বিরুদ্ধ মতবাদও আছে। তলে তলে তাই নিয়ে জমে উঠছে বিরোধের কালো ধোঁয়া, সেটা আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারি নি। টের পেলাম বাড়ি ফিরে আসার পর যখন প্রেস সাংবাদিকদের বৈঠক ডাকলাম বাড়িতে, তখন। কুড়ি জনের মতো সাংবাদিক হাজির। সবাই বসে আছে চুপচাপ। আমি যেতে যেন আরো থম হয়ে গেলো পরিবেশ। কি খাবে জিজ্ঞেস করলাম। বললো, কিচ্ছুনা। এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা।

কথাও বলছে না সবাই। মুখপাত্র হিসেবে এক ছোকরা। ভারী চতুর চটপটে। বললো, বলুন কেন আমাদের ডেকেছেন ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কেন আবার—ছবির একটু প্রচার চাই। একটু ভালো করে লেখেন আপনার সে জন্যেই তলব।

প্রসঙ্গতঃ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কথা বললাম। রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন ছবির জন্য আর্জেন্টিনায় ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে সেটাও জানালাম। উদ্দেশ্য যাতে এগুলোও তাদের লেখায় স্থান পায়। তারা চুপ। কোন বিকার নেই। তখন পরিহাস ছলে বললাম, কি মনে হচ্ছে আপনাদের, ব্যাপার স্যাপার খুব সুবিধের নয়, তাই না ?

বললো, তা নয়, সেটা নিয়ে আমরা কিছু বলতে চাই না। লোকজনের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কম। আপনি চলে গেলেন ওয়াশিংটন, আমাদের একবার জানালেন না। এটা আপনি ভালো করেন নি।

করি নি ইচ্ছে করেই। সুযোগ পেলেই কাগজে ওরা যা তা লেখে আমার নামে। নিউ ইয়র্ক গেছি, যাবার আগে ওদের জানাই নি—তাহলে ছবি নিউ ইয়র্কে মুক্তি পাওয়ার আগে ওরা সাত তক্কা এমন লিখতো, দর্শক ভয় পেতো ছবি দেখতে আসতে। আর কিছু নয়, ছবিতে আমার নিজস্ব কুড়ি লাখ ডলার খরচ হয়েছে এটা ঘটনা। কারুর কলমের খোঁচায় অতোগুলো টাকা রসাতলে যাবে এটা আমার কাম্য নয়। তা সে সব কথা তো আর মুখের ওপর বলা যায় না। বললাম, জানাই নি আসলে আমেরিকায় তো নাৎসী বাহিনীর সমর্থকের অভাব নেই, ছবি সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু প্রকাশ হলে তারা ঝামেলা করবে। তাই সকলের অজ্ঞাতেই চলে যেতে বাধ্য হয়েছি। এটাতে যেন তারা দোষ না ধরেন।

ধরলো। আসলে ধরবে দোষ, সেই মন নিয়েই এসেছে। কোন সাধ্যসাধনাতেই কিছু হবার নয়। লিখলো খুব কড়া ভাষায় যাচ্ছেতাই কথা। গালাগালির মাত্রা একটু একটু করে বাড়তে লাগলো। সে ছবির গল্প নিয়ে, তার বক্তব্য নিয়ে, সর্বশেষে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে। পলেট আর আমাকে জড়িয়ে যা নয় তাই গল্প ফাঁদলো। তাতে অবিশ্যি লাভ বিশেষ হলো না। ছবি চলতে লাগলো হু হু বেগে। ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন ইতিহাস বচনা করলো।

•

আমেরিকা এখনও যুদ্ধের মধ্যে ঢোকে নি। ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। রুজভেল্ট আর হিটলারের মধ্যে। ভালো নয় দিনকাল। আমেরিকার প্রতিটি গণ প্রতিষ্ঠানে হিটলারের লোক ঢুকে পড়েছে। অত্যন্ত গোপনে। জানে না কেউ। তাদের মতই সর্ব স্তরে প্রাধান্য পায়।

হঠাৎই খবর পাওয়া গেলো জাপান নাকি পার্ল বন্দর আক্রমণ করেছে। এতো আকস্মিক এই সংবাদ—আমাদের কল্পনার বাইরে—আমরা নিথর, মূক। আমেরিকার তরফেও প্রতিরোধের যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হলো। বিস্তর সৈন্য পাঠানো হলো বাইরে। এদিকে রাশিয়া তখন বেদম লড়ছে হিটলার বাহিনীর সাথে। মস্কোর বাইরে চলছে রাতদিন লড়াই। দ্বিতীয় ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানালো রাশিয়া। রুজভেল্ট সমর্থন করলেন। নাৎসী বাহিনীর কর্তারা বেগতিক বুঝে ততদিনে পালিয়েছে। যে যার লুকিয়ে পড়েছে গোপন আস্তানায়। প্রকাশ্যে আর বেরোতে সাহস পায় না মোটে। কিন্তু বিষ ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। তাতেই বাধা আসছে নানান কায়দায়। কিছুতে

মানতে দেবে না রাশিয়া আমাদের মিত্রশক্তি, তাদের সাহায্যের জন্য আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। প্রস্তাব উঠলেই বলে, আগে দেখি না কতদূর পারে রাশিয়া, আমরা তারপর যাবো। দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর কিছুতে গঠিত হয় না। দিনের পর দিন কেটে যায়। মাসের পর মাস। রোজ একবার করে কাগজে ছেপে বেরোয় রাশিয়ার মর্মন্তুদ অবস্থার বিবরণ। তখনো লড়াই চলছে সমানে। মস্কোর বাইরে হিটলারের বাহিনী। তাদের ঠেকিয়ে রাখছে রাশিয়ায় বীর সৈনিকেরা।

আমারও যাবতীয় বিপদের সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। সান ফ্রান্সিস্কো থেকে ফোন করলো একদিন রাশিয়া যুদ্ধ ত্রাণ সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা। আমেরিকার নাগরিকদের নিয়েই গঠিত কমিটি। আমাকে বললো, যুদ্ধ ত্রাণের প্রশ্নে সভা হবে তাতে রাশিয়ার প্রাক্তন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত জোসেফ ই. ডেভিসের বক্তৃতা দেবার কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন তিনি, অসুস্থ বলে আসতে পারবেন না। এ অবস্থায় প্রধান বক্তা হিসেবে আমাকেই তারা হাজির রাখতে চান। আমি কি যাবো? বললাম যাবো। এবং যেহেতু পরদিন বিকেলেই সভা, সেদিন রাত্রের ট্রেনে রওনা হলাম।

পৌঁছে ইস্তক নানান কর্মসূচী। সব তারা আগে থেকে ঠিক করে রেখেছেন। বিকেল অব্দি ভাবনার সময়টুকুও মিললো না। কি বলবো? এদিকে প্রধান বক্তা আমি। কর্মকর্তারা বললো আপনাকে একঘণ্টা বলতে হবে। শুনে তো আমি তাজ্জব। বলে কি এরা। খুব বেশি হলে বক্তৃতার দৌড় আমার চার মিনিট। এতো কি বলার আছে যে একঘণ্টা ধরে বলতে পারবো।

সারা হল্ জুড়ে প্রায় দশ হাজার শ্রোতা। বুক আমার কাঁপতে শুরু করেছে। মঞ্চে আছেন সান ফ্রান্সিস্কোর মেয়র রোসি, সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি এবং আরো গণ্যমান্য বিস্তর লোক। মেয়রের উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে শুরু হলো সভা। মাপা কয়েকটি কথা বললেন। অতিরঞ্জন নয়, অতিকথন নয়, ঠিক সভার যা উদ্দেশ্য তাই। বললেন, বলবার সময় একটা কথা যেন আমরা সর্বদা মনে রাখি—রাশিয়ার মানুষেরা আমাদের বন্ধু, তাদের মঙ্গল হোক আমরা চাই। আরো নানান কথা বললেন। কিন্তু রাশিয়ার মানুষের বীরত্ব, তাদের স্থৈর্য, তাদের দুশো ডিভিশন নাৎসী সৈন্যের বিরুদ্ধে মাটি কামড়ে লড়াই—এর কোন উল্লেখ মাত্র করলেন না।

আমি তখন মঞ্চের পেছনে ঘনঘন পায়চারী করছি। রাগ হচ্ছে খুব। কোন কিছু বললেন না মেয়র, শুধু মিত্র আমাদের তাদের মঙ্গল আমরা কামনা করি—এ আবার কি ধরনের বক্তৃতা। ঘটনা তুলে ধরতে হবে সঠিক ভাবে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়বার ব্যাপারে জনগণের কাছে আবেদন জানাতে হবে। মিত্র বলে যদি মানি তবে এগুলোও আমার কাজ। আমাকেই সব বলতে হবে।

নাম ঘোষণা হলো।

মঞ্চের ওপর উঠলাম। পরনে ডিনার খাবার পোশাক। উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হৈ চৈ। ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানালো অযুত কণ্ঠ। সব থিতিয়ে আসতে বললাম, কমরেডস্! সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরোল, অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। দুহাত তুলে সাড়া দিলো সারা হলের মানুষ। একটু একটু করে শান্ত হলো। বললাম, আমি কমরেড বলেই আপনাদের সম্ভাষণ করতে চাই। ফের হাসি, অট্টরোল। শান্ত হতে বললাম, এখানে অনেক রাশিয়ান উপস্থিত আছেন আমি জানি। প্রচণ্ড লড়াই করছে এখন এই মুহূর্তে আপনাদের দেশের মানুষ। প্রাণ দিচ্ছে। আপনাদেরকে কমরেড বলে ডাকা আমার কাছে পরম গৌরবের বিষয়। পারবো কখনো, এরকম আশা করি নি।

নতুন করে একপ্রস্থ হাততালি, অভিনন্দন, সাধুবাদ। ভেতরে ভেতরে আমিও যেন একটা ভীষণ জোয়াবের স্রোত টের পাচ্ছি।

—বললাম, আমি কম্যুনিষ্ট নই। আমি মানুষ, সাধাবণ মানুষ। মানুষের মর্ম আমি বুঝতে পারি। কম্যুনিস্টরাও মানুষ। অন্য কিছু নয়। কম্যুনিস্টের হাত পা কাটা গেলে যেরকম দুঃখ হয়, অন্য যে কোন মানুষের ক্ষেত্রে একইরকম হয়ে থাকে। তারা মরে, আমরাও মরি। কোন কম্যুনিস্টেব মা আমার আপনার আর পাঁচজনের মায়েরই মতো। সন্তান আর ফিবে আসবে না জেনে তিনি যেমন অশ্রুপাত করেন, আমার আপনার মায়েরাও তাই করে থাকেন। এগুলো বুঝবাব জন্য জানবার জন্য কম্যুনিস্ট হতে হয় না। মানুষ হলেই সব বুঝতে পারা যায়। এই মুহূর্তে আমি জানি পৃথিবীর যে কোন দেশের মায়ের মতো বহু রাশিয়ান মা কাঁদছেন, তাদের সন্তানের দুঃখে, সে আর ফিরে আসবে না সেই যন্ত্রণায়।....

টানা চল্লিশ মিনিট সেদিন বলেছিলাম। ভাবতে হয় নি। কথা আপনা আপনি এসে ভিড় করেছে মনের দরজার গোড়ায়। দর্শক হেসেছে, আনন্দে বিহ্বল হয়েছে, শুনেছে প্রতিটি কথা মন দিয়ে—এ আমাব পরম সন্তোষ। প্রসঙ্গক্রমে রুজভেল্টের মনোভাবের কথাও বলেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মতামত—সব। এতে কোন ভুল নেই। যেটা ঘটনা সকলকে অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়েছি।

বলেছিলাম, যুদ্ধ ত্রাণ সংস্থার পক্ষে আজ আমাদের এই সভা। ত্রাণ অর্থাৎ সাহায্য। টাকা দিয়ে সাহায্যে করা যায়। কিন্তু আজ রাশিয়ায় যেটা দরকার তা টাকার চেয়েও অনেক বেশি। শুনেছি আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্তরে বিশলাথ মিত্র সৈন্য মোতায়েন। কিন্তু বহু দূর আয়ার্ল্যাণ্ড। দুশো ডিভিশন নাৎসী বাহিনী আজ রাশিয়ার দোরগোড়ায়। তাদের সঙ্গে একলা লড়াই করছে রাশিয়ার মানুষ।

—এ লড়াইয়ের গভীর তাৎপর্য আছে। এ শুধু নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্ত

লড়াই নয়, আমাদেরও জন্যে লড়াই। এর প্রভাব একদিন না একদিন আমাদের ওপরেও পড়বে। একে ঠেকাবার জন্য স্তালিন যতখানি তৎপর, আমাদের রুজভেল্টও ততখানি। সবাই চাই আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। আসুন এই সভা থেকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার জন্যে তাই আমরা আহ্বান জানাই।

তুমুল অট্টরোল, অজস্র সাধুবাদ। দু হাত তুলে সমর্থন জানালো আমাকে দশ হাজার মানুষ। সাত মিনিট পরে শান্ত হলো। সবার মনের কথাই আমি মুখ ফুটে বলেছি। এ প্রত্যেকের অন্তরের ইচ্ছা। শূন্যে টুপি ছুঁড়ে হাত তুলে উদ্দাম নৃত্য করে সে কী আনন্দ সবার, কী খুশী! অবাক লাগছে। খুব একটা বেশি কি কিছু বলে ফেললাম। হোক বেশি। পরোয়া নেই। দশ হাজার মানুষকে খুশী করতে পেরেছি এটাই সবচেয়ে বড় কথা। বললাম, শুধু হাত তুলে আমাকে অভিনন্দন জানালেই শেষ হবে না আপনাদের দায়িত্ব। দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়তে হবে। তার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে সরকারকে। সরকারকে এই মর্মে টেলিগ্রাম করুন। কাল যেন সকালে উঠে রুজভেল্ট দেখেন দশহাজাব অনুরোধ তার কাছে হাজির হয়েছে। দশ হাজার মানুষ চাইছে দ্বিতীয় ফ্রন্ট। একে অবহেলা করলে চলবে না।

সভা শেষ। ভীষণ একটা উত্তেজনা বোধ কবছি ভেতরে ভেতরে। অস্বস্তিও। খুব একটা বেশি কি বলা হলো! ডাড্‌লি ফিল্ড ম্যালোন, জন গারফিল্ড আর আমি— তিনজন বসেছি নৈশভোজে। গারফিল্ড্ বললেন, আপনার মশায় দারুণ সাহস। কথাটা কানে বাজলো। সত্যি সত্যি সাহস দেখাতে বা নিজেকে বিরাট রাজনীতিক বলে প্রমাণ করার জন্য আমি কিছু বলি নি। বলেছি যা আমায় সাধারণ বুদ্ধিতে কুলোয়, যেরকম আমি বুঝি ভাবি সেইটুকু। মনটা ভীষণ দমে গেল। আর বিষাদ। সারা সন্ধ্যে বিষাদের কালো ছায়া ঘিরে রাখলো আমার প্রতিটি মুহূর্ত। কিছুতে আর পারলাম না স্বাভাবিক হতে। সেদিন রাতের ট্রেনেই ফিরে এলাম বেভারলি হিল্‌সে।

কয়েক হপ্তা পর ফের এক অনুরোধ। টেলিফোনে দিতে হবে বক্তৃতা। ম্যাডিসন স্কোয়ারে সভা। শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা মিলিত ভাবে আয়োজন করেছেন। তাতে যুক্ত আছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের নানান মান্য গণ্য ব্যক্তিবর্গ। আমাকে বললো, আমি কি রাজী? বললাম, নিশ্চয়ই। চোদ্দ মিনিট ধরে ভাষণ দিয়েছিলাম। সেটা পরে কর্তৃপক্ষ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে বিলি করে। হুবহু সেই লেখা আমি তুলে দিচ্ছি।—

ভাষণ

("রাশিয়ার সমরাঙ্গণে স্থির হবে গণতন্ত্র থাকবে না নির্মূল হবে")

বিশাল জনসভা। আমরা আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম যেন ভাষণের সময়

কোনরকম হাততালি বা সাধুবাদ না হয়। প্রতিটি শ্রোতাকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। তারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

চোদ্দ মিনিট ধরে ভাষণ দিয়েছেন চার্লি চ্যাপলিন। সারা আমেরিকার মহান শিল্পী চার্লি। হলিউড থেকে দূরভাষের তারে ভেসে এসেছে তাব কণ্ঠ। আমবা বিমুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে প্রতিটি শব্দ শুনেছি।

২২শে জুলাই ১৯৪২। সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছেন ম্যাডিসন স্কোয়ারের দিকে। তাতে আছে ষাট হাজার শ্রমিক, অগণিত সাধারণ মানুষ, গীর্জার পাদ্রী, ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সদস্য। এককথায় সর্বস্তরের অগণিত শ্রোতা। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ার ডাকে সাড়া দিয়ে চলেছেন তারা ভাষণ শুনতে। যে কোন মূল্যে হিটলারকে আমরা রুখবোই রুখবো।

সর্বমোট দুশো পঞ্চাশটি শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মিলিত ডাকে এই মহান জনসভা। আমাদের উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়ে উইলকি, ফিলিপ মারে, সিডনী হিলম্যান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পাঠিয়েছেন শুভেচ্ছাবাণী। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

নির্মেঘ নীল আকাশ। মিত্র দেশগুলির পতাকা উড়ছিল পত পত করে। একধারে বক্তৃতা মঞ্চ। তাতে বড বড় হরফে লেখা শ্লোগান। বাষ্ট্রপতির সমর্থনে নানান বক্তব্য। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার প্রশ্নে যুক্ত ইস্তাহার। আর সামনে অগণিত জনপ্রবাহ। সে যে কত মানুষ গুণে শেষ করার নয়। পথে যানবাহন চলাচল নিদারুণ ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

উদ্বোধনী সংগীত পরিচালনা করেন লুসি মনরো। নাট্য আন্দোলনের প্রথিতযশা শিল্পী জেন ফ্রোম্যান, আরলিন ফ্রান্সিস এবং আরো অনেকে ছোট একটি নকসা নাটক মঞ্চস্থ করেন। বক্তা হিসেবে মঞ্চে হাজির থাকেন সিনেটের সদস্য জেমস মিড এবং ক্লড্ পেপার, পুরসভার অধ্যক্ষ লা গার্ডিয়া, প্রধান সেনাধ্যক্ষ চার্লস্ পোলেটি, আঞ্চলিক প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ভিটো মার্কান্টোনিও, মাইকেল কুইল এবং জোসেফ কিউরান। জোসেফ সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি।

সিনেটর মিড বলেন, এই যুদ্ধে আমরা তখনই জয়ী হতে পারবো যখন মোকাবিলায় সারা এশিয়া সারা ইউরোপ সারা আফ্রিকার মানুষ এগিয়ে আসবেন। এ হলো মুক্তিকামী মানুষের লড়াই। জীবনপণ লড়াই।

পেপার বলেন, আমাদের প্রচেষ্টায় যারা বাধা দেয়, যারা সংযত হতে বলে, তারা আমাদের শত্রু। এই দেশ ও দশের শত্রু।

জোসেফ কিউরান সদর্পে ঘোষণা করেন, আমাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ আছেন, শক্তিতে আমরা কারোর চেয়ে খাটো নই। জানি আমরা কিভাবে এ লড়াই জিততে হবে। আমাদের উচিত এখুনি এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ফ্রন্ট সংগঠিত করা।

জনতা প্রবল ভাবে হর্ষধ্বনি দিয়ে সভাপতির বক্তব্যকে স্বাগত জানায়। ঘন ঘন ধ্বনি উঠতে থাকে বীর সৈনিকদের সমর্থনে। ব্রিটেন চীন সেভিয়েত ইউনিয়ন—সর্বত্র লড়ছে লড়াকু মানুষ। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ মুহুর্মুহু ধ্বনি দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এর পরেই ভেসে আসে চ্যাপলিনের দূরভাষে বলা বক্তৃতা। জনমণ্ডলী অধীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার কাজে রাষ্ট্রপতিকে সমর্থন করুন

ম্যাডিসন স্কোয়ার। ২২শে জুলাই ১৯৪২

'রাশিয়ার সমরাঙ্গণে স্থির হবে গণতন্ত্র থাকবে না নির্মূল হবে। মিত্র দেশগুলির ভবিষ্যৎ আজ রাশিয়ার কম্যুনিস্টদের হাতে। রাশিয়া যদি পরাজিত হয়, তবে ধনসম্পদ ভরপুর বিশাল এশিয়া মহাদেশের বিপদ অনিবার্য। নাৎসীদের কুক্ষিগত হবে এশিয়া। জাপানের হাত থেকে সারা প্রতীচ্য ছিনিয়ে নেবে। তখন আর হিটলারকে ঠেকাবার মতো শক্তি আমরা কোথায় পাবো?

'এক স্থান থেকে দ্রুত অন্য স্থানে যাতায়াতের অসুবিধে, পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার অসুবিধে, ইস্পাত, তেল, রবার প্রভৃতি নিয়ে নানান সমস্যা, হিটলার এই সব সমস্যাগুলিকে মূলধন করেই এগোতে চাইছে। প্রধান কৌশল হিসেবে চাইছে প্রতিটি দেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে। এক দেশের অসুবিধেয় প্রতিবেশী দেশ যাতে সাহায্য না করে সেই পরিস্থিতি গড়ে তুলতে। এই সুযোগে সে দখল করে নেবে দেশ। আজ রাশিয়া যদি পরাজিত হয় আমাদের সামনেও দুর্দিন।

'কেউ কেউ বলেন যুদ্ধ চলবে কম পক্ষে বিশ বছর। এটা আমার মতে দুরাশা। সঠিক করে আজকের অবস্থায় কেউ বলতে পারে না কতদিনে শেষ হবে এই যুদ্ধ। বিশেষ করে শত্রু যেখানে নৃসংস উন্মাদ।

তবে কিসের জন্য আর অপেক্ষা?

'সাহায্য দিতে হবে রাশিয়াকে। প্রচুর সাহায্য। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার আবেদন রেখেছে রাশিয়া। নিজ দেশগুলির মধ্যে এই মুহূর্তে সহযোগী দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিচ্ছে। কেউ বলছে সম্ভব নয়। কেউ বলছে সম্ভব। অনেক দেশ শক্তিতেও দুর্বল। উপযুক্ত রসদ তাদের নেই সহযোগী ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনে। কারুর কারুর আছেও। যাদের আছে তাদের মনে সংশয়। যদি পরাজয় নেমে আসে! যদি হারে রাশিয়া! অর্থাৎ জয়ী হবার প্রশ্নে সবাই চাইছে নিশ্চিত হতে। আগে নিশ্চিন্তি তারপর ফ্রন্ট।

'কিন্তু সময় সংক্ষেপ। সময় নেই আমাদের হাতে। তাছাড়া নিশ্চিন্তির প্রশ্নও

ওঠে না। যে যুদ্ধে নেই কোন স্থির রণনীতিগত কৌশল, সেখানে নিশ্চিত হওয়া বা না হওয়া দুটোই অনিশ্চিত। এই মুহূর্তে ককেশাস পর্বতের পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে জার্মানীর সৈন্যদল যুদ্ধ করছে। কোন ভাবে তারা যদি ককেশাস অতিক্রম করতে পারে তবে শতকরা পচানব্বই ভাগ তৈল সম্ভার তাদের হস্তগত হবে। এটা একটা চরম মুহূর্ত। লাখো লাখো মানুষের সামনে আজ মরণ বাঁচনের প্রশ্ন। এখন আর মনের সঙ্গে চোখ ঠারার অবকাশ নেই। মন খুলে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। যা ন্যায় যা সত্য বলতে হবে। নিজের কাছে নিজেরই এখন প্রশ্ন। দ্বিধা আর সংশয়ের মধ্যে আমরা ভাসমান। শুনি তো নানান কথা। আয়ার্ল্যাণ্ডে সৈন্য মজুত হচ্ছে। ইয়োরোপে নিরাপদে পৌঁছে গেছে আমাদের পচানব্বই ভাগ সৈন্য, ইংল্যাণ্ডের কুড়ি লাখ সৈন্য আজ আদেশের জন্য প্রস্তুত। তবে আর দেরী কিসের? রাশিয়ার সাহায্যে এগিয়ে যেতে আর কিসের বাধা?

জয় আমাদের সুনিশ্চিত

'ওয়াশিংটন আর লণ্ডনের মান্যবর প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনারা শুনে রাখুন—কি বেঠিক এই নিয়ে তর্ক করার আর অবকাশ নেই। সংশয় দূর করুন ঠিক আমাদের স্থির ভাবে চিন্তা করতে কাজ করতে সুযোগ দিন। ঐক্যবদ্ধ হোন। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

'দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করছে রাশিয়া। মিত্র শক্তি রচনা করেছে এই শক্ত দেয়াল। আমাদেরই বুকে তার পিঠ। লিবিয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলাম আমরা, পারিনি তার পরাজয় রুখতে। ক্রেট এইভাবে আমাদের হাত ছাড়া হয়েছে। ফিলিপাইনস্ বা প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপগুলিও আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। সব গেছে আমাদের। রাশিয়াকে আমরা আর হারাতে রাজী নই। রাশিয়া গণতন্ত্রের শেষ স্মারক। প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

'ককেশাসের লড়াইয়ে যদি রাশিয়ার পরাজয় ঘটে তা হবে সমগ্র মিত্রশক্তির কাছে পরাজয়ের সামিল। এরই মধ্যে শান্তির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে একদল মানুষ। এদের সম্বন্ধে সতর্ক হোন। এখনও পুরোপুরি সোচ্চার নয়, অচিরেই তারা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করবে। শান্তি চাই বলে তুলে দেবে মহা সোরগোল। হিটলারকে বিজয়ীর আসনে বসিয়ে শান্তি। এটাই তাদের মনের গূঢ় বাসনা। বলবে, কি দরকার আর অহেতুক রক্তক্ষরণে। আসুন শান্তির চুক্তি করি আমরা হিটলারের সাথে। তাতে সকলের কল্যাণ হবে।

এরা নাৎসী অনুচর। এদের চিনে রাখুন।

'চিনে রাখুন এদের। এরা নেকড়ে বাঘের মতো ভয়ঙ্কর। আপাততঃ ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে ভেক নিয়েছে। শান্তি চুক্তিকে এরা নানান কৌশলে আমাদের চোখে

স্নেহময় করে তুলবে। মেনে নেবার অর্থই হলো নাৎসী ধ্যান ধারণার বলি হওয়া। আমাদেরও দাসে পরিণত করবে এই অত্যাচারীর দল। আমাদের স্বাধীন সত্তা বলতে কিছুই থাকবে না, মনের ওপরও এরা খবরদারী করতে এগিয়ে আসবে। সারা দুনিয়ার অধীশ্বর হবে গেস্টাপো বাহিনী। আকাশ থেকে করবে আমাদের ওপর খবরদারী। শক্তিকে ওরা সেই ভাবেই সংহত করার প্রয়াসে উঠে পড়ে লেগেছে।

'বিরোধী মত বলতে কিছু আর থাকবে না। বিরুদ্ধাচরণের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তাকে এরা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। মানব সভ্যতাব অগ্রগতি হবে রুদ্ধ। সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ করা হবে। শ্রমিকের অধিকার বলতে কিছু থাকবে না। থাকবে না নাগরিকের অধিকার। সব ধ্বংস করে দেবে এই নৃশংস হায়নার দল। শান্তি চুক্তির স্বপক্ষে সায় দেবার অর্থই হলো হিটলারকে বিজয়ী বলে মেনে নেওয়া, তার যাবৎ কুকীর্তিকে সত্য এবং ন্যায় বলে গ্রহণ করা।

শেষবারের মতো চেষ্টা আমরা করতে পারি

'শান্তিকামীদের সম্পর্কে অতএব খেয়াল রাখুন।

'ভয় ত্যাগ করুন। ন্যায় আমাদের সাথী। যদি চোখ কান খোলা রেখে আমরা পথ চলি তবে পারবে না কেউ আমাদের মনোবল ভাঙতে। মনোবলের জোরেই ইংল্যাণ্ড নিজেকে রক্ষা করেছে। মনের জোরেই আমরা পারবো জয়ী হতে।

'সবরকম চেষ্টা করেছে হিটলার। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নির্লজ্জ প্রচার করতে এতোটুকু কুণ্ঠা বোধ করে নি। ভগবান করুন মিথ্যার জোরে সে যেন ককেশাস অতিক্রম করতে পারে। যেন আগামী শীতের মরসুমে মস্কোতে পৌঁছতে পারে। চেষ্টার তার শেষ নেই। চেষ্টা কি পারি না আমরাও করতে? পারি। কাজ দিন আমাদের। আমাদের হাতে আরো অস্ত্র দিন বোমা দিন, দেখুন আমরা পারি কিনা।

জয় আমাদের হাতের মুঠোয়

'জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এ ব্যাপারে কোন ভুল নেই। আসুন, হাতে মেলাই হাত। আপনি শ্রমিক—হাত দিন ভাই, আপনাকে আমাদের দরকার। আপনি কৃষক—আসুন ভাই, আপনাকে না হলে আমাদের চলবে না। আপনি সৈনিক—আপনাকেও একান্তভাবে চাই। আপনি সাধারণ নাগরিক—এগিয়ে আসুন, হাত রাখুন আমাদের হাতে। সবাই মিলে লড়বো আমরা। শেষ পর্যন্ত চলবে লড়াই। ওয়াশিংটন, লণ্ডন—আপনারও আসুন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ। বিজয়ের জন্য যুদ্ধ।

'হয়তো মনে হবে অসম্ভব। অনেক কিছুই আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। বস্তুতঃ কোন কিছুই অসম্ভব নয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আছে তার স্বাক্ষর। স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে সে সব বিবরণ।'

আছি সুখেই। নিরুত্তাপ নিরুদ্বিগ্ন দিন। শান্ত নদীর মতো স্থির। ঝড়ের পূর্বাভাস যেমন। ঝড়টা হঠাৎই উঠলো।

রবিবার। টেনিস খেলা শেষ। টিম ডুরাণ্ট বললো চলে যাবে এক্ষুনি, জোয়ান ব্যারি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা। সে নাকি পল গেটির বান্ধবী। মেক্সিকো থেকে এসেছে হালফিল। বললো, চলো না তুমি, তোমার কথা বারবার আমার কাছে জিজ্ঞেস করছিলো। গেলাম। পেদিনো রেস্তোরাঁয় দেখা। সঙ্গে আরো একটি মেয়ে। বেশ হাসিখুশী চপল চঞ্চল দুজনেই। সন্ধ্যেটা ভালোই কাটলো।

পরের রবিবার দেখি জোয়ানকে নিয়ে টিম সিধে মাঠে হাজির। রবিবার সাধারণতঃ আমি বাইরে খাই। ছুটি সেদিন বাড়ির কাজের লোকদের। একসাথে ডিনার খাবার কথা বললাম। দুজনেই মহা খুশী। গাড়িতে পৌঁছে দিলাম দুজনকে দুজনের বাসায়। পরদিন সকালেই টেলিফোন। যথারীতি জোয়ান। বললো, দুপুরে কোথায় খাবেন আপনি? আমাকে সঙ্গে নেবেন? বললাম, দুপুরের তো এখনো ঢের দেরী। আপাততঃ সান্তা বারবারায় যাবো। নীলাম হবে। সেখানে হাজির থাকার কথা। যদি তোমার কোন কাজ না থাকে তো চটপট চলে এসো। নীলামের পর খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবা যাবে।

গেলো আমার সাথে সান্তা বারবারায়। একটা জিনিস কিনলাম। খেলাম। ফিরে এলাম লস এঞ্জেলেসে।

অপূর্ব সুন্দরী জোয়ান। বয়েস এই বাইশ। অনবদ্য গড়ন শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের। সেদিন আবার পরেছে গেঞ্জী। দেহের প্রতিটি খাঁজ তাতে স্পষ্ট। যেন ফেরাতে পারি না চোখ। বললো, পল গেটির সঙ্গে নাকি ভীষণ ঝগড়া হয়েছে। নিউ ইয়র্কে পরের দিনই ফিরে যাবে। কি হবে আর থেকে। অবিশ্যি আমি যদি বলি থাকতে, সেটা স্বতন্ত্র। তাহলে আর ফেরার প্রশ্ন ওঠে না।

হ্যাঁ না কোনই জবাব দিলাম না। ধন্দ লাগছে। যেন ভারী আচমকা আগাগোড়া সবকিছু। পরিচিত হওয়া থেকে শুরু করে আজ আমার এই মতামত জানতে চাওয়া অব্দি। বললাম আমার ভরসায় যেন না থাকে। আমি মতলবী মানুষ। হোটেলের দোড়গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে এলাম। হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো।

ফোন করলো ঠিক দুদিন পর। আমি তো অবাক। আছে তাহলে এখনো! এই না চলে যাবার কথা! বললো যায় নি। সন্ধ্যেবেলা আমি কি দেখা করার সময় পাবো? জোর করে খাতির যাকে বলে। তাতেই হলো কাল। প্রায়ই দেখা হয় আমাদের। বেশ কাটছে দিন। মাঝে মাঝে ভারী অস্বস্তিতে ফেলে। কথা নেই বার্তা নেই চলে এলো মাঝ রাত নাগাদ। বলে যাবো না আর, থাকবো। সে এক

উৎকট অবস্থা। অবাক লাগে। আশ্চর্য, এমন করে কেন? কি চায় মেয়ে? বিশেষ করে মাঝ রাত্রে ছুট করে আসার ঐ ব্যাপার। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি। তবু বলতে পারি না মুখ ফুটে। আনন্দে ভরিয়ে রাখে প্রতিটি মুহূর্ত। মন্দ কি। অস্বস্তি মেনেও আনন্দ তো পাচ্ছি!

একদিন কথায় কথায় স্তর সেড্রিক হার্ডউইক আর সিনক্লেয়ার লুই আমাকে 'শ্যাডো অ্যাণ্ড সাবস্ট্যান্স' নাটকের কথা বললেন। নাকি অপূর্ব। মুখ্য চরিত্র ব্রিজেট। সে নাকি আধুনিক যুগের জোয়ান অফ আর্ক। সেড্রিক নাটকে নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন। বললেন, এই কাহিনী নিয়ে দারুণ একটা ছবি হতে পারে। বললাম, বেশ তো একবার পড়ে দেখা যেতে পারে। তখন সেড্রিক আমাকে একখানা বই কিনে পাঠিয়ে দিলেন।

দিন দুই পর। জোয়ান আর আমি একসাথে ডিনার খাচ্ছি। কথায় কথায় নাটকের গল্পটা বললাম। বললো, দেখেছে নাটক। ছবি হলে নায়িকার ভূমিকা যদি কেউ তাকে দেয়, করবে। তেমন একটা গুরুত্ব দিলাম না। বাড়িতে গিয়ে পড়ে শোনালো আমাকে খানিকটা। শুনে আমি তাজ্জব। বেশ পড়ে তো! মায় আয়ার্ল্যাণ্ডের বাচনভঙ্গি অব্দি নিখুঁত। কিছু না বলে অন্য ছুতোয় ক্যামেরায় মুখখানাও একবার দেখে নিলাম। ছবির পক্ষে মানানসই।

আর পায় কে! এ যেন নতুন এক আবিষ্কার আমার, সেই রমকই মনের ভাব। দোষ ত্রুটি তখন সব ভুলে গেছি। বললাম এক কাজ করো, অভিনয়ের জন্য কিছু নিয়ম কানুন শিখতে হয়। ম্যাক্স রেনহার্ৎদের অভিনয় শিক্ষার স্কুলে তোমাকে ভর্তি করে দিই। বললো আপত্তি কিসের। তখন ভর্তি করে দিলাম। এদিকে ছবিটা নিয়ে তখন আমি রীতিমতো ভাবতে শুরু করেছি। চিত্রস্বত্ব কেনার প্রশ্ন আছে। সেড্রিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। পঁচিশ হাজার ডলারে রফা হলো। স্বস্তি। জোয়ানের সঙ্গেও চুক্তি হলো। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সে পাবে সপ্তাহে আড়াইশো ডলার।

সেই যে বলে না ঘোর, মোহাচ্ছন্ন অবস্থা—আমার তখন তাই। যেন স্বপ্নের খেয়া চলছে আকাশে ভেসে। কী যে নেশায় পেয়েছে আমায়! জোয়ানের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ইদানীং হয় না বললেই হয়। শেষ হয় নি এখনও পাঠক্রম। আমি তো নিশ্চিন্ত, শিখছে খুব মন দিয়ে। এদিকে চিত্রনাট্য নিয়ে তখন উঠে পড়ে লেগেছি। বুঁদ হয়ে আছি বলতে গেলে। হঠাৎ কেটে গেলো ঘোর। নানান খবর আসতে শুরু করেছে। মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে রোজ হোটেলে ফেরে জোয়ান, তাই নিয়ে নিত্যি অশান্তি। বাড়িতেও এসে যখন তখন হাজির হয়। কখনও মাঝরাত কখনও রাত প্রায় কাবার। তখন সোফারকে ডেকে আমি তাকে

হোটেলে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করি। একদিন ছোট খাটো দুর্ঘটনাও ঘটলো। চিন্তায় পড়লাম। এখন আর জোয়ান হেঁজিপেঁজি কেউ নয়, চ্যাপলিন স্টুডিওর সে একজন শিল্পী। এই নিয়ে কাগজে লেখালেখি হলে মুশকিল। তদুপরি থানা পুলিসের ঝামেলাও আছে। কিছু রটতে তো আর সময় লাগে না। কাজের লোকেদের বলে দিলাম, ঐ ভাবে এলে যেন খবরদার বাড়িতে না ঢুকতে দেয়। তখন জানলার কাঁচ ভেঙে ভেতরে ঢোকা শুরু করলো। আমি যে কি করবো ভেবে পাই না। স্বপ্ন টপ্ন তখন উবে গেছে। জোয়ান নাম শুনলেই আমি শিউরে উঠি।

খোঁজখবর নিয়ে শুনলাম, নাকি স্কুলেও যায় না দীর্ঘদিন। আমি জিজ্ঞেস করতে বললো, অভিনেতা হবার আমার শখ নেই। আমাকে টাকা দিন। নিউ ইয়র্ক যাবার ভাড়া। মাও যাবে সঙ্গে। মোট পাঁচ হাজার। আমি চুক্তির কাগজ ছিঁড়ে ফেলবো। তখন সানন্দে টাকা দিলাম। পাপ বিদেয় হলো। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

চিত্রনাট্য ততদিনে শেষ। ছবির পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হলাম। খরচ হয়েছে প্রচুর তাতে দুঃখ নেই। তবু স্বস্তি, ঝামেলা তো এড়ানো গেল।

এদিকে সান ফ্রান্সিস্কোতে সেই জনসভার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে, হয়নি এখনো দ্বিতীয় ফ্রন্ট। লড়াই চলছে। কার্নেগী হলে এই ব্যাপারেই জনসভা। আমাকে বললো, বক্তৃতা দিতে। দোটানায় পড়লাম। যাওয়া কি ঠিক? মন বললো, বেঠিক কিসের? শুরু যখন করেছো শেষ তো তোমাকেই করতে হবে। তখন রাজী হলাম।

পরদিন রবিবার। টেনিস মাঠে জ্যাক ওয়ার্নারের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় বললাম নিউইয়র্কে বক্তৃতা দেবার কথা। বললো, যাওয়ার দরকার নেই, বাদ দিন।

বললাম, কেন?

কারণ কিছু ভাঙলো না। শুধু বললো, এটুকুই বলছি, ঘোড়ার মুখের আগাম খবর। যাওয়া বাতিল করুন।

রোখ চেপে গেলো। কেন বাদ? কারণ কি? তবে কি ভয় দেখাতে চায় আমাকে? পরোয়া করি না। যাবোই যাবো। তাছাড়া রাশিয়ার সে ছন্নছাড়া অবস্থাও আর নেই। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে জয়ী হয়েছে রাশিয়া। দ্বিতীয় ফ্রন্ট যে কোন মুহূর্তে গঠন হতে পারে। সারা আমেরিকার বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের সহানুভূতি বলতে গেলে রাশিয়ার দিকে। কিসের ভয় আমার!

গিয়ে দেখি পার্ল বাক, রকওয়েল কেন্ট, অরসন ওয়েলস্ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ হাজির। অরসন আমার ঠিক আগের বক্তা। বললেন, একশোবার বলবো আমি রাশিয়া আমাদের বন্ধু, যুদ্ধ ত্রাণের ব্যাপারে অবিলম্বে আমাদের তৎপর হওয়া প্রয়োজন। একথা

বলতে কোন বিরোধিতাকেই আমি পরোয়া করি না।

ঠিক রান্নায় নুন না দিলে যেমন হয়। বললো কথা, যেন বহু কষ্ট করে, যেন কথার পিঠে কথা সাজিয়ে হিসেব কষে তৈরী। আরো রোখ চেপে গেলো আমার। বলতে হবে আমাকে। যা বলে না কেউ তাই। শুরুতে জনৈক সাংবাদিকের উদ্ধৃতি তুলে ধরলাম। ব্যঙ্গ করেছে আমার বক্তব্য নিয়ে। লিখেছে, আমি যেন বলেছি যুদ্ধ চলুক, আমি ধরবো হাল। বললাম, লজ্জা হওয়া উচিত এই সাংবাদিকের। সত্য কথাটুকুও লিখতে তিনি শেখেন নি। কিংবা মনে হয়, এই যে আপনারা ডাকেন আমাকে, ভালবাসেন—এটা তার ঈর্ষার বিষয়। কৌশলগত প্রশ্নে আমাদের ভিন্ন মত থাকতেই পারে। সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। আসলে দ্বিমত তার দ্বিতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলার প্রশ্নে। এটা তিনি মনে প্রাণে চান না। কিন্তু আমি চাই। সর্বান্তঃকরণে চাই।

কার্নেগী হল্ থেকে বেরিয়ে টিম আমি আর কনস্ট্যান্স কোলিয়ার একসাথে ডিনার খেলাম। কনস্ট্যান্স শুনেছে অ.ম.র বক্তৃতা। দেখি ভীষণ চিন্তান্বিত। বরাবরই বাম মনোভাবাপন্ন কনস্ট্যান্স। ওয়াল্ডর্ফ হোটেলে উঠলাম। ঘন ঘন ফোন করে জোয়ান। অফিসে বলে পাঠালাম এ ফোন আমি ধরবো না। যেন এলে বলে দেয় আমি নেই। টিম বললো,তা হয় না। ধরো। নইলে ছুটে আসবে এখানে। কি না কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে।

আবারও ফোন বাজলো। তুললাম ফোন।—কি খবর কেমন আছো? বললো, ভারী ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একবার দেখতে। আসবো হোটেলে? টিমকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে থেকো। বেসামাল দেখলে অমনি আমাকে সাবধান করবে। এলো জোয়ান। পিয়ের হোটেলে আছে। মালিক পল গেটি। বললো, চলো না একবার দেখে আসবে আমার ঘর। বললাম, সময় নেই। আজকের রাতটুকু আছি। কাল সকালে উঠেই আমি ক্যালিফোর্নিয়া রওনা হবো। বলাবাহুল্য মিথ্যে বলতে বাধ্য হলাম। আধঘণ্টার মতো থেকে বিদায় নিলো।

ডাকে না এখন আর কেউ। ছুটি কাটাবার জন্য বাড়িতে যেতে কেউ আর পীড়াপীড়ি করে না। সব আমার বক্তৃতার ফল আমি জানি।

চিঠি আসে অজস্র। নানান তার ভাষা। নানান অনুরোধ। জেরাল্ড স্মিথ লিখলেন, দ্বিতীয় ফ্রন্টের ব্যাপারে আমার সঙ্গে তিনি একদিন আলোচনা করতে চান। আমার কি সময় হবে? আমি জবাব দিই নি।

রাজনৈতিক আবর্তে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছি। বুঝতে অসুবিধে হয় না। প্রশ্ন করি নিজেরই কাছে—কি চাই আমি। কি আমার উদ্দেশ্য? অভিনেতা হিসেবে

শিখবার তো অনেক কিছুই আছে। কতটুকু শিখলাম এই এতো শত আলাপ আলোচনায়? যদি নাৎসী বিরোধী ছবি না করতাম তাহলেও কি জড়িয়ে পড়তাম এইভাবে? কিংবা জানিনা, হয়তো সবাক ছবির প্রতি চরম বিতৃষ্ণা থেকে এ আমার জীবনের নতুন এক রূপ। হয়তো এতোদিন প্রকাশ হবার সুযোগ পায় নি। তীব্র নাৎসী বিরোধী ঘটনার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটলো।

২৭

বেভারলি হিলসে ফিরে নতুন করে বসলাম 'শ্যাডো এ্যাণ্ড সাবস্ট্যান্স' ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে। অবসন ওয়েলস্ এসে শোনালেন এক অদ্ভুত প্রস্তাব। ছবি করবেন এক সিরিজে পরপর অনেকগুলো, বাস্তব জীবনের নানান ঘটনা, একটা তার মধ্যে ফরাসী দেশের বিখ্যাত খুনী ব্লুবিয়ার্ড ল্যানড্রু কে নিয়ে। আমাকে নামাতে চান নাম ভূমিকায়। আমি কি রাজী ?

প্রস্তাবে অভিনবত্ব আছে। একঘেয়েমি থেকে বলা যেতে পারে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি। কৌতুক নয়, গুরুগম্ভীর অভিনয়। তাছাড়া পরিচালনার ঝামেলা পোয়াবার প্রয়োজন হবে না। বললাম, রাজী। তবে চিত্রনাট্যে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে চাই।

বললেন, কোথায় সে সব ? লেখাই হয় নি কিছু। বিচারের নথিপত্র এখন যোগাড় করা হচ্ছে। এমন তো কিছু ঝকমারি কাজ নয়। পর পর সাজিয়ে দিলেই চিত্রনাট্য হয়ে যাবে। আপনার সাহায্যও দরকার হবে।

হতাশ হলাম। ফের সেই লেখা! তাহলে ধরে নিন আমি রাজী নই। অতো সব ঝামেলা আমি পোহাতে পারবো না।

ব্যাপারটা সেখানেই তখনকার মতো শেষ। ফের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় এলো। তাইতো এই ঘটনাটা নিয়ে আমিও তো পারি ছবি করতে। কৌতুক ঘেঁষা। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলসকে ফোন। বললাম, আপনার ল্যানড্রু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজেই একটা ছবি করতে চাই। ল্যানড্রুর সঙ্গে সে ছবির বাস্তবে কোন যোগাযোগ থাকবে না। শুধু ভাবনাটা আপনার কাছ থেকে পেয়েছি তাই পারিশ্রমিক হিসেবে আপনাকে পাঁচ হাজার ডলার দেবো। দয়া করে আপনি কি গ্রহণ করবেন ?

কি যেন ভাবতে শুরু করলেন টেলিফোনের ওধারে।

বললাম, দেখুন-ল্যানড্রুর এই যে ঘটনা এটা তো কোন লিখিত কাহিনী নয়। এটা বাস্তব। একে ব্যবহার করার অধিকার সকলেরই আছে। টাকাটা দিতে চাইছি কেননা আপনি আমাকে চিন্তা করতে সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতাও বলতে পারেন।

ভাবলেন আরো খানিকক্ষণ। বললেন, তার ম্যানেজারের সঙ্গে যেন এ ব্যাপারে কথা বলি। হলো কথা। পাঁচ হাজার ডলারেই রাজি। চুক্তি হলো। এ ব্যাপারে তার আর কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না। শুধু একটা শর্ত ওয়েলসের। ছবির পরিচয় লিপি

দেখাবার সময় যেন একটা লাইন যোগ করে দিই—কাহিনী : অরসন ওয়েলসের প্রস্তাব অনুসারে। কোন আপত্তি নেই। তাছাড়া এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপত্তি করার মতো অবস্থাও নয় তখন আমার। ভীষণ আগ্রহে তখন আমি বলতে গেলে কত তাড়াতাড়ি চিত্রনাট্য রচনার কাজ শুরু করবো তাই নিয়ে ভাবছি। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করলে হয়তো এর কৌশলগত দিকটাও আমার নজরে পড়তো। সেক্ষেত্রে আমি অরাজী হতাম।

'শ্যাডো এ্যাণ্ড সাবস্ট্যান্স' গেলো সাময়িক নির্বাসনে। শুরু হলো 'মঁসিয় ভার্দু' চিত্রনাট্য রচনার কাজ। তিনমাস একটানা ভাবতে হয়েছে আমাকে। তি-ন মাস। এরই মধ্যে জোয়ান ব্যারি একবার এসে হাজির। আমি তখন স্টুডিওতে। খানসামা জানালো টেলিফোন করে। আমি বললাম খবরদার কিছুতেই যেন বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে না পারে। আমি কোথায় আছি তাও যেন টের না পায়।

তাতে কি আর কাজ হয়! মরীয়া তখন জোয়ান। ঘাপটি মেরে বসে রইলো তক্কে তক্কে। আমি ফিরতেই জানলা ভেঙে ঢুকে সে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। বলে টাকা দাও, টাকা চাই। নইলে জীবন বরবাদ করে দেবো তোমার। টাকা না নিয়ে এক পা এখান থেকে নড়বো না।

এর পেছনে যে কত ফন্দি কত মতলব কত চক্রান্ত সে তো তখন বুঝিনি। ঝামেলা এড়াবার তাগিদে পুলিসে খবর দিলাম। আগেই দেওয়া উচিত ছিলো আমার, আরো আগে। দিই নি, কাগজে এই নিয়ে সোরগোল তুলবে বলে। তাদের হাতে তুলে দেবো আমার মারণাস্ত্র এই ভয়ে। তা পুলিস সবরকম সহযোগিতাই করলো। নিয়ে গেলো থানায়। আটক রাখলো। তখনও অভিযোগ কিছু দায়ের করেনি। আমাকে বললো, আমি যদি নিউ ইয়র্কে ফেরার ভাড়া দিয়ে দিই তাহলে আর এই নিয়ে জল ঘোলা করবে না, অনধিকার প্রবেশের অভিযোগও আনবে না। তবে ভবিষ্যতে তারা নজর রাখবে। বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখলে তুলে নিয়ে যাবে থানায়। অভিযোগ আনবে। দেবো কি আমি ভাড়া?

সানন্দে ভাড়ার টাকা গুণে সে যাত্রা ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পেলাম।

এ আমার দুঃখের দিনের কথা, দুর্দশার কাহিনী। বিচিত্র এই জগৎ। যত দেখি তত অবাক লাগে আশ্চর্য হই। দুঃখ আর সুখের এতো সামঞ্জস্য! যেমন রাত আর দিন। রাতের গর্ভে মিলিয়ে যায় কালো অন্ধকার। একটু একটু করে দিনের আলো ফুটে ওঠে। তখন স্পষ্ট সব কিছু। সুন্দর সব। যেমন সুন্দর আমার সুখের মুহূর্ত গুলি। তারই ঘটনা বলি এবার।

ছ তিন মাস পরের কথা। হলিউড থেকে মীনা ওয়ালিসের ফোন পেলাম। ফিল্মী ছনিয়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগান দেবার কাজ করে। বললো, নিউ ইয়র্ক থেকে সন্থ একটি মেয়ে এসেছে। আমার শ্যাডো এ্যাণ্ড সাবস্ট্যান্স ছবির জীবন্ত ব্রিজিট। বলেছিলাম ভালো একটি মেয়ে যোগাড় করে দেবার কথা। বললো হুবহু আপনার বর্ণনার মতো। পাঠিয়ে দেবো?

সত্যি বলতে কি মঁসিয় ভাত্র্‌র চিত্রনাট্য নিয়ে তখন আমার নাজেহাল অবস্থা। ভারী কঠিন গল্প। তাকে সাজাতে হবে, রূপ দিতে হবে। অনেক কিছু বলতে চাই আমি ছবির ভাষায়। মাঝে মাঝে ভাবি বাদ দিই, বরং আগের ছবিটা নিয়েই ভাবনা চিন্তা করি। তা নায়িকা যখন একটি যোগাড় হয়েছে, দেখাই যাক। বললাম কে সে, কি তার পরিচয়? বললো মেয়েটির নাম উনা, বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ওনীলের মেয়ে। পরিচয় নেই আমার। দেখেছি নাটক। মন্দ নয়। চলতে পারে মেয়ে। কিন্তু অভিনয় করতে পারে কি?

বললো, তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবে পারে। করেছে ছ একটা নাটকে ছোটখাটো চরিত্র। আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। বরং এক কাজ করুন না, আমার এখানে চলে আসুন। বলবো না ওকে কিছু আগে থেকে। আপনি দেখবেন। বাজিয়ে নেবেন।

তাই ভালো। গেলাম আমি আর টিম ডুরাণ্ট। ঢুকেই দেখি বাইরের ঘরে বসে আছে একটি মেয়ে। মীনা ভেতরে। আসবে একটু পরে। নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম, চিনি আমি তোমাকে, তোমার নাম উনা। কি তাই না? তখন হাসলো। অপূর্ব অনবদ্য সেই হাসি। যেন ঝলমলিয়ে উঠলো সারা ঘর। আমি স্তম্ভিত। আর নিটোল এক কমনীয়তা। তেমনই গাম্ভীর্য। বেশ লাগছে মেয়েটিকে। তখন এটা ওটা নানান গল্প জুড়ে বসলাম।

একটু পরে এলো মীনা। নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলো। ডিনার খেতে বসলাম। আর কেউ নয়, মোটে চারজন আমরা। ভারী নিরিবিলি। খেতে খেতে বললাম শ্যাডো এ্যাণ্ড সাবস্ট্যান্সের গল্প। শুনলো উনা মন দিয়ে। মীনা বললো, ওর বয়েস মাত্র সতেরো। ধাক্কা খেলাম। ছবির নায়িকা কম বয়সী হবে এটা ঘটনা, কিন্তু তাই বলে সতেরো! পারবে কি করে এতো জটিল চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে? বয়েসের অভিজ্ঞতাও যে একটা বড় ব্যাপার। মোটমাট অসম্ভব। এ মেয়েকে দিয়ে ছবির নায়িকার ভূমিকা হবে না।

মোটামুটি মন থেকে ঝেড়েই ফেলেছি তখন তাকে। মাঝখানে কাটলো কটা দিন। আবারও ফোন করলো মীনা—কি ব্যাপার আপনি যে আপনার মতামত জানালেন না? এদিকে ফক্স ফিল্ম কোম্পানী তো ওকে নায়িকা হিসাবে চুক্তি করাবার জন্যে উঠে

পড়ে লেগেছে। বললাম, তবে আর দেরী নয়। ওকে পাঠিয়ে দাও। চুক্তি করলে আমিই করবো।

জানিনা তখন এ আমার সারা জীবনের চুক্তি। আমার সুখের প্রতিশ্রুতি, আমার কুড়ি বছরের সুন্দর সুখী অপরূপ জীবনের ইঙ্গিতের সূচনা। তার শুরু এইভাবেই।

আমি মুগ্ধ উনার আচরণে। যত দেখি অবাক হয়ে যাই। সহ্যের যেন প্রতিমূর্তি। গভীর অনুভূতি বোধ। নিজের সিদ্ধান্ত কখনো চাপিয়ে দেয় না, বিপরীতে যে মানুষটি তারও কি যুক্তি আছে কি উদ্দেশ্য—সেটা ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করে। আরো যে কত গুণ সে আমি বলে শেষ করতে পারবো না। প্রেমে পড়লাম। খাদ নেই তাতে এতোটুকু। সতেবো পেবিয়ে আঠেরোতে পা দিয়েছে তখন উনা। কিন্তু বয়েসটা ওর ক্ষেত্রে কোন ব্যাপার নয়। বয়েসের সীমা লঙ্ঘন করেছে অনেক আগেই। গুণ দিয়েছে বয়েসের সব মাপ তুচ্ছ করে। বোঝে অনেক বেশি যা এই বয়েসে বুঝবার কথা নয়। ভুল হয়েছিল আমার প্রথম দর্শনে। ভেবেছিলাম তখনো কিশোরী, বোঝেনা জীবনের গভীর দর্শন। সব মিথ্যে। ঠিক হলো আমরা বিয়ে করবো। তার আগে ছবিটা শেষ হোক।

চিত্রনাট্যেব প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ। এবার শুরু হবে আসল কাজ। সে আর সম্ভব হলো না। নতুন এক গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। শুধু এইটুকু বলি, ছবি তোলা হলে আশ্চর্য এক নায়িকার সাক্ষাৎ পেতেন দর্শক, এমন বিরল গুণপনার স্বাক্ষর আমি খুব কমই দেখেছি। বলা বাহুল্য নায়িকার ভূমিকায় উনাকেই আমি নামাতাম।

ফের হানা দিয়েছে জোয়ান। এবারের কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। খানসামাকে বললো, আমি তিন মাসের অন্তঃস্বত্তা, আমার টাকা নেই পয়সা নেই, যা হোক ব্যবস্থা করুন। ফোনে কথা। বললো না একবারও পেটে সন্তান আসার জন্য বা দুরবস্থার জন্য কে দায়ী। আমাকে জানাতে আমি গ্রাহ্য করলাম না। দরকার কি আমার। কার বাচ্চা পেটে নিয়ে ঘুবছো তুমি সে তুমিই বুঝবে। আমি কেন অহেতুক নিজেকে জড়াতে যাই। খানসামাকে বললাম, ওকে বলে দাও, যদি বাড়ির ত্রিসীমানায় আসে বা কোন অনর্থ বাধাবার চেষ্টা করে আমি ছাড়বো না এবার। তাতে আমার নামে যা রটে রটুক। আমি স্রেফ পুলিসে খবর দেবো। দেখি পরের দিনই বেশ হাসি হাসি ভাব, আমার বাড়ির সামনে দিব্যি ঘোরাঘুরি করছে। নির্ঘাৎ মতলব আছে কিছু। আমি পাত্তা দিলাম না। পরে শুনি, গিয়েছিলো নাকি এক কাগজের অফিসে, জনৈক মহিলা সাংবাদিক তাকে বলে দিয়েছে এইভাবে আমার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে, ঢুকবার চেষ্টা করতে। গ্রেপ্তার হলে খবর ছাপতে বরং তার সুবিধে হবে। তখন জেকে

বললাম, তুমি এই মুহূর্তে চলে যাও, নইলে পুলিস ডাকবো আমি। শুনে হাসলো শুধু। সহ্যের সীমা আছে প্রত্যেকের। খানসামাকে বললাম, যা হবার হোক, ছড়াক আমার নামে কলঙ্ক, তুমি পুলিসে খবর দাও।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। প্রায় সব কাগজেরই আমি শিরোনাম। বড় বড় হরফে ছাপা খবর—নাকি অবৈধ সন্তানের গর্ভধারিণীকে আমি পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছি, তাকে অসীম লাঞ্ছনা দিয়েছি। এক সপ্তাহ পরে সন্তানের পিতৃত্বের প্রশ্নে আমার নামে মামলা দায়ের করা হলো। আমি তখন আমার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা লয়েড রাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। খুলে বললাম তাকে সব কথা। মেয়েটির সাথে দু বছর যে আমার কোন সংশ্রব নেই সে কথাও জানালাম।

বললেন ছবির কাজ সাময়িক স্থগিত রাখুন। উনা নিউইয়র্কে চলে যাক। বাকী যা করার আমি করবো। কেন যাবে উনা? কি অপরাধ তার। এটা মেনে নিতে পারলাম না। কোথায় কে বললো না বললো, তাতে সত্যের এতোটুকু নামগন্ধ নেই আর তারই ভিত্তিতে আমরা সেই ভাবে ঘুরবো ফিরবো কাজ করবো। এ তো হতে পারে না। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারটা যত শত্বর সম্ভব চুকিয়ে ফেলারই ইচ্ছে আমাদের দুজনের। হ্যারি ক্রকারকে বললাম ব্যবস্থা করতে। করলো সব। বর্তমানে হার্স্টের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী। যোগাযোগ বিস্তর। ছবি তুলবে বিয়ের। আমি বললাম, তুলতে পারো তবে বেশি নয়। দু তিনখানা। বললো তাতেই রাজী। অমনি ছবি সমেত হার্স্টের কাগজে খবর ছেপে বের করার ব্যবস্থা করবে। লোয়েলা পার্সনকে দিয়ে লেখাবে রিপোর্ট। সেটা একদিক থেকে ভালো। পাঁচজনের পাঁচ রকম গল্প ফাঁদার চেয়ে একজনের সুস্থ সুন্দর লেখার আর কিছু না হোক, অন্ততঃ বাস্তব মূল্য তো আছে।

কার্পেণ্টারিয়ার অফিসে আমাদের বিয়ে হবে, সেরকমই ঠিক। নিরিবিলি গ্রাম। সান্তা বারবারা থেকে পনেরো মাইলের মতো দূর। নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে সান্তা বারবারায়। সকাল আটটা তখন। পথে ঘাটে মানুষ নেই। চলেছি আমরা বিয়ে করতে। নাম খাতায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম হলো কাগজের অফিসে খবর দেওয়া। সেটা করেন রেজিস্ট্রি অফিসের বড়বাবু। হাতের কাছেই টেবিলে ছোট্ট একটা বোতাম। তাতে একবার মাত্র চাপ। খবর পৌঁছে যাবে অফিসে। তো হ্যারি করেছে কি, আমাকে বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখে ঢুকলো আগে উনাকে নিয়ে। নাম খাতায় উঠলো। তখন পাত্রের তলব : কই তাকে নিয়ে আসুন, সে কোথায়?

তখন ভেতরে ঢুকলাম। দেখে তো ছানাবড়া।—বলেন কি, আপনি? সঙ্গে সঙ্গে বোতামের দিকে হাত। হ্যারি খেয়াল রেখেছে। অমনি চেপে ধরলো।—আগে খাতায়

লিখুন, তবে তো খবর। লিখলো খাতায় নাম। সে যেন হাত আর মোটে চলে না। নানারকম ছলছুতো করে দেরী করায়। আর বারবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকায় বোতামের দিকে। রসিদ নিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলাম। খবর তো ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। গাড়ি বোঝাই সাংবাদিক চোখের নিমেষে হাজির। তখন সে যেন এক জীবনমরণ সমস্যা আমাদের। দৌড় দৌড়—গাড়ি নিয়ে বাঁই বাঁই বেগে তখন ছুটতে শুরু করেছি। পেছনে তারা। যেন চোর আর পুলিস। ডাইনে ঘোরাই বাঁয়ে ঘোরাই, চাকা টাল খেতে খেতে সিধে হয়, ফের ডাইনের গলি, বাঁয়ের গলি করে কার্পেন্টারিয়ায় যখন হাজির হলাম, তখন স্বস্তি। নাগাল পায় নি আমাদের। পথ ভুল করে অন্য দিকে চলে গেছে।

দু মাসের জন্য সান্তা বারবারায় বাড়ি ভাড়া নিলাম। সে অদ্ভুত। আশ্চর্য সুন্দর সেই সব দিন। কালে ভদ্রে বেরোই, তা-ও সন্ধ্যে লাগার পর। আসে না কোন বন্ধু বান্ধব, না কোন টেলিফোন, না একটা চিঠি। জানে না যে কেউ। শুধু হ্যারি জানে। সে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে।

বড় নিরিবিলি পরিবেশ। হাঁটতাম হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের ধারে। উনা আর আমি। সে বড় অপূর্ব। উনা দিতো আমার প্রতিটি অবকাশ ভরিয়ে। একঘেঁয়ে লাগতো যখন, মনের গভীরে জমতো অকারণ দুঃখ বোধ—হয় না মাঝে মাঝে এমন! —উনা পড়ে শোনাতো আমাকে 'ট্রিল্‌বির' কাহিনী। হাসতে হাসতে আমার তো দমবন্ধ হবার দাখিল। আর পড়তেও পারে উনা। কখনো ছদ্ম গাম্ভীর্য, কখনো সরসতা, কখনো কৌতুক—যেন ছবির মতো প্রতিটি দৃশ্য আমি দেখতে পেতাম। অপূর্ব। আমি ভুলবো না কখনো সেই সব দিনের স্মৃতি।

লস এঞ্জেলেসে ফিরতে না ফিরতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আমার প্রিয় বন্ধু মার্কি ফোন করে বললেন, নাকি আমার অনুপস্থিতিতে হোমরা চোমরা ব্যক্তিবর্গের এক গোপন সভা ঘটে গেছে, এবং তাতে স্থির হয়েছে আমার ওপর এক হাত নেবে, যেন তেন প্রকারেণ। বললেন, ঝামেলা কিছু দেখলে বিরাট কোন উকিল ঠিক করার দরকার নেই, তাতে ভাল ফল না-ও হতে পারে। যেন সাধারণ হেঁজি পেঁজি কাউকে দাঁড় করাই। তাতে বরং লাভ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তখনও পতন হয় নি। হবো হবো এমন একটা ভাব। কাগজে সরকারকে সমর্থন জানিয়ে রোজ বেরুচ্ছে লেখা। সেই সব কাগজ যাদের চোখে আমি শয়তান, আমি পাপী, আমি পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধী।

পিতৃত্ব নিয়ে সেই যে মামলাটা সেটা নিয়ে এবার উঠে পড়ে লাগা দরকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের আওতায় এটা পড়ে না, এটা দেওয়ানী মামলা। লয়েড রাইট

বললেন, এক কাজ করা যাক—রক্ত পরীক্ষার দাবী তুলি। আপনার রক্ত-গ্রুপের সঙ্গে যদি না মেলে তবে আপনি বেকসুর খালাস। কিছুতেই প্রমাণ হবে না জোআনের গর্ভের সন্তানের আপনি পিতা। মোটামুটি দোনামোনা আছি। হঠাৎ একদিন এসে বললেন, ঠিকঠাক করে এলুম। কথাবার্তা হয়েছে। আপনার সম্মতির অপেক্ষা। পঁচিশ হাজার ডলার পেলে জোআন রক্ত পরীক্ষায় রাজী আছে। সন্তানেরও রক্ত পরীক্ষা হবে। যদি প্রমাণ হয় আপনি পিতা নন, তাহলে মামলা তুলে নেবে জোআন। বলুন কি এখন আপনার মত।

রাজী হবার মতই কথা। কিন্তু মুশকিলও আছে। আমার গ্রুপের সঙ্গে মিলবে এমন কত মানুষই তো আছে। যদি সেরকম একটা বিপর্যয় ঘটে। তখন লয়েড বললেন, সেটা খুব একটা অসুবিধে নয়। এরকম কালেভদ্রে ঘটে থাকে। যদি দেখা যায় সন্তানের দেহে মা এবং অভিযুক্ত পিতা কারুরই রক্ত নেই বা একজনের আছে, সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে সন্তান অপর কারুর ঔরসজাত।

তো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। অমনি শুরু হলো নতুন সরকারের তৎপরতা। বললো, এটা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পড়ে, এ ব্যপারে জুরিদের নিয়ে একটা নিপুণ তদন্ত হোক। এটা নাকি জোআনেরও অভিপ্রায়। সেই ভাবেই ঘটনাটাকে সাজাবার চেষ্টা হচ্ছে। বন্ধুরা বললো, এক কাজ করো, গেইস্‌লারকে নাও। নামডাক খুব। ভালো উকিল। এই জাতীয় মামলাই করে থাকেন। জেতেন। কথা বলো তুমি। তাই বললাম। মার্কির উপদেশে তখন আর ভরসা করতে পারছি না। ভুলই করলাম। জনসমক্ষে প্রমাণ করলাম আমার অপরাধ। বিরাট মাপের তাই দামী উকিল পাকড়াতে হলো। লয়েডই আমার হয়ে যাবতীয় যোগাযোগ করলেন। ঠিক হলো মামলা শুরুর আগে আমি আর গেইসলার দুয়ে মিলে নিভৃতে একদিন গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবো। সেখান থেকেই ঠিক হবে আমাদের পরবর্তী কর্মপদ্ধতি কি হতে পারে।

সরকার আমার বিরুদ্ধে মূল যে অভিযোগ আনছে তা হলো পতিতা বৃত্তি নিরোধ সংক্রান্ত আইনের অবমাননা।

এটা কৌশল, আমি পরেও অনেকবার দেখেছি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নাজেহাল করার এটা একটা প্রচলিত উপায়। বলা বাহুল্য আইনের আস্তরণ মাখিয়ে। একে ব্ল্যাকমেল বলতে পারি। আইনানুগ ভাবে ভয় দেখিয়ে কার্য উদ্ধার। আইনের উপধারায় যেটা আছে তা হলো অন্য কোন রাজ্য থেকে কোন মেয়েকে ভিন্ন রাজ্যে আনা যাবে না, নিছক কামনা চরিতার্থ করার প্রয়াসে। সেটা পতিতা বৃত্তি প্রশ্রয়ের আওতায় পড়ে। এদিকে সারা দেশে গণিকালয় খারিজ। সুতরাং এ আইনের যৌক্তিকতার প্রশ্নও স্বাভাবিক নিয়মে তোলা যায়। নতুন আইনের উপধারায় বলা আছে যদি কোন ব্যক্তি

তার প্রাক্তন স্ত্রীকে নিয়ে ভিন্ন রাজ্যে যায় এবং সীমানা পার হয়ে তার সাথে সহবাস করে, সেটা আইনের চোখে ঘোর দণ্ডনীয় অপরাধ। শাস্তি পাঁচ বছরের হাজতবাস। সীমানা না পেরিয়ে কিছু করাটা অপরাধ নয়। অর্থাৎ যে ভাবে হোক কিছু একটা অজুহাত তুলে বাছাই বাছাই কিছু মানুষকে আইনের চোখে সর্বসাধারণের• চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার মতলব। স্বভাবতই আমি সেই বাছাই মানুষদের একজন।

শুনলাম আরো নাকি কি একটা অভিযোগ অনবার চেষ্টা করছে সরকার। কাগজ-পত্র নাকি তৈরী। শেষ মুহূর্তে শুনি সেটা নিজেরাই বিচার বিবেচনা করে বাদ দেবার সংকল্প করেছে। বর্তমানে আইনের সে ধারা বাতিল। সে যাই হোক, গেইস্‌লার লয়েড দুজনেই বললেন, আগের জুটোর কোনটাই ধোপে টিকবে না। জয় আমাদেব সুনিশ্চিত।

জুরীদের নিয়ে বসলো তদন্ত বৈঠক। কদিন চললো নানান নথিপত্র দেখা। জোআন আর তার মাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পালা। অভিযোগ মঞ্জুর। আমাকে গেইস্‌লার ফোন করে বললেন, আপনি অভিযুক্ত সাব্যস্ত হয়েছেন। বিশদ বিবরণ কদিনের মধ্যেই হাতে আসবে। মামলা শুরু হবে। আমি তারিখ আপনাকে পরে জানিয়ে দেবো।

সে যেন কাফকার গল্পের মতো। পর পর বেশ কটা দিন। আমি হেন মানুষ নিশিদিন বুঁদ হয়ে আছি নিজের স্বাতন্ত্র্য নিজেব অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। বাঁচতে হবে যে কোন প্রকারে। জিততে হবে। যদি অভিযুক্ত বলে প্রমাণ হই, তবে বিশ বছরের সশ্রম কারাবাস।

কোর্টে পয়লা শুনানীর দিন সাংবাদিকদের যেন মোচ্ছবেব মতো অবস্থা। নানান মাপের ক্যামেরা বাগিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লো কোর্ট মার্শালেব কামরায়। আমি তখন তারই হেফাজতে। বাধা দিলাম। ছবি নিতে মানা করলাম। মানে না মানা। আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে আমার, পর পর তার অনেকগুলো ছবি নিলো।

মার্শালকে বললাম, এ কি ব্যাপার ? এরা যে ছবি নিলো আপনার অনুমতি নিয়েছে ?

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললেন, হে হে, শোনেনা যে বারণ। কি করি বলুন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একজন পদস্থ কর্মচারী। পাঠক শুনুন তার কথা।

শিশুটি ভূমিষ্ঠ হবার পর কেটে গেছে অনেকগুলো দিন। ডাক্তারী মতে রক্ত পরীক্ষা আপাততঃ হতে পারে। উভয় পক্ষের উকিলের সম্মতিক্রমে ডাক্তার ঠিক হয়েছে। সেখানেই তিনজনের রক্ত পরীক্ষা হবে। নেওয়া হলো রক্ত। সে এক ভীষণ উত্তেজনাকর অবস্থা। রিপোর্ট বেরুনো অব্দি যেন ঘুম নেই, স্বস্তি নেই। শেষে বেরুলো রিপোর্ট। গেইস্‌লার ফোন করলেন। কাঁপছে থর থর করে তার গলার স্বর। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। বললেন, আপনি মুক্ত। অভিযোগ টেঁকে নি। অবৈধ পিতা হবার সুযোগ আপনার হলো না।

বললাম, সেটা অতীব দুঃখের।' হাসলাম।

কাগজে· ফলাও করে খবর বেরুলো। সে-ও হৈ হৈ কাণ্ড। কেউ লিখলো চ্যাপলিন মুক্ত। অভিযোগ অস্বীকৃত। কেউ লিখলো, রক্ত পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে চ্যাপলিন সন্তানের পিতা নন।

বেকায়দায় পড়লো সরকার। তবে সাময়িক। মামলা চালু থাকবে। এটা সিদ্ধান্ত হলো। কোন ক্রমেই প্রত্যাহার করা চলবে না। ফলে আমারও গলগ্রহ। রোজ সন্ধ্যেবেলা কাটে গেইস্লারের বাসায়। নানান খুঁটিনাটি নিয়ে একের পর এক আলোচনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে যাবতীয় কথা জিজ্ঞেস করেন গেইসলার। আমাকে বলতে হয়। কি আর করি। নিরুপায় যে। ইতিমধ্যে সানফ্রান্সিস্কো থেকে একখানা চিঠি পেলাম। লিখেছেন জনৈক রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী। তাতে স্পষ্টভাবে লেখা, নাকি জোআনকে পরিচালনাব পেছনে কোন এক ফ্যাসিস্ট সংগঠনের মদৎ আছে। সেটা তিনি জানতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজন বোধে তিনি সাক্ষ্য প্রমাণও হাজির করতে পারেন। গেইসলারকে চিঠিখানা দেখালাম। মোটেই গুরুত্ব দিলেন না।

জোআনের অতীত জীবন, স্বেচ্ছাচারিতা, ভ্রষ্টাচার—এসব নিয়েও বহু তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছুলো। এসব ব্যাপারে খোঁজখবরও চলছে দীর্ঘদিন ধরে। অবাক কাণ্ড, হঠাৎ গেইসলার একদিন বললেন, যাক চরিত্র নিয়ে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই, এগুলো পুরনো দিনের কায়দা। এরল ফ্লিন যদিও এই ভাবে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, আপনার ক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আর তাছাড়া দরকার কি। মামলা তো আমাদেরই হাতের মুঠোয়। জিত তো আপনার বাঁধা। ফালতু ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি।

হতে পারে গেইসলারের চোখে ফাল্তু। হয়তো তার সঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু আমি মনে করি এগুলোর যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। অন্ততঃ আমার একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থে।

জোআনও লিখেছে এরই মধ্যে একখানা চিঠি। কত মিষ্টি তার ভাষা। ক্ষমা চেয়েছে বারবার। আমাকে হেনস্থা হতে হয়েছে—এতোটা নাকি সে চায়নি। সে দুঃখিত, লজ্জিত। "আমি যে কত উদার কত মহান তা শুধু সেই জানে।

এটা আমি পরবর্তী কালে ব্যবহার করবো ভেবেছিলাম। অন্তত কাগজে ছাই পাশ যা লিখবে তার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ আর কি। লেখার ধারা অবিশ্যি বদলেছে। এখন আর নোংরা কিছু লেখে না। তবে আমি যে নির্দোষ বলে প্রমাণ হতে যাচ্ছি, সে ব্যাপারেও বিশেষ কিছু বের করে না।

এই প্রসঙ্গে জে. এড্‌নার হুভারের কথা একটু বলে নিই। এফ. বি. আই প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্ণধার। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর। যেহেতু এটাও রাষ্ট্রের সঙ্গে মামলা, তার সংগঠনের এক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রের হয়ে সরকারী কৌঁসুলিকে যোগাড় করে দেবে তারা সাক্ষ্য প্রমাণ, তারই ভিত্তিতে মামলা চলবে। তা বহুকাল আগে ভোজের আসরে হুভারের সঙ্গে আমার চেনা হয়েছিল। এখন সে চেহারাও নেই। বয়েস বেড়েছে, নাকটা ভাঙা, সব মিলিয়ে মুখখানা লাগে বড় নির্দয় নিষ্ঠুর। করুণার লেশমাত্র যেন নেই মুখে। যখন পরিচয় হয়েছিল তখন কিন্তু স্বাভাবিক আর পাঁচটা মানুষের মতন। শান্ত নম্র ব্যবহার। বরং মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন আচরণে।

হুভারের সঙ্গে বলতে গেলে আচমকাই দেখা। চেসেন রেস্তোরাঁয় গেছি খেতে। আমি আর উনা। দেখি একটু দূরে গোয়েন্দা দপ্তরেব আরো কজনের সঙ্গে বসে আছে হুভার। কি যেন আলোচনা চলছে। টিপি গ্রে তার ডাইনে। চিনি আমি। দেখেছি স্টুডিও পাড়ায় অনেকবার। ভাবতাম ছোট খাঁটো ভূমিকায় নামে তাইতেই চলে গ্রাসাচ্ছাদন। নিরীহ গোবেচারা গোছের মানুষ, সাতে পাঁচে থাকে না, শুধু মুখে সদা এক ধরনের অমায়িক হাসি। দরবিগলিত বলতে যা বোঝায়। দেখে হাড়পিত্তি অব্দি জ্বলে যেতো। এতোদিনে বুঝলাম তার আসল পেশা। গোয়েন্দা বিভাগের খবরাখবর দেয়ানেয়ার কাজ করে। ছবিতে নামাটা ওর খোলস-মাত্র। হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে সেই অমায়িক ভঙ্গিতে। দাঁতের ফাঁকে চাপা হাসি। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। চক্রান্ত যে চারিদিক থেকে চলছে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পাবছি।

এবার শুরু হবে বিচার। তারিখ পড়লো। গেইস্‌লার বললেন, ঠিক দশটা বাজার দশমিনিট আগে ফেডারেল বিল্ডিংয়ের সামনে আপনি হাজির হবেন। দুজনে আমরা একসাথে কোর্টে ঢুকবো।

তিনতলায় কোর্টঘর। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছিলাম বেশ একটা আলোড়ন উঠবে। ছুটে আসবে সবাই—এলো না। ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলো না কাগজের লোকজন। আড়চোখে কয়েকজন শুধু আমাকে একবার দেখে নিলো। আসলে আমাকে ওরা তখন বর্জন করতে শুরু করেছে। আমার কাছ থেকে আর নতুন কিছু জানবার ওদের নেই। সব মামলা চলাকালীনই জেনে নেবে। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন গেইসলার। বসলাম। চলে গেলেন তিনি। ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা বললেন, হাসলেন, করমর্দন করলেন। সবাই মোটের ওপর ব্যস্ত। শুধু আমি বসে আছি একা চুপচাপ।

সরকারী কৌঁসুলিকেও দেখা যাচ্ছে। নথি পড়ছেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন সহকারীদের। তারা টুকে নিচ্ছে খস খস করে, হাসিখুশী ভাব। বেশ দাপট। দেখে মনে

হলো। টিপি গ্রে তার কাছাকাছি বসে। আমাকে অমায়িক শয়তানীর হাসি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলো।

করার তো কিছু নেই। হাতের গোড়ায় গেইসলার দিয়ে গেছেন একটা কলম আর এক ফালি কাগজ। তাই নিয়ে অগত্যা আঁকি বুকি কেটে ছবি আঁকতে শুরু করলাম। একটু পরে হাঁ হাঁ করে তেড়ে এলেন গেইসলার। কাগজ ছিনিয়ে নিলেন। বললেন, এ আপনি কি করছেন? এখুনি এই ছবির ছবি তুলে নিয়ে যাবে ওরা, কাগজে ছাপাবে, তার সাতরকম ব্যাখ্যা করবে। তাই নিয়ে ফের আবার নতুন করে বিপত্তি। কি দরকার মশাই এসব ঝামেলা বাড়াবার।

এমন কিছু আঁকিনি। একটা নদী আর তার ওপর একটা সাঁকো। মাত্র কয়েকটা দাগ। ছেলেবেলায় হামেশা কাগজ কলম পেলেই আঁকতে বসে যেতাম। কি জানি তার মধ্যে কি পাপ ঢুকে আছে।

এবার শুরু হবে মামলা। সবাই যে যার আসনে বসলো। পেশকার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজালো তিনবার। হাকিম এসে এজলাসে বসলেন। অভিযোগ পড়ে শোনানো হলো আমার বিরুদ্ধে। মোট চারটি। দুটি পতিতাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেবার অপরাধ, দুটি নাগরিক আইন ভঙ্গ জনিত অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের কথা আজ অব্দি কেউ শোনেনি। হয়তো ছিলো কোনকালে, এখন আর তার অস্তিত্ব নেই। গেইসলার প্রথমে সমগ্র অভিযোগই অস্বীকার করলেন। কিন্তু সেটা প্রচলিত একটা প্রথা মাত্র। এরকম করতে হয় তাই করা। তিনি অস্বীকার করলেও আইন তো করবে না, দেশের জনগণ বিশেষ করে জনগণের যে অংশ আজ বসে আছে কোর্ট-ঘরে সাংবাদিক টেবিল আলো করে, তারা তো করবে না।

ঠিক হলো জুরীর বিচার হবে। কে হবে জুরী তাই নিয়ে ফের এক কাণ্ড। মোট চব্বিশ জনের নাম দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে থেকে বারোজনকে বাছতে হবে। অর্থাৎ উভয় পাশ থেকে ছটি করে নামে আপত্তি জানাতে পারে। বারো জন নিয়ে হবে জুরী কমিটি। উভয় পক্ষ থেকে জুরীদের সে কী জেরা, কত প্রশ্ন! নিয়ম হলো হাকিম এবং দুজন কৌঁসুলি বাজিয়ে নেবেন—জুরী হবেন যিনি তার স্বাধীনভাবে মতামত দেবার শিক্ষা দীক্ষা বা ক্ষমতা আছে কিনা। অদ্ভুত সে সব প্রশ্ন।—কাগজ পড়েন আপনি? পড়েছেন অভিযুক্ত সংক্রান্ত ঘটনা? কোনো পক্ষকে কি আপনি সমর্থন করেন? ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে দুজন তাদের কারুকে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন? আমার মনে হয় না, আদৌ এ জাতীয় প্রশ্নের কোন প্রয়োজন আছে। চোদ্দ মাস ধরে সমানে কাগজে নিন্দা রটাচ্ছে আমার নামে। ঘৃণার বিষ ঢালা বলতে যা বোঝায়। সেখানে কোন মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না এটা ভেবে নেওয়াও তো বোকামী।

এক একটা নাম আসে আর গেইসলার কাগজে লিখে দিয়ে দেন তার গোয়েন্দা কর্মচারীদের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে তারা বেরিয়ে যায়। মিনিট দশেক পর ঘুরে এসে তাদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে দেয় গেইসলারের হাতে। যেমন: জো ডোক্স্। অমুক দোকানের কেরাণী। স্ত্রী আছে। দুটি সন্তান। কখনো সিনেমা দেখে না। শুনে গেইসলাব চিন্তিত ভাবে কপালে টোকা দেন,—একে· একে রাখি বরং সাময়িক ভাবে। পরে দেখা যাবে। এইভাবে কাকে কাকে রাখবো আমরা ঠিক করি। সরকারী তরফেও একই রকম। সেদিকেও চলে সমান তৎপরতা। আব টিপি গ্রে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে অমায়িক শয়তানী হাসি হাসে।

আটজন এইভাবে বাছাই হলো। ন নম্বব এক মহিলা। কাঠগড়ায় দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গেইসলাব মাথা নাড়লেন, নাঃ একে ঠিক সুবিধেব মনে হচ্ছে না। কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপাব আছে এব চালচলনে। ভালো লাগছে না আমার। এইসব নানান কথা বলছেন আপন মনে এমন সময় সহকাবী তাব বিববণী পেশ করলো। দেখেই বললেন, ঠিক যা ভেবেছি তাই। লস এঞ্জেলেস টাইমস্ কাগজে আগে সাংবাদিকতা কাজ করতো। একে বাদ দিতে হবে। ওরা দেখছেন কেমন চটপট ওকে মেনে নিলো।

মুখখানা ভালো করে দেখাব চেষ্টা কবলাম, ঠিক দেখা যায় না এতো দূর থেকে। তখন চশমা পরবো বলে চশমাটা বের করলাম। গেইস্লার অমনি চেপে ধরলেন আমার হাত।—খবরদার, পববেন না। এই নিয়েও নানান কথা লিখবে। মোটের ওপর খালি চোখেই যা নজরে পড়ে—চিন্তাশীল দেখতে, বয়েস বেশি নয়। আর কিছু খুঁটিয়ে বুঝতে পাবি না। একটু পরে গেইসলার বললেন, কি করি বলুন, আমাদের আর দুটো আপত্তি পাওনা। একে বরং নিয়ে নিই এখনকার মতো। শেষ মুহূর্তে দেখা যাবে। দেখার সুযোগ আর হলো না। দুই আপত্তিতে দুজন পড়লো বাদ। আর কাউকে বদল করাব সুযোগ নেই। মহিলা সাংবাদিক অতঃপর রয়ে গেলেন।

যেন বিরাট এক প্রহসন। ধাঁধা বিশেষ। তল পাই না। খেলার ছক সাজিয়ে বসেছে কৌসুলি আর হাকিম, আমরা ঘুঁটি মাত্র। আমাদের কোন ভূমিকা নেই। ভয় ভয় করে। কে জানে যদি অভিযোগ থেকে মুক্ত না হই। তখন কি হবে? কি করবো আমি ভবিষ্যতে? ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায়ই ভাবনাটা চেপে বসে। সরিয়ে দিই জোর করে। থাকেও না মনে বেশিক্ষণ। এক বগ্‌গা মন আমার। একটা ছাড়া একসাথে দুটো ব্যাপার কখনো ভাবতে পারি না।

তা সব সময় কি আর ভাবনা চিন্তায় তোলপাড় হয়ে গুম হয়ে বসে থাকা যায়। বদলও তো চায় মন। একদিনের কথা বলি। বসে আছি একা। জুরীরা তখন গেছে ভেতরের ঘরে দরবার করতে। কৌসুলিরাও নেই। হাকিমের এখন "বিশ্রাম। কোর্ট

ঘর মোটামুটি ফাঁকা। অল্প কয়েকজন বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আর এক ফটো তুলিয়ে। ক্যামেরা বাগিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে একধারে, সুযোগ পেলেই তুলবে আমার ছবি। একটু অন্যভাবে ছবি তুলতে চায়। ঠিক যে ভাবে দেখা যায় সর্বদা তেমন নয়। কি আর করি। সামনে মামলারই একটা নথি। তাই টেনে নিলাম। পড়বো। চশমাটা বের করে পরতে যাবো, অমনি দেখি বাছাধন ক্যামেরা তুলেছে। অমনি হাত নামিয়ে নিলাম। সেও ক্যামেরা নামালো। ফের খানিকক্ষণ পরে আবারও চেষ্টা। আবারও দেখি তার ক্যামেরা তাক। অমনি সরিয়ে নিলাম চশমা। সেও সরালো। চললো এইভাবে খানিকক্ষণ। হেসে তো সবাই কুটিপাটি। কোর্ট চালু হতে নিশ্চিন্তে আমি চশমা পরলাম।

শেষ আর হতে চায় না। এই বিচাবেব প্রহসন। যেহেতু প্রতিপক্ষ খোদ সরকার। পল গেরিকে খবর কবে হাজিব করা হলো। সঙ্গে দুই জার্মান ছোকরা। জেরার মুখে প্রকাশ করতে বাধ্য হলো পল, জোআন আব সে দীর্ঘ দিনের বন্ধু। তাদের মধ্যে যথেষ্ট দহবম মহরম আছে। জোআনকে সে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর টাকাও দিয়েছে। তখন জোআনের লেখা সেই চিঠি পেশ করা হলো। সরকারী কৌঁসুলি আপত্তি তুললেন। এটা নাকি বিধি বর্হিভূত। গেইস্‌লারও বিশেষ একটা পীড়াপীড়ি করলেন না।

জেরার মুখে প্রকাশ পেলো, আমাব বাড়িতে যেদিন জানলা ভেঙে ঢুকেছিল জোআন, তার আগে সারাক্ষণ কাটিয়ে এসেছে এক জার্মান ছোকরার সাথে। তাকেও হাজির করা হলো। অস্বীকার করতে পারলো না।

সব মিলিয়ে সে যেন এক খণ্ডযুদ্ধ। শুধু জেরা আর জেরা আর স্বীকার আর অস্বীকার। সবেরই কেন্দ্রে আমি। যতক্ষণ কোর্টে থাকি নিজেকে ভারী অসহায় লাগে। বাড়িতে গেলে শান্তি। উনা বসে থাকে অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে। তাকে বলি সব। জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর ডিনাব। শুধু আমি আব উনা। তারপর ক্লান্তিতে বিছানায় গা দেবার সাথে সাথে ঘুম।

সবচেয়ে বিড়ম্বনা ভোর সাতটায় ঘুম থেকে ওঠা। যেন রুটিন মাপা কাজ। কোন ক্রমে চটপট খেয়ে নিই প্রাতরাশ। অমনি বেরিয়ে পড়তে হয়। এক ঘণ্টা লাগে যেতে গাড়িতে। দূর তো কম নয়, সেই লস এঞ্জেলেস। রাস্তায় ভিড়। হাতে সময় রাখতে হয় কিছু বেশি। ঠিক দশটা বাজার দশ মিনিট আগে গেইস্‌লার আসবেন। দুজন একসঙ্গে ঢুকবো তারপর কোর্টঘরে।

বিচার পর্ব শেষ। আড়াই ঘণ্টা করে সময় নিলেন দুজন কৌঁসুলি বিচারের সারমর্ম নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে। কিছুই মাথায় ঢুকছে না আমার। দুজনের বলাই আমার কাছে সমান। কিছু শুকনো কথা, কাটা কাটা, সঙ্গে আইনের ঘোরপ্যাঁচ

একটা ব্যাপার বুঝলাম, সরকারী সেই যে জুটো নাগরিক অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ, সেটা ধোপে টেকে নি। খারিজ হয়ে গেছে। অন্ততঃ কুড়ি বছরের হাজতবাসের ব্যাপারটা আর নেই। হাকিমও তার মনোভাব ব্যক্ত করলেন। রায় নয়, সমগ্র ঘটনার সার সংক্ষেপ। এবার জুরীদের মতামত প্রকাশের পালা। ভারী জানতে ইচ্ছে করছে সাংবাদিক সেই মহিলার দৃষ্টিভঙ্গী কি। মুখখানা নজরে পড়ছে। যেন ভারী চিন্তাকুল। একটু পরে সদলবলে তারা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

আমরাও বেরিয়ে এলাম। গেইসলার বললেন, রায় না বেরুনো অব্দি আমরা কিন্তু যাচ্ছি না। চলুন ঐ রোদ্দুরে গিয়ে একটু বসি।

রোদ ঠিকই। আমার চোখ ধোঁয়াশা। জানিনা খানিকক্ষণ পরে কি রায় বেরুবে। এখন আর স্বতন্ত্র সত্তা বলতে আমার কিছু নেই। আমি আইনের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ভার আইনের হাতে ন্যস্ত।

প্রায় দেড়টা বাজে। জুরীদের এখনও বেরুবার নাম নেই। কুড়ি মিনিটের বেশি তো লাগবার কথা নয়। কি এমন হলো যে নিষ্পত্তি হয় না এখনো। উনা বসে আছে ফোনের সামনে। আমার উনা। কি খবর দেবো তাকে?

কাটলো আরো একটি ঘণ্টা। আর দেরী নয়। ফোন করলাম। বললাম, চিন্তার কোন কারণ নেই। বেরোয় নি এখনও জুরীরা। রায় বেরোনো মাত্র আমি ফোনে খবর দেবো।

আরো এক ঘণ্টা কাবার। দেখি গেইস্লারও ভেতরে ভেতরে ভারী চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। ঘড়ি দেখলেন ঘন ঘন।—চারটে বাজে। কিসে লাগে এতো সময়? তখন কোন্ কোন্ বিষয়ে মতভেদ হতে পারে বা প্রশ্ন উঠতে পারে তাই নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা হলো। সময় যেন তাতেও আর কাটতে চায় না। সাড়ে চারটে। পাঁচটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। ঘন্টি বেজে উঠলো। অর্থাৎ জুরীরা সমাধানে পৌঁছতে পেরেছেন। কোর্টঘরের দিকে পা বাড়ালাম। গেইসলার বললেন, খবরদার, রায় যাই হোক না কেন, আবেগের আতিশয্যে হঠাৎ কিছু করে বসবেন না। এটা যেন মনে থাকে। দ্রুত চেয়ার সব ভরে উঠছে। টিপি গ্রে দেখলাম সর্বশেষ ব্যক্তি। মুখে অমায়িক হাসি নিয়ে সরকারী কৌঁসুলির কাছে গিয়ে বসলো।

ধক ধক করছে বুকের ভেতরটা। হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে দারুণ এক উত্তেজনা। কোর্টঘর স্তব্ধ। পেশকার ঢং ঢং করে তিনবার ঘণ্টা বাজালো। হাকিম এসে বসলেন আসনে। ঢুকলেন জুরীর দল। আসন পরিগ্রহন করলেন। পেশকারের হাতে যাবতীয় নথি। ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছলেন গেইসলার।—না না, যদি দোষী বলে সাব্যস্ত হয় তবে বলবো এটা বিচার নয়, বিচারের প্রহসন মাত্র।

কথাটা প্রায় তিন চারবার আপন মনে বললেন। তারপর রায় পড়ে শোনানো হলো।

—চার্লি চ্যাপলিন। তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আটষট্টি নম্বর মামলা। দায়রায় সোপর্দ। প্রাথমিক বিচারে...সময় নিলো খানিকক্ষণ...**নির্দোষ**।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস। মাতোয়ারা জনগণ। আমার চারধারের অজস্র মানুষ। পেশকার আবার ঘণ্টা বাজালো।

—শেষ এবং সর্বশেষ বিচারেও...**নির্দোষ**।

বাঁধ ভাঙা বন্যার জল যেন। ছুটে আসছে সবাই চতুর্দিক থেকে। করমর্দনের ঘটা, জড়িয়ে ধরা, দু একজন আনন্দের আতিশয্যে আমাকে চুমুও খেলো। আড় চোখে টিপির দিকে তাকালাম। হাসিটুকু আর নেই। থমথমে মুখ। যেন বিরাট ঝড় বয়ে গেছে এই মাত্র মানুষটার ওপর দিয়ে।

হাকিম বললেন, আপনি এখন যেতে পারেন মিঃ চ্যাপলিন। আপনাকে আমাদের আর দরকার নেই। আপনি মুক্ত। বলে হাসতে হাসতে করমর্দন করলেন। অভিনন্দন জানালেন। গেইসলার বললেন, এবার জুরীদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসুন।

এগিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়ালো সেই মেয়েটি। সাংবাদিক। গেইস্লার আপত্তি করছিলেন একে মেনে নিতে। খুব কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি এবার। শ্রীময়ী সুন্দর অপূর্ব বুদ্ধিদীপ্ত মুখের প্রতিটি রেখা। বাড়িয়ে দিলো হাত। হাসলো,—এখনো দেশে মানুষ আছে চার্লি। আমরা আছি। স্বাধীন দেশ আমাদের। কোন চিন্তার কারণ নেই।

জবাবে একটা কথাও বলতে পারছি না। গলার কাছে জমাট বেঁধে থমকে আছে কান্না। কাঁদতে মন চাইছে। কি বলে ধন্যবাদ দেবো ওকে। আমার যে ভাষা নেই।

বললো, দেখছিলাম আপনাকে জানলা দিয়ে। ভাবছিলাম ছুটে যাই, গিয়ে আগাম বলে আসি খবর। সব উদ্বেগের অবসান ঘটাই। এগারো জন আমরা আপনার পক্ষে। বাকী একজনকে পেলে দশ মিনিট লাগতো সিদ্ধান্ত নিতে।

সব অলৌকিক লাগছে। নতুন যেন পরিবেশ। কতদিন দেখি না এমন প্রাণ খোলা হাসি। এতো মানুষ যে ভালবাসেন আমাকে একটু আগেও বুঝতে পারিনি। করমর্দন করলাম প্রত্যেকের সাথে। শুধু এক মহিলা বাদ। ঘৃণার দৃষ্টি চোখের তারায়। ওঠে নি আসন ছেড়ে। পেশকার বললো, কি হলো উঠুন। আর কি, সব তো মিটে গেছে। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে আমার সঙ্গে করমর্দন করলো।

উনা তখন চারমাসের পোয়াতি। বসে ছিল একা। ফোন করে জানাবার ফুরসত পাইনি। রেডিওতে শুনেছে খবর। শুনে তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারিয়েছে।

নিঃশব্দে ডিনার খেলাম দুজন। আমি আর উনা। এখন কদিন নিরালা বিশ্রাম। বলে দিলাম যেন কাগজ আসে না, টেলিফোন করলে যেন বলে দেয় আমি বাড়িতে

নেই, দেখা করতে এলে তাকে যেন পত্রপাঠ বিদেয় করে। ভীষণ ফাঁকা লাগছে চারধার। দরকার এখন অটুট নৈঃশব্দ্য। বাড়ির কাজের লোকেদেরও যেন ছুটি দিতে পারলে বাঁচি।

সব বললাম উনাকে। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিবরণ। কেন দেরী হয়েছে রায় দিতে। কজন আমার পক্ষে সব। বড় শান্তিতে ঘুমোবো আজ। সকাল সাতটায় উঠে আর ছুটতে হবে না পড়ি কি মরি করে। বড় আরাম। আহ্ শান্তি!

ঠিক দুদিন পর। ফোন করেছেন লিও ফুটওয়াংগার। বললেন, আপনি মশাই ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। রাজনীতি করার জন্যে এমন দণ্ড আর কাউকে দিতে হয় নি। বিশেষ করে আমেরিকার কোন শিল্পীকে। এটা একটা নজির হয়ে রইলো।

মেটেনি এখনো সব। পিতৃত্বের ব্যাপার নিয়ে সেই মামলাটা এখনও আছে। আমি মনে করেছিলাল রক্ত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই শেষ। দেখি শেষেরও শেষ আছে। এবার আর সরকার নয়। প্রতিপক্ষ স্বয়ং জোআন। ভারী চতুর এক উকিল পাকড়েছে। প্রথম ধাক্কাতেই সন্তানের দায়িত্ব সে কোর্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো। কোর্ট তলব করলো আমাকে। ঘুরে ফিরে সেই সরকার। আমাকে বললো, আপনি এর দায়িত্ব নিন।

প্রাথমিক বিচারে আমি নির্দোষ। অর্থাৎ দায়িত্ব নেবার প্রশ্নই ওঠে না। কেন নেব আমি ভরণ পোষণের ভার। আমি কি ওর জন্মদাতা? বিচারের দ্বিতীয় পর্যায়ে গেলো সব গোলমাল হয়ে। আমার বিরুদ্ধে গেলো রায়। রক্ত পরীক্ষার যাবতীয় সিদ্ধান্ত হলো অর্থহীন। মিথ্যে সব। বিজ্ঞান হার মানলো প্রহসনের কাছে।

আর নয়। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এবার পালাতে চাই। ভালো লাগে না আর। বিষ যেন পরিবেশে। অব্যাহতি চায় মন। উনারও তাই একান্ত ইচ্ছে। যাবো আমরা দুজন। সঙ্গে বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়, আর কেউ নয়, শুধু বেড়াল ছানাটা। বড় পোষ মেনেছে উনার। তিনটি জীব অতর্কিতে একদিন ট্রেনে চেপে বসলাম। জানতে পারলো না কেউ। সিধে নিউইয়র্ক। সেখান থেকে নিয়াক্। ভাড়া নিয়েছি বাড়ি আগে থেকে। বাড়ি তো নয় যেন ঘর আমাদের। সেরকম নিজস্বত্ব। ভারী অন্তরঙ্গ পরিবেশ। পুরনো দিনের বাড়ি। ১৭৮০ সালে তৈরি। চারপাশে টিলা পাহাড়।

রুক্ষ তার সৌন্দর্য। আর গাছগাছালিতে ঘেরা সবুজ সুন্দর আমাদের কুটীর। বাড়ির কর্তা থাকেন একধারে। গিন্নী নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ান। তারিফ করার মতো সে রান্না।

কালো একটা কুকুরও এসে জুটেছে। কুচকুচে কালো। উনার সঙ্গেই দেখি বেশি খাতির। প্রাতঃরাশ যখন খাই, বসে থাকে ঘাসের ওপর চুপটি করে। খাবার পেলে কৃতার্থ চিত্তে লেজ নেড়ে দাত'কে ধন্যবাদ জানায়। দু চোখে দেখতে পারে না তাকে মিনি—আমাদের বেড়ালছানা। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে অবিরাম জানায় অসন্তোষ। সে কিন্তু নির্বিকার। স্থির দৃষ্টিতে ঘাসের সাথে গলা টান টান করে দেখে মিনিকে। বোধ হয় বলতে চায়, অতো রাগ কেন, এসো না কাছে। মিলেমিশে আমরা খেলা করি।

গড়িয়ে গড়িয়ে চলে দিন। আলস্য যেন আর কাটতে চায় না। কি করবো, কাজ তো নেই। নেই কোন বন্ধু কি পরিচিতব ভিড। চিঠিও আসে না যে পড়বো। শুধু শুয়ে বসে আলস্যে কালযাপন। আর গল্প উনার সঙ্গে। ভবিষ্যতের কথা।

ভেবেছিলাম ছ'মাস থাকবো এখানে। বাচ্চা হবে উনার তারপর ফিরবো। এদিকে মঁসিয় ভার্দু´ চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেষ। এখন ছবি তোলার প্রস্তুতি নেবার প্রশ্ন। মনটা ছটফট করে ভীষণ। হাত নিশপিশ করে কাজের তাগিদে। কি করব, এখানে তো আর শুটিং শুরু কবার কোন সুযোগ নেই, তাই টানা পাঁচ সপ্তাহ থেকে ক্যালি-ফোর্নিয়া ফিরে এলাম।

উনা বলেছে ছবিতে কাজ করতে তার একদম ইচ্ছে নেই। একটুও না। বিয়ের পরেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে। আমি তাতে খুশী। ভারী সন্তুষ্ট। এতোদিনে সত্যিকারের ঘরণী আমি পেলাম। মনেপ্রাণে এই তো ছিলো আমার চিরন্তন বাসনা। 'শ্যাডো এণ্ড সাব্‌স্ট্যান্স' ছবির পরিকল্পনা তাই মন থেকে দূর করেছি। এখন 'মঁসিয় ভার্দু´'। বিচারের প্রহসনে না জড়িয়ে পড়লে এতোদিনে শেষ হয়ে যেতো আমার ছবি। আমার দুর্ভাগ্য। নতুন করে সব আবার ভাবতে হচ্ছে।

উনাকে ছবিতে দেখতে পেলো না দর্শক। এটা আমার আফশোস। বড় উঁচুদরের শিল্পী। তেমনি সততা নিষ্ঠা। তেমনই সূক্ষ্ম কৌতুক বোধ। বোঝে সব, খোলে না কখনো নিজেকে। গুটিয়ে রাখে। এটা অভিনেতার একটা বড় গুণ।

একটা ঘটনা বলি।

বিচার শুরু হবার আগে উনা আর আমি গেছি এক সোনা গয়নার দোকানে। হাতব্যাগটা ছিঁড়ে গেছে। সেটা সারাই করতে। দেখি শো কেসে ভারী চমৎকার একছড়া হার। হীরে আর পান্না বসানো। ভারী পছন্দ হলো উনার। আমারও। কিনতে বললাম। বলে—না থাক, অনেক দাম। দোকানদারকে বললাম, থাক এখন,

পরে চিন্তা ভাবনা করে এসে বলবো। বলে হাতব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

গাড়িতে উঠেই উনাকে বললাম, একটু তাড়াতাড়ি চালাও। দরকার আছে। ছোটালো উনা গাড়ি। বেশ খানিকটা দূরে এসে পকেটে হাত দিয়ে বের করলাম সেই হার। বললাম, এই নাও তোমার হার। তোমাকে যখন অন্য গয়না দেখাচ্ছিলো আমি সেই ফাঁকে হাত সাফাই করে পকেটে ভরে এনেছি।

উনা তো থ। গাড়ি থামালো। বললো, ছি ছি এ তুমি কি করলে।

—কিন্তু দেখো এখন তো আর ফিরিয়ে দেবার প্রশ্ন ওঠে না। বরং চলো বাড়ি ফিরে যাই।

বলে হেসে ফেললাম। উনাও হাসলো। মিথ্যে বলে ধোঁকা দিচ্ছিলাম এতোক্ষণ। বললাম, আমি কিনেছি তোমার ভয় নেই। তুমি যখন ওদিকে আমি চুপি চুপি দোকানদারকে বলেছি দিয়ে দিতে।

উনা বললো, আমি জানি।

ভুলবো না তাদের কথা। কোনদিন ভুলবো না। আমার দুঃসময়ের সাথী। আমার পরম বান্ধব। মামলার দিনগুলিতে আমাকে সাহস দিতেন, বুদ্ধি দিতেন, পরামর্শ দিতেন। ভরিয়ে রাখতেন আমার দুশ্চিন্তার মূহুর্তগুলি। সাল্কা ভিয়াত্রেল, ক্লিফোর্ড ওদেতস, হান্স আইলার আরো কত সাথী। স্মৃতির খাতায় চির জাগরূক হয়ে থাকবে তাদের নাম।

সাল্কা ভিয়াত্রেল পোল্যাণ্ডের যশস্বী অভিনেত্রী। সান্তা মনিকায় বাড়ি। সেখানে পার্টি দিতেন শিল্পী জগতের নামকরা দিকপালদের নিয়ে। আসতেন টমাস মান, বার্টোল্ট ব্রেখ্ট, শোনবার্গ, হানস্ আইলার, লিও ফুটউইংগার, ষ্টিফেন স্পেণ্ডার, সিরিল কনোলি আরো কত বিশিষ্ট মানুষ। এটা সাল্কার চরিত্রের এক বিশেষ গুণ। যেখানেই থাকতো, সেখানেই বসিয়ে দিতো ফুলের মেলা।

হান্স্ আইলারের বাড়িতে দেখতাম বার্টোল্ট ব্রেখটকে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। মাথায় টাক। মুখে সর্বদা চুরুট। মসিয় ভার্দুর চিত্রনাট্য তাকে দেখিয়েছিলাম। আগাগোড়া পড়লেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন চীনা ধরনে লিখেছেন। ভালো।

ফুট্‌উইংগারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন, বলুন তো, এখানকার রাজনীতিক হালচাল আপনি কি চোখে দেখছেন? বললেন, তাহলে একটা গল্প বলি। আমার জীবনের গল্প। বার্লিনে আছি তখন। নতুন বাড়ি করলাম। অমনি হিট্‌লার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। পালিয়ে চলে গেলাম প্যারিসে। সেখানে বাড়ি কিনে সবে তার সাজগোজ বদলাতে শুরু করেছি শুনি নাৎসী বাহিনী ফ্রান্স দখল করেছে। ফের পালালাম। এখন এসেছি এখানে। বাড়িও কিনেছি। জানিনা ভবিষ্যতে কি হবে।

অলদাস হাক্সলির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হতো। তখন ভাববাদ নিয়ে মেতে উঠেছেন। ভালো লাগতো না আমার। যেন আগের রূপটাই সুন্দর। রাগী কঠোর একটা ভাব। সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখেন—বিশ দশকে যেমন দেখেছি আর কি। এখনকার চেহারাটা যেন তার সঙ্গে মোটে মেলে না।

একদিন বন্ধু ফ্রাঙ্ক টেলর ফোন করে বললেন, নিউ সাউথ ওয়েলসের কবি ডিলান টমাস আমার আর উনার সঙ্গে দেখা করতে ভারী আগ্রহী। বললাম বেশ তো নিয়ে আসুন না একদিন। ফ্রাঙ্ক বললেন, মুশকিল হলো সব সময় ঠিক হুঁশে থাকে না। বললাম দেখাই যাক না কতটা বেহুঁশ।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা। দোরের ঘণ্টি বাজলো। দরজা খুলতেই দেখি টাল খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলো একটা মানুষ। জড়ানো গলায় নিজের নাম বললো, অর্থাৎ সেই টমাস। দেখো কাণ্ড! হুঁশে না থাকা মানে বুঝি এতোটা! দু দিন পর এলো ফের। সেদিন সুস্থ। কবিতা শোনালো। মনে নেই সে কবিতা। শুধু একটা দুটো শব্দ মনে আছে। যেমন 'মসৃণ', 'স্বচ্ছ,' ইত্যাদি। টমাসের নাম মনে পড়লেই শব্দ কটা কানের গোড়ায় বাজতে থাকে।

থিয়োডোর ড্রেসিয়ারের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে। খুব তারিফ করতাম তাকে। আমার বন্ধু। সস্ত্রীক আসতো আমাদের বাড়িতে। স্ত্রীর নাম হেলেন। একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতাম। ভারী নম্র স্বভাব। ছেলেদের সঙ্গে প্রায়ই একথা সেকথা নিয়ে খটামটি লাগতো। মারা গেলো আচমকা। জন হাওয়ার্ড লসন— প্রথিতযশা নাট্যকার এবং আমার বিশিষ্ট বন্ধু, আমাকে বললো কফিনে কাঁধ দিতে। রাজী হলাম। একটা কবিতাও পড়ে শুনিয়েছিলাম সেদিন। ড্রেসিয়ারেরই লেখা।

চিত্রনাট্য শেষ। কাজে আমার কামাই নেই। যতই ঝড় উঠুক, যতই নাজেহাল হই না কেন, আমি জানি বাজারে ছবি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব আবার স্বাভাবিক হবে। হৃত সম্মান আবার ফিরে পাবো। তারিফ করবে লাখো লাখো দর্শক। সেই আশা নিয়েই আছি। দু বছরের আপ্রাণ পরিশ্রমে শেষ হয়েছে কাজ। পরে চিত্র গ্রহণে লেগেছিল তিন মাস সময়। এর আগে এতে কম সময়ে কোন ছবি আমি তুলতে পারি নি। চিত্রনাট্য এবার সেন্সর করাতে হবে। পাঠালাম ব্রীন অফিসে। কদিন পরে চিঠি পেলাম। বলতে গেলে ছবির শুরু থেকে শেষ অব্দি প্রায় প্রতিটি অংশ নিয়ে তারা আপত্তি তুলেছেন।

দেশে যাবতীয় ব্যাপারে রুচি নির্দ্ধারক প্রশ্নে একটি সংস্থা আছে। লিজিয়ন অফ ডিসেন্সি তার নাম। ব্রীন অফিসে তারই একটা শাখা। দেশে সেন্সর সংক্রান্ত কোন বিধিনিষেধ নেই, তবু রুচির প্রশ্নে চিত্রনাট্য করার পর আমরা সেন্সর করতে পাঠাই। এটা আবশ্যিক বলে আমি মনে করি। মতামতও নেওয়ার প্রয়োজন আছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটিই কথা—যেন নিয়ম নিষেধগুলো অনেক সরল হয় সহজ হয়, যেন কাষ্ঠ কঠোর কোন শৃঙ্খলাবোধের দ্বারা পরিচালিত না হই। সুরুচি কি কুরুচি এটা নির্ধারণের সময় যেন বুদ্ধি রুচিবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ থাকে। তা না হলে কোন ছবির ক্ষেত্রেই সুবিচার হবে না।

হিংসাত্মক যে কোন ক্রিয়াকল্পাপ ছবিতে দেখাবার আমি ঘোর বিরোধী। বিরোধী

মিথ্যে কোন. কিছু তুলে ধরার প্রশ্নে। দুটোই সমান ভাবে মানব মনে প্রভাব বিস্তার করে। রগরগে কামোত্তেজক দৃশ্য দেখালে যে প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতি হয়, এতেও তার চেয়ে কিছু কম হয় না। বার্নাড শ'র একটি উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বলেছিলেন, খল-নায়কের চোয়ালে একটা ঘুঁষি মারলেই যদি সব সমস্যা মিটে যেতো তবে তো কোন চিন্তার কারণই থাকতো না।

সে যাই হোক, সেন্সর সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দেবার আগে ছবির সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি বলে নিই। ভার্দু কোন একটি ব্যাঙ্কের সাধারণ কেরানী। মন্দার সময় চাকরী গেছে। এমতাবস্থায় নতুন এক পরিকল্পনা মাথা খাটিয়ে সে বের করেছে। বাছাই বাছাই প্রৌঢ় মহিলাদের সে বিয়ে করে, তাকে হত্যা করে, তারপর তার সম্পত্তির মালিক হয়। ব্যক্তি জীবনে সংসারী মানুষ। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে স্ত্রী থাকে গাঁয়ের বাড়িতে। সে অসুস্থা। জানে না স্বামীর পরিকল্পনার ইতিবৃত্ত। ভার্দুও যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ। এক একটা খুন করার পর বাড়িতে আসে। যেন সারাদিন খাটাখাটুনির পর ভারী ক্লান্ত ভারী পরিশ্রান্ত। দোষ আর গুণের এক আশ্চর্য সমন্বয়। বাড়িতে যখন বাগান পরিচর্যা করে তখন সাবধানে ফেলে পা, একটা পোকা দেখলে তাকে সযত্নে সরিয়ে দেয়, তারপর পা বাড়ায়। অথচ বাগানেরই একপ্রান্তে মস্ত এক কফিনে শোয়ানো থাকে একের পর এক লাশ—তার নিপুণ চিন্তায় এক একটি শিকার। কৌতুকের মধ্য দিয়ে গোটা ঘটনাটি ব্যক্ত করা হয়েছে। তাতে আছে ব্যঙ্গের ছোঁয়া, আছে সামাজিক নানান নিয়ম নিষেধের তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা।

ব্রীন অফিস থেকে যে চিঠিখানা পেলাম, তা দীর্ঘ, সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে আমার ছবি—অর্থাৎ সেন্সরের হিসেব অনুযায়ী এ ছবি দেখানো উচিত নয়। চিঠির অংশ বিশেষ আমি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম—

"....চিত্রনাট্যের বেশ কিছু অংশ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। গভীর তাৎপর্যবাহী। বর্তমান অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে তীব্র ভাষায়। এগুলোকে বাদ দিলেও আরো কিছু অংশ আছে যা আইনের চোখে বিপজ্জনক এবং স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরোধী।

ভার্দুর দাবী যুদ্ধে আইনানুগ পন্থায় যে হত্যালীলা চলে সে তুলনায় তার দুটি একটি হত্যা কিছুই না। বর্তমান অবস্থা সেই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জনক। এ দাবী ঠিক কি বেঠিক, ন্যায় কি অন্যায় এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় ভার্দু বক্তৃতা দেবার সময় আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তার হত্যা যে নীতিগত এটা প্রমাণ করতে। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

আমাদের আপত্তির দ্বিতীয় প্রধান কারণটি হলো ভার্দুর একের পর এক বিয়ে

করা। বিয়েটা তার একটা ফাঁকি, আসল উদ্দেশ্য সম্পত্তি হস্তগত করা। এটা নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্কের দিকে আমাদের দৃষ্টি টে'ন নিয়ে যায়। আমাদের বিচারে এটা ঘোর অন্যায়।"

আপত্তি কোথায় কোথায় সেটা তারা চিত্রনাট্যের অংশ বিশেষ তুলে ধরে ধরে দেখিয়ে দিয়েছে। আমি হুবহু উদ্ধৃত করছি। লিডিয়ার অংশটুকু প্রথমে চিত্রনাট্যে যেমনটি রেখেছিলাম দেখাবো। লিডিয়া ভার্দুর অবৈধ স্ত্রী। অবৈধ বলছি কেননা তাকে বিয়ে করেছে ভার্দু উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। প্রৌঢ়া। যে রাত্রের ঘটনা সেই রাত্রেই ভার্দু লিডিয়াকে হত্যা করবে।

[হলঘরে আলো আঁধারির খেলা। লিডিয়াকে দেখা যায়। আলো নেভায়। তারপর শয়নকক্ষে ঢোকে। আলো জ্বালে। দরজা দিয়ে আলোর রেখা বাইরের হলঘরে পড়ে। ভার্দুকে ধীরে ধীরে আসতে দেখা যায়। হলঘরের শেষ মাথায় বিরাট একটা জানলা। বাইরে আকাশে চাঁদ। তারই আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন ঘোর লাগা একটা মানুষ, সেইভাবে ভার্দু জানলার দিকে এগিয়ে যায়।]

ভার্দু ॥ [জনান্তিকে] কী অপূর্ব কোমল অথচ অপরূপ এই চাঁদ।

লিডিয়া ॥ [শোবার ঘর থেকে] আমাকে কিছু বললে ?

ভার্দু ॥ [আবিষ্ট গলায়] ভারী অপূর্ব এই চাঁদ তন্বী সুন্দরী আমার দেখতে ভারী চমৎকার লাগছে।

লিডিয়া ॥ [গলা শোনা যায়] থাক, এখন আর চাঁদ দেখতে হবে না। শোবে এসো।

ভার্দু ॥ যাই। বড় ভালো লাগছে গো। যেন ফুলের ওপর দিয়ে হাঁটছি। চমৎকার।

[লিডিয়ার শোবার ঘরে ঢোকে। হলঘর অন্ধকার। শুধু চাঁদের আলো পড়েছে জানলা দিয়ে।]

ভার্দুর গলা ॥ [শোবার ঘর থেকে] ঐ দেখো চাঁদ। এতো উজ্জ্বল আমি কখনো দেখি নি। বড় অশ্লীল লাগছে।

লিডিয়ার গলা ॥ চাঁদ ? অশ্লীল ? হাসালে তুমি হা হা হা অশ্লীল চাঁদ হা হা

[বাজনা শোনা যায়। বাড়ে। শেষ পর্দায় ওঠে। ফেড ইন। সকাল। সেই হলঘর। রোদ ঝলমল করছে। লিডিয়ার শোবার ঘর থেকে গুনগুন করে গান করতে করতে ভার্দু বেরোয়।]

ব্রীন অফিস লিখলো—আপত্তি আছে। লিডিয়ার সংলাপ বদলাতে হবে। "থাক এখন

আর চাঁদ দেখাতে হবে না, শোবে এসো।" এটা হবে "শুতে যাও।" দৃশ্য উপস্থাপনার ব্যাপারেও আপত্তি থেকে যায়। এমন ভাবে দেখাতে হবে যাতে ভার্দু এবং লিডিয়া অবৈধ সম্পর্কের অজুহাতে বৈধ ভাবে বিবাহিত জীবনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে এটা যেন দর্শক সমক্ষে প্রমাণ না হয়। 'অশ্লীল চাঁদ' কথাটা চলবে না। পালটাতে হবে। তাছাড়া পরদিন সকালে ভার্দু গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে আসে স্ত্রীর ঘর থেকে, এটা পরিবর্তন করা দরকার।

পরের আপত্তি ভার্দু এবং একটি মেয়ের সংলাপ নিয়ে। মেয়েটিকে গভীর রাতে ধরে এনেছে ভার্দু। এটা ওদের ভাষায় অশোভন। কেননা এতে প্রমাণ হয় মেয়েটি বেশ্যা। এবং স্বভাবতই ছবিতে বেশ্যাকে বেশ্যা বলে দেখানোটা অন্যায়।

সে দেহোপজীবিনী। ছবিতে মেয়েটির তাই পরিচয়। গভীর রাতে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছে তাকে ভার্দু, নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে তাই। সেটা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। একটা বিষ সে আবিষ্কার করেছে, তাতে মৃত্যুর পরে কোন প্রমাণ থাকবে না, অথচ তীব্র এবং তাৎক্ষণিক তার প্রতিক্রিয়া। সেটাই পরীক্ষা করে দেখবে মেয়েটির ওপর। বিষ খাওয়ার পর এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে মেয়েটি। দৃশ্যটির মধ্যে কামের নামগন্ধ নেই। আমি হুবহু এখানে তুলে দিলাম।—

[প্যারিসে ভার্দুর বাসা। নীচের তলায় কাঠের আসবাবপত্রের দোকান। ঢুকবার পর দেখা গেলো মেয়েটি জামার নীচে একটা ছোট্ট বেড়ালছানা লুকিয়ে রেখেছে।]

ভার্দু ॥ বেড়াল খুব ভালবাসো, তাই না?

মেয়েটি ॥ ভালবাসি না। বাইরে তো খুব ঠাণ্ডা, তাই জামার নীচে রেখে দিয়েছিলাম। বেশ গরম লাগে। দুধ আছে আপনার?

ভার্দু ॥ আছে। সবই আছে। আমাকে তুমি হেঁজিপেঁজি ভেবো না।

মেয়ে ॥ আমি কি তাই বলেছি নাকি?

ভার্দু ॥ বলো নি। তবে হাবেভাবে প্রকাশ পায়। তোমাদের আশার তো শেষ নেই।

মেয়ে ॥ এ কথা কেন বলছেন?

ভার্দু ॥ শীতের রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো কি তাহলে এমনি এমনি?

মেয়ে ॥ তা নয়। তবে যে কোন মক্কেল পেলেই আমি খুশী।

ভার্দু ॥ কোন বাছবিচার নেই?

মেয়ে ॥ [ব্যঙ্গ সহকারে] আপনি তো দেখছি এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকে বুঝে গেছেন।

ভার্দ্র ॥ কতদিন নেমেছো এ কাজে ?

মেয়ে ॥ তিন মাস।

ভার্দ্র ॥ বিশ্বাস হয় না।

মেয়ে ॥ কেন ?

ভার্দ্র ॥ তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের তিনমাসে অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়ার কথা।

মেয়ে ॥ সুন্দরী বললেন আমাকে এজন্য ধন্যবাদ।

ভার্দ্র ॥ তা নয় বুঝলাম। এবার সত্যি কথাটা বলে ফেলো তো। জেল বা হাসপাতাল দুটোর একটা থেকে তুমি সদ্য ছাড়া পেয়েছো। কোনটা ?

মেয়ে ॥ জেনে আপনার লাভ ?

ভার্দ্র ॥ আছে। এমনও হতে পারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

মেয়ে ॥ আপনি তো দেখছি ভীষণ জনদরদী ?

ভার্দ্র ॥ কিছুটা। তবে তার জন্য কোন প্রতিদান আশা করি না।

মেয়ে ॥ আপনি কি সৈনিক ? [খুঁটিয়ে দেখে] ত্রাণ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ?

ভার্দ্র ॥ সে তুমি যা খুশী ভেবে নিতে পারো। আমার কিছু আসে যায় না।

মেয়ে ॥ আমি সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছি।

ভার্দ্র ॥ কেন জেল ?

মেয়ে ॥ অতি তুচ্ছ কারণ। ওদের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। ভাড়া করা টাইপ মেশিন বন্ধক দিয়েছিলাম।

ভার্দ্র ॥ মাথা খাটিয়ে একটু অন্য কিছু ভালো কিছু করা গেলো না ? আর শাস্তি ?

মেয়ে ॥ তিন মাস।

ভার্দ্র ॥ কালই বুঝি বেরিয়েছো ?

মেয়ে ॥ হ্যাঁ।

ভার্দ্র ॥ খিধে পেয়েছে তোমার ? কিছু খাবে ?

[মেয়েটি মাথা নাড়ে। হাসে]

ভার্দ্র ॥ একটু বোসো তাহলে। রান্নাবান্না করতে হবে। বরং তুমিও এসো না। হাত লাগাও। এসো আমার সঙ্গে।

[রান্নাঘরে যায়। দুজনেই। ভার্দ্র ডিম ভাঙতে থাকে। মেয়েটি প্লেটে খাবার সাজায়। ভার্দ্র নির্দেশ দেয়। খাবার নিয়ে মেয়েটি যায় বাইরের ঘরে। অমনি সতর্ক দৃষ্টিতে তাকে দেখে ভার্দ্র। দেয়াল আলমারির দরজা খুলে চটপট বিষের শিশি বের করে। মদের বোতলে ঢালে। বোতলের ছিপি আটকায়। তারপর বোতল এবং দুটি গ্লাস ট্রেতে সাজিয়ে-সেও বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।]

[বাইরের ঘর। ভার্দ্ এবং মেয়েটি।]

ভার্দ্ ॥ জানিনা তোমার পেট ভরবে কিনা। বিশেষ তো কিছু নেই। ডিম, টোস্ট আর এই ...সুরা।

মেয়ে ॥ আর কি চাই! দারুণ।

[বই পড়ছিল। হাত থেকে বই নামিয়ে রাখে। হাই তোলে।]

ভার্দ্ ॥ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। খেয়ে নাও। আমি তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

[বোতলের ছিপি খোলে]

মেয়ে ॥ [ভার্দ্‌র দিকে চোখ] খুব মিষ্টি ব্যবহার আপনার। ভারী দয়া। আমার খুব অবাক লাগছে। এতো কেউ করে না।

ভার্দ্ ॥ না করার কি? [গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে] দয়া এমন কি মহার্ঘ বস্তু যে দিতে আপত্তি থাকবে?

মেয়ে ॥ আমার তো মনে হয় ঠিক উলটোটা।

[নিজের গ্লাসে মদ ঢালতে গিয়ে ঢালে না।]

ভার্দ্ ॥ ও হো, টোস্ট আনতে ভুলে গেছি। দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

[বোতল হাতে নিয়ে রান্নাঘরে যায়। বোতল তাকে তুলে রাখে। নতুন আরেকটা বোতল নেয়। টোস্ট নেয়। বাইরের ঘরে আসে। টোস্ট রাখে টেবিলে। তারপর নতুন বোতল থেকে নিজের গ্লাসে মদ ঢালে।

মেয়ে ॥ আপনি অদ্ভুত লোক।

ভার্দ্ ॥ কেন?

মেয়ে ॥ জানি না। মনে হলো তাই বললাম।

ভার্দ্ ॥ খেয়ে নাও এবার। তোমার না খিদে পেয়েছে? নাও শুরু করো।

[খেতে শুরু করে মেয়েটি। টেবিলে রাখা বইখানার দিকে ভার্দ্‌র চোখ পড়ে।]

ভার্দ্ ॥ কার লেখা?

মেয়ে ॥ সোপেনহাওয়ার।

ভার্দ্ ॥ ভালো লাগে তোমার?

মেয়ে ॥ মোটামুটি।

ভার্দ্ ॥ সেই যে আত্মহত্যার ওপর লেখা বই—পড়েছো?

মেয়ে ॥ আত্মহত্যার ব্যাপারে আমার কোনরকম আগ্রহ নেই।

ভার্দ্ ॥ [আচ্ছন্ন ভাবে] শেষটা কত সুন্দর ভাবো তো! ..ঘুমিয়ে পড়লে, জানো না কিছু, হঠাৎ নিশ্বাস গেলো বন্ধ হয়ে ..বেঁচে থাকার কি লাভ বলতে পারো?

মেয়ে ॥ জানিনা।

ভাৰ্ত্ত ॥ আসলে তিল তিল করে ভয়াবহ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

মেয়ে ॥ আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন? এই যে জীবনের এতো দুঃখ এতো গ্লানি—যারা জন্মায় নি এখনও তারা যদি জানতে পারে, তাহলে হয়তো ভয় পেতো। হয়তো আতঙ্কে আর জন্মাবার চেষ্টা মাত্র করতো না।

[ভাৰ্ত্ত মিটি মিটি হাসে। গ্লাসে চুমুক দেয়। মেয়েটিও গ্লাস তোলে। বিষাক্ত গ্লাস। চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে যায়।]

মেয়ে ॥ তবু কিন্তু জীবন সুন্দর।

ভাৰ্ত্ত ॥ কি রকম? কিসে তোমার মনে হলো সুন্দর?

মেয়ে ॥ এই যে চতুর্দিকের সব কিছু····ধরুন শরতের অপরূপ কোনো সকাল কিংবা গ্রীষ্মকালের রাত····সুর, গান, ভালবাসা····

ভাৰ্ত্ত ॥ ভালবাসা!

মেয়ে ॥ এটা জীবনের একটা দারুণ জিনিস।

ভাৰ্ত্ত ॥ কিভাবে জানলে?

মেয়ে ॥ ভালবাসা হয়েছিলো একজনের সাথে। তাই।

ভাৰ্ত্ত ॥ তার মানে তুমি বলতে চাও কোন একটি যুবকের চেহারা দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে। তাই তো?

মেয়ে ॥ আপনি মেয়েদের দু চোখে দেখতে পারেন না। তাই না?

ভাৰ্ত্ত ॥ ঠিক উলটোটা। মেয়েদের আমি ভীষণ ভালবাসি। কিন্তু প্রশংসা করার মতো কিছু খুঁজে পাই না।

মেয়ে ॥ কেন? প্রশংসা করার মতো কি কিছুই নেই?

ভাৰ্ত্ত ॥ বড় হিসেবী। বড় বেশি রকমের বাস্তববাদী। আর কেবল মত পালটায়।

মেয়ে ॥ এ সব আপনি ঠিক বলছেন না।

ভাৰ্ত্ত ॥ বলছি। কি হয়ে থাকে বাস্তবে? ধরো একটি মেয়ে একজন পুরুষকে ঠকালো। অমনি ঘৃণা করতে শুরু করবে তাকে। ভীষণ। সে ভালো হোক তার ব্যবহার ভালো হোক—সে সব কোন ব্যাপারই না। তাকে ছোট করবে নানান ভাবে। যদি সুন্দর দেখতে হয়, চেহারা ভালো—তবে তো কথায় কথায় হাঁড়ির অপমান করে ছাড়বে।

মেয়ে ॥ আপনি মেয়েদের সম্বন্ধে কিচ্ছু জানেন না।

ভাৰ্ত্ত ॥ জানি হে। তোমার চেয়ে বরং বেশিই জানি। এরকমই হয়ে থাকে।

মেয়ে ॥ তবে সেটাকে ভালবাসা বলবো না।

ভাৰ্থ ॥ কি তাহলে ভালবাসা ?

মেয়ে ॥ তার মধ্যে একটা আত্মত্যাগ থাকবে· · সমর্পণ····ঠিক মা যেমন সন্তানের জন্মে করেন, ভাবেন ·· স্বার্থ থাকে না· · অনেকটা সেই রকম।

ভাৰ্থ ॥ [হাসে] তুমি বুঝি সেইভাবেই ভালবাসতে ?

মেয়ে ॥ হ্যাঁ।

ভাৰ্থ ॥ সে ব্যক্তিটি কে ?

মেয়ে ॥ আমার স্বামী।

ভাৰ্থ ॥ [বিস্ময়] তুমি · বিবাহিত ?

মেয়ে ॥ ছিলাম। এখন নই। আমি যখন জেলে, তখন মারা গেছে।

ভাৰ্থ ॥ কি হয়েছিলো তার ?

মেয়ে ॥ সে অনেক কথা। স্পেনের যুদ্ধে জখম হয়। সেই থেকে অসুস্থ। কাজ করতে পাবে না। অথর্ব। বেকার।

ভাৰ্থ ॥ [সামনে ঝুঁকে পঁড়ে] অথর্ব ?

মেয়ে ॥ তাই তো প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। আমাকেও ভীষণ ভালবাসতো। আমাব ওপর সব ব্যাপারে নির্ভর করতো। শিশুর মতো হয়ে পড়েছিলো, জানেন, ঠিক একটা বাচ্চা যেরকম। আমি বুক দিয়ে ভালবাসতাম। অন্তর দিয়ে। হৃদয় দিয়ে। পুজো করতাম তাকে· আমার নিশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্বাসেব সঙ্গে জড়িয়ে থাকতো ওর জন্যে আমি কাউকে খুন করতেও পিছপা হতাম না।

[চোখে জল। চোখ মোছে। গ্লাস তোলে মুখের কাছে। ভাৰ্থ বাধা দেয়]

ভাৰ্থ ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও। কি যেন পড়েছে একটা। ছিপিটা ভেঙে গেলো তখন। দাও দেখি গ্লাস। একটু বোসো। আমি পালটে অন্য গ্লাসে দিই।

[বলে গ্লাস নেয়। একধারে বেখে দেয়। নতুন গ্লাস নিয়ে তাতে ভালো বোতল থেকে মদ ঢালে। তাই দেয়। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দুজনে সুরাপান করে।] ভাৰ্থ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে ওঠে।]

ভাৰ্থ ॥ অনেক দেরী হয়ে গেলো। তাছাড়া ক্লান্ত তুমি। এই নাও [টাকা দেয়] এটা রাখো · চলবে'খন দু একদিন চলো এগিয়ে দিই।

[মেয়েটি অবাক চোখে টাকা দেখতে থাকে]

মেয়ে ॥ একি, এতো দিলেন কেন ? এ তো অনেক।·· আমি কোনোদিন একসাথে এতোগুলো টাকা···· [হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে]··· আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম····ভাবতাম কেউ নেই দুনিয়ায়··· কেউ নেই····

আপনি আমার সব গোলমাল করে দিলেন।

ভার্ত্ত ॥ তবুও বলি, এটাকেই ঠিক বলে ধরে নিও না। বিশ্বাস ভালো, বেশি বিশ্বাস ভালো নয়। ঠকবে তবে। দুনিয়াটা বড় বিশ্রী জায়গা।

মেয়ে ॥ শুধু বিশ্রী নয়, ঠকবাজের দুনিয়া। · নিষ্ঠুর নির্দয় এই জগৎ। অথচ দেখুন একটু দয়া একটু মায়া একটু ভালবাসা পারে সব পালটে দিতে। কত সুন্দর লাগে তখন পৃথিবী।

ভার্ত্ত ॥ নাও এবার উঠে পড়ো। ঢের হয়েছে। আর খানিকক্ষণ বসে তোমার দর্শন শুনলে আমিও তোমার মতো ভাবতে শুরু করবো।

[মেয়েটি দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ফিরে তাকায়। হাসে। শুভরাত্রি জানিয়ে পথে নামে।]

সেন্সর কর্তৃপক্ষের আপত্তিগুলি ঠিক এইবকম।—

"ভার্ত্তর মেয়েটিকে বলা সংলাপ—'শীতেব রাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো তাহলে কি এমনি এমনি?' এবং 'কতদিন নেমেছো এ কাজে?' 'আর তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের তিনমাসে অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়াব কথা'—এগুলো পালটাতে হবে। সৈনিকের প্রসঙ্গ আনাটা ঠিক নয। এটা সামগ্রিক ভাবে সৈনিক সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করে।

কাহিনীর শেষ ভাগে অনেক দিন পরে মেয়েটিব সঙ্গে ভার্ত্তর দেখা। ইতিমধ্যে জল অনেক গড়িয়ে গেছে। ভার্ত্ত এখন গবীব, মেয়েটি ধনী। ধনী কেন তাই নিয়ে সেন্সর কর্তাদের ভারী আপত্তি। দৃশ্যটা এইবকম :—

[রেস্তোরাঁর একাংশ। কাগজ পড়ছে ভার্ত্ত। সামনে ফাঁকা টেবিল। যুদ্ধের সংবাদ—ইওরোপে যুদ্ধ ঘনায়মান। বেয়ারা আসে। দাম মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভার্ত্ত। রাস্তা পার হতে যায়। লিমুজিন গাড়ি। ধাক্কা খেতে খেতে সামলে নেয়। নতুন গাড়ি। চকচক করছে রং। গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থামে। চালক হর্ন বাজায়। দস্তানায় ঢাকা একখানা হাত ইশারায় ভার্ত্তকে ডাকে। অবাক ভার্ত্ত এগিয়ে যায়। আরো অবাক। গাড়ির পেছনের আসনে বসে সেই মেয়েটি। হাসছে। খুব দামী পোশাক পরনে।]

মেয়ে ॥ কেমন আছেন জনদরদী মশাই?

[ভার্ত্ত স্তম্ভিত]

মেয়ে ॥ চিনতে পারছেন না আমাকে? আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাসায়… বৃষ্টির রাত

ভার্তৃ ॥ [অবাক তখনও] তাই নাকি?

মেয়ে ॥ কত খাওয়ালেন আমাকে। টাকা দিলেন। দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলেন।

ভার্তৃ ॥ [সকৌতুকে] সেটা বোধ হয় ভীষণ বোকামীর কাজ করেছিলাম। তাই না?

মেয়ে ॥ কেন হবে বোকামী? কত দয়া আপনার। সে কথা থাক। কোথায় যাবেন এখন?

ভার্তৃ ॥ কোন ঠিক নেই।

মেয়ে ॥ তবে উঠে পড়ুন।

[দরজা খুলে দেয়। ভার্তৃ ওঠে]

[গাড়ির অভ্যন্তর ভাগ]

মেয়ে ॥ [চালককে] লা ফাজ কাফেতে চলো। [ভার্তৃকে] এখনো বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেন নি। অবিশ্যি মনে রাখবেন আমাকে, এটা মনে করাও তো বোকামী।

ভার্তৃ ॥ [সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখে] তোমাকে আমার খুব মনে আছে।

মেয়ে ॥ সেই যে, রাত তখন আমি আগের দিন জেল থেকে বেরিয়েছি

[ভার্তৃ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চালককে দেখিয়ে ইশারা করে

ভার্তৃ ॥ আস্তে। [হাত দিয়ে টের পায় চালক আর পেছনের আসনের মাঝখানে কাঁচের আড়াল] ঠিক আছে। বলো। আমি ভেবেছিলাম শুনতে পাবে। কিন্তু ভারী অবাক লাগছে। এটা কার গাড়ি?

মেয়ে ॥ আমার। আমি এখন ধনী। ছেঁড়া কম্বল থেকে একদম রাজপ্রাসাদ। সে অনেক কথা। আপনার সাথে দেখা হওয়ার পরই আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে। বিরাট এক ধনীর সঙ্গে দেখা হয়। তার অস্ত্রের কারবার।

ভার্তৃ ॥ আমারও অমন একটা ব্যবসা করা উচিত ছিলো। কেমন মানুষ?

মেয়ে ॥ খুব ভালো। ভীষণ দয়া, ভীষণ মায়া। কিন্তু ব্যবসার ব্যাপারে দয়া মায়ার এতোটুকু লেশ নেই। ভীষণ নিষ্ঠুর তখন।

ভার্তৃ ॥ দেখো বাছা, ব্যবসা মানেই বড় নির্দয় নিষ্ঠুর ব্যাপার। সে কথা থাক। তুমি তাকে ভালবাসো?

মেয়ে ॥ না। বাসি না বলেই সে আমাকে ভালবাসে।

এই প্রসঙ্গে সেন্সরের আপত্তি এইরকম।—

"সংলাপ বদলাতে হবে—'টাকা দিলেন, দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলেন,'—'সেটা বোধহয় ভীষণ বোকামীর কাজ করেছিলাম, তাই না?'—বড় সোজাসুজি বলা হয়ে যায়। এটা ঠিক না। অস্ত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে এমন একটা কিছু ঢোকানো দরকার যাতে বোঝা যায় মেয়েটি তার রক্ষিতা নয়, প্রেমিকা।

এ ছাড়াও আরো কত আপত্তি। সব তুলছি না। কিছু কিছু বিভিন্ন অংশ থেকে শোনাই।

"মধ্যবয়সী মহিলার শরীরের বর্ণনা ঐভাবে দেওয়া চলবে না। এটা অশ্লীল।"

"নাচের দৃশ্যে সাবধান হতে হবে। পোশাকের ব্যাপারে নজর রাখা দরকার। খালি পা দেখানো চলবে না। বড জোর নীচ থেকে গোড়ালির ওপর অব্দি চলতে পারে। তার ওপরে নয়।"

"পাছায় হাত বুলিয়ে দেওয়া নিয়ে রসিকতা নিন্দনীয়। বর্জন করা দরকার।"

"কলঘরে কোনক্রমে পায়খানা দেখানো চলবে না। অংশ বিশেষও নয়।"

"ভার্দুর বক্তৃতায় একটা কথা আছে 'থলথলে'। এটা বাদ দিতে হবে।"

চিঠিতে লিখলো আমি যদি যাই একবার তবে খোলা মন নিয়ে আলোচনা করা যাবে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনবোধে গল্পটিকে নতুন করে সাজানো যাবে। তাতে বরং লাভই বেশি। কেননা ছবি দেখে দর্শক নির্মল আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পাবেন। অতএব গেলাম। খোদ মিঃ ব্রীনের সঙ্গে দেখা। ব্রীন খবর দিলেন তার সহকারীকে। এলো একটু পরে। লম্বা ঢ্যাঙা চেহারা। মুখ ভাবলেশহীন। বসলো আমার মুখোমুখি। দেখেই বুঝলাম, আমার বন্ধু নয় মোটেই। শত্রুও নয় প্রত্যক্ষ ভাবে। তবে কাছাকাছি।

বললো, ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ কি?

বললাম, কেন জিজ্ঞেস করছেন?

চিত্রনাট্য হাটকে বের করলো একটা পাতা। বললো, এই যে এই দেখুন ভার্দু জেলখানায়। পাদ্রী গেছেন দেখা করতে। ভার্দু বলছে, বলুন ভদ্রে আপনার জন্য কি করতে পারি।

—তা কি বলবো, ভদ্রলোককে ভদ্রে বলা কি অপরাধ?

—অপরাধ তো বটেই। ইয়ার্কি।

—ভদ্রে বলার মধ্যে ইয়ার্কি?

এই নিয়ে তর্ক। কিছুতে বুঝবে না সে। আমিও না বুঝিয়ে ছাড়বো না। শেষে বললে, পাদ্রীকে ভদ্রে বলে না কেউ। বলে ফাদার।

বললাম, বেশ। শিখে নিলাম আপনার কাছ থেকে। এবার থেকে ফাদারই বলবো।

—আর ঐ লাইনটা, আরেকটা পাতা ওলটালো, পাদ্রীকে দিয়ে আপনি বলিয়েছেন—আমি এসেছি ভগবানের কাছে তোমার জন্য শান্তি কামনা করতে। ভার্দু জবাবে বলেছে, ভগবানের সঙ্গে আমার কোন অশান্তি নেই। অশান্তি মানুষের সাথে। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব। এটা ঠাট্টার পর্যায়ে পড়ে।

বললাম, সেটা আপনাব বুদ্ধিতে মনে হতে পাবে। আমার মতে ঠাট্টা নয়। এটা ধারণা মাত্র।

—আব এই যে এই কথাটা। পাদ্রী বলছেন, পাপের জন্য তোমাব মনে কি এতোটুকু অনুতাপ নেই? ভার্দু বলছে, পাপ কি তাই আমি বুঝি না। কখনো মনে হয় স্বর্গ থেকে নেমে আসে। কখনো মনে হয় পবীরা পাপেব বিষ ছড়িয়ে দেয়—গোটা ব্যাপারটাই আমাব চোখে এক বিবাট বহস্য।

—বটেই তো। আমি বললাম, পাপে যতটা বহস্য, পুণ্যেব ক্ষেত্রেও তা। আমার কাছে সব গোলমাল হযে যায়।

—এটা কোন মানুষেব দর্শন হতে পাবে না। হলে বলবো ভান, মিথ্যে। খুব ঘৃণা দেখলাম কথা বলাব সময়। বললো, ভার্দুকে দিযে তাবপর আপনি বলিয়েছেন, পাপ না থাকলে আপনার কি গতি হবে?

—এটা নিযে প্রশ্ন উঠতে আমি স্বীকার করছি। তবে ব্যঙ্গ বলে যদি মনে করেন তবে কোন ভুল নেই। বলাব মধ্যে কোন অশ্রদ্ধার ভাবও নেই।

—নেই কি করে বলবো? আগাগোড়া যেখানে মানুষটা পাদ্রীর প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছে, সেখানে এটাও তো অসম্মানের প্রতিরূপ।

—আপনি কি চেয়েছিলেন, পাদ্রীও আমার সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গ করে কথা বলবে?

—মোটেই না। বরং চাই মূল্যবান কিছু বক্তব্য রাখবেন। আপনি একবারও তার মুখ দিয়ে দামী কোন কথা বলান নি।

বললাম, দেখুন, মরতে চলেছে যে মানুষটা, তার পেছুটান বলে আর কিছু নেই। পরোয়া করে না সে কিছুকে। সেই ভাবেই কথাগুলো ভার্দুর মুখে সাজানো। পাদ্রী তারই সঙ্গে সমান তাল মিলিয়ে কথা বলছেন। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাদ্রীর বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। আপনি যখন আপত্তি তুলছেন, বেশ, আমি তার মুখ দিয়ে কিছু সারবান কথা বলাবার চেষ্টা করবো।

—এ লাইনটাও ভালো নয়। আঙুল দিয়ে দেখালো আরেকটা লাইন,—পাদ্রী বলছেন, ভগবান আপনার আত্মাকে করুণা করুন। ভার্দু বলছে, তা তো করবেনই॥ আমার আত্মাটাই তো তাঁর।

—ভুল কি দেখলেন এতে ?

—পাত্রীর সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে না।

—এটা জনান্তিকে বলা। পাত্রীকে নয়। ছবি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন।

—ছবি দেখার ধৈর্য্য নেই। সমাজকে আপনি বিষিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন।

—সমালোচনা করার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে। এমন নয় যে সমাজ এবং রাষ্ট্র সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

বিস্তর আলাপ আলোচনা এবং সামান্য কিছু রদবদলের পর ছাড়পত্র মিললো। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, ব্রীনের কিছু কিছু সমালোচনা ভালো, গঠনমূলক বলা যায়। বললেন, মেয়েটির যেন ভবিষ্যৎ জীবনে বেশ্যাবৃত্তি করে বেচে না থাকতে হয়। এরকম ইঙ্গিত যেন না থাকে। একটু দেখবেন। হলিউডের প্রায় সব ছবিতেই আজকাল দেখি এই রেওয়াজ

অস্বস্তি বোধ করলাম। এ ভাবে এতো নির্মম ভাবে সাবধান করার প্রয়োজন ছিলো না। সেটা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছেও নয়। বললাম, ঠিক আছে, আমি দেখবো।

নির্দেশ মেনে দৃশ্যগ্রহণের কাজ শেষ হলো। লাগলো মোটে তিন মাস। সম্পাদনাও শেষ। লিজিয়ন অফ ডিসেন্সি সংস্থার বিশ ত্রিশ জন সভ্যকে ডেকে ছবি দেখালাম। নানান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কিছু লোকজনও রইলেন। ছবি দেখাবার পর বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করলাম। এমন আর কোনদিন হয়নি। ব্রীনই মুখ খুললেন সর্বপ্রথম। অন্যান্য দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, ঠিকই তো আছে। কি বলেন আপনারা ? ছাড়পত্র দিতে কোন অসুবিধে নেই।

থমথমে নীরবতা। অনেকক্ষণ পরে একজন বললেন, তেমন কিছু গলদ তো চোখে পড়লো না। আমার তরফে কোন আপত্তি নেই।

ব্রীন আবারও বাকীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কি হলো, আপনারা কিছু বলুন। আপত্তি করার কি কিছু আছে ?

দু একজন শুধু মাথা নাড়লেন। ব্রীনের মতে সায় দিলেন। বাকীরা চুপ। ব্রীন অবশেষে বললেন, আপনি বাকী প্রিন্টগুলো করে ফেলুন। আমাদের আপত্তি নেই।

মনের মধ্যে তখনও আমার দ্বিধা। ভাবগতিক গোড়া থেকে এদের এমন, আমি ধরে নিয়েছিলাম ছবি এরা সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করবে। নিষিদ্ধ করবে এর প্রদর্শনী। উলটোটা করলো, এটাই যেন বিরাট একটা ধাঁধা। অন্য কোন মতলব নেই তো এর পেছনে ?

নতুন করে ফের বসলাম সম্পাদনার টেবিলে। দু একটা অংশে কিছু ঘষা মাজা

দরকার! হঠাৎ কোর্টের মার্শালের কাছ থেকে টেলিফোন। কি ব্যাপার? না, শমন জারী হয়েছে আপনার নামে। রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের জন্য আপনাকে ওয়াশিংটনে এই সংক্রান্ত কমিটির সামনে হাজির হতে হবে। মোট উনিশজনের নামে এরকম শমন জারী করা হয়েছে।

এখন ফ্লোরিডা থেকে নির্বাচিত সিনেট সদস্য পেপার লস-এঞ্জেলেসেই আছেন। সবাই মিলে ঠিক করলাম তার সাথে আগে দেখা করে কি আমাদের করণীয় সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইবো। আমি গেলাম না। কেননা আমার নামে অভিযোগ ভিন্ন ধরণের। আমেরিকার নাগরিক আমি নই। বাকীরা দেখা করে সিদ্ধান্ত নিলো, যাবে না ওয়াশিংটন। নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন তুলে সরকারী ক্রিয়াকলাপের বৈধতা যাচাই করবে।

এতে কাজ হয় নি। শমন পেয়ে না যাওয়াটা আইনের চোখে অপরাধ। আদালত অবমাননার দায়। প্রত্যেকের এজন্য একবছর করে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

আমার শমনে নির্দেশ—হাতে আসার দশ দিনের মধ্যে যেতে হবে ওয়াশিংটন। দুদিন পরেই পেলাম আরেকখানা তার। তাতে লিখেছে, সময় আরো দশদিন বাড়িয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ মোট বিশ দিন। এর মধ্যে আমি যেন হাজিরা দিই।

ফের এলো আরো একখানা তার। তাতে আরো দশদিনের মেয়াদ বৃদ্ধি। তখন আমি তার পাঠালাম।—সঠিক করে কি আপনাদের বক্তব্য জানান। এতে কাজের ক্ষতি হচ্ছে আমার। ওয়াশিংটন যেতে হলে বিস্তর অর্থক্ষতির মুখে আমাকে পড়তে হবে। কেননা বিরাট সংগঠন আমার। আমি না থাকলে মাইনে গুণতে হবে তাদের। অথচ কাজ কিছু হবে না। বরং আমার বন্ধু হান্স্ আইলারকে যেমন অনুরূপ প্রশ্নে হলিউডেই জেরা করার ব্যবস্থা হয়েছে, আমার ক্ষেত্রেও যেন তেমন কোন ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ লিখলাম, কিছুটা অনুমানের ভিত্তিতেই আগাম কয়েকটি তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখি। আমি কম্যুনিষ্ট নই। কোন রাজনৈতিক দলের সাথে আমার যোগাযোগ নেই। ছিলোও না কোনকালে। তবে শান্তিকামী মানুষ আমি। এটা নিশ্চয়ই আইনের চোখে কোন অপরাধ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরো কিছু প্রশ্ন থাকলে আমাকে দয়া করে সত্বর জানাবেন আমার আদৌ আর ওয়াশিংটন যাবার প্রয়োজন হবে কিনা।

নীচে ধন্যবাদ জানিয়ে নাম সই করে দিলাম।

কদিন পরেই এলো জবাব। তাতে অবাক কাণ্ড। লিখেছে—আমার আর যাবার দরকার নেই। এই পর্ব এখানেই শেষ। এটা যেন আমি ধরে নিই।

২৯

নিজের ঝামেলা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, পারি না সময় করে কেমন চলছে আমাদের ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ কোম্পানী সে খোঁজখবর নিতে। কোম্পানীর তো ততদিনে যায় যায় দশা। আমার উকিল ফোন করে জানালো, লোকসানের পরিমাণ প্রায় দশলাখ ডলার। রমরমা অবস্থা যখন, বছরের হিসেবে দেখতাম চার থেকে পাঁচ কোটি অব্দি মোট লাভ। মনে পড়ে না কোন বছর দু বার পেয়েছি লাভের ভাগ। এদিকে ইংল্যাণ্ডের চারশো প্রেক্ষাগৃহের কাছে শতকরা পঁচিশভাগ শেয়ার বিক্রী হয়েছে। সে বাবদও এক আধলা দেয় নি আমাকে কোম্পানী। কি ভাবে যে কি হয় কিছু বুঝি না। হয়তো এমনও হতে পারে, নগদে কিছু দেয় নি তারা, ছবি নিয়ে তারই প্রদর্শনী ফি বাবদ সেই টাকা কাটাকুটি করে দেবে। আমেরিকায় অন্যান্য ফিল্ম কোম্পানী অবশ্য নগদেই চুক্তি করে থাকে। এটা আমি ভাল ভাবে জানি। আমরাও এমন কিছু হেঁজি পেঁজি নই। শেয়ারের দাম এক একখানা এক কোটি ডলার। সে হিসেবও আমার অজানা নেই।

এখানে চলছে এক অদ্ভুত ব্যাপার। একে একে প্রতিটি শেয়ার মালিক কোম্পানীর কাছেই শেয়ার বিক্রী করে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাতে ভাণ্ডারে টান পড়াটাই স্বাভাবিক। সেই শেয়ার বণ্টন হয় যারা রয়ে গেছে তখনও, তাদের মধ্যে। একদিন শুনি মেরী আর আমিই শুধু মালিক। অর্ধেক করে অংশ আমাদের দুজনের। আর কাঁধে সেই দশ লাখ ঋণের বোঝা। মেরী চিঠি লিখে জানালো, অবস্থা সঙ্গীন। ব্যাঙ্ক বলে দিয়েছে আর আমাদের কোন রকম ঋণ দেবে না। কিসের দরকার ঋণের? এরকম আগেও অনেকবার হয়েছে। ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে করেছি ছবি। ছবি বাজারে অসম্ভব ভালো চলেছে। ব্যস, ঋণ শোধ। কোম্পানীর ঘরে নতুন করে জমা পড়েছে লাখে লাখে টাকা।

এবার সেরকমই হবে। আর বিশ্বাস। মঁসিয় ভার্দু ঝড় তুলবে বাজারে। আর্থার কেলী আমার প্রতিনিধি হিসেবে কোম্পানীতে আছে। বললো, কোন চিন্তা নেই। হাসতে হাসতে এক কোটি বিশ লাখ আমরা ঘরে তুলবো। তার মধ্যে দশ লাখ যাবে ঋণ শোধ হতে। হাতে থাকবে এক কোটি দশ লাখ।

হলিউডে প্রথম প্রাক্-মুক্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করলাম। তাতে হাজির টমাস মান, ফুটউইংগার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবি শেষ হবার পর প্রায় মিনিট খানেক ধরে

নানা ভাষায় আমাকে সাধুবাদ জানালেন। যাক, মোটের ওপর নিশ্চিন্তি!

আত্ম বিশ্বাসে ভরপুর তখন আমার মন। ছবি নিয়ে পাড়ি জমালাম নিউ ইয়র্কের দিকে। পৌঁছতেই প্রথম ধাক্কা। ডেলি নিউজ কাগজে জনৈক সাংবাদিক লিখলো—

'চ্যাপলিন এসেছেন নতুন ছবির মুক্তি উপলক্ষ্যে। তিনি বহিরাগত। এদেশের নাগরিক নন। যথারীতি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকবেন। এটা আমরা জানি। তার মুখদর্শন করতেও সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। সে যাই হোক সম্মেলনে তথাপি হাজির থাকতে হবে এটা ঘটনা। তখন কিছু প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাস্ করবো।'

কোম্পানীর কর্মকর্তারা বললো, কি করবেন? এ অবস্থায় কি সম্মেলনে হাজির থাকা উচিত?

কিসের ভয় আমার! আগের দিন সকালে বিদেশী কাগজের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। দু হাত তুলে সাধুবাদ দিয়েছেন আমাকে, উৎসাহ দিয়েছেন। কি আর প্রশ্ন করবে এরা? আসুক না, তারপর দেখা যাবে। আমি কি কারুর চোখ রাঙানিতে ভয় পাই!

পরদিন সকালেই সম্মেলন। হোটেলের সবচেয়ে বড় ঘরখানা ভাড়া নিলাম। আমেরিকার সব কাগজের সাংবাদিককেই ডাকা হয়েছে। এসেছে সবাই। পানীয় দেয়া হলো সকলকে। আমি এলাম। সুবিধে মনে হচ্ছে না। কি যে একটা থম খাওয়া ভাব ঘর জুড়ে! কেমন যেন অদ্ভুত রকমের চুপচাপ। একধারে আমার জন্যে ছোট্ট একটু বক্তৃতা মঞ্চ। দাঁড়ালাম গিয়ে সেখানে। যতখানি মিষ্টত্ব আছে আমার গলায় সবটুকু ঢেলে অতি অপূর্ব করে বললাম, স্বাগতম ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ। ছবির আলোচনা করবো বলে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এই সংক্রান্ত সব রকম প্রশ্নের জবাব আমি দেবো। বলুন, কার কি প্রশ্ন আপনাদের। দয়া করে এক সাথে সকলে বলবেন না। একজন একজন করে। তাতে জবাব দিতে আমার সুবিধে হবে। বলুন এবার। কি আপনাদের জিজ্ঞাসা।

কয়েক মুহূর্ত নীরব। তারপর এক মহিলা সামনের সারি থেকে বললেন, আপনি কি কম্যুনিস্ট?

—না। বলুন তারপরে।

ঘ্যাড়ঘেড়ে একটা শব্দ। প্রথমে ভাবলাম এ নিশ্চয়ই আমার সেই ডেলি নিউজ কাগজের বন্ধুবর। কিন্তু সে নয়। আসেনি। এ আর একজন। মস্ত এক ঢোলা ওভারকোট গায়ে। দেখতে কুটিল ভাব। হাতে কি. একটা লেখা কাগজ। তাই দেখেই পড়তে লাগলো।

কিছুই বুঝতে পারছি না। বললাম, আরেকবার বলুন। আমি এক বর্ণও বুঝতে পারি নি।

সে নতুন করে শুরু করলো পড়া,—সারা দেশের রোম্যান ক্যাথলিক যুদ্ধ ফেরৎ সৈনিকদের পথ থেকে....

বললাম, রোম্যান ক্যাথলিক যোদ্ধাদের কোন প্রশ্নের জবাব দেবো বলে আমি এখানে আসিনি। এটা ছবি সংক্রান্ত সাংবাদিক সম্মেলন। অন্য কোন প্রশ্ন করুন।

আরেকজন বললো, আপনি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি কেন?

—প্রয়োজন বোধ করি নি। আমি মনে করি আমি সারা পৃথিবীর নাগরিক।

বিরাট একটা আলোড়ন। দু তিনজন এক সাথে কি যেন বলার চেষ্টা করলো। সব ছাপিয়ে কানে এলো একজনেরই গলা,—কিন্তু পয়সা আপনি আমাদের দেশেই কামান।

হাসতে হাসতে বললাম, বিনিময়ে দিয়েও থাকি বিস্তর। সারা দুনিয়ায় আমার ছবি চলে। আমার মোট আয়ের সত্তর শতাংশ আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু তার ওপরেও আমেরিকা আমার কাছ থেকে আয়কর নেয়।

ফের সেই রোমান ক্যাথলিকের গলা শুনতে পেলাম,—টাকা কি দেন না দেন সেটা আমরা শুনতে চাই না। আমি ফ্রান্সে লড়াই করতে গিয়েছিলাম। আপনি কেন নাগরিক হন নি সেটা আমরা জানতে চাই।

—তবে এটুকুও জেনে রাখুন, আমি বললাম, আমার দুই ছেলে সীমান্তে এখনো মোতায়েন আছে, তারাও সৈনিক। সেটা আমি আপনার মতো গলাবাজি করে জানাবার প্রয়োজন মনে করি না।

আরেকজন বললো, আপনি হান্‌স্ আইলারকে চেনেন?

—চিনি। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। খুব উচ্চাঙ্গের সুরকার।

—আপনি কি জানেন আপনার বন্ধু কম্যুনিস্ট?

—জানবার প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের বন্ধুত্ব সবরকম রাজনীতির উর্ধ্বে।

আরেকজন বললো, দেখা যাচ্ছে বেছে বেছে আপনি কম্যুনিস্টদের সঙ্গেই খাতির জমান।

—খাতির কার সাথে জমাবো কি জমাবো না সেটা সম্পূর্ণ ভাবে ঠিক করার দায়িত্ব আমার। কারুর কথায় আমি নাচি না।

তখন একজন বললো, একটা প্রশ্নের সদুত্তর আমি পাই নি। যে মানুষ পৃথিবীকে দিয়েছেন এতো কিছু, আনন্দ দিয়েছেন, মানুষকে হাসিয়েছেন অবিশ্রাম—কেন আমেরিকার সাংবাদিকেরা তাকে সহ্য করতে পারে না? কি তার অপরাধ?

আমার তখন আর হুঁশ বলতে কিছু নেই। যা বলে সেটাই ভাবি অভিযোগ। ভাবি নিন্দা। বললাম, দুঃখিত। আপনার একটা কথাও আমি শুনতে পাই নি। দয়া করে আরেকবার বলুন।

কোম্পানীর প্রচার বিভাগের এক কর্তা দাঁড়িয়েছিলো আমার পাশে। আমাকে খোঁচা দিলো কনুই দিয়ে। বললো, আপনাকে গাল দিচ্ছে না, পক্ষে বলছে। ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিন।

জিম এজি সেই সাংবাদিকের নাম। একাধারে ঔপন্যাসিক ও কবি। তখন টাইম পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি তাকে ঐভাবে বলতে বাধ্য হয়েছি।

বললাম, আমি দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। দয়া করে আরেকবার বলুন। ঠিক শুনতে পাইনি আপনার সব কথা।

তখন মোটামুটি একই কথা একই ভাবে আবার বললো।

কি দেবো এর জবাব। কেন আমার ওপর রুষ্ট এটা সবাই জানে। তারও না জানবার কথা নয়। বললাম, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

তখন আমি ধৈর্যের সীমার বাইরে। নির্মম ভাবে আক্রমণ করছে এরা একের পর এক। পারছি না আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। বললাম, মাননীয় উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাবৃন্দ, আমি হতাশ হয়েছি আপনাদের প্রশ্ন শুনে। যতদূর জানা ছিলো এটা আমার ছবি সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলন। দেখছি ছবি বাদ দিয়ে সেটা এখন রাজনৈতিক কচকচিতে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার আর কিছু বলার নেই। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি।

খুব দুশ্চিন্তায় পড়লাম। ভারী দুর্বল মনের অবস্থা। একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যায়। আমার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। উত্তরোত্তর বাড়ছে সেটা। কমবার কোন লক্ষণ নেই। তবে আশার কথা এইটুকু, গ্রেট ডিক্টেটর ছবির আগেও এমন অনেক বিরূপ মন্তব্যের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছে। বিস্তর ঝড় গেছে আগের ক'দিন। কিন্তু ছবি মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে সব শেষ। প্রশংসায় সকলে তখন পঞ্চমুখ। গাদা গাদা চিঠি আছে দর্শকদের এখনো আমার কাছে। সব আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। মঁসিয় ভার্দু্র বেলাতেও নতুন কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এ ছবি দর্শকের মন কাড়তে বাধ্য। একথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

মেরী পিকফোর্ড টেলিফোন করে বললো, ছবির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সে আমার আর উনার সঙ্গে থাকতে চায়। আসতে বললাম। ডিনার খেলাম একসাথে। দেরী করে ফেলেছে মেরী। তাড়াতাড়ি তিনজন বেরিয়ে পড়লাম।

হলের বাইরে ভীষণ ভিড়। উন্মুখ জনতা। তার মধ্য দিয়ে পথ করে কোনক্রমে দোতলায় ওঠা গেল। তখন মাইকে ঘোষণা চলছে।—চার্লি চ্যাপলিন সস্ত্রীক এসে গেছেন। দেখতে পাচ্ছি তাঁদের। কিন্তু এ কি! সঙ্গে এ কোন্ অতিথি এলেন

আমাদের দরবারে! মেরী পিকফোর্ড বলেই তো মনে হচ্ছে। নির্বাক যুগের সেই যশস্বী অভিনেত্রী। অগণিত মানুষের হৃদয় সম্রাজ্ঞী। মিস মেরী, আপনি আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পর্কে কি দয়া করে সামান্য কিছু বলবেন?

ভীষণ ভিড় দোতলায়। এগিয়ে গেলো মেরী। আমি মেরীর হাতধরা। আমার হাত ধরে রেখেছে উনা। ঘোষক বললো, মিস মেরী আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঐ দেখুন। নিন এবার বলুন কিছু।

বলে এগিয়ে দিলো মাইক্রোফোন। মেরী শুরু করলো,—প্রায় দু হাজার বছর আগে জন্ম নিয়ে ছিলেন যীশুখ্রীষ্ট, আর আজ আমাদের সামনে

বলা শেষ আর হলো না। প্রচণ্ড চাপ দর্শকের। আমরা ছিটকে গেলাম একদিকে। তিনজনই। আশ্চর্য ব্যাপার। আগে কোনদিন এরকম দেখি নি। যে যার আসন গ্রহণ করলাম।

ঢুকে অব্দি সেই অস্বস্তি আমার। এ যেন পরিচিত দর্শক নয় চারধারে। নতুন এরা। উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। কিছু একটা প্রমাণ করতে চায়। কি সেটা? আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারছি না।

শুরু হলো ছবি। এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা আজ। অতীতের সঙ্গে এর কোন অংশে মিল নেই। শুরু থেকেই তারিফ দিতে শুরু করে দর্শক, হাসে, আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে—আজ যেন অন্যরকম। হর্ষধ্বনির বদলে সাপের শিস দেবার মতো কিছু ছি ছি শব্দ। সাপের মতোই নিষ্ঠুর যেন। হাসি যেন আঙুলে গুণে বলে দেয়া যায় মোট কটা। ঘৃণার বিষ জমে আছে যেন দর্শকের শরীরে। পেছনে কাগজের কারসাজি আমি জানি। সেই বিষই যেন ছিটিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

ভীষণ অস্বস্তি আমার। সহ্য করতে পারছি না। বসে থাকতে পারছি না একভাবে আসনে। উনাকে বললাম, তোমরা দেখো, আমি বারান্দায় গিয়ে একটু পায়চারি করি। অসহ্য লাগছে। তখন হাত চেপে ধরলো উনা। সান্ত্বনা দিলো। হাতের তালু আমার ঘামে জবজবে। কাগজ দিয়েছিলো একটা অনুষ্ঠানের বিবরণীর, ঘামে ভিজে সেটা যেন ন্যাকড়া তখন। বেরিয়ে এলাম। পায়চারি করতে লাগলাম। এ মাথা থেকে ও মাথা। শুনতে পাচ্ছি দর্শকের প্রতিক্রিয়া। হাসি বলতে গেলে নেই। একজন দুজন হাসছে যেটুকু। ভয়ে অমনি গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। যেন সন্ত্রস্ত। আর ধিক্কার উঠছে বারে বারে। সাপের ওগড়ানো বিষ। প্রমাণ করবে বলে এসেছে আজ দর্শক। মতলব নিয়ে। সর্বত্র সেই মতলবের ছোঁয়া আমি টের পাচ্ছি।

দু ঘণ্টা ধরে পায়চারি করে বেড়ালাম। কখনো বারান্দায়, কখনো রাস্তায়। ধৈর্য ধরে দাঁড়াতে পারি না কোথাও দু দণ্ড। যেন শেষ আর হবে না ছবি। চলবে অনন্ত-

কাল ধরে। শেষ হলো অবশেষে। প্রথম দেখা আর্ল উইলসনের সঙ্গে। নানান কাগজে লেখে। বললো, আমার খুব ভাল লেগেছে। 'আমার' কথাটা বেশ জোর দিয়ে বললো। তারপর এলো আর্থার কেলী। বললো, ছবি দারুণ। তবে এককোটি বিশ লাখ আর হলো না। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। বললাম, অতো না হোক আদ্ধেক তো হবে। আমি তাতেই খুশী

ছবি দেখার পরে নৈশভোজের পার্টি [illegible]তে প্রায় দেড়শো জন নিমন্ত্রিত। কিছু পুরনো বন্ধু বান্ধবও আছেন। সেখানে [illegible] বসে চলছে টেবিলে টেবিলে। এ বলে এক কথা, সঙ্গে সঙ্গে ও প্রতিবাদ করে পাল্টা যুক্তি দেয়। মিশ্র প্রতিক্রিয়া বলতে যা বুঝি সবাই। বিস্বাদ লাগলো খাবার। এমন কি অমন প্রিয় আমার শ্যাম্পেন—তারও স্বাদ যেন তেতো। ঊনা ফিরে গেলো হোটেলে। বললো, ঘুম পেয়েছে। আমি একটু পরে [illegible] বলে বসে গেলাম।

হার্বার্ট বেয়ার্ড সোপের সঙ্গে তখন জোর তর্ক চলছে জন স্টুয়ার্টের। সোপ্‌কে জানতাম নির্ভীক নিরপেক্ষ স্বাধীন মতামত দিতে অভ্যস্ত ব্যক্তি হিসেবে। দেখি তিনিও ভিন্ন মত। সামান্য কয়েকজন আমাকে অভিনন্দন জানাতে এলো। জন স্টুয়ার্ট বেদম মদ খেয়েছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থা। বললো, চার্লি, এই বেজন্মার বাচ্চাগুলো তোমার পেছনে লেগেছে তোমাকে হেনস্থা করবে বলে। ছবির মধ্যে রাজনীতির ভূত দেখতে পাচ্ছে। আমি তোমাকে বলছি, এতো ভালো ছবি আমি অনেক দিন দেখিনি। দর্শকরাও অনেকে তাই বলছিলো।

তখন আর মাথায় কিছু নেই আমার। কে কি বললো বা বলতে পারে বা বলবে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। প্রচুর গিলেছি মদ। ফাঁকা সব কিছু। আমার শূন্যতা। সেই অবস্থাতে স্টুয়ার্ট পৌঁছে দিলো আমাকে হোটেল অব্দি। বললো, চলো তোমাকে ঘরে ছেড়ে দিয়ে আসি।

লিফটে উঠলাম। থামলো লিফট। বললো, কত তলা এটা?

আমি বললাম, আঠারো।

—কত নম্বর ঘর?

নম্বর বললাম।

বলে, সর্বনাশ! এই ঘরেরই কার্নিশে বারো ঘণ্টা একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ছেলে এই কদিন আগে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

হয়তো আমারও উচিত ছিলো সেদিন আত্মহত্যা করা। সেই একটি মাত্র পথ আমার মুক্তির। পারিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়তে। কার্নিশে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হয় নি। আমি জানি 'মঁসিয় ভার্দু' আমার এ পর্যন্ত তোলা যাবতীয় ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই [illegible]

আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

নিউইয়র্কে এতো কিছুর পরও একটানা ছ সপ্তাহ চললো মঁসিয় ভার্দু। সে এক অপার বিস্ময় আমার। খুব ভালো বিক্রী। হঠাৎ শুনি ভিড় আর হয় না। হল্ ফাঁকা। কোম্পানীর তরফে গ্রাদ্ সিয়ারস্ দেখে ছবি বিক্রীর এই দিকটা। বললাম, কি ব্যাপার বলো তো? রাতারাতি ভোল বদল? বললো, এটা আপনার ছবির একটা বৈশিষ্ট্য। মুক্তি পাওয়ার পর প্রথম তিন চার হপ্তা দারুণ চলে। পুরনো দর্শকেরা নাম শুনে আসে ছবি দেখতে। তাদের দেখা শেষ হতে আসে সাধারণ দর্শক। তারা আসে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে। দ্বিধা এই কারণে কেননা কাগজ আজ দশ বছর ধরে সমানে লেগে আছে আপনার পেছনে। তাতে ফল হয়েছে এই তাদের মনে আপনার কাজ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তাইতেই ভিড় থমকে যায়।

—কিন্তু, আমি বললাম,—সাধারণ দর্শকের তো কৌতুকবোধ বলেও একটা জিনিস আছে। মজা তো তারাও পায়।

—পায়, কিন্তু তার প্রকাশটা হতে পারে না। কাগজে যদি এই সব লেখে নিয়মিত ভাবে···

বলে পর পর কয়েকখানা কাগজ খুলে দেখালো। তাতে আমার নামে অজস্র প্রশ্ন আর নিন্দাবাদ—

"চ্যাপলিন আমাদের দেশের কেউ না, বেড়াতে এসেছে দুদিনের জন্য।"

"লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও ওকে দেশ থেকে।'

"টাকা দেয় আমাদের। বিনিময়ে আমরা খোরপোষ দিই।"

"চ্যাপলিন বেইমান। চ্যাপলিন কম্যুনিস্ট দরদী।"

"ওকে রাশিয়ায় পাঠানো হোক।"

হতাশার মুখে কেউ হয় দার্শনিক, কেউ বা হাসি তামাশা দিয়ে গোটা ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করতে চায়। বুঝিনা আমি কি করবো। খবর দেখালো গ্রাদ, ছবিও দেখালো। কাগজে বেরিয়েছে, প্রেক্ষাগৃহের বাইরে বিক্ষোভরত মানুষের মিছিল। এটা সর্বৈব মিথ্যা, আমি হলফ করে বলতে পারি। আজ অব্দি কোথাও বিক্ষোভের খবর পাই নি। সাজিয়ে তুলেছে ছবি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পথ ঘাট খাঁ খাঁ, প্রেক্ষাগৃহের ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় কেউ নেই। এতো কিছুর পরও দর্শক বর্জন করলো না ছবি। যেমন চলছিলো ঢিমেতালে চলতে লাগলো।

তখন চিঠি দিলো ভয় দেখিয়ে। আমেরিকান লিজিয়নের পক্ষ থেকে। বললো চ্যাপলিনের ছবি দেখালে সে প্রেক্ষাগৃহ তারা এক বছরের জন্য বর্জন করার আহ্বান

জানাবে। বিক্ষোভ করবে বাইরে। বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে পর্দা। জেনভারের একটা শো মাত্র দেখানো হলো। শুধু মুক্তির দিন। পরদিন থেকে বন্ধ। চিঠি দিয়ে জানালো আমাদের, তারা দুঃখিত ; এ ছবি আর তাদের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়।

যেন নিঃস্ব রিক্ত শূন্য একেকটা দিন। ভালো লাগে না আর নিউ ইয়র্ক। যেন লজ্জায় গুটিয়ে গেছি, মরে আছি মরমে। রোজই আসে একের পর এক ছবি বাতিলের সংবাদ। রোজই একটু একটু করে সংকুচিত হই। নতুন মামলা দায়ের হয়েছে আমার নামে। গ্রেট ডিক্টেটর ছবির কাহিনী নিয়ে। নাকি চুরি করেছি অন্যের গল্প। সেটা পরিচয় লিপিতে লিখে ঋণ স্বীকার করিনি বা সাহিত্যিককে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিই নি। আসলে ঘৃণা—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। বিদ্বেষ আমার বিরুদ্ধে। সিনেটের চারজন সভ্য স্পষ্ট আমাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, জুরীর বিচার হবে। আমি যুক্তি তর্কের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারা মানলেন না।

একটা কথাই বলতে চাই এ প্রসঙ্গে। আমার নিজের ছবির কাহিনী সম্পূর্ণ ভাবে আমার এবং চিত্রনাট্য আমি নিজেই লিখে থাকি। এ ব্যাপারে অন্য কারো দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন আমার হয় না। মামলা শুরু হলো যথারীতি। হাকিম বললেন, তাঁর বাবা মৃত্যুশয্যায়। এমতাবস্থায় মামলা পরিচালনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আমরা যেন নিজেরাই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা নিষ্পত্তি করে নিই। বিরোধী পক্ষ এই কথার সূত্র ধরে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করলো। পারলাম না তার প্রতিবাদ করতে। ভাঙা মন তখন আমার, চতুর্দিকে হতাশা। কাগজ দাঁত কামড়ে লেগে আছে আমার পেছনে। অন্য সময় হলে মামলা চালিয়ে যেতাম শেষ পর্যন্ত। বাধ্য হলাম প্রস্তাবে সায় দিতে।

এক কোটি বিশ লাখের আশা এখন দূর-অস্ত্। খরচটুকু কোনক্রমে উঠে আসবে সেই যা সান্ত্বনা। কোম্পানীর তখন ঘোর দুরবস্থা। খরচ কমাতে আওয়াজ তুললো মেরী। বললো, আর্থার কেলীকে বাদ দাও। ওর অনেক টাকা মাইনে। আমি বললাম, বেশ আমি তো অর্ধেকের মালিক, আমার প্রতিনিধি যখন কোম্পানীর ঘাড়ে বাড়তি বোঝা, তোমার প্রতিনিধিও তাই। তাকেও ভাগাতে হবে। তাই নিয়ে এক কথায় দুকথায় ঝগড়া। বললাম, থাকবো না আমি আর এখানে। সব বিক্রী করে দেবো। তুমি যদি আমার অর্ধেক কিনে নিতে রাজী থাকো তো বলো কত দাম দেবে।

সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। কিছুতে আর নিষ্পত্তি হয় না। তখন বাইরে এক চিত্র পরিবেশক সংস্থা যোগাযোগ করলো। এক কোটি বিশ লাখ দাম তারা দেবে। তার মধ্যে নগদে সত্তর লাখ, বাকীটা কোম্পানীর কাগজে।

মেরীকে বললাম, অর্ধেকে আমার দরকার নেই। তুমি পঞ্চাশ লাখ আমাকে দিয়ে দাও। আমি লেখা পড়া করে সব তোমাকে দিয়ে দেবো।

মেরী বললো, বেশ তাই হবে।

সেই মর্মে কাগজ পত্র তৈরী অব্দি হলো। ফোন করে বললো উকিল, আর দশ মিনিট। তার পরই আপনি পঞ্চাশ লাখ ডলারের মালিক হবেন।

দশ মিনিট পরে ফের টেলিফোন।—হলো না। সই করতে কলম তুলে নিয়ে হঠাৎ মেরী বললেন অসম্ভব, চার্লি নিজেরটুকু বেশ গুছিয়ে নেবে, আর আমি হাঁ করে বসে থাকবো দু'বছর। মজা নাকি? আমি সই করবো না।

তখন অনেক বোঝানো হলো, নানান জটিল হিসেব।

কিছুতেই রাজী হয় না মেরী। বলে না না, সেটি হচ্ছে না। আমার দুবছর ধরে অনেক বেশি ট্যাকসো গুণতে হবে। বিশলাখ বেশি পেলাম তাতে কি এসে যায়। যাই হোক, শেষ অব্দি নতুন আর একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ হলো। কিনে নিলো তারা। দাম মোটের ওপর ভালোই পেয়েছিলাম।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে একটু ধাতস্থ হলাম। মন এখন শান্ত। মঁসিয় ভার্দু নিয়ে যা তীয় চিন্তা শেষ। ভাবি না আর। নতুন ছবির কথা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। স্থির বিশ্বাস আমার আমেরিকার ব্যাপক মানুষ এখনো আমাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন। এমন নয় রাতারাতি তারা রাজনীতিক বনে গেছেন। বা ভুলে গেছেন হাসতে। চাই আরো ছবি। ছবি মনের সব ভুল বোঝাবুঝি দূর করে।

একটা জিনিস অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বুঝেছি,—দুনিয়ার মানুষ ভালবাসে প্রেমের গল্প। আবেগ যে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বড়, এটা বারবার প্রমাণ হয়েছে। আমিও করবো এবার ভালবাসার ছবি। তাতে থাকবে আশা থাকবে অফুরন্ত প্রেম। মঁসিয় ভার্দুর ঠিক বিপরীত। মোটমাট মনের মধ্যে এরকম চিন্তাই কদিন ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আঠারো মাস লেগেছিলো মোট 'লাইমলাইট' ছবি শেষ করতে। প্রস্তুতির অংশই বেশি। বারো মিনিটের ব্যালে নাচের একটা সুর আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম। ভারী কঠিন কাজ। সুরের সঙ্গে নাচের কাহিনী মেশানো কম কথা নয়। কাহিনীটা পুরোপুরি তখন কল্পনায়। অন্যান্য ছবির সুর সংযোজনা করতে এমন নাকাল হতে হয় নি। শেষ হয়ে গেছে দৃশ্যগ্রহণ। প্রতিটি দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি সুর তৈরী করেছি। সেটা এমন কিছু ঝঞ্ঝাটের কাজ নয়। আমার ধারণা সুর সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞান থাকলে যে কেউ এটা পারেন।

সুর তৈরী শেষ। এবার নাচ তোলার প্রশ্ন। তারও আগে সুরটা ব্যালে নাচের

উপযোগী হলো কিনা সেটা যাচাই করারও প্রয়োজন আছে। আন্দ্রে এগ্লেভ্স্কিকে তলব করলাম। ভীষণ ভালো লাগে আন্দ্রের নাচ। বলতে গেলে আন্দ্রের আমি ভক্ত। তা তিনি তখন নিউইয়র্কে। ফোন করে বললাম, ছবির জন্য 'নীল পাখী' নাচটা করতে পারবেন কিনা। সুর আমি তৈরী করেছি সে কথাও বললাম। শুনে বললেন, সুরটা আগে একদিন এসে শুনে তারপর বলবেন।

মোট প৲াশ রকম যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে আমাকে সুর তুলতে। সংশয় তবু যায় না। যদি না মেলে। যদি নাচের সঙ্গে ঠিক ঠিক না খাপ খায়! এলেন আন্দ্রে। সঙ্গে মেলিসা হেডেন। অপূর্ব ছন্দোময় তার নাচ। আন্দ্রের জুড়ি হিসেবে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই নাচেন তখন। শুনলেন খুব মন দিয়ে। আমার তো বুকের ধুকপুকুনি আর কমে না। শুনে বললেন, অপূর্ব। ব্যালে নাচের কায়দাতেই তৈরী হয়েছে। অনবদ্য সুর। শুনে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

এদিকে মস্ত সমস্যায় পড়েছি নায়িকাকে নিয়ে। পছন্দ আর হয় না। আমি চাই এমন একজন যে একই সাথে সুন্দরী হবে বিচক্ষণ হবে, এবং আবেগে হবে টইটম্বুর। কোথায় পাই সেরকম নায়িকা? বিস্তর বাছাই হলো। মন আর ওঠে না। শেষে বন্ধু আর্থার লরেন্টস বললো ক্লেয়ার ব্লুমের কথা। তাকেই শেষ অব্দি মনোনীত করলাম।

ভুলে গেছি সব ঘৃণার কাহিনী। মনে নেই কিছু। এখন শুধু কাজ আর কাজ। নেশা যে আমার। সব বাষ্পের মত উবে গেছে! চারটি সন্তানের মা হয়েছে উনা। জেরাল্ডিন, মাইকেল, যোশি আর ভিকি! বেভারলি হিলস্ ভরে উঠেছে নতুন প্রাণের স্পন্দনে। ভালো লাগে এখন বেশ। রবিবার আসে অজস্র বন্ধু বান্ধব। সবার সঙ্গে দেখা করি আজকাল। আসে জিম এজি। হলিউডে আছে এখন। জন হিউসটনের আগামী ছবির জন্য চিত্রনাট্য লিখছে।

আসে উইল ডুরান্টও। একাধারে লেখক এবং দার্শনিক। হলিউডেই আছে। একসাথে খাওয়া দাওয়া করি প্রায়ই। প্রাণ প্রাচুর্যে সদাই ভরপুর। বলে কোনরকম উত্তেজক কিছু খাবার নাকি তার দরকার হয় না। জীবনের বিচিত্র গতি প্রকৃতি নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকার হাজারো কৌশল তার জানা আছে। আমার কাছে জানতে চেয়েছিলো একদিন, সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার ধারণা কি। বলেছিলাম, সৌন্দর্য একই সাথে দুয়ের সংমিশ্রণ। দ্বন্দ্ব এক ধরনের। যেমন হাসি—তারই মধ্যে বিপদ। মৃত্যু—তারই মধ্যে অপরূপতা। ঠিক কবিরা যেভাবে ভেবে থাকেন। ময়লা ফেলার একটা পাত্র, তার মধ্যে এক চিলতে রোদ। কিংবা নর্দমায় ভেসে যাচ্ছে একটা গোলাপ ফুল। এল্ গ্রেকো এই সৌন্দর্য দেখেছিলেন ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মধ্যে। তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ করে।

ডগলাসের ছেলে বসালো ভোজের আসর। দেখি অতিথিদের মধ্যে ক্লিমেন্স ডেন আর ক্লেয়ার বুথ লিউসও হাজির। সাদা একটা পরচুলা পরেছে ক্লেয়ার। আর দামী পোশাক। দেখতে লাগছে অপরূপা। বহুদিন আগে দেখেছিলাম হার্স্টের পার্টিতে। চোখ ধাঁধানো রূপ তখন। এখনও বিশেষ হেরফের হয় নি। দেখি ভীষণ লেগেছেন আমার বন্ধু জর্জ মুরের পেছনে। কেবল নানান ভাবে তাকে নাকাল করার ফিকির। বললেন, হ্যাঁ মশায়, আপনি তো আচ্ছা ঘোরেল মানুষ। এতো টাকার মালিক কি করে হলেন?

এর কি জবাব কেউ দেয়? বিশেষ করে এতোগুলো মানুষের মাঝখানে? জর্জ বললো, স্রেফ কয়লা বেচে। আর হিচককের সঙ্গে পোলো খেলে। আর ঐ যে মানুষটা—আমি তখন সামনে দিয়ে যাচ্ছি, আমাকে আঙুল দিয়ে দেখালো,—এই মানুষটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। চেনেন তো একে? এর নাম শ্রীমান চার্লি চ্যাপলিন। মহিলাকে আগে ভাবতাম ভীষণ অহংকারী। সেদিন থেকে ধারণা বদলালো। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। আমেরিকার রাজনীতিতে বিশ্ব অর্থনীতিবাদের অন্যতম বক্তা বলে প্রসিদ্ধ।

ধর্মের ওপরে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন। চমৎকার। [ইদানীং শুনি ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী।] আমি বলেছিলাম, দেখুন ধর্ম হলো মানুষের ভেতরের ব্যাপার। কপালে খ্রীষ্ট ধর্মের তকমা এঁটে ঘুরে বেড়ালেই সে যে খ্রীষ্টের পরম উপাসক, এটা প্রমাণ হয় না। ধর্ম সবার মধ্যেই আছে। সাধুর মধ্যেও যেমন, শয়তানের মধ্যেও তেমনি। তফাৎ বোঝা যায় শুধু কাজে।

জানিনা এটুকু বলার জন্যে কিনা,—ভারী হাল্‌কা লাগছিল সেদিন মন, যেন মস্ত একটা ভার নেমে গিয়েছিলো বুক থেকে।

'লাইমলাইট' শেষ করে বেশ তৃপ্তি পোলাম। নিশ্চিন্তিও বটে। এ ছবি জনমন জয় করবে এ ব্যাপারে এতোটুকু সন্দেহ নেই। আমি হলফ করে বলতে পারি নিতান্ত পরিচিত কয়েকজনকে ছবি দেখালাম। এটা মুক্তি পাওয়ার আগে। একবাক্যে সকলেই সাধুবাদ দিলো। এবার ইওরোপ রওনা হবার পালা। সঙ্গে ছবি নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। উনাও যাবে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর ব্যাপারে ইদানীং ভারী উদ্বিগ্ন। হলিউড ওর দুচোখের বিষ। লণ্ডনের স্কুলে ভর্তি করবে সেরকমই বাসনা। সেই কারণেই সদলবলে আমাদের ইওরোপ যাত্রা।

তিন মাস আগে থেকেই শুরু করেছি তোড়জোড়। বেড়াবার পরে যাতে দেশে ঢোকার ছাড়পত্র পাই, তার জন্য দরখাস্ত করে দিয়েছি সেই কবে। তার জবাব আর আসে না। এদিকে বেড়াতে যাবো, তাই আগে থেকে আয়কর সংক্রান্ত হিসেব নিকেশ

মেটানোও শেষ। কোথাও কোন ব্যাপারে আপত্তি তোলার মত কিছু নেই আর কি।
হঠাৎ দেখি আভ্যন্তরীণ রাজস্ব দপ্তরের এক ফরমান এসে হাজির। তাতে লিখেছে,
আমার কাছে পাওনা নাকি এখনো অনেক। ইওরোপ যাওয়ার আগে সব মিটিয়ে
যেতে হবে। তখন ঝামেলা এড়াবার জন্যে বিশ লাখ ডলার আমি দপ্তরে জমা দিলাম।
যা ওদের দাবী, তার প্রায় দশগুণ। একবার ভেবেছিলাম দেবো না এক আধলাও, যা
খুশী ওদের করুক। দেখি তাতে লাভই হয়েছে। দাবীর চেয়ে অনেক কম টাকা কেটে
ফেরত দিয়েছে আমাকে বাকী টাকা।

তবে আরকি, এখন তো আর কোন চিন্তা নেই। ছাড়পত্র নিয়ে আরেকবার
চিঠি বরং লিখি। লিখে জমা দিলাম রাতারাতি। দিনের পর দিন যায় জবাব আর
আসে না। তখন ওয়াশিংটনে সিধে চিঠি লিখলাম। সরাসরি বলে দিলাম যদি
ঢোকার ছাড়পত্র আমাকে না দেয়, আমি পীড়াপীড়ি করবো না। যাবো ঠিকই। এবং
সেক্ষেত্রে বিনা ছাড়পত্রেই জবরদস্তি ঢুকে পড়বো।

এক হপ্তা পর বিদেশ দপ্তরের জনৈক কর্তা টেলিফোনে বললেন, কিছু জিজ্ঞাসার
প্রয়োজন আছে। আমাদের বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে। যদি আমার বাড়িতে এসে
আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তবে কি আমার কোন অসুবিধে আছে।

বললাম কোন অসুবিধে নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন।

মোট এলেন চারজন। একজন তার মধ্যে মহিলা। সঙ্গে টাইপ মেশিন।
বাকি তিনজনের হাতে ছোট ছোট চৌকোণা বাক্স। তাতে টেপ রেকর্ডিং যন্ত্র।
দলপতি বলে যাকে মনে হলো তিনি ঢ্যাঙা দেখতে, সুশ্রী, কিন্তু মুখের রেখা কঠিন।
ভারী থমথমে ভাব চারজনেরই। গতিক সুবিধের নয় দেখে আমি আমার উকিলকে ফোন
করে আসতে বললাম।

দালানে নিয়ে গিয়ে বসালাম। মেয়েটি একটা টেবিলের ওপর টাইপ মেশিন রেখে
তার সামনে বসলো। বাকীরা বসলো সোফায়। বাক্স খুলে মেশিন চালিয়ে দিলো।
দলপতি পেটমোটা একখানা ফাইল বের করে পাতা ওলটাতে লাগলেন। আমি বসে
আছি মুখোমুখি। বাকীরা চুপ।

শুরু হলো জেরা।

—চার্লি চ্যাপলিন কি আপনার আসল নাম?

—হ্যাঁ।

—কেউ কেউ বলে আপনার নাম নাকি····কি একটা যেন বললো, বিদেশী শব্দ,
আমার ঠিক মনে নেই। বললো, আপনার জন্ম নাকি গ্যালিসিয়ায়?

বললাম, না আমার বাবারও নাম চার্লি চ্যাপলিন। আমার জন্ম লণ্ডনে।

—আপনি বলে থাকেন আপনি কোনদিন কম্যুনিষ্ট নন। তাই কি?

—হ্যাঁ। আমি জীবনে কখনো কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হই নি।

—কিন্তু একটা বক্তৃতা একবার দিয়েছিলেন তার শুরুতে বলেছিলেন কমরেড্‌স্‌—বেছে বেছে এই শব্দটি ব্যবহারের তাৎপর্য জানতে পারি কি?

—অভিধানে কথাটির যে অর্থ আছে তার বাইরে অন্য কিছু আমি বলতে চাইনি। আমি মনে করি প্রতিটি শব্দের ওপরই দলগত নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমান অধিকার অছে।

—আপনি কি কখনো পরস্ত্রী ভোগে লিপ্ত ছিলেন?

বললাম, তার আগে স্পষ্ট ভাবে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনারা কি ছল ছুতো করে নানান ভাবে চান আমি যাতে দেশে আর না ঢুকতে পারি? যদি তাই হয় তবে আমি অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকবো। অহেতুক আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেবো না।

বললো, আপনি ভুল বুঝছেন আমাদের। এটা নিয়ম। এ রকম প্রশ্ন সকলকেই করতে হয়। বললাম, জ্ঞানতঃ আমি কখনো পরস্ত্রী সংসর্গ করিনি।

—এই দেশ আক্রান্ত হলে আপনি কি দেশের জন্য লড়াই করতে রাজী?

—অবশ্যই। আমেরিকা আমার দেশ। চল্লিশ বছর এখানে আমি আছি। আমার ঘর বাড়ি এখানে। স্বভাবতই দেশের প্রতি ভালবাসা আমার কিছু কম নয়।

—কিন্তু আপনি কখনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি।

—কোন আইনে নেই নাগরিকত্ব আমাকে গ্রহণ করতেই হবে। আমি নিয়মিত ভাবে কর দিয়ে থাকি।

—পার্টি করেন কেন?

—কোন পার্টি নাম বলুন। তারপর আমি বলবো করি কি করি না বা কেন করি।

কয়েক মুহূর্ত নীরব। অসহ্য লাগছে আমার। ধৈর্যের সীমার বাইরে। বললাম, জানেন কেন এতো সব ঝঞ্ঝাট? কি তার গূঢ় রহস্য?

মাথা নাড়লো সে। বললো, না জানে না।

—আপনার সরকারকে আমি খুশী করতে গিয়েছিলাম সেটাই আমার অপরাধ।

অবাক চোখে ভ্রূ তুলে আমার দিকে তাকালো।

বললাম, শুনুন তবে সে কাহিনী। সানফ্রান্সিস্কোর সভায় রাশিয়ার যুদ্ধত্রাণ ব্যাপারে বলবার কথা ছিলো জোসেফ ডেভিসের। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত। আপনার সরকারেরই মাননীয় পদস্থ কর্মচারী। শেষ মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির থাকতে অনুরোধ করা হয়। করেন আপনারই সরকারের জনৈক পদস্থ

কর্তাব্যক্তি। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে সেখানে যাই এবং বক্তৃতা করি। এটাই আমার বিরুদ্ধে ঘোর অভিযোগ।

প্রায় তিনঘণ্টা চলেছিলো জেরা। দিন সাতেক পর ফোন করে জানালো আমি যেন বিদেশ দপ্তরে গিয়ে দেখা করি। সঙ্গী হিসেবে আমার উকিলও যান। এটা তারই ইচ্ছা। আমাকে আরো কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মধ্যবয়েসী জনৈক ভদ্রলোক বিদেশ দপ্তরের কর্তা। হাসিখুশি দেখতে। কথাবার্তাও চমৎকার। আমাকে বললেন, লস এঞ্জেলেসে তারা শাখা অফিস খোলার ব্যবস্থা করেছেন। তখন ঝামেলা অনেক কম হবে। সুদূর ওয়াশিংটন পর্যন্ত যাতায়াতের বিড়ম্বনা আর পোয়াতে হবে না। দেরী যে হলো এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। তবে হ্যাঁ, আরেকটি প্রশ্ন আছে জানবার। কতদিন আমি বাইরে থাকবো।

বললাম, কোন অবস্থাতেই ছ মাসের বেশি নয়। আমরা ছুটি কাটাতে বিদেশে যাচ্ছি।

—সেক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখি। যদি আরো কয়েকদিন বেশি আপনার থাকবার ইচ্ছে হয়, তবে দয়া করে মেয়াদ জানিয়ে আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখবেন। আমরা মেয়াদ বাড়িয়ে দেবো। বলে একখানা অনুমতি পত্র দিলেন। আমার উকিল খুঁটিয়ে দেখলো। বললেন, এখানে একটা সই করুন। অন্য কাগজপত্র তৈরী হচ্ছে। একটু পরেই পেয়ে যাবেন।

সই করে দিলাম। মুচকি হাসলেন, অনুলিপি আমাকে দিলেন। বললেন, কদিন তো আর আমাদের কথা মনেও থাকবে না! তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

সেদিন শনিবার। রবিবার ভোরের ট্রেনে নিউইয়র্ক রওনা হবো। সঙ্গে থাকবে উনা আর আমার চারটি সন্তান। উনাকে বলেছিলাম, ব্যাঙ্কে যেতে, যা জমা আছে সব যেন তুলে নিয়ে আসে। আমার শেষ সম্বল। আসে নি উনা। হাতে মাত্র দশ মিনিট সময়। ব্যাঙ্ক যাবে বন্ধ হয়ে। তড়িঘড়ি ব্যাঙ্কে গেলাম। তুলে আনলাম নগদে জমা যা ছিলো সব। বাকী যা রইলো সব লকারে।

যাত্রার ঠিক আগে। ভেতরে শেষ মুহূর্তের গোছগাছ করছে উনা, আমি বাইরে বাগানের একধারে। ভালো লাগছে না মন। এই বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাবো। আমার সুখ দুঃখ আমার জীবনের বহু ঘটন অঘটনের সাক্ষী এই বাড়ি। যেন অপরূপ শান্তির এক আশ্রয়। মন চাইছে না মোটে। তবু উপায় নেই।

হেলেনকে বিদায় জানালাম। হেলেন আমাদের বাড়িতে কাজ করে। হেনরিকে বললাম, যাই হেনরি। আমাদের খানসামা। অ্যানা এখন রান্না ঘরে। কানে একটু খাটো অ্যানা। বড় চমৎকার রাঁধে। বললাম, চলি। অ্যানার চোখে জল। জেরি এপস্টাইন এলো স্টেশন অব্দি। জেরি আমার ছবির সহকারী পরিচালক।

সাতদিন রইলাম নিউ ইয়র্কে। কেনাকাটা তখনো কিছু বাকী। জাহাজে উঠবো এখান থেকেই। ঘনিয়ে এসেছে দিন। তখন উকিল চার্লস্ সোয়ার্থ্জ এলেন নতুন সমাচার নিয়ে। ইউনাইটেড আর্টিস্টস কোম্পানীর প্রাক্তন এক কর্মচারী নাকি কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। নাকি কয়েক লাখ ডলার তার ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা। আমারও নামে নাকি শমন জারী হয়েছে।

চারদিন তাই দরজা বন্ধ করে ঘরেই কাটালাম। বেরোই না ভয়ে, যদি শমন ধরায়! ঘরে তো আর দেবার নিয়ম নেই। এদিকে বাকী সব কিছু মাটি। মনে ছিলো আশা দেখাবো ছেলে মেয়েদের নিউইয়র্ক। উনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো আমার বন্ধুদের—সব গেলো নষ্ট হয়ে। শুধু একটা কাজ খানিকটা জেদের বসেই করেছি।—লাইমলাইটের প্রাক্ মুক্তি প্রদর্শনী উনাকে দেখানো। আমিও সঙ্গে গিয়েছিলাম। শমন দিক কিংবা যাই হোক, আমার তখন বেপরোয়া মনের অবস্থা।

ক্রকার তখন আমার প্রচার অধিকর্তা। তারই উদ্যোগে 'টাইম' আর 'লাইফ' পত্রিকার সাংবাদিকদের সংগে একদিন বৈঠক হলো। মূল উদ্দেশ্য 'লাইম লাইট' ছবির প্রচার। সুবিধে মনে হলো না তেমন। পরিবেশে সেই থমথম গম্ভীর ভাব। কথা খুব মাপা। খাবারও যেন একান্ত বিস্বাদ। বলে না, লাভের গুড় খায় পিঁপড়েয়—আমারও সেই দশা। দুটো কাগজেই যাচ্ছেতাই লিখলো ছবি নিয়ে। নির্দয় নিষ্ঠুর সমালোচনা যার নাম। বড় মর্মাহত হলাম।

তবে বিস্ময়ও আছে। আশা যা কখনো করি নি তাই। নামকরা কিছু কাগজে বেরুলো দারুণ প্রশস্তি। অথচ এরা কেউ আমার মিত্র নয়। এটা আমি ভালো ভাবেই জানি।

ঠিক ভোর পাঁচটায় জাহাজে উঠলাম। ব্রাহ্ম মুহূর্ত বলে এই সময়টাকে। সে বড় অপরূপ। একটু একটু করে কাটছে অন্ধকারের ঘোর। পাৎলা হচ্ছে। আর মনের মধ্যে ভয় জমছে আমার। গভীর ভয়। যদি আসে পেয়াদা! যদি শমন ধরায়! উকিল বলেছে যেন ভুলেও না বেরোই কেবিন থেকে। অন্তত: জলসীমা পেরিয়ে যাওয়া অব্দি। তখন পাইলট নেমে যাবে জাহাজ থেকে। উঠবে সারেং। ভেসে পড়বো সমুদ্রে। তবে নিশ্চিন্ত।

অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম উকিলের নির্দেশ। কেবিনেই রইলাম। কত না ছিলো সাধ। উনার হাত ধরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো ডেকে। জাহাজ এগোবে একটু একটু করে। চাকায় কাটবে জল। ঢেউ উঠবে রিমঝিম ছন্দে। চমৎকার সে দৃশ্য। হলো না দেখা। মুখ বুজে স্থাণুর মতো বসে রইলাম কেবিনে। চার দেয়ালের আড়ালে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরের দৃশ্য দেখবার জন্যে সম্বল শুধু একটা পোর্ট হোল। তাতেও চোখ রাখতে সঙ্কোচ। কে জানে, যদি পেয়াদার চোখে চোখ পড়ে যায়।

জাহাজ ছাড়বার ভোঁ দিলো।

দরজায় ঘা। চমকে উঠলাম। উনা বললো, আমি। দরজা খোলো।

দরজা খুলতে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকলো।

বললো, জিম এজি এসেছে। ঐ দাঁড়িয়ে আছে জাহাজঘাটায়। আমাদের বিদায় জানাবে। আমি চেঁচিয়ে বলেছি, তুমি কেবিনে, বাইরে বেরুতে মানা আছে। তাই দেখা হবে না। তুমি বরং পোর্টহোল দিয়ে টুপি বের করে হাত নেড়ে ওকে জানান দাও।

তাকালাম ঘুলঘুলি দিয়ে। ঘুলঘুলির মতোই ছোট্ট এক চিলতে ফুটো। দাঁড়িয়ে আছে জিম। একটু দূরে এক দঙ্গল লোক। রোদ পড়েছে জিমের মুখে। ঘামছে। টুপি বের করে নাড়লাম। উনাও দেখেছে ফুটো দিয়ে। জিম দেখতে পায় নি। একই ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ডেকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সেই জিমের সঙ্গে শেষ দেখা। সেই দৃশ্য—দাঁড়িয়ে আছে সূর্যের নীচে, দঙ্গল থেকে আলাদা—মুখটা আজো আমার মনে পড়ে। সেই শেষ। দু বছর পরে শুনি জিম মারা গেছে হৃদ্‌রোগে।

জলসীমা পার হবো এবার। এগিয়ে চলেছে জাহাজ। পাইলট নেমে যাবে। দরজা খুলে বাইরে এলাম। আহ্ মুক্তি। মাথার ওপর আকাশ। নীচে অসীম অনন্ত সমুদ্র। দূরে ঐ নিউ ইয়র্কের সারি সারি পাঁচিল। চূড়া দেখা যায় আকাশের প্রেক্ষাপটে। ঝকঝক করছে ভোরের রোদ। লাগছে অপরূপ। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা অনুভূতি। ঠিক প্রকাশ করা যায় না ভাষায়। কিন্তু অদ্ভুত।

আর মনের গভীরে সেই উত্তেজনা। যাবো আবার ইংল্যাণ্ড। সপরিবারে। খুব ভালো লাগছে ভাবতে। ঝকঝকে নীল আটলান্টিকের জলরাশি। যেন আমারই মনের প্রতিরূপ। নিজেকে আর গণ্যমান্য বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। সব রকম রাজনৈতিক প্যাঁচ কষাকষির আমি উর্ধ্বে। আমার একটি মাত্র পরিচয় এখন।—সুখী পরিবারের আমি কর্তা। এই আমার স্ত্রী, পুত্রকন্যা। খুশীতে টগবগ করছে ওরা পাঁচজন। ঐ তো ডেকের ওপর। খেলছে ওরা মায়ের সঙ্গে। আমি চেয়ারে গা এলিয়ে বসা। বড় সুখী আমি। বড় তৃপ্ত। আর সব মিলিয়ে আশ্চর্য এক বিষাদবোধ। জানিনা কেন। কি তার কারণ। হয়তো তৃপ্তির গভীরেই থাকে এই বিষাদ। বড় কাছাকাছি মনের এই দুই বিরুদ্ধ অনুভূতি।

একটু পরে উনা এসে বসলো আমার পাশে।

তখন স্মৃতি রোমন্থন। পুরনো দিনের কত কথা। বন্ধুদের প্রসঙ্গ উঠলো। উঠলো বিদেশ দপ্তরের প্রসঙ্গ। শেষ মুহূর্তে বড় অপূর্ব ব্যবহার করেছিলেন দপ্তরের সচিব। কিছুটা অপ্রত্যাশিতই বলা যায়। মনে আছে সব। মনে থাকে এসব স্মৃতি। ভালবাসার কাঙাল যে মন। পারে কখনো ভুলতে?

উনার ইচ্ছে অনেক দিন ইংল্যাণ্ডে থাকার। আমারও। লাইমলাইটের মুক্তি উপলক্ষ্যে যাচ্ছি এটা ঘটনা। নিজস্ব কিছু কাজও আছে। কিন্তু সব কিছুর ওপরে ছুটি কাটাবার একটা মনোভাব। সেটাই বলতে গেলে এখন প্রধান।

পরদিন দুপুরের খাবার খেতে বসেছি। হ্যারি ক্রকারকে ডেকে জাহাজের এক কর্মচারী নিয়ে গেলো একধারে। হাতে দিলো একখানা তার। এক চমক চোখ বুলিয়ে পকেটে রাখতে গিয়েছিলো ক্রকার, দূত বললো উঁহু, ওঁকে দেখান। ওয়ারলেসে খবর পাঠাতে হবে উনি গ্রহণ করেছেন তার। আর দেরী করবেন না।

তখন ক্রকার আমাকে ডেকে নিয়ে গেলো কেবিনে। দেখালো। বিদেশ দপ্তরের পরোয়ানা। লিখেছে আমার আমেরিকায় ঢোকা নিষিদ্ধ। যদি এর পরেও প্রবেশের ইচ্ছে রাখি, তবে বিদেশ দপ্তরের অনুসন্ধান কমিটির সামনে হাজির হতে হবে। দুটি প্রধান অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে। নাকি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আমি লিপ্ত এবং নৈতিক অধঃপতন জনিত কাজে পারদর্শী। ক্রকার বললো, স্যর। আমেরিকার

সাংবাদিকেরা উন্মুখ হয়ে আছে আমার মন্তব্য শোনার জন্যে। সাগ্রহে অপেক্ষা করছে সারা দেশের মানুষ।

বলবো কি তখন আমার প্রতিটি স্নায়ু যেন বিবশ। ঢুকতে পারি কি পারি না সেটা বড কথা নয়। কি মন্তব্য করবো সেটাই এখন প্রধান। ইচ্ছে করছে বলি, যত তাডাতাড়ি মুক্তি পেতে পারি সেই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে ততই মঙ্গল। অপমানের চূডান্ত পর্যায়ে আমি পৌঁছে গেছি। নৈতিকতা বলতে সত্যিই আর কিছু আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। এটা ছাপিয়েও মনেব মধ্যে আর একটা চিন্তা পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। আমার যা কিছু সঞ্চয় যা কিছু সম্পদ সবই তো আমেরিকায়। যদি ওরা সব কিছু বাজেয়াপ্ত কবে। যদি আনতে না দেয় এক কপর্দকও। বিবৃতি দেবার সময় অতএব সতর্ক হওযার প্রয়োজন আছে। বললাম, এটাকে আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। আমি দেশে ফিরে যাবো এবং তাব জন্য যা যা করণীয়, সবই কববো। বিদেশ দপ্তর আমাকে যথারীতি আমেরিকায ফিরবার অনুমতি পত্র দিয়েছেন। সেটা যেহেতু সবকারেরই দেওয়া, সেটাকে আমি ছেঁডা কাগজ বলে এই মুহূর্তে ভাবতে পাবছি না।

ততক্ষণে সারা জাহাজ তোলপাড। সেই সাথে সারা দুনিয়াব সাংবাদিক। একের পব এক শুরু হলো বিবৃতি দানেব পালা। চললো কদিন ধরে। জাহাজ থামলো সাদাম্পটনে। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক সাংবাদিক। সংখ্যায প্রায় শ খানেক। এরা ইওরোপীয় নানান সংবাদপত্রের তবফ থেকে এসেছেন। আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। ছবি উঠলো বাশি বাশি। খাওয়ালাম পেট পুরে সবাইকে। মোটমাট আমি যে স্বাভাবিক, মনে আমাব বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, সেটাই প্রমাণ কবতে আমি উঠে পড়ে লেগেছি। কিন্তু চাইলেই কি আর পাবা যায়? মনের কোণে যে জমাট বেঁধে আছে মেঘ। দুশ্চিন্তার ঘন এক কুণ্ডলী। কি ভাবে দূব করি তাকে?

ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে কাটলো শেষ খানিকটা সময়। সাদাম্পটন থেকে চলেছি এবার লণ্ডনের দিকে। ভাবী চিন্তা উনা আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। দেখবে যে নতুন একটা দেশ—তার গ্রামীণ পরিবেশ, তার গাছপালা মাঠ মাটি—ভালো লাগবে তো?

ঐ তো সারি সারি পাহাড়। টিলা যেরকম। মাথার ওপর সার সার ঘর বাড়ি। উনা দেখছে সেই থেকে। এটা ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত। কেমন লাগছে তোমার?

বললো, একই রকম। নতুন কিছু নয়।

নতুনের ছোঁয়া মিললো একটু পরেই। গ্রামের পর গ্রাম আর সবুজ। আর অপরূপ। দৃশ্যপট একটু একটু করে বদলাচ্ছে। ভালো লাগছে উনার।

তারপর লণ্ডন। ওয়াটার্লু স্টেশন। সেই একই ভিড়। বুকে অগাধ ভালবাসা

নিয়ে এসেছে একপাল পাগল মানুষ। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তেজনা, সেই হুড়োহুড়ি। বেশ লাগছে আবার। সেই পুরনো দিনগুলোর স্মৃতি মনে পড়ছে।

স্যাভয় হোটেলের ছ তলায় স্যুইটে গিয়ে উঠলাম। আপাততঃ সব রকম উত্তেজনা থেকে দূরে। নিশ্চিন্তি লাগছে বেশ। বলতে গেলে আমরা কজন ছাড়া আর কেউ নেই। উনাকে নিয়ে দাঁড়ালাম বারান্দায়। ঘুরে ঘুরে চারপাশে সব দেখালাম।—ঐ দেখো ওয়াটার্লু ব্রিজ। এটা নতুন। ছোটবেলায় এই রাস্তা ধরে কত যে বেড়াতাম। বেশ লাগছে এখন। চারধারে অনন্ত নৈঃশব্দ্য। বুকের মধ্যে তন্ময় একটা ভাব। ঠিক দোলা লাগলে যেরকম হয়। যেন নতুন এক শহরে এসে উঠলাম এই প্রথমবার। আমার সামনে অবাধ দৃশ্যাবলী। যেন চির মধুর চির অতুলনীয়। কতবার তো কত ভাবে দেখলাম। কই পুরনো তো লাগে না কখনো। নিউইয়র্কে এক হোটেলের জানলা দিয়ে দেখেছিলাম সূর্যাস্তের দৃশ্য। আর একবার প্যারিসে—সেই আমার প্রথম কনকর্ড দেখার স্মৃতি। অপরূপ। কিন্তু কই—টেমসের কাছে এলে সব অপরূপ যে যায় ম্লান হয়ে। হৃদয় মন যে ভরে যায়। কেন হয় এমন। আমি কত প্রশ্ন করি নিজের কাছে, এ রহস্য উদঘাটন করবো বলে বুকের গভীরে উথাল পাথাল হাতড়ে বেড়াই। পাই না তার জবাব। কিছুতে পারি না আবিষ্কার করতে সেই রহস্য।

দাঁড়িয়ে আছি স্থির নিশ্চল। আমি আর উনা। সামনে অবাধ দৃশ্যসজ্জা। ভাল লাগছে উনার। ভেতরে ভেতরে চাপা একটা উত্তেজনা। এই তো সাতাশে পা দিলো উনা। বিয়ের পর থেকে কত ঝড় গেলো ওর মনের ওপর দিয়ে। কত যাতনা। সব সহ্য করেছে মুখ বুজে। বুঝতে দেয়নি কখনো নিজের মনের কষ্ট। অভিযোগ শুনিনি কখনো মুখে। ঢেলে দিয়েছে নিজেকে উজাড় করে। সেই মুখ আজ প্রসন্নতায় ভরা। অবাক চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া। রোদ পড়েছে মুখে। আর তন্ময় ভাব। বললো, অপূর্ব। আমার খুব ভালো লাগছে।

ভালো লাগছে আমারও। এ এক নতুন ভালো লাগা। নতুন করে আবিষ্কার করছি যেন সব কিছু। ঐ তো নদী—চির পুরাতন টেমস্। একটু কি বেঁকে গেছে নদীর ধারা। ঘর বাড়ি উঠেছে তীর ঘেঁষে। আকাশটা ঢেকে গেছে অনেকখানি। সময় যত এগিয়ে যায়, আকাশ একটু একটু করে ঢাকা পড়ে। এও বুঝি কোন চিরন্তন নিয়ম। আরো কত নিয়ম যে আছে পৃথিবীতে কে পারে বলতে।

উনাকে নিয়ে বেরুলাম। লাইসেস্টার স্কোয়্যার, পিকাডিলি—সে পিকাডিলি আর নেই। আমেরিকার ছোঁয়া পড়েছে সর্বত্র। জন্ম নিয়েছে ছোট ছোট রেস্তোরাঁ, দুধের দোকান, খাবারের দোকান, আরো কত কি। তরুণ সমাজের চালচলনে উগ্র আধুনিকতার ছাপ। তারা টুপি পরে না, মেয়েরা নীল রঙের জীনের প্যান্ট পরে। ঘোরাফেরা করে

স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। এতোটুকু বিকার বা লজ্জা বা সম্ভ্রমের বালাই নেই। মনে পড়ে পুরনো দিনের রীতিনীতির কথা। সেই পোশাক, হাতে সেই ছড়ি, মাথায় টুপি সে যেন বহু পুরাতন বহু প্রাচীন কোন ছবির মতো। তাতে আছে কিছু আবেগে মিশেল, আর পুরনোর প্রতি মোহ। পাল্টে গেছে সব। এমন কি সংগীতও। এখ শুধু ঝম ঝম গম গম বাজনা। আর নাচ। উদ্দাম উত্তাল। আর খুনোখুনি মা পিট। সবেরই কেন্দ্রবিন্দু নারী। সময় এখানে এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে।

তিন নং পাওনাল টেরাসে গেলাম। বাড়ি ফাঁকা। হা হা করছে শূন্যতা। ভে ফেলা হবে। নতুন করে তৈরী হবে বহুতল অট্টালিকা। আমার স্মৃতির সেই অলিন্দ সেখান থেকে এলাম ২৮৭ কেনিংটন রোডের বাড়িতে। সেই বাড়ি। সিডনী আ আমি থাকতাম এখানে বাবার সাথে। আর লুইজি। আর আমাদের সেই ছো ভাই। সেখানে এখন নতুন বাসিন্দা। বাড়িটারও খোল নলচে বদলে নতুন একপ্র রঙ চড়ানো হয়েছে।

ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে এই ভাবেই কাটছে দিন। এদিকে উৎকণ্ঠাও বাড়ছে। সমস্ত যে একরাশ। সব পড়ে আছে ক্যালিফোর্নিয়ায—আনতে হবে তো তার অন্তত কিছু। চেষ্টা করে যেটুকু যা পাবা যায়। সব চেয়ে আগে দরকার টাকা। এর জন্য উনাকে যেতে হবে। তার তো আর বাধা নেই যাতায়াতের। রীতিমতো নাগরিক বলতে যা বোঝায় তাই। দিন দশেকের ব্যাপার। ব্যাঙ্কের লকারে যা সঞ্চয় আছে সব খালি করে সাথে নিয়ে আসবে। গেলো তাই। ফিরলো যখন বিস্তর নতুন খবর পেলাম। ব্যাঙ্কে নাকি লকার খোলার ফর্মে সই করে জমা দিতে বেশ খানিকক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কেরাণী উঠে চলে যায় ম্যানেজারের ঘরে, সেখানে দীর্ঘক্ষণ চলে বৈঠক। উনা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। মনে উৎকণ্ঠা। শেষে সদয় হন কর্তৃপক্ষ। তখন লকার খোলবার অনুমতি মেলে।

বাড়িতেও গিয়েছিল একবার। বেভারলি হিল্‌সে। সব রয়েছে পরিপাটি। কোথাও এতোটুকু আঁচড় পড়েনি। সেই বাগান। সেই ফুল, সেই নৌকোর ধাপের আঙিনা। স্থির হয়ে চুপচাপ নাকি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলো উনা। চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছিলো। তখন হেনরি এসে ডাকতে সম্বিত ফিরে পায়। আমাদের খানসামা হেনরি। সুইজারল্যাণ্ডে দেশ। দু দুবার নাকি গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এসে তাকে জেরা করে গেছে। বলাবাহুল্য জেরার লক্ষ্য আমি। নানান তাদের জিজ্ঞাসা।—আমি মানুষটা কেমন, কার কার সঙ্গে পরিচয় আমার। বাড়িতে ছোকরা মেয়েদের নিয়ে নাচের আসর বসাতাম কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। জবাবে সে যখন বলেছে, আমি শান্ত নির্বিরোধ মানুষ। নাচে গাচে থাকতে ভালবাসি না, বৌ

ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরিবিলি কাটাতাম দিন। শুনে ভীষণ বিরক্ত হয়েছে তারা। তখন আমাকে বাদ দিয়ে তাকে নিয়ে পড়েছে। সে যে সুইজারল্যাণ্ডের মানুষ—কোথায় তার পাসপোর্ট, তাতে থাকার মেয়াদ কতদিন। মেয়াদ ঠিকমতো বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে কি?—এই সব অহেতুক জিজ্ঞাসা।

শুনে অব্দি পারে কি উনা আর সুস্থ থাকতে। রাগে তো সারা শরীর জ্বলছে। আর ঘৃণা। আর বিতৃষ্ণা। মোহমুক্তিও বলা যায়। বাড়ির ওপর যেটুকু বা মমতা ছিলো সব খতম। শুধু ভেতরে ভেতরে তখন জ্বলুনি। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে মন চায় নি। অমনি রওনা দিয়েছে। সেই শেষ। কত কাকুতি মিনতি হেলেনের—আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে হেলেন,—কত তার চোখের জল—সব অগ্রাহ্য করে এক পা দু পা করে বেরিয়ে এসেছে বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে।

এ তো গেলো উনার মনোভাব। আর আমি? আমাকে বন্ধুরা মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করে। জানতে চায়, আমেরিকা সরকারের এই যে আমার প্রতি বিরূপ কোপ—এটাকে আমি কি চোখে দেখি। আমি একটাই জবাব দিই। বলি, দেখুন সত্যি বলতে কি আমার যে দোষটা কি সেটাই আজ অব্দি সঠিক ভাবে আমি জানি না। না জানলে নিজের প্রতিক্রিয়া কেমন করে বলবো? এটা ঠিক, আমি কোন অবস্থাতেই কারো সঙ্গে আপোস করি নি। হয়তো সেটা এদের চোখে মহান এক অপরাধ। আর এক অপরাধ, নিজে কম্যুনিস্ট না হয়েও ওদের দলে মিশে কম্যুনিস্ট বিরোধিতা না করা। ওরা কম্যুনিস্টদের ঘৃণা করে, আমি করি না। এখানে ওদের সঙ্গে আমার তফাৎ। হতে পারে ওদের চোখে সেটা ঘোর অন্যায়। আমেরিকার স্বাধিকার রক্ষা সমিতি তো এরই জন্যে আমার ওপর বেদম চটে গিয়েছিল। সেটা আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু কি করবো আমি—আমার যে সমিতির ওপর কোন রাগ নেই। আমি যে ওদের অনেক কাজের প্রশংসা করেছি বা করি। যেমন ধরুন যুদ্ধ ফেরৎ দুর্গত সৈন্যদের ত্রাণের জন্য ওরা যা যা করেছে বা দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্যে সরকারকে দিয়ে যে সব আইন পাশ করিয়েছে—আমি তো অনেকবার বলেছি, সেগুলো ভীষণ ভালো, তাতে মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাই বলে নিজের ক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতা ডিঙিয়ে এই যে অন্যায় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, তাকে হেনস্থা করা, তাকে পাঁচজনের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে এই অজুহাতে বে-আইনী বলে নানান আইনের ঘায়ে কাবু করার চেষ্টা করা—এগুলো কি কোন ন্যায়নীতির মধ্যে পড়ে? এর নাম কি দেশপ্রেম? এই অদ্ভুত দেশপ্রেম যদি প্রশ্রয় পায়, তবে কালেদিনে তা সরকারের বিরুদ্ধে যাবে। এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

আমার সম্বন্ধে ওরা আর একটা অপবাদ দেয়—আমি নাকি আমেরিকা বিরোধী

কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলাম। একে চরম অসাধুতা ছাড়া আমার আর বলবার মতো কোন ভাষা নেই। এই অসাধুতাই ওদের শেষ সম্বল। পারে না যখন কোনভাবে কাউকে কাবু করতে, তখন এই সর্বশেষ পন্থাটির আশ্রয় নেয়। আরো অনেকের ক্ষেত্রে এই বাক্যটির ব্যবহার আমি দেখেছি। আমেরিকায় যারা সংখ্যালঘু, তাদের দমনের, কণ্ঠরোধ করার এটি একটি চির প্রচলিত প্রথা।

আরো একটা দোষ দেয়। ওরা বলে, আমি কেন এতোদিনেও আমেরিকার নাগরিকত্ব নিই নি। কেন নেবো? নেওয়া বা না নেওয়ার মধ্যে তফাৎটা কি? যদি পালটা আমিও বলি ইংল্যাণ্ডে বহু আমেরিকান নাগরিক বছরের পর বছর রুটি রোজগারের প্রশ্নে রয়ে গেছে এবং তারা আজ অব্দি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নেয় নি। যদি বলি খোদ এম. জি. এম-এর জনৈক কর্মকর্তা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব না নিয়েও ইংল্যাণ্ডে আছেন আজ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর এবং তাঁর রোজগার হপ্তায় সহস্র ডলারেরও অনেক বেশি। এটা কি কর্তৃপক্ষ জানেন না, না কি জেনেও না জানার ভান করেন? যদি জেনে থাকেন, কই তাকে তো একবারও বলেন নি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে।

পাঠক, ভাববেন না, এসব বলে আমি সাফাই গাইছি বা কৃতকর্মের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি। মার্জনা বা সাফাইয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই বই যখন আমি লিখতে শুরু করি, আমার কাছে প্রথম প্রশ্নটা এইভাবে এসে হাজির হয়—আচ্ছা, বই আমি কেন লিখছি? জবাবও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছিলাম এবং একটা নয়, অজস্র কেনর উত্তর। কিন্তু ঐ অব্দিই। অনেক অনুসন্ধান করে দেখেছি, জবাবের মধ্যে মার্জনার ব্যাপারটা একেবারেই নেই। কারুর কাছে দয়া ভিক্ষার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। আছে যা তা হলো ঘটনার বিশ্লেষণ এবং যুক্তির অবতারণা। যুক্তি দিয়ে বুঝেছি, সারা আমেরিকার মানুষকে কোন এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। বিষিয়ে তুলেছিলো তাদের মন। এতে সরকারী মদতও আছে। আমি পারি নি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বা কোন প্রতিকার করতে। পারা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিনিময়ে যা পেয়েছি তা শুধু রাগ আর ঘৃণা। সারা আমেরিকার মানুষ কি জানি কেন, হঠাৎই যেন আমাকে ভালবাসতে ভুলে গিয়েছিল।

লাইসেস্টার স্কোয়্যারে ওডিয়ন প্রেক্ষাগৃহে লাইমলাইটের শুভ উদ্বোধন। দিনক্ষণ পাকা। এদিকে মনে আমার দারুণ অস্বস্তি। —কেমন নেবে দর্শক? কিরকম হবে প্রতিক্রিয়া? এ তো আর চিরাচরিত কমেডি ছবি নয়। এর ধরন আলাদা। লাগবে তো ভালো? তো উদ্বোধনের আগে শুধু সাংবাদিকদের জন্য এক প্রদর্শনীর আয়োজন হলো। আমিও যথারীতি দেখতে গেলাম। বলবো কি, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার—নিজের ছবি দেখে নিজেই আমি অবাক। মুগ্ধও বলা যায়। তবে সব দৃশ্য দেখে নয়। কয়েকটা দৃশ্য

নিদারুণ ভাবে হতাশজনক। আবার কয়েকটা অপূর্ব। কয়েকজন সাংবাদিক পরে বলেছিলো, আমি নাকি দু এক জায়গায় কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার ধারণা আমি কাঁদি নি। আর যদি চোখ দিয়ে জল গড়ায়—তাতে দোষেরই বা কি। এমন কিছু অন্যায় তো করিনি। বরং নিজের কাজের এটা একটা যাচাই বলা যেতে পারে। লেখক যখন নিজের লেখা পড়ে কাঁদেন, বুঝতে হবে তার মধ্যে আবেগের মিশেলটা অনেক বেশি। আমার সব ছবি একই কারণে আমার ভালো লাগে। দর্শকের চেয়ে কিছু কম নয়।

উদ্বোধন রজনীর যাবতীয় অর্থ গেলো ত্রাণ ভাণ্ডারে। এটা সরকারী সিদ্ধান্ত। সেই উপলক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা। রাজকুমারী মার্গারেট এলেন ছবি দেখতে। আরো নানান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পরদিন থেকে উন্মুক্ত হলো সাধারণ দর্শকের জন্য। কাগজে বেরুলো সমালোচনা। তেমন একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নয়, তবু নিন্দাও নয়। তাতে কিন্তু ভিড়ের কামাই নেই। স্রোতের মতো সে শুধু মানুষ আর মানুষ। এদিকে আমেরিকায় ছবি ওরা বর্জন করেছে। সেই খবর পেয়ে ভিড়ের মাত্রা যেন আরো বৃদ্ধি পেলো। বিস্তর পয়সা পেলাম। বলতে গেলে অগাধ। এ অব্দি আমার অন্য কোন ছবিতে এতো টাকা আমি পাইনি।

প্যারিস যাবো এবার। লর্ড স্ট্রাবোল্‌জি আমাকে আর উনাকে নৈশভোজের নেমন্তন্ন করলেন। ভোজের টেবিলে আমি বসলাম হার্বার্ট মরিসনের পাশে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমার মনে থাকবে চিরদিন। শুনি তো মানুষটা আগাপাস্তলা সমাজতন্ত্রী, এদিকে দেখি পরমাণু প্রতিরক্ষার ব্যাপারে পূর্ণ সায় আছে। অবাক কাণ্ড। আমি বললাম, দেখুন পরমাণু শক্তিতে যতই সমৃদ্ধ হই না কেন আমরা, বিপদ কিন্তু তাতে কাটবার নয়। ইংল্যাণ্ডের ওপর সবার রাগ, আক্রমণ কিছু হবার হলে প্রথম এদেশের ওপরই হবে। এমন একটা বিরাট দেশও নয়। মাত্র ছোট বড় কয়েকটা দ্বীপ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও সারা পৃথিবীর তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

বাস্তবিক পরমাণু শক্তির প্রশ্নে আমার সুস্পষ্ট মতামত আছে। আমি মনে করি কোন পক্ষ অবলম্বন না করে আগামী দিনে পরমাণু যুদ্ধের মুখে ইংল্যাণ্ডের সব চেয়ে উপযুক্ত কাজ হলো নিরপেক্ষ থাকা। জানি যদিও যুদ্ধের মুখে নিরপেক্ষতার কোন দাম নেই, তবু আক্রান্ত হলে বলবার মতো মুখ থাকবে। এবং সেটাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। মোটমাট মরিসনের চিন্তার সঙ্গে মোটেই আমি একমত নই।

অবাক লাগে এইসব বুদ্ধিজীবীর কথাবার্তা শুনে। পরমাণু অস্ত্র সম্বন্ধে এরা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন। সঠিক কোন চিন্তার পরিচয় এ ব্যাপারে দিতে পারেন না। লর্ড স্যালিসবারির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও একই অবস্থা। দেখি মরিসনের মতো তিনিও বলেন পরমাণু যুদ্ধের প্রশ্নে জোট বাঁধতে। আমার মত ব্যক্ত করলাম। সেটা যথারীতি

তাঁর মনঃপূত হলো না।

দুনিয়াটাকে আজকের নিরিখে যেভাবে আমি দেখি সেটা মনে হয় এই অবকাশে ব্যক্ত করে নেওয়া ভালো। বড় জটিল আমাদের এই বর্তমান জীবন। ততোধিক জটিল আজকের এই যান্ত্রিক সভ্যতা। এর আক্রমণে আমরা চতুর্দিক থেকে ক্ষত বিক্ষত। সে রাজনীতির দিক থেকেই হোক বা বিজ্ঞানের দিক থেকে কিংবা অর্থনীতির দিক থেকে। ব্যাপক আওতার মধ্যে সব কিছুই পড়ে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে আমাদের মানিয়ে নিতে হয়। যার নাম আপোষ। সেইভাবেই গড়ে তুলতে হয় জীবনের প্রতিটি কার্যক্রম।

আমার মনে হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে চরম এই বিপর্যয়ের পেছনে রয়েছে সংস্কৃতিগত অন্তর্দৃষ্টির অভাব। সৌন্দর্যবোধ আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে—জীবনের সঠিক সৌন্দর্য চেতনা। অন্ধের মতো উন্মাদের মতো যা কিছু কুৎসিৎ তাকেই বরণ করা আজ আমাদের ধর্ম। ভালো মন্দ সব মিশে গেছে তালগোল পাকিয়ে। সেখান থেকে বেরুবার আর উপায় নেই। এখন শুধু লাভ আর ক্ষমতা আর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা। জীবনের এটাই একমাত্র প্রধান কাজ। এ ছাড়া যেন অন্য কিছু আজ আর আমরা ভাবতেও পারি না।

যেমন এই বিজ্ঞান। লক্ষ্য করে দেখুন তার ব্যবহারের দিকে। কোন চিন্তাশীল নীতিনির্দেশ তাতে নেই। নেই কোন দায়িত্বের ছাপ। নগ্ন নিষ্ঠুর ভাবে বিজ্ঞানের যা কিছু অবদান আজ গিয়ে জমা হয়েছে রাজনীতিবিদ এবং যুদ্ধবাজ শয়তানদের হাতে। সারা দুনিয়াকে সেই বিজ্ঞান দিয়ে আজ তারা পরাভূত করে রাখার ফন্দী আঁটে।

এতে ন্যায় নীতির কোন বালাই নেই। নেই কোন সুচিন্তিত বিচার বোধ। শুধু হত্যার নিষ্ঠুর বাসনা। সবাইকে নিশ্চিহ্ন করার মনোভাব। তার জন্য দরকার যুদ্ধ। এরা তাই যুদ্ধ চায়। আমরাও প্রকারান্তরে সেই যুদ্ধকেই সমর্থন জানাই।

ডঃ জে. রবার্ট ওপেনহাইমার একবার আমাকে বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে জানবার বাসনা অদম্য, অসীম। আমি একথা অস্বীকার করি না। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি, জানবার সময় পরিণতি কি হবে বা হতে পারে এই জ্ঞান অনেকেরই থাকে না। আমার এই কথায় ডঃ ওপেনহাইমার সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আসলে বিজ্ঞানীদের আমি একটু ভিন্ন চোখে দেখি। কখনও কখনও মনে হয় ধর্ম নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে যে সব উন্মাদ, মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, এরা তার চেয়ে কিছু কম নয়। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে তাদের ধর্ম। একের পর এক আবিষ্কার তাদের উন্মাদনারই বহিঃপ্রকাশ। ভবিষ্যতে কি হবে বা হতে পারে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবার অবকাশও তাদের তখন থাকে না। হয়তো প্রয়োজন টুকুও

বোধ করেন না। ঝড়ের বেগে চলে অগ্রগতি। আসে নতুন নতুন আবিষ্কার। তাকে কেন্দ্র করে আরো। তার জন্যে সম্মান জোটে, যশলাভ হয়। এবং এতেই তৃপ্তি। এর বাইরে সব কিছুকে তারা অহেতুক অর্থহীন বলে মনে করেন।

আর মানুষ—ব্যাপক অসংখ্য কোটি কোটি মানুষ। বেঁচে থাকার তাগিদ তাদের মজ্জাগত। এটা জীবনের প্রাথমিক শর্ত। তারই প্রয়োজনে আসে বিজ্ঞান, আসে নতুন নতুন উদ্ভাবনী দক্ষতা। আত্মার বিকাশ ঘটে আরো অনেক পরে। স্বভাবতঃই সেই হিসেবে বিজ্ঞান থাকে এগিয়ে। মানুষের ন্যায় নীতি মূল্যবোধকে সে অতিক্রম করে। তার ছোঁয়ায় জীবন ক্রমশ উন্নত হয়।

পাশাপাশি মানুষের মনের গভীরে কাজ করে পরহিত চেতনা। ধীর মন্থর তার বিকাশ। পারে না সে বিজ্ঞানের অগ্রগতির তালে তাল মেলাতে। দুর্বল তার প্রকাশ। মাঝে মাঝে মনে হয় এই বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। পরমুহূর্তেই দেখি বিশেষ কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বোধটাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই যে উত্থান, একে জীবনের সদগুণ বললে বোধহয় একটু বেশি বলা হয়। হৃদয়ের তাগিদ তেমন পাই না। কেননা বাস্তবতঃ পরহিত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। আজকের দুনিয়ায় হয়তো এটাই নিয়ম। আমার মনে হয়, মানুষের মধ্যে এই চেতনা কার্যকরী হলে কবে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য লুপ্ত হতো। বৈষম্য বলে কিছু থাকতো না। সরকারী দাক্ষিণ্যেরও আর প্রয়োজন হতো না। কি লাভ ঐ সব অহেতুক বদান্যতায়? ওতে কি সত্যি সত্যি দারিদ্র্য ঘোচে? লুপ্ত হয় বৈষম্যের বীজ? বরং আমার মনে হয় ঠিক বিপরীত। বৈষম্য দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে স্থায়ী হয়। দারিদ্র্য বরং আরো বাড়ে।

এর ব্যতিক্রম একমাত্র দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এটা আমার নিছক অনুমান নয়, বাস্তব প্রয়োগে এর সত্যতা যাচাই হয়েছে। আর কোন শক্তি এর চেয়ে বড় নয়। কেউ পারে নি আজ অব্দি এই শক্তিকে অতিক্রম করতে। দারিদ্র্য দূরীকরণে এর চেয়ে বড় বান্ধব আর বলতে গেলে কেউ নেই।

কার্লাইল বলতেন, পৃথিবীর মুক্তি আসবে মানুষের সমবেত চিন্তায় এবং মুক্তির প্রয়োজনে মানুষকে নানান ঘটনার আবর্তে পড়তে হবে।

ঠিকই। বিজ্ঞানকে যদি মুক্তির অন্যতম উপায় বলে ধরি তাহলে আজকের এই পরমাণু বিভাজন—এটাও মুক্তি লাভেরই পথ। কিন্তু মানুষ পড়েছে আজ উভয় সংকটে। তার সামনে আজ দুটি প্রশ্ন—নিজেকে সে ধ্বংস করবে না বাঁচিয়ে রাখবে। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আজ অত্যন্ত দরকার। ঘটনার আবর্ত তাকে ঠেলে দিয়েছে এই জায়গায়। জানিনা কোথায় এর শেষ। তবে আমার বিশ্বাস—এক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াবে পরার্থ বোধ। সমগ্র মানবজাতির প্রতি মানুষের শুভেচ্ছাই জয়ী হবে।

স্পষ্ট টের পাই, আমেরিকা ছাড়ার পর থেকে জীবনের গতি আমার সম্পূর্ণ পালটে গেছে। আশ্চর্য মানুষের ভালবাসা। প্যারিসে বা রোমে যে সম্বর্দ্ধনা পেলাম, তার তুলনা নেই। বীরের মতো আমাকে তারা বরণ করলো। রোমে রাষ্ট্রপতি ভিনসেণ্ট অরিয়লের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হলাম। প্যারিসে পেলাম সরকারী মর্যাদা। ফরাসী সরকার সৈন্যবাহিনীর সম্মানে আমাকে ভূষিত করলেন। শিল্পী নাট্যকার সমিতির পক্ষ থেকে আমাকে অতিথি সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো। সমিতির সভাপতি রজার কার্দিনান্দ সেই উপলক্ষ্যে লিখলেন এক মর্মস্পর্শী চিঠি। চিঠিখানিব হুবহু অনুবাদ এখানে তুলে দেবার লোভ আমি সামলাতে পারছি না।

প্রিয় চ্যাপলিন,

যদি কেউ প্রশ্ন করেন আপনার আগমন উপলক্ষ্যে কেন এতো প্রচারের ঘটা, কেন এতো হৈ চৈ—আমি সবিনয়ে তাকে বলবো, আপনি জানেন না কেন আমরা মানুষটাকে এতো ভালবাসি। বিগত চল্লিশ বছর ধরে আমাদের তিনি কি দিয়েছেন, কত আনন্দে আবেগে মথিত করেছেন আমাদের বুক, তার মানসিক মূল্যবোধের মাপ কতখানি—এর কিছুই আপনার জানা নেই। তাই আপনি তুলছেন এসব অহেতুক প্রশ্ন। আপনি অকৃতজ্ঞ। আপনি অসচেতন।

আপনাকে আমরা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি। পৃথিবীতে মহান ব্যক্তিত্ব বলতে যা বুঝি, আপনি তাই। যশ এবং সম্মানে আপনার নীতিগত অধিকার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তি হিসেবে আপনি যে কোন সম্মান দাবী করতে পারেন।

আপনি এক বিস্ময়কর প্রতিভা। কথাটির সার্থক ব্যবহারের আপনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধু কৌতুকাভিনেতা হিসেবে নয়, লেখক সুরকার প্রযোজক এবং সর্বোপরি উদার মানবিকতাবাদের প্রবক্তা হিসেবে প্রতিভাধর বিশেষণটি আপনারই প্রাপ্য। প্রয়োগে এমন অকপট সরলতার নজির আমরা আর কখনো দেখিনি। এই সারল্য আমাদের মথিত করে, স্বতস্ফূর্ত আবেদন জাগিয়ে তোলে হৃদয়ে। এর জন্য আলাদা ভাবে কোন কৌশল বা চেষ্টার দরকার হয় না। এখানেই আপনার সার্থকতা। জানিনা একে প্রতিভা বললে কম বলা হয় কিনা। এতে আমাদের ভালবাসার প্রকাশ ঠিকমতো হয় কিনা। বিকল্প অন্য কোন শব্দ আমাদের জানা নেই। শুধু আছে আপনার জন্য এক বুক ভালবাসা।

লাইম লাইট দেখে আমরা হেসেছি। প্রাণখোলা উদ্দাম অফুরন্ত সেই হাসি।

আবার কান্নায়ও বুক ভেসে গেছে। সেও সহজ সরল অনাবিল অশ্রু। যুগপৎ এই ভাবে হাসতে ও কাঁদতে আপনিই শিখিয়েছেন। আপনার প্রতি তাই আমরা কৃতজ্ঞ।

বাস্তবিক যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে কেউ পারে না খর্ব করতে। তার স্থায়িত্ব দীর্ঘকালব্যাপী। তার মূল্য অপরিসীম। আপনার মহত্বে আপনি সর্বকালজয়ী। আপনি সার্থক আপনার স্বতঃস্ফূর্ততায়। এর মূলে আপনার নিজের জীবন। তার দুঃখ, তার তাপ, তার আনন্দ, তার যন্ত্রণা। সব মূর্ত হয়ে দেখা দেয় আপনার ছবিতে। কোন নিয়ম সে মানে না। এতোটুকু চাতুরী বা ছলনার আশ্রয় তাকে নিতে হয় না। বিনিময়ে চায় শুধু একটু সান্ত্বনা। তারই প্রয়োজনে আসে হাসির খোরাক। আমরা হাসি। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের ঝলকানি। আড়ালে থাকে তার বেদনার ইঙ্গিত। হাসি শেষ হলেই আমরা তা টের পাই।

এ এক অপূর্ব শক্তি। বা বলা যায় এক ধরনের দক্ষতা। একই চোখে একবার দেখা দেয় আনন্দের ঝিলিক, পর মুহূর্তে তা বিষাদে ম্লান হয়ে আসে। জানি না কত মূল্য দিতে হয়েছে আপনাকে এই আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করতে। তবু এটুকু বুঝি এ আপনার নিজের জীবনেরই দৃশ্যকাব্য। প্রতিটি খুঁটিনাটি মিলিয়ে অপরূপ দক্ষতায় বারে বারে হাজির করেন সেই কাব্য আমাদের দৃষ্টির নিরিখে। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের মর্মস্পর্শ করে।

সব মনে আছে আপনার। সে অর্থে আপনি এক আশ্চর্য স্মৃতিধর। ছেলেবেলা থেকে প্রতিটি ঘটনাই আপনার স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে আছে। সেই জীবন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সেই বালকের কথা ভেবে আমাদের চোখে জল আসে। সব সে নীরবে সহ্য করেছে। সব ব্যথা, সব যন্ত্রণা। এজন্য কাউকে দোষারোপ করে নি। তারই আলেখ্য দেখিয়ে আমাদের মনে সঞ্চার করতে চান আশা। আমরা সেই আশায় ভর করে বেঁচে থাকি।

একজন শিল্পীর এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু হতে পারে না। তার নিজের জীবনকে এইভাবে দেখা। তাকে মূর্ত করে তোলা অভিনয়ে। দর্শক তাই বারে বারে আকুল হয়। মনে জন্ম নেয় গভীর মমত্ববোধ। আপনি ধন্য। ধন্য আপনার সাহিত্য। ধন্য আপনার রসবোধ, ধন্য প্রতিটি প্রযোজনা। নিখুঁত এবং সাবলীল। এর জন্য কোন আলাদা তত্ত্ব আমদানী করার প্রয়োজন হয় না। দরকার হয় না কোন কৌশলের। শুধু আত্মবিশ্বাস আর স্বীকারোক্তি। এর চেয়ে বড় তত্ত্ব আর কি হতে পারে? সব মিলিয়ে পরম কোন প্রার্থনাগীতির মতো। আপনি সেই সংগীতের হোতা। আমরা আপনার কণ্ঠে সুর মেলাই।

স্তব্ধ হয়ে থাকে সমালোচকের দল। তাদের মুখে বিরুদ্ধাচরণের ভাষা জোগায়

না। এদের আমরা চিনি। কোন কিছুকে নীরবে মেনে নিতে এরা কখনই চায় না। শুধু আপনার ক্ষেত্রে দেখি ব্যতিক্রম। পারে না কোন প্রতিবাদ জানাতে। পারে না কোন দৃশ্য নিয়ে এতোটুকু সমালোচনা করতে। এও এক আশ্চর্য গুণ। আমাদের মতো গুণগ্রাহীর দৃষ্টিতে এ আপনার পরম গৌরব। আমরাও এজন্য গর্ব অনুভব করি।

আজ যে এসেছেন আপনি আমাদের মাঝখানে, এ আমাদের গৌরব। লেখক শিল্পী নাট্যকার সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাকে পেয়েছি আমরা সভ্য রূপে, এ আমাদের পরম সম্মান। আপনাকে আমরা আমাদেরই একজন বলে মনে করি। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত নাটক যে কোন ক্ষেত্রে আপনি সমান পারদর্শী। আপনি আমাদের শিক্ষক। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে আমাদের।

আপনার মতো আমাদেরও জীবনের লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন। আমরাও চাই কাজের মাধ্যমে জনগণের মনে ছাপ ফেলতে। চাই তাদের জীবনবোধ গড়ে তুলতে। আনন্দকে তারা যেমন উপলব্ধি করে, আমরা চাই দুঃখকে তেমনই দরদ দিয়ে তারা বুঝুক। বুঝুক কাকে বলে সুখ আব কাকে বলে অশান্তি। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই জন্ম নিক সৌভ্রাতৃত্ব বোধ। এই আমাদের একান্ত আকাঙ্খা। ধন্যবাদান্তে

রজার ফার্দিনান্দ্।

লাইমলাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির হলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মন্ত্রীসভার সদস্যরা এলেন দল বেঁধে। এলেন ফরাসী রাষ্ট্রদূত। শুধু গরহাজির একজন। তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদূত। বলে পাঠিয়েছেন আসতে পারবেন না।

সম্মানিত অতিথি আমরা। একদিন আমাদের সম্মানে অভিনীত হলো মলিয়েরের 'ডন জুয়ান' নাটক। অভিনয়ে অংশ নিলেন ফরাসী দেশের নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীর দল। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন রাজকীয় নাট্যশালায় বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দেব মধ্যে আমি আর উনা। চারিদিক আলোয় আলোময়। তারই মধ্যে অভিনেতা অভিনেত্রীর দল অষ্টাদশ শতকের পোশাক পরে হাতে বড় বড় মোমবাতি নিয়ে এলেন আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে। অপূর্ব সেই মুহূর্ত। নিজেকে বিরাট একটা কেউকেটা মনে হলো।

রোমেও আতিথিয়তার কিছু ত্রুটি নেই। রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরা এলেন আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। সে ভারী মনোরম পরিবেশ। শুধু লাইমলাইটের উদ্বোধনের রাতে ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা। এমন হবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ঘটনাটা কি তাই বলি।

উদ্বোধন রজনীতে শিল্প সাহিত্য দপ্তরের মন্ত্রীর সাথে চলেছি প্রেক্ষাগৃহের দিকে। কাছাকাছি প্রায়। মন্ত্রী বললেন, চলুন আমরা বরং পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ি। বললাম, কেন? সামনের দরজা থাকতে পেছন দিক কেন? বললেন, ওদিকে খুব ভিড় জমেছে, আপনার ঢুকতে অসুবিধে হবে। বললাম, হোক অসুবিধে তবু আমি সামনের দরজা দিয়েই যাবো। এতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে দেখবে বলে, তাদের এড়িয়ে পেছনের পথ দিয়ে চুপিসাড়ে ঢোকা কি ঠিক!

দেখলাম ইতস্তত ভাব। তবু আপত্তি আর তুললেন না। তখন গাড়ি সামনের পথ ধরেই এগোলো। খানিক দূর যেতে দেখি ভিড়ে ভিড়াকার। পুলিস হন্যে হয়ে ভিড় সামলাচ্ছে। দড়ির টানা দিয়ে পথ আগলানো। আলোয় ঝলমল করছে চারধার। আমরা গাড়ি থেকে নামা মাত্র হৈ হৈ করে উঠলো জনমণ্ডলী। বীরদর্পে হাত নাড়তে নাড়তে আমরা প্রেক্ষাগৃহের দিকে পা বাড়ালাম।

অমনি টুপটাপ চারধার থেকে শুরু হয়েছে টমেটো বৃষ্টি। সঙ্গে বাঁধা কপিও অঢেল। গুলির মতো আমার কানের পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি তো থ। দেখি মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ গম্ভীর। আমাকে হাত ধরে দ্রুত প্রায় টানতে টানতে এগিয়ে নিয়ে চললেন। আর বিড়বিড় করছেন সমানে,—বলেছিলাম তখন, শুনলেন না তো কথা। আমি জানতাম এরকমই একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

পরে শুনলাম এটা নাকি নয়া ফাসিস্ত বাহিনীর কাজ। বয়েসে সবাই তরুণ। পুলিস পটাপট চার জনকে গ্রেপ্তার করে ফেললো। আমাকে বললো আমি ওদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করতে চাই কিনা। বললাম, মোটেই না। অভিযোগ আবার কিসের! দুগ্ধপোষ্য কয়েকটি শিশু, না বুঝে কিছু ভুল করে ফেলেছে। যদি কোন অসুবিধে না থাকে, ওদের ছেড়ে দিন।

জানিনা ছাড়লো কিনা, তবে এ ব্যাপারে পরে আর কোন প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে হতে হয় নি।

প্যারিস থেকে রোম রওনা হবার আগে কবি লুই আরাগঁর ফোন পেলাম। বললেন জাঁ পল সার্ত আর পিকাসো আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। বললাম, বেশ তো, কোথায় দেখা হবে বলুন। বললেন, ওঁদের ইচ্ছে নিরিবিলিতে কোথাও বসে নিছকই কিছু আড্ডা হবে। তখন হোটেলেই আসতে বললাম। সঙ্গে নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ। সব শুনে হ্যারি ক্রকারের তো চোখ ছানা বড়া। আমার প্রচার সচিব। বললো, করেছেন কি! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! তিন বামপন্থীকেই একেবারে খাল কেটে ঘরে ঢুকিয়ে ফেললেন। আমেরিকায় ওরা তো এই খবর দেখিয়ে বলবে—দেখো, বলেছি না চ্যাপলিন কম্যুনিস্টদের সমর্থক।

বললাম, হ্যারি, এটা আমেরিকা নয়, ইওরোপ। আর এই তিন ব্যক্তি নেহাৎ হেঁজি-পেঁজি কেউ নয়, সারা ছুনিয়ার এরা সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। তোমার কোন চিন্তা নেই।

তখনও বলিনি হ্যারিকে আমার আর আদৌ আমেরিকায় ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই, কি বললো ওরা না বললো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সে যাই হোক, হ্যারির যদিও ডিনারের নেমন্তন্ন নেই, ঘুর ঘুর করতে লাগলো সারাক্ষণ আমাদের কাছাকাছি। বিশিষ্ট তিন ব্যক্তির অটোগ্রাফ নিলো। স্টালিনেরও অচিরেই এসে পৌছবার কথা। হ্যারিকে বললাম, যদি আসেন, অন্ততঃ এই ব্যাপারটা নিয়ে যেন কোনরকম প্রচার না হয়।

সত্যি বলতে কি, আসবেন তিন দিকপাল—কি বলতে কি বলবো, মনে তাই নিয়ে নানান ছুশ্চিন্তা। এদের মধ্যে আবার আরাগঁই শুধু পারেন ইংরিজীতে কথা বলতে। আর দোভাষীর মুখ দিয়ে বলতে যা বিশ্রী আমার লাগে। অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন। যা বলবো সেটা অনূদিত হয়ে কি জবাব হয়ে ফিরে আসবে তা কি কেউ আগে থেকে বলতে পারে?

আরাগঁ সুপুরুষ। পিকাসোকে দেখলে হাসি পায়। অদ্ভুত মুখের আদল। মানুষটাকে সার্কাসে ভাঁড়ের ভূমিকায় মানাতো বেশ। ভুলেও মনে হয় না, ওরই হাতের তুলিতে যাছু আছে। সার্ত্রের মুখের আদল গোলগাল। তাতে দর্শনীয় বিশেষ কিছু নেই, তবে একটা বুদ্ধির ছাপ আছে, আর অনুভূতি প্রবণতার ছোঁয়া। কথা বলেন খুব কম। পার্টি শেষ হতে পিকাসো বললেন, চলুন আপনাকে আমার স্টুডিও দেখিয়ে নিয়ে আসি।

গেলাম সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায়। দেখি একটা ফলকে লেখা: এটা পিকাসোর স্টুডিও নয়। আর এক সিঁড়ি সিধে ওপরে উঠুন।

তার যা হাল! সে যেন একটা গুদাম ঘর। হেন জিনিস নেই যা সেখানে নেই। আর প্রচণ্ড অগোছালো। সিলিং থেকে আংটার সঙ্গে ঝোলানো লোহার একটা হাড় জিরজিরে খাট, তার ওপর শত নোংরা বিছানা। নীচে ভাঙা একটা স্টোভ। আর দেয়ালে হেলান দেওয়া সারি সারি ছবি। তাতে ধুলো বালির পুরু আস্তরণ। একখানা তুলে দেখালেন। সেটা সেজানের ছবি। অপূর্ব তার সুষমা। আরো একখানা তুললেন। আরো। প্রায় পঞ্চাশখানা ছবি দেখলাম একের পর এক। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবার মতো প্রতিটি ছবি। খুব লোভ লাগছিল!—ভাবলাম বলি, আমি অনেক টাকা দেবো। সব ছবি আমাকে দিয়ে দিন। অন্ততঃ ঘরখানা তাতে একটু সাফ হবে। সঙ্কোচ হলো। পারলাম না মুখ ফুটে বলতে। গোর্কির 'নীচের মহল' অবলম্বনে আঁকা একরাশ ছবি। ছবি তো নয়, সোনার খনি। অন্ততঃ আমার তাই ধারণা।

৩১

হলো প্যারিস আর রোমের কাজ। ফিরে এলাম লণ্ডনে। রইলাম ক হপ্তা একটানা। কিন্তু বাড়ি যে একখানা দরকার। নিজের বাড়ি। বা নিজেদের। থাকবো সবাই মিলে। কোথায় পাই? এক বন্ধু বললো সুইজারল্যাণ্ডে থিতু হতে। আমার কিন্তু লণ্ডনে থাকারই ইচ্ছে। শুধু ছেলেমেয়েদের নিয়ে যা ভয়। সইবে তো এখানকার আবহাওয়া ওদের? তাছাড়া টাকাকড়ি আটকে আছে আমেরিকায় সেটাও একটা ব্যাপার। এখানে বাড়ি কিনতে যত টাকা দরকার, কোথায় পাবো আমি এই মুহূর্তে?

এই সব টানাপোড়েনের মধ্যেই বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে ছেলে মেয়ের হাত ধরে সিধে একদিন সুইজারল্যাণ্ড। ঘুরতে ঘুরতে লুসান। পছন্দ হলো জায়গাটা। উঠলাম বো রিভেজ হোটেলে। ভারী মনোরম পরিবেশ। সামনে মস্ত হ্রদ। চমৎকার।

এটা সাময়িক ব্যবস্থা। দরকার আমার একখানা গোটা বাড়ি। নিজস্ব। তাই খুঁজে বেড়াই চার মাস ধরে। চা-র-মাস। এদিকে উনা সন্তানসম্ভবা। পঞ্চম সন্তানের জন্ম দেবে কিছুদিনের মধ্যে। আমাকে বলেছে, হাসপাতাল থেকে সে আর হোটেলে ফিরতে রাজী নয়। সিধে উঠবে বাড়িতে। কিন্তু কোথায় পাই মনের মতো বাড়ি? খুঁজতে খুঁজতে আমি তো বলতে গেলে হয়রান।

তা সন্ধান শেষ অব্দি মিললো। বেভির উত্তরে কর্সিয়ার গ্রাম, সেখানেই মস্ত এক বাগান বাড়ি। নাম ম্যানর দ্য বান্। অপূর্ব সেই পরিবেশ। সবটা মিলিয়ে সাঁইত্রিশ একর জমি। তাতে বিরাট এক ফলের বাগান। সেখানে এই এত্তোবড় বড় জাম হয়। কালো কুচকুচে রঙ্। আর ভারী মিষ্টি। আপেল হয় অঢেল। আর বড় বড় ফুল। আর নাসপাতি। আর আছে মস্ত বড় এক সব্জিক্ষেত। তাতে স্ট্রবেরি হয় শতমূলী হয়। আরো কত কি। সে আমি বলে শেষ করতে পারবো না। বাড়িটা সামনের দিকে। গাছগাছালিতে ঘেরা। সামনে পাঁচ একর পরিমাণ মস্ত এক মাঠ। সেখানে দৌড়ও উদ্দাম, কোন বাধা নেই। নয়তো খেলো কি পায়চারি করো। পায়ের নীচে মখমলের মতো সবুজ ঘাস। অদূরে পাহাড়। হ্রদও এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায়। মোটমাট অনবদ্য। আমাদের কাছে যেন তীর্থক্ষেত্রের সামিল।

কাজের লোকও পেলাম মনের মতো। রাশেল ফোর্ডের নাম প্রথমেই করতে হয়। যুবতী। অবিবাহিতা। আসার আগে ঘর বাড়ি সাজিয়ে রাখলো ছবির মতো করে। পরে ওকে আমি আমার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম দেখাশোনার কাজে মনোনীত করি।

আর একজন মাদাম গার্ণিয়ের। দোভাষী বলা যায়। ইংরিজীতে ওস্তাদ। তাকে করি ব্যক্তিগত সচিব। যাবতীয় চিঠিপত্র লেখালেখির কাজ তাকেই করতে হতো। এমন কি এই যে বই আমার—আত্মজীবনী—কতবার যে অদলবদল করে টাইপ করে সাজাতে হয়েছে তাকে, তার আর সীমা সংখ্যা নেই।

গোড়ায় একটু ভয় ভয় করতো। পারবো তো সামলাতে এই মস্ত খরচ। এই যে এতোখানি জমি বাড়ি, এই কাজের লোকজন—আমাদের সাধ্যে কুলোবে তো। বাড়ির পূর্বতন মালিককে বললাম, কি মশাই, বলুন কত খরচপাতি হতো আপনার। তখন যা হিসেব দিলেন, সে সামান্যই। ভয় ধরাবার মতো কিছু নয়। আমাদের সাধ্যের ভেতরেই। তখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।

গাঁয়ের স্কুলেই ভর্তি করে দিলাম ছেলেমেয়েদের। সে এক রীতিমতো অস্বস্তিকর অবস্থা। সব শিখতে হবে এবার থেকে ফরাসী ভাষায়। ইংরিজী পুরোপুরি বরবাদ। এই নিয়ে তো কত দুশ্চিন্তা আমাদের। স্বামী স্ত্রী মিলে কত আলোচনা। কি জানি, যদি মনের ওপর এতে চাপ পড়ে। যদি ভাষার গোলমাল থেকে জন্ম নেয় মানসিক রোগ। নিলো না। সেটাই বড় সান্ত্বনা। কিছুদিনের মধ্যে দেখি বেশ শিখে গেছে ফরাসী ভাষা। গড়গড় করে রীতিমতো বলতে পারে, লিখতে পারে। চালচলনও দেখি বদলাতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। হাবভাবে এক একজন পুরোদস্তুর সুইস। আমেরিকান বা ইংরেজী কেতার নামগন্ধও তাতে নেই। সাথে সাথে দেখি কে. কে. আর পিনীরও বেদম অবস্থা। দুই বাচ্চার সারাক্ষণের দেখাশোনার ভার দুজনের। তারাও দেখি উঠে পড়ে লেগেছে ফরাসী ভাষা শিখতে। সে এক রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড আর কি।

এবার আমেরিকা থেকে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার পালা। এটা সময়সাপেক্ষ। গেলাম একদিন আমেরিকার বহির্দেশ দপ্তরের অফিসে। কনসালের সঙ্গে দেখা করে হাতে তুলে দিলাম আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের অনুমতিপত্র। বললাম, এই নিন। আমার আর ফিরবার ইচ্ছে নেই।

বললেন, সে কি! এ আপনি কি বলছেন চার্লি?

হাসলাম। বললাম, বয়েস হয়েছে এখন। আর ওসব অহেতুক ঝামেলা পছন্দ হয় না। এবার অব্যাহতি চাই।

কোন মন্তব্য করলেন না। বললেন, বেশ। আপাততঃ তাই যখন ইচ্ছে আপনার, আমার কিছু বলার নেই। তবে একটা কথা—ফেরার ব্যাপারে আপনার কোন বাধা নেই। যে কোন সময় ইচ্ছে করলে আপনি ভিসা দেখিয়েও দেশে ফিরতে পারেন।

বললাম, ধন্যবাদ। তার হয়তো আর কোনদিন দরকার হবে না। আমি সুইজারল্যাণ্ডে

স্থায়ীভাবে বসবাস করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ। এবার উনার কথা বলি।

উনাও চায় না আর আমেরিকার নাগরিকত্ব বজায় রাখতে। লণ্ডনে থাকাকালীন গিয়েছিল একদিন আমেরিকার বিদেশ দপ্তরে। সেই মর্মে বলেও এসেছে। ওরা বলেছে, ঠিক আছে, এ আর এমন কথা কি। আসবেন একদিন। ব্যবস্থা করে দেবো। পনেরো মিনিটের তো ব্যাপার।

আমাকে বলতে আমি তো রেগে আগুন। বলে কি! এতো সময় লাগবে নাগরিকত্ব ছাড়তে! অসম্ভব। বললাম, চলো তোমার সাথে আমিও যাবো।

গেলাম দুজন। বলবো কি, দপ্তরে পা দেওয়া মাত্র সারা শরীর যেন রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠলো। মনে পড়ছে পুরনো দিনের সব অপমান সব লাঞ্ছনা সব গঞ্জনার কথা। ভেতরে ভেতরে জ্বলছি। উনা হয়তো বুঝে থাকবে আমার মনের কথা। চোখ মুখে অস্বস্তির ছাপ। হয়তো প্রমাদ গুণছে ভেতরে ভেতরে। এমন সময় দরজা খুলে জনৈক অফিসার বেরিয়ে এলেন।

একবারে মুখোমুখি আমার। একগাল হেসে বললেন, একি আপনি? তা এখানে কেন, ভেতরে চলুন।

আমি চুপ।

বললেন, আমাদের তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদেরও ব্যাপার আছে। আপনার স্ত্রী নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চান। কেন চান সেটা তো জানতে হবে তার মুখ থেকে। স্বামী হিসেবে আপনাকেও কিছু জবাব দিতে হবে। এটা প্রথা। আমেরিকার স্থায়ী নাগরিকদের স্বার্থেই এই সব নিয়ম কানুন।

তখন ভেতরে গেলাম।

সঙ্গে সেই অফিসার। যাবতীয় হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দেবার তিনিই মালিক। আমাকে বললেন, এম্প্রেস থিয়েটারে উনিশশো এগারো সালে প্রথম আপনাকে আমি সামনা সামনি দেখি। তারপর এই দ্বিতীয়বার।

তখন পুরনো দিনের অনেক কথা উঠলো। রাগটা একটু একটু করে কমছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, একটু একটু করে আমি মানুষটাও যেন বদলে যাচ্ছি।

ততক্ষণে হিসেব নিকেশের পালা শেষ। সর্বশেষ ফর্মেও সই করা হয়ে গেছে। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে উঠলাম। সেই শেষ বিদায়। মনটা ভারী লাগছে। মনের গতিই যে এই রকম। বোধ শক্তি কাজ করছে না। জানি না, বিষণ্ণতার মধ্যে মানুষের বোধ বিবেক অকেজো হয়ে যায় কিনা।

লণ্ডনে বেড়াতে গেলে অগণিত বন্ধু আসতেন দেখা করতে। বন্ধু বলাটা হয়তো একটু কম হবো, বলা উচিত আপন জন। সিডনী বার্ণস্টাইন, আইভর মণ্টেগু, স্যর এড্ওয়ার্ড বেডিংটন বার্ণস, ডোনাল্ড ওগডেন স্টুয়ার্ট, এলা উইনটার, গ্রাহাম গ্রীন, জে. বি. প্রিস্টলে, ম্যাক্স রেনহার্ডৎ, ডগলাসের ছেলে—এরা লণ্ডনে আমার নিত্যসাথী। কিভাবে যে কেটে যেতো সময় টেরও পেতাম না। এমন নয় প্রতিদিন পেতাম সবাইকে দল বেঁধে। তবু ঐ যে বলে আত্মার আত্মীয়তা—ভালবাসার এক অচ্ছেদ্য বন্ধন—তাইতে বাঁধা পড়েছিলাম আমরা সকলে। মনের দিক থেকেও বিরাট এক সান্ত্বনার ব্যাপার সন্দেহ নেই। সব ছেড়ে ছুড়ে এসে একেবারে যে অগাধ অতলে পড়িনি, আছে এখনো অনেকে আমার শুভানুধ্যায়ী—এই চিন্তাই বুকের গভীরে তোলপাড় আশার ঝড় তুলতো।

একবার লণ্ডন বেড়াতে গিয়ে শুনি, সোভিয়েত দূতাবাস থেকে আমারই সম্মানে ক্লারিজ হোটেলে এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছে। তাতে ক্রুশ্চেভ বুলগানিন দুজনেই হাজির থাকবেন। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। গিয়ে যখন হাজির হলাম হোটেলের চারধারে অলিন্দে বারান্দায় থিক থিক করছে শুধু মানুষ আর মানুষ। মাথা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আর কী উচ্ছ্বাস তাদের। কী হর্ষধ্বনির ঘটা। দূতাবাসের জনৈক কর্মচারী ভিড় বাঁচিয়ে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। দেখি একই অবস্থা ক্রুশ্চেভ আর বুলগানিনেরও। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে তাদেরকেও নিয়ে বিপরীত দিক থেকে ভেতরে ঢোকা হচ্ছে। সে এক বিরক্তিকর অবস্থা যাকে বলে। বিরক্তির ছাপ দুজনেরই চোখে। যেন এসে মস্ত ভুল হয়েছে, পালাতে পারলেই ওঁরা বাঁচেন।

এরই মধ্যে মজাও কিছু আছে। আমাকে নিয়ে ঢুকছেন যে কর্মীটি তিনি ক্রুশ্চেভকে ডাকলেন হাত নেড়ে। কত মানুষই তো ডাকছে। ক্রুশ্চেভ ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না। তখন কর্মী বললেন, ক্রুশ্চেভ, চ্যাপলিন এসেছেন—চার্লি চ্যাপলিন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাসি। উদ্ভাসিত যাকে বলে। তখন তড়িঘড়ি ভিড় ঠেলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমাবার প্রচেষ্টা। তাতেও আর এক হুড়োহুড়ি। শেষে মুখোমুখি হতে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে করমর্দন হলো। ক্রুশ্চেভ বললেন, আপনার ছবি রাশিয়ার জনগণ ভীষণ পছন্দ করেন। সেখান থেকে তারপর তিনজনে গেলাম ভোজের আসরে। ক্রুশ্চেভ আমার দিকে ভদকার গ্লাস এগিয়ে দিলেন। চুমুক দিয়ে সে যা অবস্থা আমার। যেন মদ নয়, মশলা দিয়ে তৈরী নির্যাস। উনা দেখি নিশ্চিন্তে চুমুক দিচ্ছে। এতোটুকু বিকার বা অস্বস্তির চিহ্ন মুখে নেই।

সাংবাদিকরা অনুরোধ করলেন। আমরা গোল হয়ে বসলাম। তখন ছবি নেওয়া

হলো। মন খুলে যে একটা কথা বলবো ক্রুশ্চেভের সঙ্গে তার সুযোগ কিন্তু এখনো পাই নি। হয়তো বুঝে থাকবেন ক্রুশ্চেভ। আমাকে বললেন, চলুন পাশের ঘরে গিয়ে আমরা বসি। তখন পাশের ঘরে গেলাম। যথারীতি যাবার সময় ফের ভিড় ঠেলাঠেলির মহড়া। চারজন দেহরক্ষী বলতে গেলে আমাদের প্রায় পাঁজাকোলা করে পাশের ঘরে দুখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বসলাম মুখোমুখি। কিন্তু কথা যে শুরু হবে এবার — কি বলবো? ভাবিনি যে কিছু। এলোপাথাড়ি বলাটা ভুল হবে। সেটা আমার নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। বিশেষ করে ক্রুশ্চেভের একটু আগের দেওয়া অনবদ্য সেই বক্তৃতার পরে। খুব চমৎকার বলেছেন। লণ্ডনে আসার উদ্দেশ্য, দুনিয়া সম্বন্ধে তার ধারণা — এক কথায় অপূর্ব। যেন ভরা অন্ধকারে আলোর ঈশারা। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের বুকে আশা যোগাবার মূলমন্ত্র। সেই প্রসঙ্গ টেনেই কথা শুরু করলাম।

সাংবাদিকেরা ভিড় করে আছে চারধারে। আমেরিকার জনৈক সাংবাদিক বললো, মিঃ ক্রুশ্চেভ, কাল আপনার ছেলে বেরিয়েছিল লণ্ডন ঘুরে দেখতে। খুব হৈ হৈ করেছে। আপনি কি জানেন?

ক্রুশ্চেভ হাসলেন। বললেন, জানি। আমার ছেলেকে অন্য সবার চেয়ে আমি ভালোই চিনি। ছ্যাবলা নয়। পড়াশুনা করে। ইঞ্জিনিয়ার হবে শিগ্গী। এই বয়েসের যা ধর্ম—একটু আমোদ ফুর্তি তো করবেই। এ আর বেশি কি!

একটু পরে খবর নিয়ে এলো এক দূত। নাকি হ্যারল্ড স্ট্যাসেন এসেছেন ক্রুশ্চেভের সঙ্গে দেখা করতে। বাইরে অপেক্ষা করছেন। আমেরিকান। আমার দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে হাসলো। বললো, যদি এখানে আসেন আপনার কোন অসুবিধে নেই তো?

আমি হেসে বললাম, আমার কোন কিছুতেই অসুবিধে হয় না।

তখন পথ দেখিয়ে স্ট্যাসেন দম্পতিকে ভেতরে আনা হলো। সঙ্গে সস্ত্রীক গ্রোমিকো। ক্রুশ্চেভ আমাকে বললেন, এক মিনিট। আমি একটু ওঁদের সঙ্গে কথা বলে আসি। বলে স্ট্যাসেন এবং গ্রোমিকোকে নিয়ে ঘরের আর এক মাথায় গেলেন। আমি আর শ্রীমতী গ্রোমিকো তখন পাশাপাশি বসা। সময় কাটাবার তাগিদে শ্রীমতীর সঙ্গে শুরু করলাম আলাপচারী।

বললাম, কবে যাচ্ছেন রাশিয়ায়?

বললেন, রাশিয়া ফেরা এখন হবে না। এখান থেকে সিধে যাবো আমেরিকা।

বললাম, রইলেন তো অনেকদিন বিদেশে। দেশের জন্য মন খারাপ লাগে না।

বললেন, লাগে। তবু নিরুপায়। তাছাড়া আমেরিকায় থাকতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

বললাম, দেখুন সত্যিকারের আমেরিকা বলতে আমরা যা বুঝি—নিউইয়র্ক আর ক্যালিফোর্নিয়া—আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। এর চেয়েও অনেক সুন্দর জায়গা আছে। যেমন ধরুন ডাকোটা। উত্তর দক্ষিণ দুটো অংশই। যেমন ধরুন মিনেপোলিস, সেণ্টপল—নৈসর্গিক সৌন্দর্যে এদের তুলনা নেই। আমেরিকার অধিবাসী বলতে প্রকৃত অর্থে যাদের বোঝা যায়, তারা এই সব অঞ্চলের মানুষ।

এতোক্ষণ শ্রীমতী স্ট্যাসেন ছিলেন নীরব শ্রোতা। হঠাৎ বলে উঠলেন, ঠিক বলেছেন। আমরাও তাই মনে করি। আমরা মিনেসোটার মানুষ। আমার স্বামী আমি দুজনেই। সেদিক থেকে প্রকৃত অর্থে আমরা আমেরিকান। কত লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেছি এই সাধারণ কথাটা। কেউ মোটে মানতেই চায় না।

জানিনা এতোক্ষণ ধরে আমার সম্বন্ধে কি ধারণা করে বসেছিলেন শ্রীমতী স্ট্যাসেন। হয়তো ভাবছিলেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যে কোন মুহূর্তে শুরু হবে আমার বিষোদ্গার, আমার ওপর যে অবিচার করা হয়েছে তাই নিয়ে আমি হয়তো দু দশ কথা শুনিয়ে ছাড়বো। অতো বোকা তো আমি নই। যত্রতত্র যে কোন কথা বলে বসবার মতো নির্বোধ। বিশেষ করে শ্রীমতী স্ট্যাসেনের মতো পরমা সুন্দরী এক মহিলার সামনে।

এদিকে ক্রুশ্চেভ আর বাকী দুই অতিথির মধ্যে গভীর কোন অলোচনা শুরু হয়ে গেছে। অন্ততঃ এখান থেকে সেরকমই আমি বুঝতে পারছি। সময় নেই আমার। উঠলাম আসন ছেড়ে। দেখি অমনি নজর গেছে ক্রুশ্চেভের। স্ট্যাসেনকে দাঁড় করিয়ে রেখে অমনি চলে এলেন। বললাম। যাবার কথা। হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। করমর্দন করলাম। স্ট্যাসেন দেখি তখন দেয়াল ঘেঁষে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কড়িকাঠ গুণছে গভীর নিবিষ্টতায়। সকলের কাছেই বিদায় নিলাম। শুধু স্ট্যাসেন বাদ। এটা করতে আমি বাধ্য। খানিকটা কৌশলও বলা যায়। তবে একটা কথা স্বীকার করি এই প্রসঙ্গে। মানুষটাকে এক পলক দেখে আমার মন্দ লাগে নি। ব্যক্তি হিসেবে তার ওপর আমার কোন রাগ বা অভিমান বা জ্বালা নেই।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা। আমি আর উনা খেতে এসেছি গ্রিলে। হঠাৎ সস্ত্রীক স্যার উইনস্টন চার্চিলের প্রবেশ। ১৯১৩ সালের পর এই আবার চার্চিলের সঙ্গে আমার দেখা। ইতিমধ্যে লণ্ডনে লাইমলাইট ছবির মুক্তির পর আমার পরিবেশক লিখে পাঠালো, স্যার উইনস্টন ছবি দেখতে আগ্রহী। কি করনীয় বলুন। তখুনি আমিও পাল্টা চিঠিতে তাঁর বাড়িতে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করার নির্দেশ দিয়ে পরিবেশককে আমার মতামত জানিয়ে দিলাম।

তার কিছুদিন পরেই চার্চিলের কাছ থেকে মস্ত এক চিঠি। কী যে প্রশংসা তার প্রতি ছত্রে! কী উচ্ছ্বাস! লিখেছেন, ভীষণ ভালো লেগেছে। এতো ভালো যে প্রকাশ

করবার ভাবা তাঁর নেই।

আর আজ। আমার টেবিলের সামনে। মুখোমুখি যাকে বলে। ভ্রূ নাচিয়ে বললেন, তারপর! কি খবর?

একটু যেন রাগ রাগ ভাব। একটু যেন অসোয়াস্তি। ভ্রূকুটি যাকে বলে। আমি আর উনা চটপট সুবোধ বালক বালিকার মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

আর কোন কথা নয়। গিয়ে বসলেন ওঁরা আর এক টেবিলে। উনা গেলো কি দরকারে পাশের ঘরে। আমাকে ডাকলেন শ্রীমতী চার্চিল। টেবিলে গিয়ে বসলাম।

বললেন, পড়েছি আমি সব কাগজে। আপনার আর ক্রুশ্চেভের সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সব কাগজেই বেরিয়েছে।

চার্চিল বললেন, ক্রুশ্চেভ মানুষটাকে আমার মন্দ লাগে না।

দেখি তখনও সেই ভ্রূকুটি। সেই রাগ রাগ ভাব। যেন চাপা অসন্তোষ জমা করে রেখেছেন বুকের মধ্যে। তাকে প্রকাশ করতে পারছেন না। বা প্রকাশের ধরণটাই ঐরকম। কত জলই তো গড়িয়ে গেছে এতোদিনে ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে। সংকটের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন চার্চিল। পাশাপাশি দেশকে লৌহ আবরণীর মধ্যে আটক রাখার সেই বিখ্যাত বক্তৃতা—আমার মনে হয়, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই হয়েছে বেশি। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের একটা অবস্থার সূচনা হয়েছে।

সে যাই হোক, আলোচনা যথারীতি ঘুরে ফিরে আমার লাইমলাইটে এসে ঠেকলো। চার্চিল বললেন, দু বছর আগে আপনাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। ছবি দেখার পর। পেয়েছেন সে চিঠি?

বললাম, হ্যাঁ, পেয়েছি।

—জবাব দেন নি কেন?

বললাম, জবাব দেওয়ার কথা তো আপনি চিঠিতে লেখেন নি।

এতোক্ষণে ভ্রূকুটি উধাও। ঘাড় নাড়লেন,—বুঝলাম। আমি ধরে নিয়েছিলাম জবাব না দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে।

আমি হেসে বললাম, কোন উদ্দেশ্য নেই। শুধু ঐ যা বললাম তাই।

বললেন, আপনার সব ছবিই আমার ভালো লাগে। সুন্দর।

অবাক হয়ে দেখছিলাম তখন মানুষটাকে। দু বছর আগে লিখেছেন চিঠি। তার জবাব দিই নি। মনে রেখেছেন দু বছর পরেও। এতো কাজের মধ্যেও তুচ্ছ সামান্য ব্যাপারটা বিস্মরণ হয় নি। শ্রদ্ধা হয়। এজন্য মানুষটাকে সম্মান করেও তৃপ্তি পাই।

তবে সত্যি বলতে কি, চার্চিলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি একমত নই। একবার বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমি এখানে এসেছি ব্রিটিশ রাজ ধ্বংস করার জন্য নয়,

তাকে টিকিয়ে রাখতে, তার অস্তিত্ব জিইয়ে রাখতে। এটা মনঃপুত হয় নি আমার। একে আমি কোনভাবেই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনি।

ধ্বংস করার তিনি একছত্র অধিপতি নন। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হচ্ছে রাজনীতির চাপে, সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহে, সাম্যবাদের জোয়ারে, আরো নানান কারণে। এর পেছনে অন্য কোন চক্রান্ত ব্যাপক কাজ করে বলে আমি মনে করি না। পাশাপাশি বিজ্ঞানের অগ্রগতিও একটা বিরাট ব্যাপার। বিজ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে জীবনের গতি। যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের জীবন যাপনের কায়দা আজ যথেষ্ট উন্নত। রাজতন্ত্র এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানতে পারছে না। তাই তার বিলুপ্ত স্বাভাবিক।

সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে নেহরুর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলাম। সঙ্গে লেডী মাউণ্ট-ব্যাটেনের দু ছত্র সুপারিশ। তাতে লেখা নেহরু আর আমার নাকি অনেক ব্যাপারেই মিল আছে। নেহেরু অনতিকাল পরেই কর্সিয়ারের ওপর দিয়ে যাবেন এবং সম্ভব হলে সে সময় আমি যেন তার সঙ্গে দেখা করি। আসলে লুসার্নে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে বার্ষিক সভায় যোগদান করতে চলেছেন নেহরু। ভারী সাধ, করসিয়ার থেকে আমি তাকে সঙ্গ দিই। এক রাত্রির ব্যাপার। পরদিন ফেরার পথে আমাকে আমার বাড়ির দোর-গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে যাবেন।

মিল যে আছে এটা ঘটনা। আমারই মতো ছোটখাটো দেখতে মানুষ। সঙ্গে মেয়ে—শ্রীমতী গান্ধী। ভারী শান্ত, ভারী শ্রীময়ী। আর মেজাজী বটে নেহরু। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, কঠোর আত্মসংযমী এবং আড়ম্বরের বাহুল্য বলতে কিছুই নেই। চারিদিক তীক্ষ্ণ নজর। যা দেখেন তাতেই নিজস্ব মতামত দেন। কুণ্ঠা বা জড়তার ছাপ নেই এতোটুকু। লাগছে বেশ। ফিরছি এখন লুসার্ন থেকে। আমি আর নেহরু একই গাড়িতে। পেছনে অন্য গাড়িতে শ্রীমতী গান্ধী। তিনি যাবেন জেনিভায়। মাঝপথ থেকে বিদায় নেবেন। নেহরুকে বলেছি, কিছুক্ষণের জন্যে আমার বাড়িতে অতিথি হতে। আপাততঃ দুজনেই গল্পে মশগুল। সে নানান কথা। আলোচনা প্রসঙ্গে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কথা উঠলো। খুব প্রশংসা করলেন। ভারতকে ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে মুক্ত করতে নাকি অতুলনীয় প্রচেষ্টা তার।

বললাম, ভারতের গতি এখন কোন্ দিকে আমাকে বলুন।

বললেন, গতি যেদিকে বা যে পথেই হোক, সেটা যে ভারতীয় জনগণের কল্যাণের জন্য এটা আপনাকে স্পষ্ট বলতে পারি। সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছেন। কি সেই পরিকল্পনা, কি তার রূপ তাই নিয়ে বোঝাতে বসলেন আমায়। এদিকে গাড়িও চলেছে কমপক্ষে সত্তর মাইল বেগে। বেশিও কিছু হতে পারে।

পাহাড়ী পথ। যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনই এবড়োখেবড়ো। তার ওপর মুহুর্মুহু দুর্দান্ত রকমের বাঁক। আমি তো ভয়ে তটস্থ। ভারতের রাজনীতি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বসেছেন নেহেরু, আদ্ধেক কথা সত্যি বলতে কি আমি মনের উদ্বেগের জন্য শুনতেও পেলাম না। নেহরুর কিন্তু বিকার বলতে কিছু নেই। যেন আত্মমগ্ন এক পুরুষ। সমানে কথা বলেই চলেছেন। তারপর একসময় গাড়ি থামলো। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ। সেটা চৌরাস্তার মোড়। এখান থেকে মেয়ে চলে যাবে জেনিভার দিকে। বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবে তাই গাড়ি থেমেছে। একটু পরে মেয়ের গাড়িও হাজির। বাবা গাড়ি থেকে বেরিয়ে মেয়েকে আলিঙ্গন করলেন, আদর করলেন। বললেন, সাবধানে থাকিস্। আমি অবাক হয়ে নেহরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উলটো হলো ব্যাপারটা। আসলে মেয়েরই বলা উচিত ছিলো বাবাকে কথাগুলো। তাহলে মানাতো। তাহলে আর আমাকে অবাক হতে হতো না।

তখন কোরিয়ায় চলছে চরম সংকট। সারা পৃথিবী রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে কোরিয়ার দিকে। কি হবে শেষ অব্দি কেউ বলতে পারে না। এহেন অবস্থায় একদিন চীনা দূতাবাস থেকে ফোন এলো। চু-এন-লাই তখন জেনিভায়। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ বললেন, সিটি লাইটসের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন যদি তারা জেনিভায় করেন, আমার কোন আপত্তি বা অসুবিধে আছে কিনা। বলাবাহুল্য চু-এর সম্মানে সেই প্রদর্শনী। কোরিয়ার শান্তি এবং যুদ্ধের প্রশ্নে বলতে গেলে এই মানুষটিই কেন্দ্রবিন্দু। সেই উপলক্ষ্যে জেনিভায় আগমন। আমার আপত্তির কি কোন কারণ থাকতে পারে?

চীনের প্রধানমন্ত্রী চু। পরদিন জেনিভাতে তাঁর সাথে নৈশভোজ খাবার নিমন্ত্রণ। বেরোতে যাবো, হঠাৎ প্রধান সচিব ফোন করে জানালেন, প্রধান মন্ত্রীর হাজির হতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। জরুরী এক সম্মেলনে হঠাৎই যোগদান করার আহ্বান এসেছে। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা না করে নৈশভোজ শুরু করি। পরে এসে তিনি আমাদের সঙ্গ দেবেন।

পৌঁছে দেখি, অবাক কাণ্ড, চু নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। মন তখন আমার তোলপাড়। কি সিদ্ধান্ত হলো সম্মেলনে সেটাই জানার জন্য আকুলতা। জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, সব ঠিক আছে। কোন চিন্তা নেই। ভারী সুন্দর ভাবে নিষ্পত্তি হলো। এই তো মাত্র পাঁচ মিনিট আগে।

অনেক গল্প শুনেছি চীনের কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে। উনিশশো তিরিশের শেষ ভাগের নানান কাহিনী। চীনের প্রত্যন্ত প্রদেশে তাদের সংগঠিত হওয়া। মাও সে-তুঙের নেতৃত্ব, তাদের পিকিং অভিযানে, শক্তি সঞ্চয় সব যেন গল্প কথার মতো। সেই

অভিযানে চীনের ছ কোটি মানুষের সমর্থন তারা লাভ করেছিলেন।

সে রাত্রেই চু শোনালেন এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। বিজয় লাভের পর পিকিংয়ে এসেছেন মাও। তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে এসেছে অগণিত মানুষ। বিশাল এক মঞ্চ প্রস্তুত। প্রায় পনেরো ফুট উঁচু। সামনে অবারিত মাঠ। সিঁড়ি দিয়ে সেই মঞ্চে উঠছেন মাও। সে কী আনন্দ উল্লাস জনতার! শেষে মঞ্চের ওপর উঠলেন। উদ্বেল জনতা দু হাত তুলে সোৎসাহে তাকে অভিনন্দন জানালো। চীনের বীর সৈনিক মাও। নয়া চীনের স্রষ্টা। দু চোখ ভরে দেখলেন সেই অগণিত জনতার মুখ। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

আর এই মানুষটি—আমার সামনে এই চু এন-লাই। কষ্ট দুঃখ কিছু কম করেন নি। ছায়ার মতো সঙ্গে থেকেছেন মাওয়ের, সেই বিজয় অভিযানে তারও ভূমিকা অবিস্মরণীয়। দৃপ্ত সুন্দর মুখ। তেমনই কঠোর, সংকল্প কঠিন। আর তারুণ্যে চির উজ্জ্বল। যেন বয়সের ছাপ এখনও পড়ে নি মুখে।

বললাম, ছত্রিশ সালে আমি সাংহাই গিয়েছিলাম।

বললেন, জানি আমি। সেটা অভিযানের অনেক আগে।

বললাম, যাত্রা তো প্রায় শেষ করে এনেছেন। আর খুব একটা এগোবার দরকার নেই।

শুনে হাসলেন মুচকি মুচকি। কোন জবাব দিলেন না।

চীনা পানীয় পরিবেশিত হলো নৈশভোজের আসরে। মন্দ নয়। শুভকামনা জানালাম। বললাম, কম্যুনিস্ট আমি নই, তবু সর্বান্তকরণে তাদের চিন্তার অনুগামী। চীন আরো উন্নতি করুক আমি চাই। চীনের জনগণ আগামী দিনে রচনা করুক এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

বেভিতে আমাদের অনেক নতুন বন্ধু জুটেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমিল। রোসিয়ার, মাইকেল রোসিয়ার এবং তাদের পরিবার পরিজন। এরা প্রত্যেকেই সঙ্গী ভক্ত। এমিলই তো আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো পিয়ানো বাদিকা শ্রীমতী ক্লারা হাস্‌কিলের সাথে। তিনিও বেভিতেই থাকেন। যদি কখনো আসেন শহরের দিকে তো ব্যস্—আসতে হবেই আমার বাড়িতে। গল্পগুজব হবে, ভোজ খাবো এক সাথে বসে। তারপর আর কি—বাজনা। বলবো কি, ষাটের কোঠায় বয়েস, সেই কবে থেকে আজও চূড়ামণি হয়ে রয়েছেন ইওরোপ আর আমেরিকার সঙ্গীত জগতে। কে পারে অমন অশ্চর্য সুরলহরী তুলতে? আঙুল তো নয় যেন যাদু। সে যে কী মায়ার প্রলেপ! এমন মানুষ হুট করেই একদিন মারা যান। এটা নিয়ম। আমি আরো অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি। বেলজিয়াম থেকে ট্রেনে চেপে আসবেন। সেটা ষাট

সাল। হঠাৎ উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলেন। তারপর হাসপাতাল। এবং সেখানেই মৃত্যু।

আমি এখনও সময় পেলে তাঁর রেকর্ড বাজাই। মৃত্যুর অব্যবহিত আগে করা শেষ রেকর্ড। এই তো এখনো বাজছে সেই সুর। এই চলছে লেখা—এই নিয়ে ছবার তো লিখলাম আর বদল করলাম,—প্রতিবারই কাজ করতে করতে শুনি সুরের খেলা। যেমন আজ বাজছে বিঠোফেনের তিন নং সুর, সঙ্গে ক্লারার পিয়ানো। দুটোকে মেশাবার দায়িত্ব মার্কেভিচের। তিনিই পরিচালক। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। অপরূপ ঝঙ্কারে ভরে উঠছে আমার হৃদয়। কাজ করার উৎসাহ পাচ্ছি। সব আমাকে যোগায় উৎসাহ। আজ এই বই লেখার ব্যাপারে বলে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এটা আমি আগেও লক্ষ্য করে দেখেছি।

এবং এই সব মিলিয়েই আমাদের এই নতুন সংসার। সুইজারল্যাণ্ডের গ্রামে নিরিবিলি জীবন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকেন স্পেনের রাণী। আর থাকেন আস্রেইগের জমিদার এবং তদীয় গৃহিণী। ভারী হৃদ্যতা আমাদের সাথে। বহু ছায়াছবির অভিনেতা সাহিত্যিক কবিকেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে আছেন জর্জ স্যাণ্ডার্স, বেনিটা স্যাণ্ডার্স এবং নোয়েল কাউয়ার্ড। এরাও বলতে গেলে আমাদের প্রতিবেশী। ছুটি কাটাতে মাঝে মাঝে আসেন আমেরিকার কোন বন্ধু বা ইংল্যাণ্ডের কোন পরিচিত কেউ। ট্রুম্যান ক্যাপোট্‌কে তো প্রায়ই কাছে পাই। কর্মব্যপদেশে সুইজারল্যাণ্ডেই তাকে থাকতে হয়। আবার বড় দিনের ছুটিতে বা অন্য কোন ছুটি-ছাটা জুটলে ছেলেমেয়ে উনাকে নিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়ি। এই তো সেদিন ঘুরে এলাম আয়ারল্যাণ্ড। খুব হৈ হৈ করে কাটিয়ে এলো সবাই। ফি বছরই কোথাও না কোথাও এইভাবে বেরুতে হয়।

বড় অপরূপ এখানকার গ্রীষ্মকাল। কোমল উষ্ণতা বলতে ঠিক যা বোঝা যায়। গরমের দিনে আমাদের রুটিনও আলাদা। ছোট প্যাণ্ট পরে শরীর যতদূর সম্ভব খোলা রেখে সবাই বসে যাবো মাঠে। গল্প গুজব হবে। রাতের খাবারও খাবো মাঠে বসেই। রাত বাড়বে। আকাশে উঠবে চাঁদ। তারও অনেক পরে আমরা ভেতরে যাবো।

মাঝে মাঝে এরও ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। হয়তো খেয়াল চাপলো মাথায়, অমনি তল্পিতল্পা গুটিয়ে সদলবলে সিধে প্যারিস কি ইংল্যাণ্ড। নয়তো রোম বা ভেনিস। এমন তো দূর নয়। বলতে গেলে দু তিন ঘণ্টার পথ। যেতে বাধা কি।

প্যারিসে গেলে পল লুই উইলার বড় আদর আপ্যায়ন করেন। বিশিষ্ট বন্ধু আমার। এই তো গেলো আগস্টে ভূমধ্যসাগরের ঠিক তীরে তার বিশাল জমিদারী—আমাদের বললেন গোটা একটা মাস সেখানে কাটিয়ে আসতে। কী ফুর্তি সবার! ছেলেমেয়েরা

তো বলতে গেলে ওখানে গিয়েই সাঁতার শিখলো। আর কি করা। জলের বুকে কটা দিন সে যা দাপাদাপির চোট।

বন্ধুরা মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করেন—তা এই যে মশায়, নিউইয়র্কের জন্যে মন কেমন করে না? সত্যি বলছি আমি—এতোটুকু অতিরঞ্জন নয়, অতিরঞ্জনের স্বভাব আমার নেই—বিন্দুমাত্র মন খারাপ করে না। আসলে সে আমেরিকা আর নেই। বদলে গেছে। নিউইয়র্কও বদলে গেছে অনেকখানি। মস্ত বড় বড় শিল্প কারখানা, কাগজের অফিস, টেলিভিশন আর নানান জাতের প্রচার দিয়েছে সব তছনছ করে। জীবনযাত্রার কায়দাই এখন অন্যরকম। পারবো না মেশাতে। এ আমেরিকা তো আমি চাই না। আমি টাকার উলটো পিঠটা দেখতে চাই। সহজ সরল অনাড়ম্বর। নেই তাতে প্রচারের আধিক্য, নেই সেখানে আকাশ ছোঁয়া উঁচু উঁচু মিনার কি গম্বুজ কি অট্টালিকা। শান্ত নদীর মতো কুলুকুলু সেই প্রবাহ। বুক ঠুকে নিজেকে জাহির করার। চোখে আঙুল দিয়ে দুনিয়ার দশজনকে দেখাবার প্রবণতা সেখানে নেই। সেই জীবনধারাই আমার একান্ত প্রিয়।

আর সব চেয়ে বড় কথা, কি আছে আমার ওদেশে যে মন কেমন করবে। সব সম্পর্ক তো চুকিয়ে দিলাম। সে-ও তো প্রায় দেড় বছর হতে চললো। পঞ্চান্ন সাল অব্দি আমার পেছনে লেগে ছিল। লাইমলাইটের আয়ের ওপর ওরা ট্যাকসো চায়। কেননা লাইমলাইট যখন করেছি, তখন আমি আমেরিকার বাসিন্দা। লড়তে পারতাম এই নিয়ে। হয়তো জিততামও। যুক্তি ছিলো আমারই পক্ষে। তোমরা বাপু বাহান্ন সালে বরবাদ করেছো আমায়, আর কিনা ট্যাকসো দাবী করো পঞ্চান্ন অব্দি। তা উকিল বললো, লাভ কি। মামলা তো আর বিদেশে বসে লড়া যায় না, সেখানে যেতে হয়। ঢুকতে কি দেবে ওরা আমাকে দেশে?

ভাবলাম, বলি একবার—দেবে না তাতে আমার ভারী বয়ে গেল। কে আর চায় ঢুকতে। কোম্পানী আমি তুলে দিয়েছি, পেছুটান বলতে কিছুই আর নেই। সে অবস্থায় আমার কোন সম্পদের ওপর তো তোমরা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যাও, বসে বসে আঙুল চোষো।

কিন্তু ভেবে দেখলাম, এভাবে বলাটা ঠিক হবে না। দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। যদি এই যে আছি এখানে—সরকারের ওপর পাছে কোনরকম চাপ সৃষ্টি করে। সেটা আমার পক্ষে মোটেই শোভন হবে না। তখন যা হোক একটা থোক টাকা ধরে দিয়ে দিলাম। মিটিয়ে দিলাম সব। তবু ভালো, কিছু দিয়ে ঝামেলা তো মিটলো।

সব কিছুর শেষই বড় দুঃখের। আমেরিকা থেকে শেষ সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার ব্যাপারেও। বড় কষ্ট পেয়েছি সেই সময়টায়। হেলেন তো আশা নিয়ে বসে ছিলো

ফিরে যাবো আমরা একদিন। বেভারলি হিল্‌সে আমাদের সারাক্ষণের কাজের মেয়ে হেলেন। যখন বুঝলো আর ফিরবো না কোনদিন, এই চিঠিখানা লিখেছিলো অসীম অনন্ত বেদনা নিয়ে—

প্রিয় চ্যাপলিন,

এ পর্যন্ত অ-নে-ক অনেক চিঠি লিখেছি আপনাদের। ডাকে দেওয়া হয় নি। তাই আপনাদের হাতে পৌঁছবার প্রশ্নই ওঠে না। কত যে লিখতে মন চায়। অনেক যে কথা। সব তছনছ হয়ে গেলো আপনারা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। স-ব। দুঃখে বুক আমার ভেঙে যায়। অসহ্য সেই কষ্ট। বিশ্বাস করুন আর কারুর জন্যে কোনদিন (শুধু নিজের পরিজন ছাড়া) এতো দুঃখ পাই নি। সবই যেন কেমন। যেন ভীষণ অনিয়ম, অন্যায় ভুল, মিথ্যে—আরো অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে পারছি না। এ কষ্ট আমার সহ্যের সীমার বাইরে। শেষমেশ যে খবর পেলাম তা যেন আরো আ-রো করুণ, আরো বেদনাদায়ক। শুনলাম আমাদের এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। কেমন করে যাবো? এ যে অসম্ভব। ভাবতে পারছি না একদম। ভাবতে গেলেই বুক ঠেলে দুমড়ে মুচড়ে আসে কান্না। কাঁদি তখন। আর কত কাঁদবো বলুন? একটা অনুরোধ মিসেস চ্যাপলিন, দোহাই আপনার—কর্তাকে মানা করুন, যেন বাড়ি না বিক্রী করেন। যেন বিক্রীর কথা মোটেও না ভাবেন। কি হবে তাহলে আমাদের গতি? এই ঘর দোর—এর যে বড় মায়া, বড় আপন যে আমাদের—কাউকে দেবো না আমি এ বাড়ি ভোগ করতে। বেঁচে থাকতে না। যদি টাকা থাকতো আমার···কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর, যা নেই তা নিয়ে কথা বলা অর্থহীন। দোহাই আপনার, একটু বুঝিয়ে বলুন। কি আর এমন খরচ বাড়িতে? বরং ওদিকের খরচ একটু কমালে এদিকেরটা পুষিয়ে যাবে। দেখুন না একটু হিসেব নিকেশ করে। আর দোহাই, বেচবেন না বাড়ি। আমার অনুরোধ, আমার মনের একান্ত ইচ্ছা। হয়তো ভাবছেন অহেতুক প্রলাপ। হয়তো ভাবছেন যা বলা উচিত নয় মেয়েটা তাই বলছে। ভাবুন তাই, আমার কোন দুঃখ নেই, তবু বাড়ি থাকুক। এমন তো নয় কোনদিন ফিরতে পারবেন না। একদিন না একদিন আসবেন। এ তো আপনাদেরই রইলো। উঠবেন আবার এখানে। একটু ভেবে দেখুন। এই নিয়ে আরো তিনখানা চিঠি আমার তৈরী। সেগুলো আরো বড়। পাঠাতে বড় বড় খাম লাগবে। হাতের কাছে জুটলো না। তাই এখানাই পাঠালাম। আর কি? কি লিখতে কি লিখলাম জানিনা। মার্জনা করবেন। ইতি—

হেলেন।

এবার পাঠক, আমাদের খানসামা হেনরির চিঠিখানা তুলে দিলাম। হুবহু এইরকম—

প্রিয় শ্রী ও শ্রীমতী চ্যাপলিন,

চিঠি লিখতে ভয় হয়, লিখিনা তাই। কে জানে পাছে ভাষার গোলমাল হয়, যদি বেরিয়ে যায় আমার নিজের দেশের ভাষা। জমা আছে মনের গহনে কত কথা। সুখ দুঃখের মিশ্র অনুভূতি। এই যেমন সেদিন। বড় আনন্দে কাটলো কিছুক্ষণ। লাইমলাইট দেখার সুযোগ পেলাম। ঘরোয়া প্রদর্শনী। আমাকে খবর দিয়েছিলেন রান্সার—আপনি চিনবেন হয়তো মেয়েটিকে। মোট বিশ বাইশ জন। চিনি না সবাইকে। শুধু সিডনী চ্যাপলিন, তার বৌ, রান্সার আর রলি আমার পরিচিত। এক ধার করে বসেছিলাম। ওরা বললো সামনে বসতে। যাই নি। একা বসলে ভালো ভাবে ছবির প্রতিটি দৃশ্য উপভোগ করতে পারবো, খুটিয়ে দেখার সুযোগ পাবো। দেখলামও সেইভাবে। জানিনা সত্যি কিনা, তবে আমার মনে হয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলাম সেদিন একমাত্র আমিই। বারে বারে। আর চোখের জলও ঝরিয়েছি। সে-ও অনেকখানি। অনবদ্য আপনার সৃষ্টি। আমি অভিভূত। এমন ছবি আগে আর কখনো দেখিনি। এ আমি হলফ করে বলতে পারি। ওরা এমনই অপদার্থ—লস এঞ্জেলেসে ছবি দেখাবার মোটে অনুমতিই দিলো না। তবে রেডিওতে সুর বাজায়। আপনার সুর। তন্ময় হই। যতবার শুনি ততবার। বিহ্বল বিবশ হয় হৃদয়। ওরা কিন্তু ভুলেও বলে না কখনো এর স্রষ্টা আপনি। নামটুকু উচ্চারণ করতেও যেন ওদের জিভে আটকায়। সে যাই হোক, ছেলেমেয়েদের ভালো লেগেছে সুইজারল্যাণ্ড, জেনে সুখী হলাম। ভালো তো লাগবেই। সেরকমই যে পরিবেশ। তবে বড়দের একটু অসুবিধে হয়। সেটা গোড়ার দিকে। হাজার হোক বয়েসটা তো সব ক্ষেত্রেই বাধা। বাচ্চাদের পক্ষে স্বর্গপুরী সুইজারল্যাণ্ড। এমন স্কুল আপনি আর কোথাও পাবেন না। এমন আবহাওয়া। আর তাছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো প্রজাতন্ত্রী দেশ। এখানে যেমন পয়লা আগস্ট, ওখানে চৌঠা জুলাই। স্বাধীনতা দিবস। ছুটির দিন নয়। কাজের দিন। শুধু চিনতে পারবেন আপনি রাতে পাহাড়ের মাথায় আগুনের রোশনাই দেখে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ঐ বিশেষ দিনটিকে উপলক্ষ্য করে। খুব নিয়মতান্ত্রিকতা। একটু খেয়াল করলেই নজরে পড়বে। আঠেরো সাল অব্দি ছিলাম আমি দেশে। তারপর এখানে চলে আসি। গিয়েছিলাম তারপর মাত্র দুবার। সৈন্যদলেও ছিলাম। আমার জন্ম সেণ্ট গ্যালেনে। গিয়েছেন নিশ্চয়। আমার এক ভাই এখনো ওখানেই আছে। আর এক ভাই বার্ণে। আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালবাসা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করি। ইতি—

হেনরি

এরা সকলেই এই কিছুদিন আগে অব্দি আমার কাছ থেকে নিয়মিত বেতন পেতো।

মোটে এই দুজন নয়। সবাই। কালিফোর্নিয়ার বাড়ির কাজে যাদেরকে বহাল করেছিলাম প্রত্যেকে। কিন্তু তা তো আর অনন্তকাল চলতে পারে না। বিশেষ করে আমি যখন এখানেই স্থায়ী বাসিন্দা। সম্ভবও নয়। সেই ভাবেই ব্যবস্থা হলো। চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে এককালীন হারে বোনাস দিলাম। সাকুল্যে আশি হাজার ডলার। এড্‌না পারভিয়েন্সও বোনাসের আওতা থেকে বাদ নয়। শুধু বিশেষ ব্যবস্থা তার জন্য। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাকে আমি নিয়মিত বেতন দিয়ে গেছি।

'মঁসিয় ভার্দু' তোলার সময় এডনাকে ভেবেছিলাম গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা দেবো। মাদাম গ্রস্‌নে তাকে ভালো মানাবে। খবর দিলাম। বিশ বছর তাকে দেখি না। আসে না তো কোনদিন স্টুডিওতে। ভারী অভিমান। আমি সপ্তাহান্তে স্টুডিও থেকেই বাড়ির ঠিকানায় চেক পাঠাই। তো খবর পেয়ে এলো একদিন। যেন আসতে হয় তাই আসা। উত্তেজনার নামগন্ধও নেই।

আমি তখন সাজঘরে। রোলি এলো ছুটতে ছুটতে। আমার ক্যামেরাম্যান। বিশ বছর তার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ নেই এড্‌নার। বললো, এসেছে। দেখলাম এক চুমুক। কাজ চলতে পারে। তবে সেই মেয়ে আর নেই। এটা খেয়াল রাখবেন।

নাকি ভেতরে আসতে বলেছিলো, আসে নি। বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে খবর দিতে বলেছে।

তা বিশ বছরে আমি মানুষটাও তো পালটে গেছি। আবেগ টাবেগের ধার আর ধারি না। সেই পুরনো আবেগ। বুকের মধ্যে ছলাৎ ছল রক্তের দোলা। খুব সহজ ভাবে এখন তাকে পেতে চাই। আমার ছবির কোন এক অভিনেত্রী হিসেবে। সেই মন নিয়েই বাইরে গেলাম। বললাম, এসেছো ভালো হয়েছে। তোমাকে কদিন ধরে খুব খুঁজছিলাম।

জবাব দিতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপছিল এড্‌নার। আমার নজর এড়ায় নি। তখন আমি খবর দেবার কারণ ব্যক্ত করলাম। ছবির ভূমিকার কথা বললাম। বললো, ভালোই লাগছে। দেখি চেষ্টা করে পারি কিনা।

সংলাপ পড়ে আমাকে শোনালো। মন্দ না। চলনসই। তবে সত্যি বলতে কি, আমারই কেমন যেন লাগছে। এই মনের ভেতরটায়। মনে পড়ছে বারবার পুরনো দিনের কথা। আমার প্রথম দিকের সাফল্যের ইতিবৃত্ত। এড্‌না সাক্ষী তো তার। তাই তার উপস্থিতি মনে পড়িয়ে দেয় সব কিছু।

মহলা দিলো। মন ভরলো না। চাই ইওরোপীয় আদবকায়দা। সেই ভাবেই চরিত্রটি লেখা। পারবে কিভাবে? জানে না যে কিছু। তিন চার দিন এলো। আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করতে বাধ্য হলাম। রাখঢাকের তো কোন ব্যাপার নেই। ছবি যেখানে ভালো করা মূল উদ্দেশ্য। তখন খোলাখুলি ভাবে সহজ হবার চেষ্টা করাই

ভালো। এড্‌না কিন্তু তাতে অখুশী নয় এতোটুকু। বরং সন্তুষ্ট। হাঁপ ছেড়ে বাঁচার সামিল। বন্ধ করলো আসা। তারপর দীর্ঘকালের অদর্শন। খবরও কিছু পাই না। বোনাসের টাকা পেয়ে হঠাৎ লিখলো এই চিঠি—

প্রিয় চার্লি,

প্রথমেই জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার জন্যে যতখানি করেছো, আমাদের অটুট বন্ধুত্বের স্মারক সেই সব কীর্তি—কোনদিন আমি ভুলতে পারবো না। আমার মনে গাঁথা থাকবে সব। মাঝে মাঝে ভাবি, কী অপূর্ব ছিলো আমাদের সেই প্রথম পরিচয়ের দিনগুলি। কিন্তু সে কথা থাক। তুমি সুখী তাইতেই আমি সুখী। পরিবার পরিজন সহ সুখের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করে সার্থক হোক তোমার জীবন। এই আমার কামনা। [এর পরে নিজের অসুস্থতার খবর। ডাক্তার নার্স মিলিয়ে বিরাট খরচের তালিকা। চিঠির শেষ যথারীতি ছোট্ট একটা মজার গল্প দিয়ে। এটা ওর বরাবরের অভ্যেস।]

এইমাত্র একটা গল্প শুনলাম। তোমাকে না শুনিয়ে পারছি না। রকেটে চড়ে একজন চলেছে আকাশ মুখো। উঠছে তো উঠছে। বলা হয়েছে তাকে কত উঁচুতে উঠছে খেয়াল রাখতে। সে গুণছে—পঁচিশ হাজার....ত্রিশ হাজার....এক লাখ.... পাঁচ লাখ....তখন আরো উঁচুতে, সে উচ্চতা গোণার এক্তিয়ারের বাইরে, কি নম্বর হাঁকবে এর? তখন হাঁকলো—প্রভু যীশুর কাছাকাছি....অমনি শোনে কি, কে যেন ভারী মোলায়েম গলায় তার কানের গোড়ায় ফিসফিস করে বললো—এই তো আমি।....

দোহাই তোমার। জবাব দিও। আর ফিরে এসো দেশে। আমার একান্ত অনুরোধ। এসো কিন্তু। ভালবাসা রইলো। ইতি—

এড্‌না

যথারীতি জবাব আমি দিই নি। আমার অভ্যেসের বাইরে। তবে যোগাযোগ রাখতাম। নৈমিত্তিক খবরাখবর। সব আমার স্টুডিওর মাধ্যমে। শেষ চিঠি পেলাম আরো অনেকদিন পরে। বোনাস দেবার পরেও সবার মতো ওর সঙ্গে যে সম্পর্ক চুকিয়ে দিই নি, মাইনে দিয়ে যাই নিয়মিত, তারই প্রাপ্তি স্বীকার প্রসঙ্গে এই লেখা—

প্রিয় চার্লি,

আবারও তোমাকে জানাই আমার হৃদয়ের শুভেচ্ছা। আর ধন্যবাদ। আবার হাসপাতালে ফিরে আসতে হয়েছে। ঘাড়ে নিয়মিত কোবাল্ট রশ্মি দিয়ে চিকিৎসা চলছে। এ যে কী বিদঘুটে ব্যাপার! তবু বললো এটাই আমার সর্বশেষ

চিকিৎসা। এর চেয়ে ভালো চিকিৎসা নাকি আমার এই অসুখে আর নেই। এই সপ্তাহের শেষ দিকেই ওরা ছেড়ে দেবে বলেছে। তারপর মাঝে মাঝে এসে দেখিয়ে যাবো। বরং তা মন্দের ভালো। তবু তো এই কুম্ভীপাক থেকে বাইরে। ওরা তো বলে তেমন একটা ঝঞ্ঝাটের অসুখ নয়। সেরে যাবে। ভারী মিষ্টি ওদের ব্যবহার। আমি কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার সেই ছোকরার কথা।- ব্রডওয়েতে দাঁড়িয়ে একদিন একমনে কাগজ কুচি কুচি করে ছিঁড়ছে আর ছড়াচ্ছে। পুলিস এসে বললো, কি ব্যাপার, আপনি এরকম করছেন কেন? বললো, এমনি। হাতি গুলোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। পুলিস বললো, কোথায় দেখলেন আপনি হাতি? সারা শহরে একটাও হাতি নেই। সে বললো, দেখুন না এর মধ্যে যদি দুটো একটা চলে আসে!

আজ এখানেই শেষ করি। সুখে আছো নিশ্চয়? তোমার পরিবার পরিজন স্ত্রী পুত্র কন্যা—কেমন আছে সবাই? ভালো তো? ভালবাসা নিও। ইতি—

এড্‌না।

এর কিছুদিন পরেই এড্‌না মারা যায়। ভাবি তাই। পৃথিবীর আয়ু ক্রমশঃ সংক্ষেপ হয়ে আসছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। যাবে একদল। আসবে নতুন জীবন প্রবাহ। আমাদের স্থান দখল করে নেবে নতুনেরা। আমরা দুনিয়া থেকে চারপাশের এই জীবন স্রোত থেকে একটু একটু করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। এটাই হয়তো চিরন্তন নিয়ম।

কিন্তু আর না। বন্ধ করি এবার আমার এই মহাভারত। কয়েকটা কথা শুধু বলার আছে। তা আমার জীবন এবং জীবিকার প্রশ্নে। দেখুন, সত্যি বলতে কি, এটা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় না যে সময় এবং পারিপার্শ্বিকতা আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছে। দুনিয়া দিয়েছে দুহাত ভরে আমাকে ভালবাসা আর আদর। দুহাত ভরে আবার সব ছিনিয়েও নিয়েছে। তখন শুধু ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা। সবচেয়ে ভালোর স্বাদও যেমন পেয়েছি, সব চেয়ে খারাপের ছোঁয়াও বাঁচাতে পারি নি। তবে ভালোর অংশটাই বেশি, খারাপ নামে মাত্র, সামান্য। তার জন্য যত দুঃখই আমি ভোগ করি না কেন, এ বিশ্বাস আমার আছে—ভালো আর মন্দ মেঘের মতো একবার আসে একবার মিলিয়ে যায়। এটা জানি বলেই দুঃখ আমাকে টলায় না, কখনো আঘাতে মর্মাহত হই না বা ভালো দেখলে তেমন একটা মাতোয়ারাও হয়ে উঠি না। এ থেকে আমার নিজেরই কখনো কখনো মনে হয়, আমার জীবনের হয়তো নিজস্ব কোন ধাঁচ নেই, নেই কোন দর্শন। তবে সংগ্রাম আছে। কঠোর সংগ্রাম। আমার মনে হয়, পাঠক আপনার অবস্থান যাই হোক না কেন, আপনি মূর্খ হোন কি সাধু হোন—লড়াই করুন। জীবনের লড়াই। বাঁচার জন্যে

সংগ্রাম। যা আমি বলতে গেলে সারা জীবনভর করেছি। তবে দোদুল্যমানতা নিয়েই। কখনো কখনো খুব তুচ্ছ ব্যাপারে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়েছি, কখনো বা বড় কিছুতেও চঞ্চল হই নি। জানি না, হয়তো এই অদ্ভুত বৈপরীত্যই আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছে স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ থেকে। বহুর মধ্যে থেকেও বারে বারে আমি একলা হয়ে পড়েছি।

তবু বলবো, এতো কিছুর পরেও জীবন আমার কাছে এখনও আশ্চর্য রোমাঞ্চকর। আমার শরীর সর্বাঙ্গীন সুস্থ। এখনো আমি আগের মতো সৃজনশীল। আরো ছবি আমি করতে চাই। নিজে হয়তো আর অভিনয় করবো না। লিখবো শুধু আর পরিচালনা করবো। অভিনয়ে থাকবে আমার পরিবার পরিজন। এদের মধ্যে কারো কারো অভিনয়ের দিকে খুব ঝোঁক। এদের নিয়েই রচিত হবে আমার আগামী ভবিষ্যৎ। মোটমাট আমি এখনও আশাবাদী। অবসর নিতে আমার ভীষণ অনীহা। আরো যে অনেক কিছু করার আছে। অ-নে-ক কি-ছু। অনেক অসমাপ্ত চিত্রনাট্য পড়ে আছে বাক্স বন্দী অবস্থায়। সেগুলোকে শেষ করতে হবে। নাটক লেখারও ভারী ইচ্ছে আমার। আর একটা অপূর্ব গীতিনাট্য। অবিশ্যি সময়ের প্রশ্নটা এখন প্রধান। সবই হবে যদি সময় ফুরিয়ে না যায়।

সোপেনহাওয়ার বলেছিলেন, সুখ হলো একটা নেতিবাচক অবস্থা। আমি বলি ঠিক উলটো। আমি মানি না তার কথা। সুখ কি গত বিশ বছর যাবৎ আমি দেখছি। এ এক আলাদা সৌরভ। আমার সৌভাগ্য, উনার মতো স্ত্রী আমি পেয়েছি। অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে হয় উনাকে নিয়ে। অনেক কথা। কিন্তু সংযত করি নিজেকে। যদি লিখি তবে তো আমার হৃদয়ের কথা, আমার প্রেম ভালবাসার কথা সবই প্রকাশ হয়ে গেলো! তবে আর নিজস্ব বলতে কি থাকলো আমার! সত্যিকারের ভালবাসা কি কখনো প্রকাশ করা যায়! আমার মনে হয় সেটা অসম্ভব। আসলে সে সব কথা আমি কোনদিন লিখতে পারবো না। শুধু নীরব দর্শক হয়ে দেখে যাবো। দেখবো দু চোখ ভরে তার চরিত্রের মাধুর্য, তার ভালবাসার গভীরতা। সব একটু একটু করে আমার কাছে নতুন ভাবে প্রকাশ পাবে। এই তো সুখ। এই সুখ তো আমি প্রায় প্রতি-নিয়তই পেয়ে থাকি। বেভির রাস্তা ধরে হাঁটি যখন দুজন পাশাপাশি—আমি আর উনা—নিছকই বৈকালিক বা সান্ধ্য ভ্রমণ, কী যে অপূর্ব লাগে তাকে! অতি সাদাসিধে সাজ, তবু তারই মধ্যে কি যেন এক বৈশিষ্ট্য, ছোট্ট শরীর তবু কী সাবলীল পদক্ষেপ, একমাথা কালো চুলের ভাঁজে ভাঁজে রূপোলী রঙের ঝিলিক—আমার সারা বুক তোলপাড় করে ভালবাসা উপচে পড়তে চায়। দুচোখ ভরে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গলার কাছে কি যেন এক অব্যক্ত বেদনা দলা বেঁধে থাকে। আমি পারি না কিছু মুখ ফুটে প্রকাশ করতে।

এই সুখ নিয়েই কাটে আমার দিন। কখনো মাঠে এসে বসি ঘাসের ওপর। সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে। তার শেষ আভায় ভরে থাকে আকাশ। দূরে দেখা যায় হ্রদের টলটল জল। আরো দূরে ঢেউ খেলানো পাহাড়। স্তব্ধ মৌন বিস্ময় নিয়ে আমি এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। আমার মনে কোন ভাবনা নেই। নেই কোন দুশ্চিন্তার রেশ। শুধু দুচোখ ভরে সেই পবিত্রতা সেই অপরূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছে।

সেই ইচ্ছে নিয়েই আমার সময় কাটে।

শেষ